kIKZ Imgv‡bi †QvUM‡í mgKvj, Rxeb‰ewPÎ¨ I wkíi/c

†gvt Avãi ikx‘
রেজিস্ট্রেশন নং : ১০ ॥ শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯-২০১০
বাংলা বিভাগ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

XvKv wekwe‘¨vj‡qi wcGBP.wW. wWwMi Rb¨ iwPZ Awfm›‘f́
অক্টোবর ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

cZ¨qb-cÎ

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ আব্দুর রশীদ কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত "শওকত ওসমানের ছোটগল্পে সমকাল, জীবনবৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এ অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

(Aa¨vcK W. ˆmq‘ AwRRj nK)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক,
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

mwPcÎ

gLeÜ ৫

fwgKv ৯

c_g Aa¨vq : wewUk Kvjce

প্রথম পরিচ্ছেদ	: ব্রিটিশ কালপর্ব : ত্রিশ ও চল্লিশের দশক।	৩০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	: ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পের জীবনবৈচিত্র্য।	৫১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	: ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পের শিল্পরীতি।	৯৬

wØZxq Aa¨vq : cvwK¯Ívb Kvjce

প্রথম পরিচ্ছেদ	: পাকিস্তান কালপর্ব : পঞ্চাশ ও ষাটের দশক।	১২২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	: পাকিস্তান কালপর্বের গল্পের জীবনবৈচিত্র্য।	১৩৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	: পাকিস্তান কালপর্বের গল্পের শিল্পরীতি।	১৯৫

ZZxq Aa¨vq : evsjv‡`k Kvjce

প্রথম পরিচ্ছেদ	: বাংলাদেশ কালপর্ব : সত্তর, আশি ও নব্বইয়ের দশক।	২১৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	: বাংলাদেশ কালপর্বের গল্পের জীবনবৈচিত্র্য।	২৩০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	: বাংলাদেশ কালপর্বের গল্পের শিল্পরীতি।	২৮৩

Dcmsnvi ৩০৫

MšcwÄ ৩১২

gLeÜ

১

‘শওকত ওসমানের ছোটগল্পে সমকাল, জীবনবৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ’ আমার পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের বিষয়। শওকত ওসমানের ছোটগল্পের সামগ্রিক বিবেচনার অভিমুখ হিসেবে অভিসন্দর্ভটি বিন্যস্ত হয়েছে ভূমিকা ও উপসংহার-অংশ ব্যতীত আরো তিনটি অধ্যায়ে। শওকত ওসমানের ছোটগল্প দেশকালের পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে প্রবহমাণ। তাই, তাঁর গল্পের অনুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের জন্য অভিসন্দর্ভকে ব্রিটিশ কালপর্ব, পাকিস্তান কালপর্ব এবং বাংলাদেশ কালপর্ব-নামে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

ভূমিকা-অংশে ব্যাখ্যাত হয়েছে সমাজ ও সময়ের পরিচর্যায় গঠিত শওকত ওসমান-মানসের দেশকালগত পরিপ্রেক্ষিত; এবং সেই সূত্রে বিশ্লেষিত হয়েছে শওকত ওসমানের ব্যক্তিচেতনা ও সমাজচৈতন্যের আন্তঃসম্পর্ক। প্রকৃতপক্ষে শওকত ওসমানের ছোটগল্প মূল্যায়নের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত রচিত হয়েছে এই অংশে।

অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় : ব্রিটিশ কালপর্বকে তিনটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ : ব্রিটিশ কালপর্ব : ত্রিশ ও চল্লিশের দশক। এ পরিচ্ছেদে বিশ্লেষিত হয়েছে ব্রিটিশ কালপর্বের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত, সমকালীন বাস্তবতায় শওকত ওসমানের অবস্থান এবং তাঁর শিল্পিমানসের প্রবণতাসমূহ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পের জীবনবৈচিত্র্য। এ অংশে শওকত ওসমানের গল্পে বিধৃত জীবনবৈচিত্র্য হিসেবে বিশ্লেষিত হয়েছে ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের বিভীষিকা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক জটিলতা, শোষণ ও শ্রেণিসংঘাত, নারী ভাবনা, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য, মানুষের পেশাজীবী জীবন এবং মানুষের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন। তাছাড়া এ কালপর্বের গল্পে জীবনচিত্র রূপায়ণের প্রবণতাসমূহ বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পের শিল্পরীতি। এ পরিচ্ছেদে বিশ্লেষিত হয়েছে এ কালপর্বের গল্পের প্রকরণবৈশিষ্ট্য।

অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায় পাকিস্তান কালপর্বকেও তিনটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ : পাকিস্তান কালপর্ব : পঞ্চাশ ও ষাটের দশক। এ পরিচ্ছেদে বিশ্লেষিত হয়েছে পাকিস্তান কালপর্বের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত, সমকালীন বাস্তবতায় শওকত ওসমানের অবস্থান এবং তাঁর শিল্পিমানসের প্রবণতাসমূহ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পাকিস্তান কালপর্বের গল্পের জীবনবৈচিত্র্য। এ অংশে শওকত ওসমানের গল্পের জীবনবৈচিত্র্য হিসেবে বিশ্লেষিত হয়েছে দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের রূপ, রাজনীতিমনস্কতা, নর-নারীর সম্পর্ক, মনস্তত্ত্ব বা মানব প্রকৃতি, ধর্ম ও ধর্মতন্ত্র, ভাষা ও শিক্ষা, কৌতুক, হাস্যরসাত্মক বা ব্যঙ্গ, পেশাজীবী মানুষের প্রবণতা ও

রূপকধর্ম। তাছাড়া এ কালপর্বের গল্পে জীবনচিত্র রূপায়ণের প্রবণতাসমূহ বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পাকিস্তান কালপর্বের গল্পের শিল্পরীতি। এ পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হয়েছে এ কালপর্বের গল্পের প্রকরণবৈশিষ্ট্য।

অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশ কালপর্বকেও তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশ কালপর্ব : সত্তর, আশি ও নব্বইয়ের দশক। এ পরিচ্ছেদে বিশ্লেষিত হয়েছে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত বাংলাদেশ কালপর্বের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত, সমকালীন বাস্তবতায় শওকত ওসমানের অবস্থান এবং তাঁর শিল্পিমানসের প্রবণতাসমূহ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশ কালপর্বের গল্পের জীবনবৈচিত্র্য অংশে হিসেবে বিশ্লেষিত হয়েছে তাঁর গল্পে বিধৃত গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ-অবলম্বী, ইতিহাস-আশ্রয়ী, সমাজ-সমস্যামূলক, নর-নারীর সম্পর্ক, মনস্তত্ত্বমূলক বা মানব প্রকৃতি বিষয়ক, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, পেশাজীবী জীবন-আশ্রয়ী ও স্বদেশ-ভাবনামূলক বিষয়সমূহ। তাছাড়া এ কালপর্বের গল্পে জীবনচিত্র রূপায়ণের প্রবণতাসমূহ বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশ কালপর্বের গল্পের শিল্পরীতি। এ অংশে ব্যাখ্যাত হয়েছে এ পর্বের গল্পের প্রকরণবৈশিষ্ট্য।

তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে শওকত ওসমানের ছোটগল্পে সমকাল, জীবনবৈচিত্র্য ও এর শিল্পরীতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তার সারাৎসার বর্ণিত হয়েছে উপসংহার অংশে ।

গ্রন্থিপঞ্জি অংশে অভিসন্দর্ভের ব্যবহৃত শওকত ওসমানের গ্রন্থপঞ্জি, পত্রিকা এবং সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকার তালিকা তুলে ধরা হয়েছে।

শওকত ওসমানের প্রকাশিত পনেরটি গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত একশ বাহাত্তরটি গল্প থেকে একশ পঞ্চাশটি গল্পকে অভিসন্দর্ভের বিষয় এবং শিল্পরূপের আলোচনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভ রচনায় মূলগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে

Dcj ÿ¨ (১৯৬৫), ওয়ার্সী বুক করপোরেশন, ঢাকা।
weMZ Kv‡ji Mí (১৯৮৭), বিউটি বুক হাউস, ঢাকা।
nš ÍviK (১৯৯১), সময় প্রকাশন, ঢাকা।
kIKZ Imgvb MímgM (২০০৩) [সম্পা. বুলবন ওসমান], সময় প্রকাশন, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

2

‘শওকত ওসমানের ছোটগল্পে সমকাল, জীবনবৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ’ শীর্ষক পিএইচ.ডি. গবেষণা-অভিসন্দর্ভ রচনার লক্ষ্যে আমি ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবন্ধনভুক্ত হই। উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি রচিত হয়েছে আমার শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হকের তত্ত্বাবধানে। বিষয়নির্বাচন থেকে শুরু করে গবেষণাকর্মের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ আর নির্দেশনা ছাড়া কাজটি সম্পন্ন করা অসম্ভব ছিল। গবেষণাকালে তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, সস্নেহ সহানুভূতি ও তাগিদ আমার পাঠ-পরিধিকে সমৃদ্ধ এবং অভিসন্দর্ভ রচনাকে সহজতর করেছে। তাঁর সহৃদয় সাহচর্য আমার জীবনের অন্যতম প্রাপ্তি। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিসীম।

অভিসন্দর্ভের শিরোনাম নির্ধারণ এবং অভিসন্দর্ভ-গঠন পরিকল্পনা তৈরির প্রাথমিক পর্যায়ে আমার আরেক শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. সৈয়দ আকরম হোসেন তাঁর সুচিন্তিত মতামত এবং নির্দেশনা দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন। অভিসন্দর্ভ রচনাকালে বিষয়-মূল্যায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আমাকে উৎসাহিত ও চিন্তার সুযোগ করে দিয়েছেন আমার শিক্ষকবৃন্দ— প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিদ্দিকা মাহমুদা, বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল, অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, অধ্যাপক ড. ফাতেমা কাওসার, অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ সালেকীন), অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন (গিয়াস শামীম) এবং স্নেহভাজন সহকারী অধ্যাপক চৌধুরী মোঃ তাশরিক-ই-হাবিব। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এছাড়া যাঁদের সহযোগিতা ও সুচিন্তিত মতামত আমার অভিসন্দর্ভ রচনার পিছনে উৎসাহ যুগিয়েছে তাঁদের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বুলবন ওসমান (চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. অনীক মাহমুদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. চঞ্চল কুমার বোস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. রবিউল হোসেন অন্যতম। তাছাড়াও শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক মোঃ আবদুল মুহিত (বেলগাছি রেলগেট পাড়া, চুয়াডাঙ্গা) ও সহকারী অধ্যাপক মোঃ আবদুল মতিনের (সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ) অবদান স্মরণীয়। এ দুজন আমাকে প্রয়োজনীয় ও দুষ্প্রাপ্য তথ্য এবং পুস্তক সংগ্রহ করে দিয়ে কৃতজ্ঞার বাঁধনে বেঁধেছেন। এছাড়াও যাঁদের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি তাঁরা হলেন, অধ্যাপক মোঃ কামরুজ্জামান (অধ্যক্ষ, সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজ, চুয়াডাঙ্গা), অধ্যাপক পতিত পাবন দেবনাথ (সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ), অধ্যাপক মোঃ আব্দুস সোবহান (সরকারি সিটি কলেজ, যশোর), সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান

শেখ (সরকারি এম.এম. কলেজ, যশোর), বন্ধুস্বজন সহকারী সচিব মোঃ মাহফুজুল ইসলাম শামীম, (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়), সহকারী অধ্যাপক হাসান অরিন্দম (সরকারি কে.সি কলেজ, ঝিনাইদহ), সহকারী অধ্যাপক মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন (সরকারি মহিলা কলেজ, যশোর), সহকারী অধ্যাপক রতন আলী (চৌমুহনী সরকারি এস.এ কলেজ, নোয়াখালি) সহকারী অধ্যাপক মোঃ রবিউল ইসলাম (তালা সরকারি কলেজ, সাতক্ষীরা), সহকারী অধ্যাপক নাজমুল হুসেইন (চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ) ক্যাফেটেরিয়া সুপারিন্টেন্ডেন্ট মোঃ আল-আমীন (জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকা) এবং স্নেহভাজন ছাত্র শামীম হাসান (ঝিনাইদহ)।

গবেষণাকর্মে আমি মূলত ব্যক্তিগত সংগ্রহের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ কাজে গ্রন্থাগার-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতা অনস্বীকার্য।

সহধর্মিণী মাহমুদা আকতার অপরিসীম ধৈর্যে গার্হস্থ্যদায়িত্ব পালন করে আমার অভিসন্দর্ভ রচনাকে সহজসাধ্য করেছেন। তাঁর আন্তরিকতা ও সহযোগিতা স্মরণীয়।

মোঃ আব্দুর রশীদ

fwgKv

বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮) একটি উজ্জ্বল নাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) হাতে বাংলা ছোটগল্পের সার্থক যাত্রা এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী সে সার্থক যাত্রার বিশেষ অংশীদার হিসেবে অন্য গল্পকারদের মতো শওকত ওসমানও বিশেষ অবদান রেখেছেন। বাঙালি সত্তার মর্মমূল থেকে উৎসারিত তাঁর শিল্পিমানস। আত্ম-আবিষ্কারের উন্মেষলগ্নে কথাশিল্পী শওকত ওসমানের সাহিত্যিক মন আবর্তিত হয়েছে এদেশের প্রকৃতি, সমাজ, জীবন ও তার পরিপার্শ্বকে ঘিরে। ফলে, স্বদেশের সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে তাঁর গল্পে। সমাজ ও রাজনীতিসচেতন গল্পকার হিসেবে তিনি সমসময়ের নানামাত্রিক জটিলতাকে অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে তুলে ধরেছেন গল্পের শিল্পভাষ্যে। তিনি বাংলা কথাশিল্পে ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও ছোটগল্পেও যথেষ্ট সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিপুল অভিজ্ঞতা, গভীর জীবনবোধ, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির সমবায়ে তিনি তৈরি করেছেন তাঁর গল্পের ভুবন। সুদীর্ঘ জীবন পথের বিভিন্ন সময়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের বাস্তব সমস্যা সুদৃঢ়ভাবে বিন্যস্ত তাঁর গল্পে। মূলত তাঁর ছোটগল্পগুলো সময়, সমাজ ও দেশকালের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রবহমাণ। ফলে তাঁর গল্পে যুগ-জীবন, যুগ-মানস ও সমাজের বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ করা যায়। গল্পকার তাঁর গল্পে প্রগতিশীল চিন্তাধারার আলোকে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী এবং ধর্মান্ধতার বিষয়গুলোকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। গল্পগুলোতে তিন কালপর্বের (ব্রিটিশ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ) সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে স্থান লাভ করেছে। এছাড়া সাধারণ মানুষ, বঞ্চিত মানুষ, অবহেলিত-নির্যাতিত মানুষের চিত্র এবং দুর্ভিক্ষ, মহাজনি বা জমিদারি শোষণ, নারীর অবমূল্যায়ন, শিক্ষা সমস্যা, মুক্তিযুদ্ধ, পারিবারিক নানা চিত্র, উঁচু শ্রেণির মানুষের বিরুদ্ধে নিচু শ্রেণির মানুষের প্রতিবাদের কাহিনির অনবদ্য রূপায়ণ শওকত ওসমানের বিভিন্ন ছোটগল্পে অসাধারণ শিল্পভাষ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে।

শওকত ওসমান[১] লেখকের সাহিত্যিক নাম। তাঁর পৈতৃক নাম শেখ আজিজুর রহমান। সর্বমহলে শওকত ওসমান নামে পরিচিত হয়ে উঠলেও পেশাগত জীবনে তিনি সমস্ত কার্যাদি সম্পন্ন করতেন শেখ আজিজুর রহমান নামে। নতুন নামে সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ তাঁর লেখাকে যেমন উজ্জীবিত করেছে, তেমনি বিষয় বৈচিত্র্যের সাথে সাথে স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ এবং শিল্প-নৈপুণ্যের সার্থকতা তাঁকে নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্য জগতে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শওকত ওসমানের জন্ম, শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য, ছাত্রজীবন, পেশা-সাহিত্যিক ও ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন দিক উন্মোচনের জন্য তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনাসমূহ[২] বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ-সব রচনা থেকে জানা যায়, শওকত ওসমান তাঁর দাদির হাত ধরে নিজ গ্রাম সবলসিংহপুর গ্রামের মেহেদি-

মহল্লা এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম-প্রতিবেশের সান্নিধ্যে আসেন এবং প্রত্যক্ষ করেন জন-জীবনের বিচিত্ররূপ। শৈশবে লেখক দাদির নিকট থেকে শুনেছেন রূপকথা, উপকথা, পুঁথি, স্বগ্রাম-পাশ্ববর্তী গ্রাম জনপদের বিচিত্র কাহিনি। বাল্যকাল থেকেই গল্পকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর-জনপদের হাজারো সুখ-দুঃখ, ভাঙা-গড়ার ইতিহাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এ-প্রত্যক্ষ সমাজ-ইতিহাস-অভিজ্ঞতা কিশোর শওকত ওসমানের চিত্তজগতে বহুমাত্রিক শিক্ষা ও প্রেরণার সঞ্চার করে। এ-বিষয়ে লেখকের বক্তব্য উদ্ধারযোগ্য :

> অতি সাদাসিধা মানুষ, এক থেকে বিশ পর্যন্ত গণতে পারতেন না। পাঁচ বা দশের হিসাবে চলতেন। বলাবাহুল্য, তিনি নিরক্ষর। গোলগাল প্রশান্ত মুখাবয়ব। যখন তিনি কারো দিকে চাইতেন, মনে হতো তাঁর স্নেহবিগলিত... ঝরে পড়ছে। কারো খারাপ আচরণে তিনি চেতে উঠতেন না। ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন আমার গোটাপৃথিবী। মার চেয়ে বিশেষ প্রিয়জন, বায়না-আবদারের ক্ষেত্রভূমি।...ছেলেবেলায় দাদির সঙ্গে গ্রামের পথে হাঁটা মানে নানা অভিজ্ঞতা। (শওকত, ২০০৭ ক : ১৭)

শওকত ওসমান শৈশবে একদিকে যেমন দাদির স্নেহসিক্ত হয়ে সমকালীন নানামাত্রিক অভিজ্ঞতার সাথে পরিচিত হয়েছেন— অন্যদিকে মায়ের কোমল ও কঠিন অনুশাসনের মধ্য দিয়ে বিদ্যাভ্যাস করেছেন। তাছাড়া মায়ের আগ্রহে-প্রশ্রয়ে-শাসনে তিনি সাধারণ মানুষজন ও বহির্জগৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। ফলে মায়ের স্নেহ শওকত ওসমানের জীবন-চেতনাকে দিয়েছে ভিন্নতর মাত্রা। মায়ের স্নেহ-শাসন তাঁর গল্পের আবেগকে শিল্প-শাসনে বাঁধতে শক্তি যুগিয়েছে; যা পরবর্তীকালে লেখকের জীবনের সঙ্গে অনিবার্য সম্পর্কসূত্রে সাহিত্যিক মানস গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর লেখকসত্তা গঠনে শৈশব-কৈশোরের অর্জিত অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে এবং এর সাথে যুক্ত হয়েছে জগৎ ও জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গ। তবে লেখকের গল্প বলার ঢঙ বা উপস্থাপন কৌশলটি সম্ভবত মাতৃসূত্রে প্রাপ্ত। লেখক জানাচ্ছেন :

> তবে মার গল্প বলা সবচেয়ে ভালো লাগতো। মেজাজ কড়া তার। লেখাপড়ার বেলা তো আগুন। কিন্তু গল্প বলতেন চমৎকার। গাঁয়ের ভিতর নানা কাণ্ড হয়। আকসাআক্‌সি দুই ভায়ে বা দুই সতীনে– এসব মা বড় সুন্দর বয়ান করতেন। কিন্তু সে গল্প রূপকথা নয়। গাঁয়ের কাহিনি। ব্যক্তি-ভিত্তিক, ঘটনা -ভিত্তিক। নিজের পাড়ার বিশ্লেষণ, কে কেমন ধরনের মানুষ বা আচার ব্যবহারে কি পরিচয় পাওয়া যায়, তা সুন্দর বয়ান করতেন। (শওকত, ২০০৭ ক : ৪৪)

দাদির রূপকথার জগৎ ছেড়ে বস্তু ও বাস্তব জগতে অনুপ্রবেশ করতে মায়ের এ মেজাজ, জীবনদৃষ্টি উত্তরোত্তর তাঁকে সাহিত্যের পথে চালিত করেছে এবং মানুষ-মানবসমাজকে বুঝতে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। কালিকভাবনা লেখকের মানসচেতনাকে প্রভাবিত করে শিল্পচেতনার পথ ধরে এগিয়ে গেছে। এর ফলে তিনি মন থেকে অন্ধসংস্কার-অন্ধবিশ্বাস, গোঁড়ামির শেকড় ঝেড়ে ফেলে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পথ ধরে মানুষের সেবার ব্রত গ্রহণ করেছেন সাহিত্য রচনার মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

লেখকের অসাম্প্রদায়িক মানস গঠনে নিজগ্রাম সবলসিংহপুর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। তিনি লিখেছেন– "দাদির কল্যাণে গ্রামের বিভিন্ন হিন্দু পাড়ার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। অনেককে আমি চিনতাম সেই বয়স থেকে ভূপতি মান্না, সাধু পোড়ে, বিহারী পোড়ে প্রমুখ। মুসলমান যে কটা পাড়া ছিল খালের এপারে প্রায় আত্মীয়তায় বাঁধা। সংলগ্ন হিন্দু বাড়ি। আত্মীয় নয় কিন্তু প্রতিবেশী তো।...পাড়ায় একটা মেলবন্ধন ছিল। বিয়ে-শাদি উপলক্ষে দাওয়াত করতে হয়। তা প্রায় বাধ্যতামূলক ব্যাপার।" (শওকত, ২০০৭ ক : ৩৯) গল্পকার বাল্যকালে নিজ গ্রাম-প্রতিবেশে প্রত্যক্ষ করেছেন বহু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ও বিচিত্র জনস্রোত। প্রত্যক্ষ করেছেন নানা সম্প্রদায়ের মানুষের একত্রে বসতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে গ্রামকে অভিন্ন আত্মিক বন্ধনে বেঁধে আত্মীয় পল্লি গড়ে তুলতে। ধর্ম সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠতে লেখকের এ জীবনাভিজ্ঞতা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে– যা তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে নানামাত্রিকতায়। শওকত ওসমান ছিলেন সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মনের অধিকারী। বাঙালি মুসলমান সমাজের ধর্মান্ধতার কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন এবং সাথে সাথে শঙ্কাও প্রকাশ করেছেন– "জীবন সায়াহ্নে নয় গোধূলি লগ্নে এসে নিজ সম্প্রদায়ের অন্ধতা দেখে যন্ত্রণা বাড়ে, যেহেতু আমার শোনিতের শোনিত, আমার অস্থির অস্থি-আমার সন্তান-সন্ততি, দৌহিত্র-পৌত্রেরা এই ভূখণ্ডে বাস করবে? অমানুষের অরণ্য, নৈতিকতাহীনতার জঙ্গল এ মানুষের লোকালয় নয়।" (শওকত, ২০০৭ ক : ১৫৬-১৫৭)

শওকত ওসমান নিজের জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার খনাকুল থানার অন্তর্গত সবলসিংহপুর গ্রামের মাদ্রাসায় লেখাপড়া (১৯২৬-১৯২৯) শেষে ১৯২৯-এ ভর্তি হন কলকাতার মাদ্রাসা-এ-আলিয়ায়। এ প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের অসংখ্য পুস্তক ছিল লেখকের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে থেকে তিনি অধ্যয়ন করেছেন ইংরেজ লেখক চার্লস ডিকেনস (১৮১২-১৮৭০)-এর G †Uj Ae U wmwUR, রুশ গল্প এবং উপন্যাস– "তবে বিশেষ পাঠ্য ছিল কবিতা, কবিতা পড়াই ছিল নেশা।" (শওকত, ২০০৭ ক : ১৯৭) তিনি বিশেষ করে অধ্যয়ন করতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাসমূহ। গ্রন্থাগারের বৈচিত্র্যধর্মী অসংখ্য গ্রন্থ এবং কবিতা পড়ার নেশা ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে লেখকসত্তার ভিত গড়ে তোলে। কবিতার প্রতি শওকত ওসমানের আগ্রহ দেখে তাঁর এক সহপাঠী আবু নসর মহাম্মদ তবীর তাঁকে বারবার উৎসাহ যুগিয়েছেন– "তুমি কবিতা লেখো না কেন?" (শওকত, ২০০৭ ক : ১৯২)– এ উক্তির মধ্য দিয়ে। শওকত ওসমানের মানস জগতে লেখালেখির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলেও তা এ-পর্যন্ত প্রকাশের অনুকূল পথ খুঁজে পায়নি– কিন্তু অবশেষে বন্ধুর হৃদয়ভেদী উষ্ণ উৎসাহে সাহিত্যের ভুবনে প্রবেশ করতে তাঁর আর কোনো দ্বিধা-বাধা বা পিছুটান থাকে না। পরবর্তীকালে তিনি স্কুল ম্যাগাজিনে কবিতা প্রকাশ করে বন্ধুমহলে 'কবিসাব' (শওকত, ২০০৭ খ : ৬৪) উপাধি লাভ করেন। শওকত ওসমানের স্বীকারোক্তি :

> সহপাঠীদের মধ্যে কয়েকজন আমার আজীবন সহচর হয়ে আছে। কোনো না কোনো ভাবে তারা আমাকে মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার উপাদান যুগিয়েছে। তাঁদের আমি চিরকাল স্মরণ করব। লেসারগঞ্জের আবু নসর মহাম্মদ তবীর আদৌ ভুলে যাওয়া দায়। নিজে আর সাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেনি, কিন্তু আলিবাবার

> মতো রত্নগুহার খবর সে আমাকে দিয়েছিল। আমার সাহিত্য সাধনা কবিতা দিয়েই শুরু হয়। আজ আমি নিছক গদ্য লেখক রূপে পরিচিত। (শওকত, ২০০৭ খ : ১৯৮)

শওকত ওসমান কবিতা দিয়ে সাহিত্য সাধনা আরম্ভ করলেও পরবর্তী সময়ে প্রতিশ্রুতিশীল কথাসাহিত্যিক হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় স্কুল ম্যাগাজিনে। লেখক উদ্ধৃত করেছেন— "সহপাঠী আবু নসর তবীর যে কবিতার সবক ও নেশা ধরিয়েছিল ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় তা ছুটে যায়নি। কিন্তু মন টানতো গদ্যের দিকে। কারণ, মাথার ভেতর নানা জটিল চিন্তার রেশ সচল। গল্প লিখেছিলাম ম্যাগাজিনে ১৯৩৩ সনে। তারপর গদ্যের প্রতি আর তেমন টান ছিল না। কিন্তু তাঁতিবাগান রোডে থাকার সময় আবার গদ্যে কিছু লেখার তাগিদ পেলাম ভেতর থেকে।" (শওকত, ২০০৭ খ : ১৮৫)

১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত শওকত ওসমান কলকাতার বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিত করেছেন। তিনি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে এবং কলকাতার কমার্স কলেজে পেশাগত সময়ে ধর্মতলা, ২/১ই তাঁতিবাগান লেন, ধুকাড়িয়া বাগান, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হোস্টেল, বোডিং হাউজ ও বাংলাভাগের সময় অবস্থান করেন বিখ্যাত বেকার হোস্টেলে। বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থানের কারণে তিনি বিচিত্র ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন— যা পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্যের উপকরণ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

১৯৩৩ সালে কলকাতার মাদ্রাসা-এ-আলিয়া থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৯৩৪ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলে লেখকের মানস জগতে বিশাল পরিবর্তন সাধিত হয়। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পূজনীয় কয়েকজন শিক্ষকের সাহচর্য এবং তাদের যৌক্তিক ব্যাখ্যা গল্পকারের অন্তর্জগতকে অসাম্প্রদায়িক চিন্তায় আলোকিত করেছিল। এদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ফাদার ব্রায়ান অন্যতম ছিলেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়নকালে শওকত ওসমান কলকাতার তাঁতিবাগান এলাকায় এক আত্মীয়ের বাসায় অবস্থান করতেন। সে পাড়ার হিন্দু-মুসলানের সহাবস্থান তাঁর অসাম্প্রদায়িক মানস গঠনে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করে— "পাড়ায় পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমান পরিবার। মেলা মেশার এই আবহাওয়া আমাদের বড় নিশ্চিন্তে রেখেছিল।" (শওকত, ২০০৭ খ : ১৬৮) শওকত ওসমান জীবনাচরণ ও সংস্কৃতিচর্চার মধ্যেই খুঁজেছেন জীবনের গভীর সত্যকে এবং উপলব্ধি করেছেন মানুষের শাশ্বত কল্যাণকর দিককে। তাই তিনি সহজেই স্ব-পরিবেশ থেকেই আহরণ করেছেন মানবতাবাদী রূপকে। বলা বাহুল্য, স্ব-গ্রামের অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের মানবতাবাদী যৌক্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং কলকাতায় বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নকালে অসাম্প্রদায়িক সহাবস্থান— এ ত্রিমাত্রিক অভিজ্ঞতা লেখকের মুক্ত জীবনবোধে উত্তরণে যুগপৎ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। এরই ফলে তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয় এক

ধরনের সমগ্রতাবোধ এবং মনুষ্যত্ববোধের চেতনা। এ চেতনাবোধই পরবর্তীকালে তাঁর শিল্পসৃষ্টির উপকরণ হিসেবে বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ছিল লেখকের কাছে "এক নতুন মহাদেশ আবিষ্কার। কত বড় তার জ্ঞানের ল্যান্ডস্কেপ।" (শওকত, ২০০৭ খ : ৫৭) এ প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষ এবং গ্রন্থাগার ছিল শওকত ওসমানের কাছে সমান আকর্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ফাদার ব্রায়ান তাকে সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী করে তোলেন এবং এখান থেকেই তিনি সাহিত্য রচনার উৎসাহ অনুভব করেন। লেখক স্মরণ করেছেন— "খ্রিস্টান পিতৃপ্রতিম অধ্যাপকদের মধ্যে ফাদার ব্রায়ানের কথা পূর্বে উল্লিখিত। শেকস্‌পীয়রের সাহিত্যরাজ্যে প্রবেশের শুলুক সন্ধান যাঁর কাছে পেয়েছিলুম। বাঙালি অধ্যাপকদের মধ্যে বড় সন্নিকট হয়েছিলেন শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যের মানুষ। তখনই কবিতার বই বেরিয়েছে KwU‡ii Mvb। তাছাড়া সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্যে পাক্ষিক সভা এবং প্রবন্ধ রচনা প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় তাঁর উৎসাহ ছিল প্রচুর। মানসিকভাবে একই প্রবণতা তখন আমার মধ্যে সঞ্চারিত। মনে হতো আমাকে লিখতে হবে। কী লিখব বা কী লেখা উচিত— এসব প্রশ্ন তেমন জাগত না। লিখতে হবে আমাকে— এই চিন্তাই ছিল আসল।" (শওকত, ২০০৭ খ : ৬২-৬৩) সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সাহিত্যিক পরিমণ্ডল এবং শিক্ষকদের সান্নিধ্য লেখকের সঞ্চরণশীল মনে লেখার ভুবনে অনুপ্রবেশের জন্য সঞ্জীবনীশক্তির উৎস খুলে দেয়।

শওকত ওসমান যখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন রাজনৈতিক স্রোতধারায় ছিল বামপন্থি চেতনার প্রভাব। তাঁর যে সমস্ত গল্পে সমাজতান্ত্রিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়— তার ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছিল মূলত এ কলেজে অধ্যয়নকালে। গল্পকার উল্লেখ করেছেন— "সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের চার বছর ১৯৩৪-৩৭ আমার নিকট যেন কোনো দৈব-অনুগ্রহ। সহপাঠীদের মধ্যে মনসুর হবীবের সাহচর্যে প্রচণ্ড উপকৃত হই।...আমার ভেতরের মানস যেন সে উসকে দিয়েছিল।...কলেজের বিশাল জ্ঞান-প্রাঙ্গণের চত্বরে তাকে পাওয়া গিয়েছিল। মার্কস্‌বাদের কাছে টেনে এনে মনসুর আমার যেন খোলস ছাড়ার প্রস্তুতি ঘটায়।" (শওকত, ২০০৭ খ : ৪৯) সৈয়দ আবুল মনসুর হবীবুল্লাহ-র সৌজন্যে লেখক লাভ করেন সে সময়ে সরকারিভাবে নিষিদ্ধঘোষিত কার্ল মার্কস্‌ (১৮১৮-১৮৮৩) এর Kg¨wb÷ g¨wb‡d‡÷v (১৮৪৮) গ্রন্থটি। Kg¨wb÷ g¨wb‡d‡÷v গ্রন্থপাঠে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের ভাবনা শওকত ওসমানকে মার্কস্‌বাদের প্রতি প্রবলভাবে আগ্রহী করে তোলে। এসময় লেখকের সহপাঠী দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও মনসুর হবীব তাঁকে মার্কসবাদী সাহিত্য অধ্যয়নে সাহায্য করেন। ফলে মার্কস্‌বাদের প্রভাব এবং ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অধীনে চলমান সমকালীন রাজনৈতিক ঘূর্ণিস্রোত লেখককে সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের দিকে আকৃষ্ট করে। আর এভাবে শওকত ওসমানের শিল্প-সাহিত্যে মার্কস্‌বাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে— যা গল্পকারের জীবনেতিহাস থেকে উদ্ধৃত করা যায় :

> মার্কস্‌বাদের উৎস তো দর্শন। তারপর ইতিহাস, অর্থনীতি ও অন্যান্য দিকে বিচ্ছুরণ। রাজনৈতিক চেহারার সঙ্গে আমার প্রথম মোলাকাত।...আমার ভেতরে চিন্তার ঝড় বয়ে যেতে লাগল প্রায় প্রতিদিন। এই দুনিয়া বদলানো যায়। কোনো সমাজ-ব্যবস্থা চিরস্থায়ী নয়। বিবর্তনের ধারা একটি যায় একটি আসে। মানুষের যাযাবর যুগ, বন্য যুগ শত শত বছর টিকে ছিল। পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামই তাকে পথ দেখায়। মানুষের বড় অসহায় তার হাত ও হাতিয়ার। পরিবেশকে অনুকূলে আনতে গিয়ে মানুষের হাতিয়ার বদলাল না শুধু চিন্তার মধ্যেও পরিবর্তন এলো। দাস যুগ, ফিউডাল যুগ, বর্তমান পুঁজির যুগ। ধাপে ধাপে এগোনোর যুক্তি একটা ছোট পুস্তিকার মধ্যে ঠাসা। সব বুঝে ওঠার মতো ধীশক্তি ছিল না, আজ স্বীকারে কোনো দোষ নেই। কিন্তু বদলানোর প্রস্তাবই এই ভাবাদর্শের আসল শক্তি। (শওকত, ২০০৭ খ : ৫৪)

এখানে স্মরণযোগ্য, কলকাতার মাদ্রাসা-এ-আলিয়া থেকে শওকত ওসমান বন্ধুদের উৎসাহে এবং নিজের আন্তর্তাগিদে কবিতা রচনার যে প্রেরণা অনুভব করেছিলেন তা এ-সময় প্রকাশের উত্তম পথ খুঁজে পায়। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে শওকত ওসমানের প্রথম সাহিত্যকর্ম 'দিনের কবিতা' 'বুলবুল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মূলত শওকত ওসমানের লেখকসত্তা বিকাশের বা প্রকাশের প্রাথমিক মাধ্যম হিসেবে 'সওগাত', 'মাসিক মোহাম্মদী', 'দৈনিক আজাদ', 'বুলবুল' পত্রিকা, পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ, পত্রিকাকেন্দ্রিক এবং কলকাতাকেন্দ্রিক সমকালীন লেখকগোষ্ঠী বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এ সময় যে সমস্ত স্বনামধন্য সাহিতিকের সাথে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে তাঁদের মধ্যে আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯), মুহাম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার (১৯০৬-১৯৬৬), আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮), আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৬), গোলাম কুদ্দুস (১৯১৭-২০০৬), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), আবু রুশ্‌দ (১৯১৯-১৯১০), আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ (১৯২২-১৯৭১), সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৯২৩-১৯৮৬), শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭), আলাউদ্দীন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এটা প্রমাণিত সত্য যে— শিল্পিসত্তার বা "ব্যক্তিপ্রতিভার বিকাশসাধনে সক্রিয় উপাদানগুলোর মধ্যে ব্যক্তিত্বসান্নিধ্য অন্যতম। বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মহৎ অর্জনসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়জনিত উত্তাপে কোনো শিল্পিমানসে সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি, অভিরুচিগঠন ও স্বনির্ভরতা অর্জন সহজসাধ্য হয়।" (আজিজুল, ১৯৯৮ : ২৮) শওকত ওসমানের শিল্পিসত্তার বিকাশে, সাহিত্যের বৈচিত্র্যপ্রয়াসে এবং পরিপুষ্টিদানে ব্যক্তিপ্রভাব যে সক্রিয় ভূমিকা প্রতিপালন করেছে তা স্বচ্ছন্দে অনুমেয়।

১৯৪০ সালে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় 'সাহিত্যিক কড়চা' নামে শওকত ওসমানের একটি গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্যিক কড়চা' রচনাটি প্রকাশের পর আবুল কালাম শামসুদ্দীন শওকত ওসমানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত চমৎকার রচনাশৈলী সমন্বিত এক শিল্পিসত্তাকে। এ সময় আবুল কালাম শামসুদ্দীন শওকত ওসমানকে "আপনি গদ্য লেখেন না কেন ? তা-ও দেখছি আপনার হাতে বেশ খোলে।" (শওকত, ২০০৭ খ : ২২৪)— এ জাতীয় বাক্যের মধ্য দিয়ে গদ্য লেখার জন্য অনুপ্রাণিত করেন।

শওকত ওসমান সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি.এ. পাস (১৯৩৯) করেন এবং ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। যখন তিনি এম.এ. পড়েন তখন থেকেই কলকাতার সাহিত্য মহলে তাঁর অবারিত যাতায়াত আরম্ভ হয়। ১৯৪০-১৯৪১ সালে সাহিত্যিক আবু রুশ্‌দের পৈতৃক নিবাস কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকায় কর্নেল বিশ্বাস রোডের বৈঠকখানায় 'কালচারাল মজলিস' নামে নিয়মিত একটি সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হতো। শওকত ওসমান এ আসরের একজন নিয়মিত সদস্য ছিলেন। আবু রুশ্‌দের সাংগনিঠক তৎপরতায় কাজী নজরুল ইসলাম 'কালচারাল মজলিস'-এ উপস্থিত হয়ে 'রসলোক' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় বিদ্রোহী কবি বলেন— "শিল্পী জগতের সকল অলিগলির ভেতর জড়িয়ে থাকবেন। কিন্তু তাঁর শিল্পের ধর্মে তাকে জাগতিকতার উর্ধ্বে উঠতে হবে। এবং সেখান থেকেই তিনি আবার মানুষের কাছে নেমে আসবেন। নদী সমুদ্রের জল পৃথিবীর মাটিসংলগ্ন। কিন্তু এই জল মেঘরূপে আকাশচারী হয়। তারপর নেমে আসে বর্ষণ-ধারায় এবং পৃথিবী শস্যশ্যামল হয়ে ওঠে।" (আজাদ, ২০০০ : ১৭) এছাড়াও লেখক ১৯৪১ সালে সুফী জুলফিকার হায়দারের কলকাতার ৮৪ নং ঝাউতলার বাসাতে বিদ্রোহী কবির উপস্থিতিতে আরেকটি ঘরোয়া বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকের কোনো এক অবসরে লেখক বিদ্রোহী কবির দিকে কিছু লেখার অনুরোধসহ একটি নোট বই এগিয়ে দেন। কবি সে মজলিসে শওকত ওসমানকে আশীর্বাদসূচক একটি কবিতা[৩] রচনার মধ্য দিয়ে তাকে সাহিত্যের প্রতি আরও বেশি অনুপ্রাণিত করে তোলেন। শওকত ওসমানের মানস গঠনে কাজী নজরুল ইসলামের সান্নিধ্য, 'কালচারাল মজলিস'-এর বক্তৃতা, ঘরোয়া বৈঠকের আলোচনা, আশীর্বাদসূচক কবিতা নিঃসন্দেহে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। এ-সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য এখানে উদ্ধারযোগ্য :

> আপসহীন-অকুতোভয় শওকত ওসমান পলে পলে প্রতিবাদী চেতনাকে লালন করে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গেই যেনো অর্জন করেন নজরুল ইসলামের বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহী চেতনার উত্তরাধিকার। (আজাদ, ২০০০ : ১৫)

এখানে উল্লেখ্য যে, শওকত ওসমান বি.এ. পাস করার পর প্রয়োজনের তাগিদে অস্থায়ীভাবে কাজ করেন "করপোরেশনের পানি-সরবরাহ বিভাগে কয়েক হপ্তা কেরানিপদ-এ এবং গ্রামের জুনিয়র মাদ্রাসার হেডমাস্টারি" (শওকত, ২০০৭ খ : ২৯৮) পদে। ১৯৪১ সালে তথ্য বিভাগের একজন অনুবাদক হিসাবে এবং ১৯৪২ সালে (?) আবুল মনসুর আহমদ সম্পাদিত 'কৃষক' পত্রিকায় যোগদানপত্র ছাড়া চল্লিশ টাকা মাসিক চুক্তিতে গোপনে খণ্ডকালীন সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন। এরপর তিনি ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতা গভর্নমেন্ট কমার্স কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষকের পদ অলঙ্কৃত করেন। শওকত ওসমান অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের সন্তান হওয়াতে জীবন এবং জীবিকার প্রয়োজনে প্রতিটি পরীক্ষার জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। এর ফলে একদিকে একনিষ্ঠ অধ্যয়নস্পৃহা ও অক্লান্ত জ্ঞানচর্চা তাকে পরীক্ষাতে ভালো ফল করতে সাহায্য করে, অপরদিকে তাঁকে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতেও সহায়ক

ভূমিকা রাখে। বলা যায়, সরকারি কলেজে চাকুরির সূত্রে তাঁর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়াতে সাহিত্য সাধনার পথ আরও বেশি প্রশস্ত হয়।

চল্লিশের দশককে শওকত ওসমানের সাহিত্য সাধনার প্রথম পর্যায় হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এ সময় তাঁর কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মুসলিম কবিদের কবিতাসংগ্রহ আবদুল কাদির (১৯০৬-৮৫) ও রেজাউল করিম সম্পাদিত Kve¨-gvjÂ (১৯৪৫) গ্রন্থেও তাঁর কবিতা গৃহীত হয়েছে। 'মাসিক মোহাম্মদী'তে 'আধুনিকী' নামে অন্য কবিদের সাথে তাঁর কবিতা একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। হুমায়ুন কবির সম্পাদিত 'ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গ পত্রিকা'-তে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। একই সময়েই যেমন কবিতায় তেমনি কথাসাহিত্যে এক সঙ্গে বহুসংখ্যক তরুণ মুসলমান লেখক সৃজনশীল উদ্দীপনা নিয়ে কবিতায়, গল্পে আমাদের সাহিত্যকে একটি ভিন্নখাতে নেওয়ার চেষ্টা করেন, যা আগে তেমনভাবে লক্ষ করা যায়নি। সমসাময়িক কবিদের মধ্যে ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, শওকত ওসমান, সিকানদার আবু জাফর, গোলাম কুদ্দুস, আবুল হোসেন, হাবীবুর রহমান— এঁরা কবিতা রচনার পাশাপাশি গল্প লেখাও শুরু করেন। তবে অচিরেই এসব লেখক নিজের নিজের সঠিক পথ চিনে নিয়ে সেই পথে পদচারণা করেছেন। পরবর্তীকালে শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শামসুদ্দীন আবুল কালাম ও আবু ইসহাকসহ যে চারজন সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের ছোটগল্প তথা কথাসাহিত্যে বিষয়বৈচিত্র্য, আখ্যানমালা, জীবনদৃষ্টি ও শৈল্পিক পরিচর্যা এবং উপস্থাপনের বিশেষ বিন্যাসসহ নানা ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষরবাহী শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন, শওকত ওসমান নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

১৯৪৬ সালে ঈদ সংখ্যায় শওকত ওসমানের প্রথম উপন্যাস eWY Av‘g এবং সাথে সাথে বিভিন্ন পত্রিকাতে বিচ্ছিন্নভাবে গল্পও প্রকাশিত হয়। এ কালপর্বটি মূলত শওকত ওসমানের লেখক হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার কাল হিসেবে বিবেচিত হয়। আবু রুশ্‌দ এ সময় শওকত ওসমান সম্পর্কে লক্ষ্যভেদী আশ্চর্য মন্তব্য করেন :

> কবিরূপে শওকত ওসমান প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারবেন কি পারবেন না, কোনোটাই এখন ঠিক করে বলা যায় না। এদিক দিয়ে তাঁর সম্ভাবনা এখনো নিঃশেষিত হয় নাই। তাঁর সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু আশা করবার মতো প্রতিশ্রুতিও তিনি এ পর্যন্ত দিতে পারেন নাই। তবে সৌভাগ্যের কথা এই, গদ্যলেখক হিসেবে শওকত ওসমান ইতোমধ্যেই প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছেন। কথাশিল্পীরূপে তাঁর সম্ভাবনা প্রচুর। (মান্নান, ২০০৪ : ১৪)

আবু রুশ্‌দের ভবিষ্যদ্‌বাণী বিফলে যায়নি। শওকত ওসমান শেষ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যভুবনে প্রতিশ্রুতিশীল কথাশিল্পীরূপেই আবির্ভূত হয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এ সম্পর্কে আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০)-এর মন্তব্যটিও উল্লেখযোগ্য :

Dhaka University Institutional Repository

> আমাদের কবিতা ও কথাসাহিত্য অর্থাৎ সৃষ্টিশীল সাহিত্যে রবীন্দ্র-নজরুলোত্তর আধুনিকতা এনেছিলেন প্রথম যে–'সপ্তরথী', তাঁরা হচ্ছে : আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন, গোলাম কুদ্দুস এবং শওকত ওসমান, আবু রুশ্‌দ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। (মান্নান, ২০০৪ : ১৫)

শওকত ওসমান নিজেও তাঁর লেখা সম্পর্কে ছিলেন সচেতন এবং আত্মসমালোচক। তিনি নিজেও বিশ্বাস করতেন কবিতাতে নয়, গদ্য রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত এবং তাঁর সৃজন-প্রতিভাশক্তির পূর্ণ বিকাশ গদ্যাভিমুখী। তাঁর অন্তর্লোকে নিরন্তর গদ্য-পদ্যের আসা-যাওয়া চললেও শেষ পর্যন্ত স্থিত হয়েছেন কথাসাহিত্যেই। লেখক নিজের লেখা সম্পর্কে নিজে যে মন্তব্য করেছেন সেখানেও আবু রুশ্‌দ এবং আবদুল মান্নান সৈয়দের এর মন্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন—

> এই ভাগ্যহত দেশ যখন ক্রমশ নিচের দিকে তলাতে শুরু করেছে, আমরা ভাবতাম, এইদেশে অন্তত একটি লোক আছে যিনি এই রসাতলের পথে বাঁধ দিতে বদ্ধপরিকর। অনেক কাল আগে থেকে আমাদের পরিচয় আপনার সঙ্গে। সেই ঊনিশ শ' আটত্রিশ সাল। ঠিক পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে, মরহুম হবিবুল্লাহ বাহার সম্পাদিত 'বুলবুল' পত্রিকায় আপনার প্রকাশ। লিখেছিলেন তিনটি কবিতা। আমরা ভাবলাম, এক কবির অভ্যুদয় ঘটলো মুসলমান সমাজে। ওই পত্রিকায় তখনই বেরিয়েছিল একটি রাজনৈতিক রচনা : সুভাষ বসুর একটি বক্তৃতা সমালোচনা। সেই লেখাটি পড়ে মনে হল আপনি কাব্য-জগতের লোক নন এবং সমাজ সম্পর্কে আপনি আদৌ চোখ বুজে থাকতে অক্ষম। আমাদের ধারণা ঠিক খেটে গেল। চুলকানির মত মাঝে আপনি কবিতা হেথাহোথা ছোটালেন বটে আরো কিছুদিন, তারপর টিকে রইলেন গদ্যের জগতে জোঁকের মত। একের পর এক গল্প লিখে চললেন। (শওকত, ২০০৮ : ১২)

এছাড়াও শওকত ওসমানের শিল্পিমানসের পরিচয় দিতে গিয়ে আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে স্মরণযোগ্য :

> আমাদের উত্তরসুরীদের মধ্যে যে কয়জন সাহিত্যিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন, আর তাতে আত্মনিবিষ্ট তাঁদের মধ্যে শওকত ওসমান অন্যতম। তাঁর প্রতিভা আর রচনার বিশিষ্টতা অনস্বীকার্য— বিশেষ করে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে। (ফজল, ২০০৬ : ২৪২)

শওকত ওসমান যে সাহিত্যিক পরিবেশে এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাহিত্য রচনা করেছেন তা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। এ সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রাধান্য এবং পত্রিকাকেন্দ্রিক বিভিন্ন লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। তন্মধ্যে মোহাম্মদ আকরম খাঁ-র সম্পাদনায় 'মাসিক মোহাম্মদী' (১৯০৩), মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের 'সওগাত' (১৯১৮), মোজাম্মেল হকের 'মোসলেম ভারত' (১৯২০), ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র 'আঙুর' (১৯২০), কাজী নজরুল ইসলামের 'ধূমকেতু' (১৯২২), দীনেশরঞ্জন দাস-এর 'কল্লোল' (১৯২৩), সজনীকান্ত দাস-এর 'শনিবারের চিঠি' (১৯২৪), কাজী নজরুল ইসলামের 'লাঙ্গল' (১৯২৫), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর 'কালি কলম' (১৯২৬), বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্তের 'প্রগতি' (১৯২৭), আবুল হুসেনের 'শিখা' (১৯২৭), বিষ্ণু দে-র 'পরিচয়' (১৯৩১), মুহাম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার ও বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের 'বুলবুল' (১৯৩৩), মোহাম্মদ

আকরম খাঁ-র 'দৈনিক আজাদ' (১৯৩৫), হুমায়ূন কবিরের 'চতুরঙ্গ' (১৯৩৯), কাজী নজরুল ইসলামের 'দৈনিক নবযুগ' (১৯৪১), রণেশ দাশগুপ্তের 'প্রতিরোধ' (১৯৪২), বিষ্ণু দে-র 'সাহিত্যপত্র' (১৯৪২), বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' (১৯৪৫), আবদুল কাদিরের 'মাহে নও' (১৯৪৯) এবং সিকান্দার আবু জাফর-এর 'সমকাল' (১৯৫৭) অন্যতম। এ-সময়ে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর সাথে শওকত ওসমানের কোনো না কোনোভাবে সম্পর্ক ছিল এবং ব্যক্তি পর্যায়েও এসব পত্রিকার সম্পাদকের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন।

শওকত ওসমান যে পটভূমিতে ছোটগল্প লেখা আরম্ভ করেন— তার প্রায় সমসাময়িকালে প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), আবু রুশ্‌দ (১৯১৯-২০০২), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১), সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৯২৩-১৯৮৬), শাহেদ আলী (১৯২৫-২০০১), আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩), শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২) ছোটগল্পকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। "কল্লোলের যুগধর্ম অন্য লেখকদের মতো শওকত ওসমানকেও প্রভাবিত করেছে। ফ্রয়েডীয় অবচেতন, যৌন অভীপ্সা প্রভৃতি অতোটা না হলেও, মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব তো বটেই; তাছাড়া রুশ বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক চেতনা এবং উত্তালবিক্ষুব্ধ সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে আন্দোলিত করে।" (সালাউদ্দীন, ২০০৮ : ১২১) এছাড়াও ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর, ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা তাঁর প্রথমদিকের গল্পের প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে একাধিকবার। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৪১ সালের ৩১ মার্চ আল্লামা ইকবালের (বর্তমানে পাকিস্তানের জাতীয় কবি) মৃত্যুদিবস উপলক্ষে কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি আয়োজিত অনুষ্ঠানের সভাপতির (তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতা মেয়র আবদুর রহমান সিদ্দিকী) উর্দুতে বক্তৃতা দেওয়ার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং পরিণামে মুসলিম লীগের সদস্যদের হাতে প্রচণ্ডভাবে প্রহৃত হন। এ-প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান উল্লেখ করেন :

> লাহোর-প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির উদ্‌যোগে ইকবালের কবিতা সম্পর্কে একটি আলোচনা-অনুষ্ঠান হয়। এর সভাপতি ছিলেন কলকাতার মেয়র আবদুর রহমান সিদ্দিকী, আর আলোচক ছিলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী। সভায় ইংরেজি ও উর্দুতে আলোচনা হলেও বাংলায় আলোচনার অনুমতি সভাপতি দেন নি। তাতে শ্রোতাদের কেউ কেউ— যেমন হবীবুল্লাহ বাহার ও শওকত ওসমান— এমন ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে, সভাপতিকেই সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যেতে হয়। পরদিন এই ঘটনার উল্লেখ করে অমিয় চক্রবর্তী চিঠি লেখেন রবীন্দ্রনাথকে : মাতৃভাষার প্রতি বাঙালি মুসলমান তরুণদের এই অসাধারণ ভালোবাসার পরিচয় পেয়ে একই সঙ্গে তিনি বিস্ময় ও মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন। (আনিসুজ্জামান, ২০০৮ : ৫৯-৬০)

১৯৫১ সালে চট্টগ্রামে মাতৃভাষার জন্য আয়োজিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে শওকত ওসমান আহ্বায়ক-এর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বদলিজনিত কারণে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আগমনের সাথে সাথে তিনি আরও বেশি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বিশিষ্টজনের সান্নিধ্যে আসেন এবং নতুন উদ্যমে সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৫৭ সালে কাগমারিতে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে তিনি 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' নামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সরকারি চাকরির সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তিনি কখনও লেখার মাধ্যমে আবার কখনও শারীরিক উপস্থিতির মাধ্যমে পাকিস্তানি শোষক এবং তাদের প্রবর্তিত নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে রাজপথের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, সভ্যতার ক্রান্তিকালে, রাজনৈতিক অস্থিরতায়, ব্যক্তিক নিরাপত্তাহীনতায় শিল্পী-সাহিত্যিকগণ সরলরেখায় অনেক কিছু প্রকাশ করা থেকে বিরত থেকে বক্ররেখার পথ ধরেন। এ সময় প্রকাশের যথার্থ অনুষঙ্গ হিসেবে উঠে আসে রূপক-প্রতীকের বহুবিধ ব্যবহার। শওকত ওসমানের সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি— তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনকালে রচিত µxZ'v‡mi nvwm (১৯৬২) এবং †PŠimwÜ (১৯৬৬) উপন্যাসের কথা উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমি এপার বাংলা-ওপার বাংলা শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিয়ে 'সাহিত্য সম্মেলন'-এর আয়োজন করে। উক্ত সম্মেলনে আলোচনাংশে শওকত ওসমান সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়— জীবনমুখী সমাজসচেতন সাহিত্যিক হিসেবে অনিবার্য উপকরণরূপেই বহমান ঘটনাস্রোত তাঁর সাহিত্যে উঠে এসেছে। তাঁর সাহসী উচ্চারণ, প্রবল জীবনজিজ্ঞাসা, দার্শনিক মনোদৃষ্টি, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তাঁর সাহিত্যের বিষয়-বৈচিত্র্যেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে এবং সমাজসংশ্লিষ্টতার ফলে তাঁর সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায় সমাজ নির্মাণের অন্তর্নিহিত রূপ। এখানে স্মরণীয় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) মৃত্যু পরবর্তীকালে তিনি নীরব প্রতিবাদ হিসেবেই স্বেচ্ছা নির্বাসনে দেশ ত্যাগ করেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল লেখকের আবেগ-অনুভূতি, নিরাপত্তার অভাব। এছাড়া তিনি কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন— "আমার পক্ষেও দেশের বর্তমান আবহাওয়া ক্রমশ শ্বাসবিরোধী হয়ে উঠেছিল। তাই সিদ্ধান্ত নিতে হোলো। যদি কিছু লিখতে হয়, অন্য পরিবেশে চলে যাওয়াই উচিত।" (শওকত, ২০০৯ খ : ৪০) গল্পকার ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় সময় অতিবাহিত করেছেন। তবে, "১৯৮১ সালে নির্বাসন থেকে ফিরে শওকত ওসমান প্রথমেই ছুটে যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে চিরনিদ্রায় শায়িত কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিতে। সকল অসমতা, নিপীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্মারক বাঙালির জাতিসত্তার চেতনা বিকাশের প্রধানতম স্থপতি কাজী কবির সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে নির্বাসন প্রত্যাগত শওকত ওসমান সেদিন তাঁর পরবর্তী জীবনের কর্মধারায় বিপ্লবাত্মক ইঙ্গিত করলেন।" (আজাদ, ২০০০ : ১৫) বলা যায়, স্বেচ্ছা নির্বাসিন থেকে প্রত্যগমনের পরে তাঁর লেখা আরও বেশি শানিত এবং ইঙ্গিতধর্মী হয়ে ওঠে। এ-সময় তিনি তাঁর মনের পুঞ্জীভূত ব্যথা-বেদনা, ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন সাহিত্য-শিল্পের মধ্য দিয়ে।

তিনি এ সময় wbR¯ msev' 'wZv †cwiZ (১৯৮২) এবং †k‡Li m¤ii (১৯৯২) ব্যঙ্গ কাব্য রচনার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন তির্যক ভাষায়।

শিক্ষকরূপেও শওকত ওসমান সর্বাংশে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। একজন ছাত্রের চোখ দিয়ে দেখা একজন শিক্ষকের সফলতা-ব্যর্থতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি ছাত্রজীবনেই গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বাস্তবতার নিরিখে তিনি অধ্যাপনায় দ্যুতি ছড়িয়েছেন— যা একজন শিক্ষকরূপে সাফল্যের চূড়াস্পর্শী। সুদীর্ঘ তিরিশ বছর (১৯৪২-১৯৭২) ধরে তিনি আলোর ফেরিওয়ালার মতো শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্নমুখী জ্ঞানের আলো বিতরণ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, বিদ্যাভাসে অবহেলা কাউকে সমাজে কোনো উঁচু স্তরে নিয়ে যেতে পারে না। ঢাকা কলেজে শওকত ওসমানের তৎকালীন ছাত্র আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর শিক্ষক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন :

> কোনো বিষয়ে কথা বলার সময় তিনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন থেকে অজস্র দৃষ্টান্ত দিতেন। তিনিই একদিন ক্লাসে এবং সাহিত্যকর্মে আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজের অপরিহার্যতার কথা বলেছেন খুব বিশ্বাসের সঙ্গে।– তবে তিনি যাই বলুন না কেন, জোর করে ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা তাঁর একেবারেই ছিল না।...কিন্তু ক্লাসে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করে ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ। তাঁর ব্যক্তিত্বে এমন শক্তি ছিলো যে তাই দিয়ে ছাত্রদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারতেন।... ছাত্রের কৃতিত্বে তিনি সব সময়েই আনন্দিত, তাঁর ছাত্রদের কেউ যদি কোনোদিন তাঁর চেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে তো, আমি নিশ্চিত, তিনি সবচেয়ে খুশি হবেন। কৃতী ছাত্রদের নিয়ে এরকম গর্ববোধ করতে, এরকম উচ্ছ্বসিত হতে পারেন ক'জন শিক্ষক? (আখতারুজ্জামান, ১৯৯১ : ১১০-১১১)

উপরিউক্ত মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, শওকত ওসমান শুধু প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, তিনি শিক্ষাকে ব্যবহার করেছিলেন বহুমুখী জ্ঞানের আধার হিসেবে। যে জ্ঞানাধার দীপাবলির ন্যায় শিক্ষার্থীদের চেতনাজগৎকে প্রজ্বলিত করেছে এবং তাদের বড় হৃদয়ের মানুষ হতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আরেক ছাত্র তানভীর মোকাম্মেল তাঁর শিক্ষক সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা এখানে উদ্ধারযোগ্য :

> ঢাকা কলেজে বাংলা কথাসাহিত্য পড়াতেন। আমাদের টেক্সট বইয়ের পাঠ্য একটা ছিল বটে, কিন্তু আলোচনায় চলে যেতেন সেই কোথায় কোথায়। সাহিত্যসম্ভারের কোন গহীনে ডুব দিয়ে কোন মুক্তা আমাদের সামনে হাজির করতেন, প্রগাঢ় রাজনৈতিক-সামাজিক জ্ঞান ও গভীর জীবনাভিজ্ঞতা দিয়ে হীরকের দ্যুতির মতো ঝলকে দিয়ে যেতেন আমাদের চেতনার অন্ধকার কোণগুলোকে। (তানভীর, ১৯৯১ : ১৯৬)

শওকত ওসমান শিক্ষকের আসনে উপবিষ্ট হয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শুধু পুঁথিগতবিদ্যা আত্মস্থ করার শিক্ষা দেন নি। তিনি জীবন-বাস্তব থেকে ছেকে আনা অজস্র ঘটনা-অভিজ্ঞতার সমবায়িত রূপের

মধ্য দিয়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়েছেন শিক্ষার্থীদের মাঝে, যা তাঁদের সম্মুখে জ্ঞানের পথকে অবারিত করে ভবিষ্যতের চলার পথকে মসৃণ করেছে এবং পৃথিবী নামক গ্রহের যোগ্য বাসিন্দারূপে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

শওকত ওসমানের লেখার গতি-প্রকৃতি দেশকালের পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে অঙ্গীভূত। তাঁর জন্মের বছর থেকে আরম্ভ করে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন চলার মধ্যেই, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আরম্ভ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এ সময় বিশ্বরাজনীতি এবং দেশীয় রাজনীতি এক বিক্ষুব্ধকাল অতিক্রম করছিল। ফলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটল ব্যাপকভাবে। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাব পাস এবং স্বতন্ত্র আবাসভূমির জন্য হিন্দু-মুসলিমের বিরোধ আরো তীব্র আকার ধারণ করে, ১৯৪১ সালে ভারতবর্ষে জাপানি আক্রমণ, ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আরম্ভ হয় 'ভারত ছাড়' (Quit India Movement) আন্দোলন, যা আগস্ট আন্দোলন নামে পরিচিত, ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহিংস বিরোধ সংঘটিত হয়, 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র (Two Nations Theory) উপর ভিত্তি করে হিন্দু- মুসলিমের পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা (১৯৪৭), রাষ্ট্রভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্র (১৯৪৮-১৯৫২), বাংলাভাগ-পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি শোষকদের নতুন শোষণ-পীড়ন নীতি, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন (১৯৫৪), ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন ও পাকিস্তানের সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান, ১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন (১৯৬৬), গণঅভ্যুত্থান (১৯৬৯), অখণ্ড পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন (১৯৭০), ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে নিহত হওয়া, ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনা লেখক অতি সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে, শওকত ওসমানের সাহিত্যে জাতীয় জীবনের উপর দিয়ে প্রবাহিত এসব সামাজিক-রাজনৈতিক ডামাডোলের চিত্রের সন্নিবেশ ঘটেছে। মূলত বাহ্যিক ঘটনার ঘূর্ণাবর্তের আন্তরবৈশিষ্ট্য তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে তাঁর সাহিত্যসম্ভার হয়ে উঠেছে ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ কালপর্বের সামাজিক দায়বদ্ধতার ফসল।

জাতীয় জীবনের বিচিত্র ঘটনাস্রোত শওকত ওসমানের সাহিত্য সাধনাকে যে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে, তা সহজেই উদঘাটিত। আর্থসামাজিক, ভূ-রাজনৈতিক, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সময়সচেতন গল্পকার শওকত ওসমান "সাহিত্য-জীবনের প্রায় পুরো সময়টা প্রধানত জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা সংকটের অভিমুখী হয়ে তাঁর সাহিত্য মানসকে এক ধরনের বিপ্লবের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে। এ জন্যেই জাতীয় আন্দোলনের অনেকগুলো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাহিত্যিক কৃতির বিচার চলে।" (আজহার, ১৯৯৬ : ১০৫) সভ্যতার সঙ্কটকালে শিল্পী-সাহিত্যিকেরা নির্লিপ্ত থাকতে পারেন না। শওকত ওসমানও নির্লিপ্ত কথাসাহিত্যিক ছিলেন না। তিনি তাঁর সাহিত্য-কীর্তির

মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্র-যন্ত্রের সব অন্যায়-অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং দৃঢ় প্রতিবাদ করে গেছেন। তিনি সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে (ব্রিটিশ কালপর্বে) প্রতিবাদ করেছেন 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব', বাংলাভাগ এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। পাকিস্তান কালপর্বে লড়াই করেছেন পাকিস্তানি শাসকদের বাংলা ভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে, সর্বোপরি দেশ-মাতৃকার মুক্তির জন্য। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ কালপর্বে বা তাঁর সাহিত্যিক জীবনের অন্তিমপর্বেও তিনি মৌলবাদ, অপসংস্কৃতি, স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনের সাথে কখনও লেখনীর মাধ্যমে আবার কখনও সরাসরি রাজপথে নেমে এসে উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ করেছেন। সমকালের বিভিন্নমুখী ঘটনা লেখকের মনোলোকে বিভিন্নমুখী অনুভূতির সৃষ্টি করেছে এবং তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছে সাহিত্যের পথে ধাবিত হতে। "সব কোলাহল ও কুশ্রীতার ঊর্ধ্বে, জগতের ভালোমন্দের ব্যাপারে নিরাসক্ত থেকে শুধু শিল্পের জন্য শিল্প সৃষ্টি করার বিলাসিতা সচেতনভাবে পরিহার করে তিনি দীর্ঘকাল আপসহীনভাবে" (মতিন, ১৯৯৯ : ১৫৬) সাহিত্য সাধনা করেছেন। এ সম্পর্কে শামসুর রাহমানের (১৯২৯-২০০৬) মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> আমাদের ইতিহাসের বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নের রক্তাক্ত ভাষ্য যেন তাঁর সাহিত্য। তাঁর সরব বিবেকী উচ্চারণ আমাদের সাহস যুগিয়েছে সংশয়ের দিনগুলোতে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল তাঁর এই সপ্রাণ ভূমিকা। (শামসুর, ২০০৮ : ১৬৩)

আপসহীন, সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতন, ইতিহাস-ঐতিহ্য মনস্ক লেখক হিসেবে শওকত ওসমান বরাবরই ছিলেন ধর্মীয় মৌলবাদ, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, সামাজিক কুসংস্কার এবং সামরিক স্বৈরাচারের তীব্র সমালোচক। তিনি ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি গভীরভাবে আস্থাশীল এবং ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী। সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তিনি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অসারতা প্রমাণ করেন ইতিহাসের আলোকে। তিনি মনে করতেন "ধর্ম এবং জাতীয়তা আলাদা ব্যাপার। তবু এই মিথ্যের উপর মানুষকে উন্নত করে পাকিস্তান তৈরি করে দেখল তা টিকল না, তবু তাদের শিক্ষা হয় না। মিথ্যের বুনিয়াদ অমানুষের বুনিয়াদ। তবু এই অমানুষিয়ানার প্রতি বাংলাদেশের এক শ্রেণীর প্রবণতা কি দুর্দম এবং প্রগাঢ় তা দেখে শিউরে উঠতে হয়।" (শওকত, ২০০৭ ক : ৯৮) এ সম্পর্কে রফিকুন নবীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

> বিভিন্ন দিকে এবং বিষয়ে ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান। নিজের প্রধান দিক সৃষ্টিশীল সাহিত্যচর্চা তো ছিলই, পাশাপাশি রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রগতিশীল এবং সাহসী ভূমিকা ছিল সবার জন্যে উজ্জীবক এবং অনুকরণীয়। নিজের মতাদর্শ থেকে সরেন নি কখনো। মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, অপসংস্কৃতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে তিনি আজীবন লড়াই করে গেছেন। সোচ্চার ছিলেন চিরকাল এসব নির্মূলের আন্দোলনে। তাঁর আধুনিক মনন চিন্তা আর দর্শনকে, প্রজ্ঞাকে তিনি তাঁর লেখনীতে, বক্তব্যে, এমনকি দৈনন্দিন জীবনেও প্রয়োগ করে চলেছিলেন চিরকাল। (রফিকুন, ২০০৭ : ১৮৪)

শওকত ওসমানের তীক্ষ্ণ রসবোধ, সমাজ সচেতনতার সাথে রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে অঙ্গীভূত করে দেখার দৃষ্টি, বিষয় নির্বাচন ও নির্ভীক উচ্চারণ তাঁকে বাংলা সাহিত্যে একটি পৃথক আসন দান

করেছে। জীবন চলার পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, যাপিত জীবনের অসংখ্য চিত্র, সমাজ-রাষ্ট্রের বুকে ঘটে যাওয়া বহুবিধ ঘটনা তাঁর সাহিত্যে শৈল্পিকরূপ ধারণ করেছে। শওকত ওসমান তাঁর সাহিত্যে "সমাজকে তাঁর বাহ্য অস্তিত্বের অনুপুঙ্খতায় এবং সেক্যুলার মানস ও বিশ্লেষণী মনোদৃষ্টিতে উপস্থিত করতে চেয়েছেন, তা বোঝা যায়। দীর্ঘদিনের সাহিত্যসাধনায় বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য এসেছে, বর্ণনাভঙ্গি এবং ভাষা কৌশলেও ঘটেছে পরিবর্তন, আঙ্গিকের নিরীক্ষাও নগণ্য নয়, কিন্তু সমাজ পর্যবেক্ষণের উপরোক্ত প্রায় মীমাংসিত দৃষ্টিকোণ তাঁর গল্পমালায় আনুপূর্ব অপরিবর্তিত।" (সালাউদ্দীন, ২০০৮ : ১৯) সমকাল সচেতন ও জীবনবাদী কথাসাহিত্যিক জীবনকে বিশ্লেষণ করেছেন প্রবহমাণ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তা রূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি বিচিত্র প্রকরণ নিরীক্ষায়ও সফল হয়েছেন। তাঁর শিল্পচেতনা মূলত সমকালীন সময়েরই শিল্পনির্দেশক।

ব্যক্তি শওকত ওসমান ও সাহিত্যিক শওকত ওসমান এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ব্যক্তিজীবনাচরণের অনুরূপ তিনি সাহিত্যসাধনাতেও ছিলেন সমান আন্তরিক, ন্যায়নিষ্ঠ, স্পষ্টভাষী, প্রতিবাদী ও কর্তব্যসচেতন। তাঁর জীবনাচরণ ও তাঁর সাহিত্য একই সুতায় গাঁথা। সমাজাশ্রয়ী জীবনভাবনা-জীবনান্বেষণ, রাজনৈতিক ও ইতিহাস সচেতন মানসিকতা, সমকালীন ঘটনাস্রোত তাঁর শিল্পিসত্তাকে শানিত ও পরিপুষ্টি দান এবং নতুন সমাজ বিনির্মাণে সাহায্য করেছে। তিনি যা বিশ্বাস করতেন, যা প্রত্যক্ষ করতেন তা তিনি অকপটে সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরতেন। তাঁর শিল্পকৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্য বাস্তবের শিল্পমণ্ডিত উপস্থাপনা। "শওকত ওসমান প্রকৃত জীবনশিল্পী। তাঁর লক্ষ্য স্থির। তিনি মানুষের বরং শোষিত নির্যাতিত মানুষের পক্ষে আছেন। সেদিক থেকে তিনি বাংলা ছোটগল্পের প্রধান ধারাটিকেই বহন করে এনেছেন বলা যায়।" (বশীর, ১৯৯৫ : ১০২)

শওকত ওসমান দেশ-কাল, বিভিন্নমুখী ঘটনাকে অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি পরিকল্পিত, তীব্র ও গভীর ইঙ্গিতের দ্বারা তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপন করেছেন। ফলে, তাঁর সাহিত্যে যুগ, জীবন ও পরিবেশ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে "বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থতার মধ্য দিয়েই চমৎকার শিল্পব্যঞ্জনা লাভ করে। তাতে তাঁর উদ্দেশ্য যেমন সিদ্ধ হয়, তেমনি তাঁর সুদক্ষ প্রয়োগ শিল্পের নান্দনিক বৈশিষ্ট্যকেও অক্ষুণ্ন রাখে। উদ্দেশ্যকে বিষয়ানুগ রূপ দেওয়ার কারণে শওকত ওসমান তাঁর রচনায় অত্যন্ত কৌশলে সঙ্কেত সৃষ্টি করেন, এই সঙ্কেত সৃষ্টির কারণে কখনো কখনো তাঁর শিল্পমানসে প্রতীকের ব্যবহার জরুরি হয়ে পড়ে। কেননা প্রতীকের সার্থক ব্যবহারে কাহিনির পশ্চাতে প্রায়শ নিগূঢ় কোনো অভিসিঞ্চন সাধিত হয়। এবং প্রতীক-যোজনায় শওকত ওসমানের সাফল্য প্রায় অবিসংবাদিত।" (আজহার, ১৯৯৬ : ১০৫-১০৬) প্রথাগত ঢঙে তিনি গল্প রচনা আরম্ভ করলেও উত্তরোত্তর গল্পের বিষয় বৈচিত্র্যে এবং প্রকরণেও নতুনত্ব সঞ্চার করেছেন।

শওকত ওসমানের শিল্পিসত্তা গঠনের পশ্চাতে সমকালীন ঘটনাস্রোত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। প্রবহমাণ সময়ের সমান্তরালে আবর্তিত তাঁর সাহিত্যজগৎ। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, একজন লেখকের শিল্পসাধনার প্রধান উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের চাল-চিত্র, সমকালীন অভিঘাত, বিচিত্রমুখী

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনাক্রমকে সাহিত্যের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে পাঠক বা বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপন করা। লেখকের অভিজ্ঞতাপুষ্ট মন্তব্য এখানে স্মর্তব্য :

> কতো না মানুষ জড়িত এই সামাজিক ঝটিকার মধ্যে। শত শত মানুষ, তাদের জীবনপ্রবাহ নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সৌজন্য ভণ্ডামি, আত্মত্যাগ, হাসি-কান্না দৈনন্দিনতা– এত বিচিত্র সমাহার।...দেশবাসীর সামনে তাদের চেতনা-গঠনে এসব তুলে ধরার দায়িত্ব প্রত্যেক দেশপ্রেমিক লেখকের উপর বর্তায়। (শওকত, ২০০৯ ক : ১৩৬)

শওকত ওসমানের শিল্পচেতনা সামাজিক দায়বদ্ধতার অচ্ছেদ্য দলিল। জীবনশিল্পী হিসাবে তিনি ছিলেন সমাজ সম্পৃক্ত এবং বাস্তবনিষ্ঠ। তিনি কখনো কারো মনোরঞ্জনের জন্য সাহিত্য রচনা করেননি। তিনি তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকর্মে সমাজ ও সমাজস্থ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদের কাছে এক সাক্ষাৎকারে বলেন :

> আমি সুড়সুড়ি-দানে কোনো কিছুই লিখি না। যদি চিন্তার ব্যাপার না হয়ে দাঁড়ায় পাঠকের কাছে, লিখে লাভ কী? বিনোদনী ভূমিকায় আমি বিশ্বাসী নই। তাই হয় তো আমার রচনা সুখপাঠ্য নয়। (হুমায়ুন, ২০০৮ : ৯৩)

মন্তব্যটির মধ্য দিয়ে লেখকের শিল্পিসত্তার পরিচয় পরিদৃষ্ট হয়। "এটা ঘোষণা করে জানিয়ে দেওয়ার নয়। সাহিত্যে সমাজের খনন ও মানুষের ভেতরকার বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে লেখক অস্তিত্বকে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখান।" (সুশান্ত, ২০০৮ : ১৮২) তাঁর এ অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত জনসাধারণ-দেশ-কালিক ভাবনা। তিনি মনে করতেন জনগণই সকল উত্তরণের মূল সোপান, উত্তরণই মূল চালিকাশক্তি, যেখানে আসল ক্যানভাস দেশ। প্রকৃতপক্ষে লেখকের চিন্তার ব্যাকরণ জুড়ে ছিল দেশ এবং দেশের সর্বসাধারণ। "তিনি ঘোরতরভাবে সমকালসচেতন। সমসাময়িক কালের মানুষ, রাজনীতি, নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনা, আন্দোলন, সংগ্রাম, সংঘাত, যুদ্ধ, আপস প্রভৃতি নিয়ে তাঁর ক্রমবর্ধমান সচেতনতা তাঁকে ক্রমে স্পর্শকাতর করে তুলেছে। তাঁর প্রতিক্রিয়া দিনদিন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। বয়স তাঁকে ভোঁতা করে না, বরং বয়সের সাথে তাঁর অনুভূতি আরো ধারালো, আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।" (আখতারুজ্জামান, ১৯৯১ : ১১২) ক্ষেত্রবিশেষে তিনি তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে রূপক-প্রতীক-ইঙ্গিতধর্মিতাকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

শওকত ওসমান সাহিত্যিশিল্পী হিসেবে সুপরিচিতি পেলেও সমাজ-রাজনীতির অন্দরমহলে ছিল তাঁর অগাধ বিচরণ। তিনি সরাসরি রাজনীতি না করলেও এ বিষয়ে ছিলেন তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। "এ-উপমহাদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং আলোড়ন-বিলোড়নেরও অঙ্গাঙ্গী সহচরের ভূমিকা পালন করেছেন তিনি— কখনো রাজপথে সরাসরি নেমে এসে, কখনো নেপথ্যে থেকে, কখনো বা স্বসৃষ্ট রচনার ভেতর দিয়ে। তাই শওকত ওসমানের জীবন এবং আমাদের দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস সমান্তরাল।" (আতাউস, ২০০৮ : ৯৯) তিনি ব্রিটিশ

কালপর্ব, পাকিস্তান কালপর্ব এবং বাংলাদেশ কালপর্বের রাজনীতির প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন— "এই যুগে রাজনীতি ছাড়া সমাজ বদলানো সম্ভব নয়। কিন্তু সেই রাজনীতির ভিত্তি হবে ব্যাপক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর, পেশার মানুষের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত।" (আতাউস, ২০০৮ : ১০৫) একটি বিষয় অবশ্যই স্বীকার্য; আধুনিক যুগে রাজনীতি এক জনগুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ এবং সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর প্রত্যেকটি স্তরই রাজনীতি দ্বারা আলোড়িত। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং সমাজ-ভাবনা শিল্পিসত্তার বুনিয়াদ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এ সম্পর্কে যতীন সরকারের মূল্যায়ন স্মরণযোগ্য :

> সাহিত্যিকের শিল্পদৃষ্টি ও মননশীলতা নিয়ে শওকত ওসমান গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদ, বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুসলিম বিশ্বের গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ের অন্দরমহলে যে-ভাবে প্রবেশ করতে পারেন ও এসবের নাড়ি-নক্ষত্রের পরিচয় টেনে বের করতে পারেন আশ্চর্য কুশলতায়, সে রকমটি একজন পেশাদার রাজনীতিকের পক্ষে সম্ভব নয়,– এমন কি তিনি মার্কসবাদের প্রতি নিবেদিতচিত্ত হলেও না। দেশ-বিদেশের অনেক মার্কসবাদী পণ্ডিত, তাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রনেতারাও যে নানা ধরনের প্রতিবন্ধের শিকার হয়ে অনেক অনর্থ ঘটান,– সে সবের দৃষ্টান্ত তো আমাদের চোখের সামনেই আছে। দেশী-বিদেশী সে সব দৃষ্টান্ত থেকে শওকত ওসমান সঠিক শিক্ষাটি তুলে ধরে সচেতনতার বিস্তার ঘটাতে চেয়েছেন। এখানেই পেশাদার ইতিহাসবিদদের থেকে শওকত ওসমানের পার্থক্য। (যতীন, ১৯৯১ : ১১)

শওকত ওসমানের জ্ঞানের পরিধি ছিল গভীর এবং বহুমুখী। তিনি ছাত্রজীবনে গণিত, অর্থনীতি, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, বাংলা-ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের এবং সহপাঠীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকারের দুর্লভ কিছু গ্রন্থও ছিল তাঁর পঠিত। তাছাড়া পেশাগত জীবনে এবং অবসর সময়ে তিনি অধ্যয়ন করেছেন বিজ্ঞানের ও নৃ-বিজ্ঞানের ইতিহাস, এছাড়া উইলিয়াম শেকস্পীয়রের (১৫৬৪-১৬১৬) নাটক, জন ব্যাপটিস্টি পকিউলিন মলিয়ের (১৬২২-১৬৭৩)-এর কমেডি রচনা, লিও টলস্টয়ের (১৮২৮-১৯১০) উপন্যাস, মোপাসাঁর (১৮৫০-১৮৯৩) ছোটগল্প, জর্জ বারনার্ড শ-এর (১৮৫৬-১৯৫০) নাটক, এইচ.জি.ওয়েলসের (১৮৬৬-১৯৪৬) উপন্যাস, কারেল চাপেকের (১৮৯০-১৯৩৮) নাটক A¨i. BD. A¨i, মারিয়া ভার্গাস যোসার (১৯৩৬-২০১৩) †÷wi‡Uj¨vi ও দেশি-বিদেশি অসংখ্য রচনা। শওকত ওসমান বিভিন্ন ধরনের রচনা অধ্যয়ন করেছেন নিজেকে ঋদ্ধ করার অভিপ্রায়ে। তবে নানাধর্মী গ্রন্থপাঠেও তিনি নিজের লেখার স্বকীয়তা হারাননি, বরং তাঁর রচনাতে স্বদেশের সমাজ-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং প্রবহমাণ সময়ের অন্তঃসত্য আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র আসন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর অধ্যয়নের গভীরতা সম্পর্কে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম মন্তব্য করেন :

> কি নিয়ে কথা বলতেন ? তাঁর কোনও লেখা, 'শেখের সম্বরা'র কোনও কবিতা, সঞ্জীব দত্ত, আললাঁ-রব গ্রিলে, ভলতেয়ার, বার্ট্রান্ড রাসেল, সালমান রুশদী, রোহিনতন মিস্ত্রি, কাফকা, আলবেয়ার ক্যামু, রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ রায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ... অন্তহীন সে তালিকা। আমি অবাক হতাম, কি বিশাল

> তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার, কি ব্যাপক তাঁর পড়াশোনা এবং কি সতেজ তাঁর স্মৃতিশক্তি! সবচেয়ে সাম্প্রতিক সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর জানাশোনা ছিল হালফিল। আরবি জানতেন, ফার্সি জানতেন। (মনজুরুল, ২০০৮ : ২২৫)

শওকত ওসমান শেষ পর্যন্ত সাহিত্য-সাধনাতেই ব্যাপৃত থেকেছেন। লেখকের স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যসত্তার পরিচয় চিহ্নিত— "বাড়িতে ব'সে বই প'ড়ে যা শেখা যায়, সব জ্ঞান শাখার প্রতি আমার আকর্ষণ নেশার মতো। অর্থনীতি, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বহু দিকেই মন গেছে। তবে কল্পনার জগৎ সাহিত্যেই আমি আত্মস্থ।" (হুমায়ুন, ২০০৮ : ৯) বাংলা সাহিত্যসহ বিশ্বসাহিত্যের বিচিত্র গ্রন্থ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাসমূহ তাঁর জ্ঞানের জগৎকে করেছে সমৃদ্ধ এবং চিন্তা ও প্রকাশের জগৎকে করেছে প্রসারিত। শেষাবধি শওকত ওসমানের শিল্পচৈতন্যর প্রকাশ ঘটেছে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। লেখক তাঁর অফুরন্ত জীবনীশক্তি, গ্রন্থানুরাগ এবং অধীতবিদ্যাকে সমকালীন জীবনস্রোতের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে তৈরি করেছেন সাহিত্যের নতুন আঙ্গিক। ফলে, তিনি সব্যসাচী লেখকের ন্যায় বিচরণ করেছেন সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতে।

বহুপ্রজ লেখক শওকত ওসমান জীবন, কর্ম ও সাহিত্যে "একজন নিরতিশয় বৈচিত্র্যসন্ধানী পুরুষ। জীবন ও কর্মের ডাকে তিনি ছেড়ে এসেছিলেন যেমন মাতৃভূমি, তেমনই সাহিত্যের সৃষ্টি ক্ষেত্রেও নিরন্তর বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান তাঁকে পেয়ে বসেছিল। কবিতা দিয়ে সাহিত্যের যাত্রা শুরু হলেও কবিতার মধ্যেই তাঁর প্রয়াস সীমায়িত থাকেনি।" (অনীক, ১৯৯৫ : ৩১) সুদীর্ঘ লেখক জীবনে বাংলা কথাসাহিত্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন প্রকাশের বহুমাত্রিক নান্দনিকতা এবং এই নান্দনিকতার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ ঘটেছে বাংলা ছোটগল্পে। শওকত ওসমানের ছোটগল্পে জীবন চলার পথের এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন চিত্রের সন্নিবেশ ঘটেছে। মূলত তাঁর ছোটগল্পগুলো ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলের সামাজিক দায়বদ্ধতার ফসল। তাঁর ছোটগল্পে তিন কালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা বিদ্যমান। ফলে তিন কালের গল্পগুলো পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। গল্পগুলোতে রাজনৈতিক সচেতনতা, সমাজমনস্কতা, বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা পনের এবং গল্পের সংখ্যা একশ বাহাত্তর। আমরা তাঁর গল্পগুলোকে রচনাকালানুসারে তিনটি ভাগে (ব্রিটিশ কালপর্ব : ত্রিশ ও চল্লিশের দশক, পাকিস্তান কালপর্ব : পঞ্চাশ ও ষাটের দশক এবং বাংলাদেশ কালপর্ব : সত্তর, আশি ও নব্বইয়ের দশক) বিভক্ত করে গল্পের জীবনবৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ মূল্যায়নে অগ্রসর হব। গল্পকার যেহেতু সাহিত্যিক জীবনের সবটুকু সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়ে সাহিত্য সাধনায় অগ্রসর হয়েছেন, সেহেতু এ তিন কালের রেখায় তাঁর গল্পগুলো মূল্যায়ন করা হলে সামগ্রিকভাবে শওকত ওসমানের ছোটগল্পে বিধৃত সমকালের অভিঘাত ও জীবনবৈচিত্র্য এবং তার শিল্পরূপের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা সম্ভব।

UxKv

1. শওকত ওসমান লেখকের সাহিত্যিক নাম। তাঁর পৈতৃক নাম শেখ আজিজুর রহমান। ১৯৩৪ সালে স্কুল ম্যাগাজিনে শেখ আজিজুর রহমান নামে একটি কবিতা ও একটি গল্প প্রকাশিত হলেও ১৯৩৮ সালে 'বুলবুল' পত্রিকায় তিনি শওকত ওসমান নাম ধারণের মধ্য দিয়ে 'দিনের কবিতা' শীর্ষক তিনটি কবিতা প্রকাশ করেন । মূলত এ সময় থেকে তিনি শওকত ওসমান নামে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। শওকত ওসমান নাম ধারণের অন্তরালে ছোট একটি ঘটনা বিদ্যমান। সমকালে আজিজুর রহমান নামে আরেকজন কবি থাকাতে গল্পকারের এক বড় বোন সুফিয়া খাতুন লেখকের নাম শওকত আলি রাখার প্রস্তাব করেন। কিন্তু লেখক 'আলি'র স্থলে 'ওসমান' যোগ করে নিজে নাম ধারণ করেন শওকত ওসমান। উৎসগত দিক থেকে 'শওকত' এবং 'ওসমান' দুটিই আরবি শব্দ। 'শওকত' (شوكة) শব্দের অর্থ— দাপট, শক্তি, প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং 'ওসমান' (عثمان) শব্দের অর্থ— ঐশ্বর্যের মহিমা বা মহিমান্বিত শক্তি, সুন্দর কলম।
2. শওকত ওসমানের আত্মজীবনীমূলক রচনার মধ্যে ¯Rb ¯Mvg (১৯৮৬), Kvjiwΐ LÐwPΐ (১৯৮৬), ¯§wZLÐ gwRebMi (১৯৯২), DËice gwRebMi (১৯৯৩), ivnbvgv 1 †Q‡j‡ejv I ˆK‡kvi †Kvjvnj (২০০৭) এবং ivnbvgv 2 Ab¨ iYcvšÍi I feb PZ‡i (২০০৭) উল্লেখযোগ্য।
3. বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম শওকত ওসমানকে যে কবিতা নোট-বইয়ে লিখে দিয়েছিলেন :

'শ্রীমান
শওকত ওসমান
কল্যাণীয়েষু
আছে সত্যের পূর্ণ স্বরূপ
চূর্ণিত-পরমাণুতে
আছে দেহাতীত অজানা অরূপ
তোমারই বদ্ধ তনুতে।'
১৭ ই ভাদ্র ১৩৪৭ নজরুল ইসলাম

Mš I ceÜcwÄ

অনীক মাহমুদ (১৯৯৫)। evsjv K_vmvwn‡Z¨ kIKZ Imgvb, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৯১)। 'শওকত ওসমানের প্রভাব ও প্রস্তুতি'; wbmM© [সম্পা. সরকার আশরাফ], বাণী প্রকাশনী, বগুড়া।

আতাউস সামাদ (২০০৮)। 'দেশ, দেশ, সবার উপরে দেশ'; e¨w³ I mwnwZ¨K kIKZ Imgvb [সম্পা. বুলবন ওসমান], দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা।

আজহার ইসলাম (১৯৯৬)। evsjv‡`‡ki †QvUMí : welq-fvebv ¯^iƒc I wkíiƒc, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আনিসুজ্জামান (২০০৮)। 'ভাষা-আন্দোলনের প্রাসঙ্গিক কথা'; fvlv Av‡›`vj‡bi BwZK_v [সম্পা. আবদুন নুর], মেলা প্রকাশনী, ঢাকা।

আবদুল মতিন (১৯৯৯)। 'শওকত ওসমান স্মরণে'; e½eÜz †kL gywRe gy³hy‡×i ci, র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশান্স, ঢাকা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০০০)। 'শওকত ওসমান'; GK‡ki ¯§iKMš' [সম্পা. সেলিনা হোসেন, নূরুল ইসলাম, মোবারক হোসেন], বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবুল আজাদ (২০০০)। bRiæj Bmjvg-kIKZ Imgvb mgKvj-ms¯wZ, রাইটার্স ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

আবুল ফজল (২০০৬)। †iLwPÎ, গতিধারা, ঢাকা।

তানভীর মোকাম্মেল (২০০৮)। 'আমার শওকত স্যার বিরাশি আউট কিন্তু অপরাজিত'; e¨w³ I mwnwZ¨K kIKZ Imgvb [সম্পা. বুলবন ওসমান], দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা।

বশীর আল্ হেলাল (১৯৯৫)। 'বাংলাদেশের ছোটগল্প'; GK‡ki wbewPZ ceÜ 1963-1976 [সম্পা. মোবারক হোসেন], বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

যতীন সরকার (১৯৯১)। 'ইতিহাস-চেতন শওকত ওসমান'; wbmM© [সম্পা. সরকার আশরাফ], বাণী প্রকাশনী, বগুড়া।

রফিকুন নবী (২০০৮)। 'শ্রদ্ধাঞ্জলি'; e¨w³ I mwnwZ¨K kIKZ Imgvb [সম্পা. বুলবন ওসমান], দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০০৭ ক)। ivnbvgv 1 †Q‡j‡ejv I %K‡kvi †Kvjvnj, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০০৭ খ)। ivnbvgv 2 Ab¨ iYcvšÍi I feb PZ‡i, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০০৯ ক)। 1971 ¯§wZLÐ gwRebMi, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০০৯ খ)। DËice gwRebMi, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০০৮)। 'নিজেকে লেখা পত্রলেখা'; e¨w³ I mwnwZ¨K kIKZ Imgvb [সম্পা. বুলবন ওসমান], দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (২০০৮)। 'একজন অসামান্য রাহানুমা'; e¨w³ I mwnwZ¨K kIKZ Imgvb [সম্পা. বুলবন ওসমান], দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা।

সালাউদ্দীন আইয়ুব (২০০৮)। 'ছোটগল্পে শওকত ওসমান'; e¨w³ I mwnwZ¨K kIKZ Imgvb [সম্পা. বুলবন ওসমান], দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা।

সুশান্ত মজুমদার (২০০৮)। 'শওকত ওসমান : অনুজের বোধে'; e¨w³ I mwnwZ¨K kIKZ Imgvb [সম্পা. বুলবন ওসমান], দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক (১৯৯৮)। gwbK e‡›`¨vcva¨v‡qi †QvUMí : mgvR‡PZbv I Rxe‡bi i|cvqY, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (২০০৮)। 'দ্য স্টোরিটেলার অব আওয়ার টাইম'; e¨w³ I mwnwZ¨K kIKZ Imgvb [সম্পা. বুলবন ওসমান], দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (২০০৮)। 'শওকত ওসমান কথাসাহিত্যের পথিকৃৎ'; e¨w³ I mwnwZ¨K kIKZ Imgvb [সম্পা. বুলবন ওসমান], দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা।

c_g Aa¨vq
wewUk Kvjce

c_g cwi‡”Q‘
wewUk Kvjce : wÎk I Pwjø‡ki ‘kK

mgKvjxb cwi‡cÖwÿZ

ivR‰bwZK cwigÐj

প্রায় দুশো বছর (১৭৫৭-১৯৪৭) ধরে বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ছিল খুবই ঘটনাবহুল ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ সময় জীবন, সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য সবক্ষেত্রেই পরিবর্তনের ঢেউ লাগে। ব্রিটিশ সরকার ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার্থে ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (Permanent Settlement) ব্যবস্থার প্রবর্তন করে এবং তাদের বশীভূত এ দেশীয় জমিদার শ্রেণির মাধ্যমে নানাভাবে এ দেশের জনগণকে বিভিন্নভাবে শোষণ করে। পলাশি যুদ্ধের ঠিক একশ বছর পূর্তিতে ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ সংঘটিত হয়। সিপাহি বিদ্রোহ পরবর্তীকালে ১৮৫৮ সালে মহারানি ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণার মাধ্যমে সরাসরি ভারতের শাসনভার নিজহাতে তুলে নেন এবং তা কার্যকর ছিল ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত। এখানে উল্লেখ্য যে, সিপাহি বিদ্রোহ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলেও এসময় থেকেই ভারতবাসী বিট্রিশ সরকারের কাছে তাদের দাবি দাওয়া আদায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়। সংগঠিত হওয়ার সূত্র ধরেই ১৮৮৫ সালে এ অঞ্চলের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গড়ে ওঠে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' (Indian National Congress)।

ভারতবর্ষে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এ এলাকার জন-সমাজ সম্মিলিতভাবে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন অব্যাহত রাখে। তবে অল্পদিনের মধ্যে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'-এর নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হলে সৈয়দ আহমদ খানের (১৮১৭-১৮৯৮) নেতৃত্বে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আলীগড় আন্দোলন গড়ে ওঠে। আলীগড় আন্দোলনের ফলে মুসলমানেরা জেগে ওঠার শক্তি অর্জন করেন এবং তারা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন— এরই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ। বঙ্গভঙ্গের অন্তর্নিহিত নেতিবাচক ব্রিটিশ মনোভাব উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত 'বাংলার মাটি বাংলার জল' সঙ্গীত। জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনে প্রবর্তিত হলো রাখি বন্ধন প্রথার। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরোধ প্রশমিত না-হয়ে তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর (১৮৬৬-১৯১৫) প্রচেষ্টায় ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ'। ভারতীয় হিন্দু মধ্যবিত্ত-শ্রেণি যে-কারণে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিলো, সেই অভিন্ন কারণেই মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ১৯০৬ সালে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ'এর প্রতিষ্ঠা তাই অস্বাভাবিক নয়। কংগ্রেস যেমন শক্তিশালী সামন্ত প্রতিনিধিত্ব গড়ে তুলেছিলো, তেমনি মুসলিম

লীগ সংগঠনের পেছনেও ছিল সামন্ত প্রতিনিধিত্ব। এই নবোদ্ভূত সংগঠনের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হলেন ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এবং খাজা নাজিমুদ্দীনের (১৮৯৪-১৯৬৪) মতো সামন্তমূল্যবোধ-আশ্রয়ী ব্যক্তিবর্গ। এখানে উল্লেখ্য যে, বঙ্গভঙ্গের পরে ভারতের জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ডাক দেয়, যা এক পর্যায়ে স্বদেশী আন্দোলনে রূপ লাভ করে। পরিশেষে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্নমুখী চাপের মধ্যে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ আইন জারি করতে বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য, বাংলা ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত। এ সম্পর্কে হারুন-অর-রশিদ মন্তব্য করেন :

> ১৯০৫ সালের বাংলা বিভাগ এবং নতুন প্রদেশ সৃষ্টি পূর্ব বাংলার মৃতপ্রায় মুসলিম সমাজে প্রাণ সঞ্চার করে। উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকায়। অনেক কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রতিষ্ঠান ঢাকাভিত্তিক হওয়া শুরু করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সুসংগঠিত ও শক্তিশালী আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠনের আবশ্যকতা তুলে ধরে। নবাব স্যার সলিমুল্লার উদ্যোগে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার মূলে অন্যতম কারণ ছিল।
>
> হিন্দু সম্প্রদায় কিছুতেই বঙ্গবঙ্গকে মেনে নিতে পারে নি। তাদের দুর্বার আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে ব্রিটিশ সরকার পুনরায় বাংলাকে একত্রিত করতে বাধ্য হয়। আসামকে পূর্বের ন্যায় পৃথক শাসনাধীনে নিয়ে আসা হয়। বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর (যা পূর্বে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির' অন্তর্ভুক্ত ছিল) নিয়ে পৃথক প্রদেশ গঠিত হয়।
>
> বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন এক শ্রেণির বাঙালির মধ্যে জাতিসত্তাবোধ জাগিয়ে তোলে। সীমিত আকারে হলেও, বাঙালির জাতিসত্তার উন্মেষ ছিল বঙ্গভঙ্গ উদ্ভূত পরিস্থিতির ইতিবাচক ফলাফল। অপরদিকে, বঙ্গভঙ্গ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এই সর্বপ্রথম বাংলার সমাজ সাম্প্রদায়িক ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ার লক্ষণ দেখা দেয়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ আনুষ্ঠানিকভাবে রদ হলেও পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার জনগণের মনে একটি বিভক্তি রেখা রয়ে যায়, যা বাংলার পরবর্তী রাজনৈতিক গতিধারাকে প্রভাবান্বিত করে। (হারুন, ২০০১ : ৭০-৭১)

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তার ঢেউ ভারতবর্ষেও আছড়ে পড়ে। মুসলমান সম্প্রদায় ধর্মীয় আবেগের কারণে তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার চেষ্টা করে। ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করলে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা তুরস্কের খেলাফত রক্ষা করার দাবিতে আন্দোলন করে—এ আন্দোলন ইতিহাসে খেলাফত আন্দোলন নামে পরিচিতি। এ আন্দোলনে ব্রিটিশ বিরোধী চেতনা কাজ করার এক পর্যায়ে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন যুক্তভাবে অগ্রসর হয়। "১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু-মুসলিম মিলনের স্মারক লক্ষ্মৌ প্যাক্ট সাধিত হলে মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা ও আইন সভার আসন সংরক্ষণের দাবি স্বীকৃত হয়। এ সময় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনৈতিক তৎপরতা যুক্তভাবে ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়।" (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭ : ১৪) পরিণামে

এ আন্দোলন হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবোধকে আরও বেশি জাগ্রত করে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

১৯১৭ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং একই সালের অক্টোবর মাসে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়— যা বিশ্বে অক্টোবর বিপ্লব বা রুশ বিপ্লব হিসেবে পরিচিত। রুশ বিপ্লব প্রতিটি সচেতন ভারতীয়দের দৃষ্টিতে প্রতিক্রিয়াশীল বিরাট এক বিশ্বশক্তির পতন হিসেবে চিহ্নিত হলো। রাউলাট বিলের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলাকালে জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে সংঘটিত হয় জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড (১৩ এপ্রিল ১৯১৯)। ঐ বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন আরও ব্যাপকতা লাভ করে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত (১৯১৫ সালের ৩ জুন) 'স্যার' বা 'নাইটহুড' উপাধি বর্জন করেন। এ পরিস্থিতিতে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশদের দমন ও নিপীড়নমূলক শাসনকার্যের বিরুদ্ধে তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন।

১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নে-উজবেকিস্তানের রাজধানি তাসখন্দে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের[১] উদ্যোগে এবং ভারতে ১৯২১ সালে শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, শওকত ওসমানি ও মুজফ্ফর আহমদ-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে কমিউনিস্ট পার্টি। "বস্তুত ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পর থেকেই এই অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী সশস্ত্র আন্দোলনে ছেদ পড়ে। স্বাধীনতাকামীরা দলে দলে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে আরম্ভ করেন। বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে কমিউনিস্ট পার্টি খুবই প্রভাব ফেলে। কোথাও কোথাও কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনও গড়ে ওঠে।" (হাননান, ১৯৯৯ : ৯৬) ব্রিটিশবিরোধী খেলাফত আন্দোলন ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ক্রমশ সহিংস হয়ে উঠলে চৌরিচোরা হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মহাত্মা গান্ধী হঠাৎ করেই আন্দোলন স্থগিত করেন। আন্দোলন স্থগিত করার প্রতিক্রিয়ায় হতাশা এবং সেই সূত্রে সশস্ত্র আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

বিশ শতকের বিশ ও তিরিশ দশকে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় এ অঞ্চলে বিভিন্ন সংগঠন ও চুক্তি করার ঢেউ জাগে। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ১৯১৫ সালে ভারত থেকে জাপানে পালিয়ে গিয়ে ১৯২১ সালে সেখানে গড়ে তোলেন 'স্বাধীন ভারত লীগ' এবং সুভাষচন্দ্র বসুও ভারত থেকে জার্মানিতে পালিয়ে গিয়ে ১৯৪৩ সালে সেখানে 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' সংগঠন গড়ে তোলেন। ভারতবর্ষের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) ১৯২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর গঠন করেন 'নিখিল ভারত স্বরাজ পার্টি।' একজন উদার এবং অসাম্প্রদায়িক মানুষ হিসেবে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে চিত্তরঞ্জন দাশের ছিল ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা। তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির জন্য ১৯২৩ সালে মুসলমান নেতাদের সাথে ঐতিহাসিক

'বেঙ্গল প্যাক্ট' (Bengal Pact) চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৯২৮ সালে এ.কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'কৃষক প্রজা পার্টি'।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত ইংরেজরা এদেশে শাসনকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে দমন-পীড়নের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। "১৯৩০ সালে ৬ এপ্রিল গান্ধীজী লবণ আইন অমান্য করার জন্যে পায়ে হেঁটে ডান্ডি যাত্রা শুরু করেন। ১২ এপ্রিল গান্ধী গ্রেফতার হন। ৩০ জুলাইয়ের দিকে এই আন্দোলনে যোগদানকারী প্রায় লাখ লাখ মানুষ স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণ করে। মদের দোকানে প্রতিরোধ, বিলেতি কাপড় পোড়ানো প্রভৃতি ঘটনা তখন একটি নিত্যদিনের স্বাভাবিক দৃশ্য ছিল।" (হাননান, ১৯৯৯ : ১০১) ঐ একই সালের ১৮ এপ্রিল মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে বাঙালি বিপ্লবীরা চট্টগ্রামে ব্রিটিশদের দুটি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে। ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সূর্যসেন গ্রেফতার হন এবং ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি দেশ-দ্রোহীতার অপরাধে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এ সময় স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল সূর্যসেনের চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দখল কিংবা মীরাট ষড়যন্ত্র[২] মামলা।

ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভারত শাসন আইন পাশ করে। ১৭৫৭-১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সালে সংঘটিত 'সিপাহি বিদ্রোহ' ভারতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার ওপর একটি বড় আঘাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিদ্রোহ পরবতীকালে ১৮৫৮ সালে মহারানি ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণার মাধ্যমে সরাসরি ভারতের শাসনভার নিজহস্তে তুলে নেন। ভারতের শাসনকার্য গ্রহণ করার পূর্বে ১৭৭২ সালের 'রেগুলেটিং এ্যাক্ট' এবং ১৭৮৪ সালের 'পিটস ইন্ডিয়া এ্যাক্ট'-এর সমবায়ে ভারত শাসনের প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করা হয়। "বস্তুত ১৮৫৮ সালের পরবর্তীকালে বিভিন্ন এ্যাক্ট বা ভারত শাসন আইন, যথা ১৮৬১, ১৮৯২, ১৯০৯, ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ সালের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভারত সংক্রান্ত আইনের মাধ্যমেই এদেশে শাসনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটে।" (হারুন, ২০০১ : ৮৭) এ-সম্পর্কে আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেন :

> ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বড় রকম সমর্থন পেয়ে যায় ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে। ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন-আইনে এর প্রতিফলন ঘটে।...১৯৩৫-এর পর এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি করে যাতে দেশবিভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। (আনিসুজ্জামান, ২০১১ : ৩১)

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দশ বছর (১৯৩৭-১৯৪৭) পূর্ব বাংলায় চারটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের মাধ্যমে এ.কে. ফজলুল হক প্রথম এবং ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৪৩ সালের ২৮ মার্চ ফজলুল হক মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলে খাজা নাজিমুদ্দীন ২৪ এপ্রিল ১৩ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ব্রিটিশ শাসনামলে সর্বশেষ নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালে। "১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনে লিগের সাফল্যে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়ে তাদের দাবির সারবত্তা প্রমাণ করে। এতদিন ধরে কংগ্রেস যে নিজেদের ভারতীয় জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি বলে দাবি করে আসছিল, তা খানিকটা দুর্বল হয়ে যায়।" (আনিসুজ্জামান, ২০১১ : ৩১) এ নির্বাচনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) ও আবুল হাশিমের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) সারা বিশ্বের ন্যায় পূর্ব বাংলার ভূ-রাজনীতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। ব্রিটিশ শাসনের অন্তিমপর্বে বৈশ্বিক রাজনীতির সমান্তরালে এ অঞ্চলেও দ্রুত আর্থ-সামাজিক, ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনও অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ সময় বিশ্বরাজনীতি এবং দেশীয় রাজনীতি এক বিক্ষুব্ধ কাল অতিক্রম করছিল। ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ হিন্দু-মুসলমানের পৃথক ধর্ম, স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্পকলা, রীতিনীতির কথা উল্লেখ করে দুটি সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের তাগিদ প্রদান করে 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র (Two Nations Theory) প্রবর্তন করেন। পরবর্তী দিন ২৩ মার্চ পাকিস্তানের লাহোরে ঐ একই অধিবেশনে শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক পাকিস্তান প্রস্তাব বা লাহোর প্রস্তাব ঘোষণা করেন। দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও লাহোর প্রস্তাব ঘোষণার পরবর্তী সময়ে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। এ-সম্পর্কে কালিপদ বিশ্বাস উল্লেখ করেন :

> ফজলুল হক দীর্ঘকাল ধরে যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব বিকশিত করেন, তার প্রভাব দ্রুতগতিতে হ্রাস পায়। ঘটনার চাপে 'লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং 'সাতানা' বক্তৃতা দিয়ে ফজলুল হক দ্বিজাতিতত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িক শক্তিকেই ক্রমবর্ধমান করে তোলেন।....ফজলুল হক 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করে জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বকেই সামনে নিয়ে এলেন এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রগঠনের দাবিটির প্রতি গুরুত্ব দান করেন। কিন্তু অচিরেই হক সাহেব তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। জিন্না তখন অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। (কালিপদ, ২০১২ : ২-৩)

১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু-যা আগস্ট আন্দোলন (Quit India Movement) নামে পরিচিত। উপনিবেশ আকড়ে রাখবার স্বীয় চেষ্টায় রত ঔপনিবেশিক শাসকচক্র; অন্যদিকে স্বদেশী, জাতীয়তাবাদী এবং শ্রেণিসচেতন কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলন শাসকচক্রের ভিত নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। "অহিংস এবং সহিংস আন্দোলনের দুটো ধারাই স্বতন্ত্রভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে এমন একটা পর্যায়ে উন্নীত করে, যার ফলে ব্রিটিশ শাসকরা উদ্বিগ্ন হয়ে হন। মহাত্মা গান্ধী বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও নীতিগতভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের ধারাটিকে সমর্থন করা কখনোই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।...ইতিমধ্যে উদ্বিগ্ন ব্রিটিশ সরকার মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত গণআন্দোলনকে প্রতিহত করতে সহায়করূপে পায় মুসলিম লীগের একমাত্র কর্ণধার জিন্নাকে। তাই মহাত্মা গান্ধীর ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারত গঠন করার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।" (কালিপদ, ২০১২ : ৫) ঔপনিবেশিক শাসনের পরিণাম স্বরূপ সাম্প্রদায়িক

বিষবাষ্পে বাংলার আকাশ তখন ভারাক্রান্ত। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত উভয় বাংলায় অসংখ্যবার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত হয়। তবে ১৯৪৬ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘটিত হয় স্মরণাতীত কালের ভয়াবহ দাঙ্গা। উল্লেখ্য, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাকালীন ব্রিটিশ শাসকদের ভূমিকাও ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। এ-সম্পর্কে আনিসুজ্জামানের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের কলকাতায় যে মর্মান্তিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হল— যার জের চলে অন্যত্র, বিশেষ করে, একদিকে নোয়াখালিতে, অন্যদিকে বিহারে— তা-ই লিগ-কংগ্রেসের একযোগে চলা চূড়ান্তভাবে অসম্ভব করে দেয়। বাকিটা করে অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকারে কাজ করার অভিজ্ঞতা। একদিকে ব্রিটেনে নির্বাচনোত্তর নতুন সরকার ভারতবর্ষকে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে স্বাধীনতাপ্রদানের ঘোষণা দিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় করে পাঠায়, অন্যদিকে ভারতের রাজনৈতিক নেতারা দেশবিভাগের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হন। (আনিসুজ্জামান, ২০১১ : ৩১-৩২)

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সাম্প্রদায়িক সংঘাত দূর করার লক্ষ্যে ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস উভয় নেতাদের সঙ্গে সমঝোতা বৈঠকে বসেন। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন নিয়ে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন উপলব্ধি করেন যে, ভারত বিভক্তি ছাড়া এদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় "যে বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকদের কাছে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ ছিল 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ' যারা বাংলাভূমি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদে ঐক্য রাখার জন্য আয়োজন করেছিল রাখিবন্ধন উৎসবের এবং যাদের দুর্বার আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ সরকার ঐ ব্যবস্থাকে রদ করতে বাধ্য হয়েছিল, সে হিন্দু ভদ্রলোক সমাজই ১৯৪৭ সালে বাংলাকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করার পক্ষে রায় দিল।" (সিরাজুল, ১৯৯৩ : ১৮) অবশেষে, দীর্ঘ পথপরিক্রমা শেষে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট হিন্দু-মুসলমানের জন্য ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক আবাসভূমির জন্ম হয়। ভারতবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হয় আরেক নৃশংস ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ— হিন্দু-মুসলমান ও শিখ-মুসলামান দাঙ্গা। "ইতিহাসের বৃহত্তম দেশত্যাগও সংঘটিত হয়— প্রায় দুই কোটি মানুষ বাস্তুত্যাগ করে। তারপরেও দেখা গেল, ভারতে মুসলমান এবং পাকিস্তানে হিন্দু রয়ে গেল— যার যার দেশের নাগরিক হিসেবে। মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্ব-অনুযায়ী যে ভারতীয় মুসলমানদের একটি পৃথক জাতি বলা হয়েছিল, তারা এখন ভারতীয় ও পাকিস্তানি জাতিতে বিভক্ত হয়ে দ্বিজাতিত্ত্বের অসারতাই প্রমাণ করল।" (আনিসুজ্জামান, ২০১১ : ৩৩) আর এভাবেই দ্বিখণ্ডিত হল দুই বাংলা এবং দ্বিখণ্ডিত হল বাঙালি সত্তা।

A_%bwZK Ae¯'v

১৭৫৭ সালে "ব্রিটিশ অধিকারের আগে ভারতবর্ষের অর্থনীতি ছিল সামন্ততান্ত্রিক। দীর্ঘকালব্যাপী প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এই অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয়। অবশ্য সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য একেবারে লোপ পায়নি। এই পরিবর্তন ঘটেছিল প্রধানত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকারের ফলে। একদিকে ছিল ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অনুসৃত এবং আর্থিক নীতিসমূহ, অন্যদিকে ছিল বাণিজ্য, শিল্প ও আর্থিক এই তিন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের প্রসার।" (দেশাই, ২০০১ : ২৫) পলাশি যুদ্ধের পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ব্যবস্থা ১৭৫৭-১৮৫৭ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হয়। এসময় থেকে আরম্ভ হয় কোম্পানি এবং নবাবের দ্বৈতশাসন এবং এ দ্বৈতশাসনের ফলে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ১৭৬৪-৬৫ সালে ভূমিরাজস্ব ছিল ৮১ লক্ষ টাকা, ১৭৬৫-৬৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকায় পৌঁছায় এবং এর মাত্র সাত বছর পর ১৭৭৩ সালে এ রাজস্ব ধার্য করা হয় ৩ কোটি টাকা। কোম্পানির লুন্ঠন ও নবাবের শাসনের উৎপীড়নের পথধরে বাংলায় দুর্ভিক্ষ (১৭৬৯-১৭৭০) ভয়াবহরূপ ধারণ করে— যা এদেশে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' (১১৭৫-১১৭৬ বঙ্গাব্দ) নামে পরিচিত। এ দুর্ভিক্ষে অর্ধেক কৃষক এবং জনগণের তিন ভাগের এক ভাগ মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। জমিদারের অত্যাচার এবং কোম্পানির শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেক চাষী নিজ অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। "একমাত্র রংপুরের উর্বর জমি ছেড়ে ৩০ হাজার পরিবার কোচবিহার চলে গিয়েছিলো। এভাবে চাষীরা অন্যত্র পালিয়ে যাওয়া এবং মারা যাওয়ায় জমিও পড়েছিলো অনাবাদি হয়ে।" (মুরশিদ, ২০০৮ : ৯১) এরই পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি বাংলার ভূমি এবং রাজস্ব ব্যবস্থায় ১৭৭২ সালে পাঁচশালা, ১৭৮৯-৯০ সালে দশসালারীতির প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে কোম্পানির সুশৃঙ্খল শোষণের সুবিধার্থে ইংরেজরা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (১৭৯৩) প্রবর্তন করেন। উল্লেখ্য যে "মোঘলযুগে জমিদার ছিলেন খাজনা আদায়কারী মাত্র, জমির দখলীসত্ব ছিল কৃষকের; কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় জমিদারকে দেওয়া হল জমির মালিকানা। ফলে কৃষকেরা শক্তিশালী জমিদারের অর্ধদাসে পরিণত হল।" (মনিরুজ্জামান, ২০০৪ : ২০০) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজরা দেশীয় জমিদার শ্রেণির ওপর স্থায়ী প্রভুত্ব অর্জন করে। অন্যদিকে ইংরেজ-সাহায্যপুষ্ট জমিদারশ্রেণিও এ সুযোগে কৃষকের ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করে। এসময় মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি ইংরেজ তোষণের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ-সম্পত্তির মালিক হয়। এ মধ্যস্বত্তভোগী শ্রেণি সমাজে জমিদার, পত্তনিদার, গাঁতিদার, তালুকদার, জোতদার, হাওলাদার হিসেবে পরিচিতি পায়। এ শ্রেণিও স্ব-সমাজের সাধারণ জনগণকে শোষণের মাধ্যমে তাদের জীবনকে বিষিয়ে তোলে।

নবাবি, কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায় এ সময়ে এদেশে বিভিন্ন খাদ্যশস্য ও রপ্তানিকারক দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে ধাবিত হয়েছে। "প্রাক-ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ভিত্তি ছিল বস্ত্রশিল্প.

হস্তশিল্প, আফিম ও শর্করা। কোম্পানি শাসনের শেষ নাগাদ এই সব উপাদান গুরুত্ব হারায় এবং প্রাচীন অর্থব্যবস্থার ধ্বংসস্তুপের উপর আবির্ভাব ঘটে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির, যাতে যুক্ত হয় নতুন উপাদান, যেমন নীল, পাট, চা ও আধুনিক শিল্পের। কিন্তু সাধারণ অর্থনীতি তখনো ছিল মূলত কৃষি নির্ভর।" (সুগত, ১৯৯৩ : ৮৮) নীলচাষের মাধ্যমে এদেশে কৃষকের উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হলেও জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে কৃষক প্রতিকূল পরিবেশেও স্বাভাবিক উৎপাদন বজায় রাখার জন্য ছিল তৎপর।

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও "১৯২০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সময়পর্বকে মাথাপিছু উৎপাদনহ্রাসের পর্যায় বলে গণ্য করা হয়।" (সুগত, ১৯৯৩ : ৯৪) তবে কিছু সময়ের জন্য হলেও "১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে চা-এর রপ্তানিমূল্য ঘটনাক্রমে কাঁচা পাটের রপ্তানি মূল্যকে ছাড়িয়ে যায়।" (সুগত, ১৯৯৩ : ৯৮) এসময় পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বেহাল অবস্থা, এ অঞ্চলে দ্রুত গতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে ফসলি জমির উপর চাপ এবং ব্রিটিশ শাসনের সুবিধার্থে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হলে অর্থনীতির উপর তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে এ অঞ্চলে উৎপাদিত কাঁচামাল দ্রুতগতিতে অঞ্চলের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হতো এবং সেই কাঁচামাল থেকেই উৎপাদিত পণ্য এদেশেই উচ্চমূল্যে বিক্রি করা হতো। ১৯৩০ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে সর্বগ্রাসী মন্দার যে প্রভাব পড়েছিল সে প্রভাব থেকে এদেশের অর্থনীতিও মুক্ত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক মন্দার ফলে কৃষিদ্রব্যের উৎপাদনহ্রাস না পেলেও কৃষিদ্রব্যের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবেহ্রাস পায় । একারণে কৃষকের আয়ও উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণেহ্রাস পায়। ফলে বিশ্ববাজারে পাটের চাহিদা প্রথমবারের মতো নিম্নগামী এবং আমদানির পরিমাণ দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বিশ্বমন্দার ফলে অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতা, পণ্যের উর্ধ্বমুখী মূল্য, ঋণগ্রস্ততার হার বৃদ্ধি, বাংলার মুসলমান এবং কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপাদন ও আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণেহ্রাস পায়। বাংলার মুসলমান এবং কৃষকের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থাকে দায়ী করে ভূমি ব্যবস্থার উপর নতুন করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, বাংলার ভূমিব্যবস্থা এবং কৃষকদের উন্নতি সাধনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রমথ চৌধুরী বিভিন্ন প্রবন্ধে তাঁদের মতামত উপস্থাপন করেছিলেন।

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় কৃষকশ্রেণি বরাবরই উপেক্ষিত থেকেছে। সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) পরবর্তীকালে ১৮৫৯ সালে 'খাজনা আইন', ১৮৮৫ সালে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন', ১৯২৮ সালে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' (সংশোধন), ১৯৩৮ সালে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' (সংশোধন), ১৯৪০ সালে 'মহাজনী আইন' পাস হয়। এসব আইনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জমিদারি শোষণ বন্ধ করা এবং কৃষকের উদ্বৃত্ত পুঁজিতে পরিণত করা। কিন্তু ১৯৩৭ সালে এসে দেখা যায় কৃষকের কোনো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধিত হয় নি। তবে সে-সময় বাংলার মুসলমান এবং কৃষকদের দুরবস্থার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

দায়ী করা হতো ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা এবং শাসিত হিন্দু সম্প্রদায়কে। ইংরেজদের প্রতি অভিযোগ ছিল মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, আর্থিক উন্নতি সাধনে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে চরম ঔদাসীন্য দেখানোর কারণে মুসলমান সমাজ অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদপদ এবং শাসিত হিন্দুদের প্রতি অভিযোগ ছিল তারা মুসলমানদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল । কর্মসংস্থান বিষয়ে মুসলমানদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার ব্রিটিশ সরকার কোন কোন বিভাগে শতকরা ৪৫ ভাগ চাকুরি দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল। এ-সময় মুসলিম সাহিত্য সমাজের লেখক আবুল হুসেন 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ' নামে একটি প্রবন্ধও রচনা করেছিলন।

তবে ১৯৩৮-১৯৩৯ সালের দিকে বৈশ্বিক রাজনৈতিক উত্তাপ, ভারতবর্ষীয় সমাজে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক অসহযোগিতার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্থবির হয়ে পড়ে। সে-ক্ষেত্রে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, আর্থিক মূলধন এবং ভূ-সম্পত্তি কতিপয় শক্তিমান জোতদারের হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ে। জোতদার শ্রেণি তাদের সম্পত্তিতে আধিয়ার বা ভাগচাষীর মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থা বজায় রাখে । এ প্রক্রিয়ার মালিক হিসেবে জোতদার শ্রেণি ফসলের অর্ধেক অংশ হস্তগত করত কিন্তু সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বৃদ্ধির প্রবণতা থমকে দাঁড়ায়। এর মূল কারণ ছিল জোতদার শ্রেণির অসহযোগিতা, বৈরি আবহাওয়া এবং এ অঞ্চলের ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক অস্থিরতা। তাছাড়া সমাজের বিভিন্ন প্রকারের সুবিধাবাদি শ্রেণি কৃষকের উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিভিন্নভাবে ব্যাহত করার জন্য তৎপর ছিল। অবশেষে তিরিশ-এর শেষ পর্যায়ে ফড়িয়া, বেপারি, সুদখোর মহাজন, দাদন ব্যবসায়ী, মধ্যস্বত্বভোগী, জোতদার শ্রেণির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এ.কে. ফজলুল হক 'ঋণ সালিশী বোর্ড' (১৯৩৮), 'প্রজস্বত্ব আইন' (১৯৩৯) এবং 'মহাজনী আইনে'র (১৯৪০) মাধ্যমে মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান ও চাষী সম্প্রদায়ের জন্য প্রভূত উপকার সাধন করেছিল। তবে কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে মুসলমান সমাজ এবং কৃষকের উন্নতির কথা উঠলেও প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে তা আর বেশিদূর অগ্রসর হয় নি। তাছাড়াও সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের চিন্তা করলেও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও সুদ আদান-প্রদানের কথা ভেবে ধর্মীয় কারণে মুসলমান সমাজ সেখান থেকেও পিছিয়ে আসে। এ-সময় উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও কুটির শিল্পের পতন অবশম্ভাবী হয়ে ওঠে এবং কৃষকসমাজকে অর্থনৈতিক দিক থেকে পরনির্ভরশীল করে তোলে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) ভারতবর্ষীয় সমাজে রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়াও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এ-সময়ে অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক সরকার এবং ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের অর্থ ও মুদ্রা ব্যবস্থার কারণে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হিন্দু-মুসলমানদের পারস্পরিক সহিংস সংঘাত, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এ অঞ্চলের মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে আরও বিপন্ন করে তোলে। তাছাড়া এ সময় কর্ডনিং প্রথা চালু, বন্টনের চূড়ান্ত অব্যবস্থা, অসাধু ব্যবসায়ী

কর্তৃক অধিক মুনাফা লাভের আশায় অধিক খাদ্যশস্য গোপনে মজুদ করে রাখা, জাপান কর্তৃক ব্রহ্মদেশ আক্রমণের ফলে সেখান থেকে চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়া, দুর্ভিক্ষের আভাস পেয়ে ভারত সরকার সেনাবাহিনির জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে গুদামজাত করার ফলে এ অঞ্চলে খাদ্য ঘাটতি চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। অবশেষে ঔপনিবেশিক শোষণ, বিশ্বমন্দা, ২য় বিশ্বযুদ্ধ, রাজনৈতিক টানাপড়েন এবং খাদ্য ঘাটতির পথ ধরে ১৯৪৩ সালে (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) নেমে আসে মহাদুর্ভিক্ষ। এ দুর্ভিক্ষ ছিল মূলত ব্রিটিশ সরকারের শাসন-শোষণ এবং তাদের ষড়যন্ত্রের ফল। ব্রিটিশ সরকার এদেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিকাশকে যেমন বাধাগ্রস্ত করেছে তেমনি অর্থনৈতিক বিকাশকেও করেছে স্থবির।

mgvR-ms¯‹…wZ

আধুনিক যুগে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ। ব্রিটিশ শাসনামলে শিক্ষার সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাঙালির মেধা-মননের পরিচর্যা আরম্ভ হয়। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বাঙালি সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। শিক্ষা-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্পকলা-ইতিহাস রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে আসে পরিবর্তনের ডাক। আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়ে ইংরেজদের আনুকূল্যে হিন্দু সমাজ এগিয়ে গেলেও অশিক্ষা-অভিমান-ইংরেজদের অসহযোগিতা-বৈরী পরিবেশ এবং বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কারণে মুসলমান সমাজ পিছিয়ে পড়ে। ব্রিটিশ শাসকবর্গ কৌশলে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বকে লালন করে সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টিতে রসদের যোগান দেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, এদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে আবহমান বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতির উপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। বিশেষ করে শাসন ব্যবস্থা, বাংলার ধর্মীয় জীবন, ভাষা-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সঙ্গীত, স্থাপত্য, রীতি-নীতি, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, যাতায়াত ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ সিরাজুল ইসলাম মন্তব্য করেন :

> বাঙালি জাতির ধর্ম, বর্ণ,সংস্কার, অভ্যাস, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, আইন-কানুন প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদেশী শাসক শ্রেণীর ছাপ সুস্পষ্ট এবং সেটা রাজনৈতিক আধিপত্যেরই প্রত্যক্ষ ফল। (সিরাজুল, ১৯৯৩ : ১)

আঠারো শতকের প্রথমার্ধে নবাবি সমাজব্যবস্থায় দেশীয় সুবাহদার, আমলা এবং মুৎসুদ্দি শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। কৌলীন্য, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, বাঈজি নাচ এ-সময়ে ছিল প্রচলিত প্রথা। উনিশ শতকের প্রারম্ভে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা সূচিত হওয়ার পর এদেশে “খাজনা-নির্ভর পরশ্রমীজীবী একটি নতুন শ্রেণি গড়ে উঠেছিল।” (মুরশিদ, ২০০৮ : ৯৩) এ শ্রেণিকেই কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে ‘বাবু , ভদ্রলোক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির’ উদ্ভব ঘটে। সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা, অফিস-আদালত, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য সমাজের সর্বস্তরে ছিল এ বাবু-মধ্যবিত্ত শ্রেণির

একচেটিয়া আধিপত্য। ধর্মীয় পুনর্জাগরণ, আধুনিক নগরায়ণ, বহুভাষাচর্চা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ এ সময়ে সাধিত হয়।

ভারতবর্ষীয় সমাজে ব্রিটিশ শাসনের বিস্তার এবং তা শক্তভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে ইংরেজরা সরকারি কর্মচারীদের এদেশের সাধারণ জনগণ, ভাষা, সমাজ-সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা- প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। উল্লেখ্য, ভাষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ব্রিটিশরা এদেশে তাদের শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে নি। এ-সম্পর্কে গোলাম মুরশিদ উল্লেখ করেন :

> তাদের শাসনের বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে বঙ্গদেশে এমন একটা পথে এগিয়ে গিয়েছিলো, যার নির্দেশ মুসলিম শাসকরা দিতে পারে নি, পর্তুগীজ যোগাযোগও নয়। অতঃপর এই পথ ধরেই উনিশ শতকে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা আমূল বদলে গিয়েছিলো। এবং কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সঙ্গীত তথা বাঙালির সংস্কৃতি অসামান্য সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। (মুরশিদ, ২০০৮ : ৯৯)

সরকারি দলিলপত্রাদি তৈরি, কর্মচারীদের উপযোগী গ্রন্থ রচনা, অভিধান সৃষ্টি এবং ধর্মীয় পুস্তক প্রণয়নের সূত্র ধরে জেমস অগাস্টাস হিকির উদ্যোগে ১৭৭৭ সালে এদেশে প্রচলন ঘটে মুদ্রণ সংস্কৃতির। বাংলা গদ্যের বিকাশে কলকাতার অদূরে শ্রীরামপুর মিশনারি প্রেসের (১৮০০) কথা স্মরণীয়। কেননা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের (১৮০০) ছাত্রদের উপযোগী যে পুস্তকগুলো প্রণয়ন করা হয়েছিল তা এ ছাপাখানা থেকেই মুদ্রিত হয় এবং এ পুস্তকগুলোতে এদেশের বিভিন্ন ইতিহাস, ভূগোল, প্রচলিত কাহিনি, চিঠিপত্র, সমাজের বিভিন্নস্তরের মানুষের কথ্য ভাষার নমুনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া মুদ্রণ সংস্কৃতির বিকাশের ফলে অসংখ্য গ্রন্থ এবং একাধিক পত্রিকা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার সাথে সাথে এ অঞ্চলের জনমনে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে।

ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে এ অঞ্চলে ইংরেজি ভাষা শেখার আগ্রহ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। কেননা সে সময় ইংরেজদের অধীনে চাকরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের একমাত্র মাধ্যম ছিল ইংরেজি ভাষা। তবে এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের থেকে হিন্দুরা অনেক বেশি এগিয়ে ছিল। অনেকে ইংরেজি না জেনেও— শুধু ইংরেজি কাগজপত্র কপি (নকল) করার মাধ্যমে নিজেদেরকে বিত্তবান শ্রেণিতে রূপান্তর করেছিলেন। সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় ইংরেজিচর্চা এবং পাশ্চাত্য ভাবধারা ব্যক্তির মনন এবং আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। এ-সম্পর্কে গোলাম মুরশিদ-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> ইংরেজি শেখার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার প্রতি অবজ্ঞার ভাবও এসেছিল এই তরুণদের মধ্যে। ইংরেজিতে তাঁদের জ্ঞান যেমনই হোক না কেন, তাঁরা বাংলা ভাষায় দুর্বল।... জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব ইংরেজি ভাষার ব্যবহার ক্রমশ ফ্যাশনে পরিণত হচ্ছিলো। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই নগরায়ণ,

Dhaka University Institutional Repository

> ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং পশ্চিমা চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে মন ও মননে নানা ধরনের পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। (মুরশিদ, ২০০৮ : ১২৪-১২৫)

ঊনিশ শতকের প্রারম্ভে বিদেশি শাসক, ধর্ম এবং সংস্কৃতির সংস্পর্শে এদেশের মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধর্মবোধ, রীতি-নীতি এবং মূল্যবোধেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। মুক্তবুদ্ধি, যুক্তিবাদ এবং উদারনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসময়ে প্রথাগত রীতি-নীতি, ধর্মবোধ এবং সংস্কৃতিকে নতুন যুক্তির আলোকে বিচার করা হয়। ফলে আবহমান বাঙালি সমাজে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা (১৮২৯) এবং গঙ্গা সাগরে সন্তান বিসর্জন দেওয়ার মতো অমানুষিক প্রথার বিলোপ সাধিত হয়। পরবর্তীকালে কুলীনদের বহুবিবাহ বন্ধে এবং হিন্দু বিধবা নারীদের পুনর্বিবাহের পক্ষে প্রবল জনসচেনতা গড়ে ওঠে। পরিশেষে ১৮৫৬ সালে ‘বিধবা বিবাহ’(১৮৫৬) আইন প্রচলিত হয়।

বিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালি সমাজ ছিল প্রধানত গ্রামভিত্তিক, মানুষের জীবনপ্রবাহ ছিলো মন্থরগতির এবং তাতে পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে ধীর গতিতে সমাজচক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু বিশ শতকে এসে গ্রাম এবং শহরজীবনে পরিবর্তনের নতুন মাত্রা সূচিত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষি জমির উপর দ্রুতগতিতে চাপ বৃদ্ধি পায় এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষ শহরমুখো ধাবিত হয়। প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে হাট-বাজার-শহর-বন্দর। অন্যদিকে বড় শহরগুলো আরও বিস্তৃতি লাভ করে এবং শহরগুলোতে অধিক সংখ্যক অফিস-আদালত, কল-কারখানা গড়ে ওঠে। তাছাড়া এসময় যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থায়ও উন্নতি সাধিত হয়।

বিশ শতকে পরিবার কাঠামোতেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। “শতাব্দীর প্রথম দিকে হিন্দু মধ্যবিত্তের পরিধি যতো বিকাশ লাভ করে, একান্নবর্তিতাও ততো প্রসারিত হয়। আবার তাঁদের দেখাদেখি শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও একান্নবর্তিতা যৎকিঞ্চিত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে।” (মুরশিদ, ২০০৮ : ১৫৫-১৫৬) মূলত জীবিকা উপার্জনের তাগিদে এবং মূল্যবোধ পরিবর্তনের ফলে যৌথ পরিবারের স্থানে একক পরিবার জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাছাড়া ঊনিশ শতকে যেখানে জন্মের ওপর সামাজিক মর্যাদা এবং আভিজাত্য নির্ভর করতো— বিশ শতকে সেখানে স্থান অধিকার করে সম্পদ ও শিক্ষা। ঊনিশ শতকে শিক্ষা ব্যবস্থা কলকাতাকেন্দ্রিক উচ্চবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বিশ শতকে এসে প্রায় সব ধর্ম-বর্ণের, শ্রেণি-পেশার পরিবারের সন্তান শিক্ষার অধিকার লাভ করে। বিশ শতকের সূচনাতে ‘বঙ্গভঙ্গ’-এর (১৯০৫) মাধ্যমে রাজধানী ঢাকাকেন্দ্রিক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসময় পূর্ব বাংলায় স্কুল-কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার গতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৯১১ সালে হিন্দু রাজনীতিকদের প্রবল আন্দোলনের মুখে ‘বঙ্গভঙ্গ রদ’ হলে সে গতিধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এখানে উল্লেখ্য, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির যে ফাটল সৃষ্টি হয় তা বাংলাভাগের (১৯৪৭) পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা জীবনের বিকাশের সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্পর্ক নিগূঢ়। একথা স্পষ্ট যে, অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম প্রায় দেড়শ বছর মুসলমানদের তেমন কোন সাংস্কৃতিক বা শিক্ষার প্রসার ঘটে নি। তাই উনিশ শতকের নবজাগরণে মুসলমানদের কোন ভূমিকা চোখে পড়ে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও লাখেরাজ সম্পত্তির বাজেয়াপ্তিজনিত কারণে বাঙালি মুসলমান শহর থেকে গ্রামমুখী হয়ে পড়ায় তাদের পক্ষে শহরে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ অর্থনৈতিক কারণেই ছিলো অসম্ভব। উনিশ শতকের শেষ তিন দশক ও বিশ শতকের প্রথম দুই দশক— এই অর্ধশতাব্দীব্যাপী বাঙালি মুসলমানের জীবনে যেমন কিছুটা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আসে, তেমনি আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতিও সৃষ্টি হতে থাকে আগ্রহ। বাঙালি মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করতে যাঁরা অগ্রণি ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) এবং সৈয়দ আমির আলী (১৮৪৯-১৯২৮) উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ কালপর্বে বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষা-সাহিত্য এবং মানস গঠনে যে-সব সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান কিংবা এসোসিয়েশন বিশেষ ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে মহামেডান লিটারারি সোসাইটি (১৮৬৩), সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন (১৮৭৮), আঞ্জুমানে ইসলামী বা মহামেডান এসোসিয়েশন (১৮৮৫), কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন (১৮৯৩), মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন (১৮৯৬), বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি (১৮৯৯), বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি (১৯০৩), বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি (১৯১১), আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা (১৯১৩), বেঙ্গল মোসলেম ফেডারেশন (১৯২১), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১), পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি (১৯৪২) অন্যতম। এখানে উল্লেখ্য যে, পূর্ব বাংলার মানুষের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হয় ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলীর প্রচেষ্টায় এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম সমাজের বিকাশ সাধিত হয়— এঁদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২), কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২), শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), সৈয়দ আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) অন্যতম। এঁদের চিন্তা ও কর্ম পূর্ব বাংলার সমাজ পরিবর্তনে এবং মানুষের মানস গঠনে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল।

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় হিন্দু- মুসলমানের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল তা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও বিদ্যমান ছিল। উনিশ শতকে পশ্চিম বাংলায় বিশেষ করে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে যেভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তার সমান্তরালে পূর্ব বাংলায় বিশেষ করে ঢাকা শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সাধিত হয় নি। "সমগ্র বাংলায় সব মিলিয়ে ৪৫টি কলেজের ৩০টি

Dhaka University Institutional Repository

ছিল পশ্চিম বাংলায় এবং মাত্র ১৫টি ছিল পূর্ব বাংলা ও আসামের ছাত্রদের জন্যে।" (হাননান, ১৯৯৯ : ১১৪) ১৯২১ সালে পূর্ব বাংলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে বিশেষ করে মুসলিম ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তবে "ব্রিটিশদের নিয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ঠিক করে যে, এই অঞ্চলের মুসলমান ছাত্ররা শুধু আরবি-ফারসি অধ্যয়নের জন্যই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবে।" (হাননান, ১৯৯৯ : ১১৪) প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলার ছাত্রদেরকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, সংস্কৃতিচর্চা থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ সরকার এ অপকৌশল গ্রহণ করে। বিভিন্ন ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও পূর্ব বাংলায় শিক্ষা এবং চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৯২৬ সালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (পরে ডক্টর) এবং আবুল হুসেনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'সাহিত্য সমিতি'। ঢাকা কেন্দ্রিক সাহিত্য ধারায় এ সমিতির প্রথম আনুষ্ঠানিক যাত্রা ছিল বিস্ময়কর— যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র ও নতুন মেজাজের সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টিতে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন ছাত্রদের উদ্যোগে গঠিত হয় 'পর্দা বিরোধী সংঘ'। এ সংঘের কর্মীরা মূলত পর্দাপ্রথা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে কাজ করে।

হেনরি ভিভিয়ান লুই ডিরোজিও (১৮০৮-১৮৩১)-এর নেতৃত্বে 'ইয়াংবেঙ্গল' (১৮২৮) প্রতিষ্ঠার প্রায় একশ বছর পরে ১৯২৬ সালে ঢাকাকেন্দ্রিক একদল মুসলমান তরুণ মুক্তবুদ্ধির আলোকে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' নামে সমাজচিন্তনে নিবিষ্ট হন। তাঁরা তাঁদের মতামত প্রকাশ করতেন 'শিখা' পত্রিকার মাধ্যমে। এ আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিল 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' তবে 'ইয়াংবেঙ্গল'-এর সদস্যদের সাথে 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে'র একটা বড় পার্থক্য প্রতীয়মান হয়— "ইয়াংবেঙ্গলদের জীবনযাত্রায় পশ্চিমের প্রভাব পড়েছিল বড্ডো বেশি। পোশাকে-আশাকে, চলনে-বলনে, এমনকি পানাহারে তাঁরা ইংরেজদের অনুকরণ করেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের সদস্যরা পশ্চিমের অনুকরণ তেমন করেননি। একটা কারণ হতে পারে যে, ততোদিনে স্বাজাত্যবোধ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে ঘিরে একটা ইংরেজ-বিরোধী তথা পাশ্চাত্য-বিরোধী মনোভাব সমাজের ভেতরে শেকড় গেড়েছিলো।" (মুরশিদ, ২০০৮ : ১৭৮) এ আন্দোলনের তরুণেরা রক্ষণশীলতা কাটিয়ে উঠলেও তাঁরা পশ্চিমা হয়ে ওঠে নি । বরং তাঁদের চিন্তার মধ্য দিয়ে স্বাজাত্যবোধই প্রকাশ পেয়েছে বেশি। বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রগতিশীল চেতনার প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'কে কেন্দ্র করে। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে আহমদ ছফার মন্তব্য এখানে উদ্ধারযোগ্য :

> তিরিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্ররা বুদ্ধির মুক্তির জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের সূচনা করেছিল তার গুরুত্ব বাংলাদেশের মননশীলতা বিকাশে মস্ত বড় ভূমিকা রেখেছিল, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অদ্য স্বাধীন চিত্তবৃত্তি এবং মুক্তচিন্তার কথা উঠলেই সকলে একবাক্যে শিখা গোষ্ঠীর নাম উচ্চারণ করে থাকেন। (ছফা, ২০১১ : ১৫৬)

মুসলিম সাহিত্য সমাজের 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে'র লেখকবৃন্দ বাঙালি মুসলমান সমাজকে অন্ধ সংস্কার ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে এক দশকেরও অধিককাল ধরে তাঁদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এ-সম্পর্কে খোন্দকার সিরাজুল হকের মন্তব্যও উদ্ধারযোগ্য :

> 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' ঊনিশ ও বিশ শতকের বাংলার তথা ভারতের জাগরণ প্রয়াস এবং এবং বিশ্বের সর্বকালের প্রগতিশীল চেতনা থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন একটি বিশেষ অভীষ্টকে সম্মুখে রেখে। এই অভীষ্টটি হলো, বাংলাদেশের একটি অনগ্রসর সমাজের চিন্তার চৌহদ্দীর বিস্তার ঘটিয়ে তাদের জাগতিক জীবনকে উন্নত করা এবং ধর্মীয় উপলব্ধিকে গভীরতর করা। (খোন্দকার সিরাজুল, ২০০৬ : ১২৭)

১৯৩৯ সালে কলকাতার প্রগতি লেখক সংঘের 'প্রগতি' পত্রিকার ভাব ও আদর্শের সাথে একাত্ম ঘোষণা করে পূর্ব বাংলার প্রগতি লেখক সংঘ প্রকাশ করেন 'ক্রান্তি' পত্রিকা– যার প্রকাশক ছিলেন সোমেন চন্দ। এছাড়া ১৯৪১ সালে জুন মাসে জার্মানির হিটলার বাহিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীগণ পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল লেখক সংঘের উদ্যোগে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' গঠন করে। ১৯৪২ সালে মার্চ মাসে সোমেন চন্দের মৃত্যুতে কলকাতার প্রগতি লেখক সংঘ 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' গঠন করে।

বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বিশ শতকের তিরিশ ও চল্লিশ দশকে বাংলা সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক নতুন প্রাণের ছোঁয়া লাগে। এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে এবং জনগণকে সংঘবদ্ধ করার লক্ষ্যে গণসঙ্গীতের সূচনা হয়। "জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিনয় রায়, সলিল চৌধুরী প্রভৃতি গীতিকার-সুরকার এ শ্রেণির গান রচনায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে।" (করুণাময়, ১৯৯৩ : ৩৬৭) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তথা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সু-সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এ সময়ে অসংখ্য দেশাত্মবোধক গান, ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে রক্তমাতাল কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড প্রতিবাদ এবং সমসাময়িকে বাংলা কাব্যসঙ্গীতে গজলের প্রবর্তন করেন। তাছাড়া তিরিশের দশকে এক দল তরুণ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যাদর্শের বিপরীতে আরেকটি নতুন সাহিত্যাদর্শ সৃষ্টির প্রচেষ্টায় মনোনিবেশ করেন। "আধুনিক সঙ্গীত কলার বিকাশ, গীতিকার-সুরকার-গায়ক-শ্রমবিভাজন, রেকর্ডকরণ পদ্ধতির যান্ত্রিক উৎকর্ষ, সবাকচিত্রে নেপথ্য গায়েনের বিকাশ, বেতারের সাঙ্গীতিক কর্মসূচির সম্প্রসারণ" (করুণাময়, ১৯৯৩ : ৩৭০) এবং ১৯৪৩ সালে গণনাট্য আন্দোলনের সূচনা হয়। তবে, ১৯৩০ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সহিংস সংঘাত, ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয় নি।

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার শেষ পর্যায়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কর্ম, রাজনীতি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সবক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। এ প্রতিযোগিতা প্রথমে বিদ্বেষে এবং পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িকতার পথ ধরে এগিয়ে যায়। এর ফলে, এ অঞ্চলে দুই ধরনের জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে খুবই দ্রুত। বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকদের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং স্বল্প সময়ের ব্যবধানে "বাঙালি জাতীয়তাবাদ থেকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের রূপান্তর ঘটে।...পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি তারা প্রণয়ন করেছিল স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখা।" (সিরাজুল, ১৯৯৩ : ২০) পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (১৯৪২), পূর্ব পাকিস্তান রেঁনেসা সোসাইটি (১৯৪২) প্রভৃতি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে নিখিল বঙ্গ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার এবং লাহোর প্রস্তাবের সমর্থনে। উল্লেখ্য, এ সাম্প্রদায়িকতার পথ ধরেই শেষ পর্যন্ত বাংলাভাগ ত্বরান্বিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উন্মাতাল রণ-দামামায় অবিভক্ত বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে জন-জীবনে নেমে আসে দুর্যোগ, দুর্ভোগ, বিপর্যয়, হতাশা আর গ্লানি। মন্বন্তরের হাহাকার, হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু, নারী ও শিশুর চরম মানবেতর দুর্দশা ও লাঞ্ছনা, বাঙালি জীবনকে দিশেহারা করে দেয়। যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা 'পথের পাঁচালী'র গোষ্ঠীবদ্ধ গ্রাম-জীবনের শান্ত, ধীর, নিরুদ্বিগ্ন, মধুর পারিবারিক জীবনের চালচিত্র দ্রুত বদলে যেতে থাকে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা থেকে। হিন্দু মুসলমানের ধর্মীয় ও সামাজিক অসন্তোষ, নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, খুন, জখম, ধর্ষণ, লুটপাট ইত্যাদি ভেদ-বিভেদের অস্থির প্রেক্ষাপটে জাতীয় জীবনে দেখা দেয় নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র, অপরিণামদর্শী রাজনৈতিক হঠকারিতা। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নানা বিভ্রান্তি ও কুয়াশার আচ্ছন্নতা বাঙালি জন-জীবনকে গ্রাস করে ফেলে। সুস্থ অসাম্প্রদায়িক আবহমান জীবনধারা বাঙালির জীবন থেকে মুছে ফেলার রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক চক্রান্ত শুরু হয়।

e¨w³-cwi‡ek

শওকত ওসমানের সাহিত্যিক মানস গঠনে প্রথম পর্যায়ে কলকাতাকেন্দ্রিক এবং পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলাকেন্দ্রিক সমাজ ও জীবনপরিবেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। হুগলি জেলার সবলসিংহপুরের গ্রাম-প্রতিবেশ থেকে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে তিনি শৈশবকালের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। কলকাতায় আগমনের মধ্য দিয়ে গ্রাম পরিবেশের সাথে তাঁর সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটে কিন্তু চেতনাগত দিক থেকে তিনি কোনো না কোনোভাবে গ্রাম-প্রতিবেশের সাথে সংযোগ রেখেছেন। লেখকের ভাষ্যানুসারে : "গ্রাম আমাদের শিকড় বৈকি।" (শওকত, ২০০৭ খ : ৩৭২)— এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে লেখকের গ্রাম-প্রীতি এবং একই সাথে গ্রামের সাথে নিবিড় সম্পর্কের-ই পরিচয় বহন করে। অধ্যয়ন ও অবস্থানগত কারণে তিনি কলকাতার সাহিত্যিক

পরিমণ্ডল (বিশেষ করে ব্যক্তিসান্নিধ্য), পত্রিকা অফিস এবং সংগঠনের সাথে সম্পর্কসূত্রে সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন।

শওকত ওসমানের জন্ম-সমকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বাংলায় মুসলমানদের খেলাফত আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং বহির্বিশ্বে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার অন্তর্গত আরামবাগ মহকুমার খানাকুল থানার সবলসিংহপুর গ্রামে মেহেদি-মহল্লায়। তাঁর পিতার নাম শেখ মোহাম্মদ এহিয়া এবং মাতা গুলেজান বেগম। গ্রামে অবস্থিত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত 'লোয়ার প্রাইমারী এবং হায়ার প্রাইমারী' মক্তবে তাঁর শিক্ষাজীবনের সূচনা হয়। লেখক স্মরণ করেছেন— "যাঁর কাছে আমার হাতে খড়ি হয়...তিনি মৌলবী আইনুদ্দিন খুলনা জেলার অধিবাসী।" (শওকত, ২০০৭ ক : ৫২) ১৯২৭ সালে নিজ জন্মভূমি সবলসিংহপুর গ্রামে স্থাপিত হয় জুনিয়র মাদ্রাসা। শওকত ওসমান এ প্রতিষ্ঠানকেই তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের প্রথম সোপান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে :

> প্রতিষ্ঠানের অভিঘাত সুদূরপ্রসারী। আজ বলতে দ্বিধা নেই, গ্রামে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত না হলে জীবনের স্রোতগতি কোনো দিকে বইত, কোথায় নিয়ে ফেলে দিত, কে জানে। নাথই পথ দেখায়। এক পৈঠায় উঠলে পা কোথায় দেওয়া যায়, তা ঠিক হয়। সবলসিংহপুর জুনিয়র মাদ্রাসা আমার নিকট তেমনই এক সোপান। (শওকত, ২০০৭ ক : ১১১)

লেখক ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত গ্রামের মাদ্রাসাতে অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৯৩৩ কলকাতা মাদ্রাসা-ই-আলিয়া থেকে প্রবেশিকা, ১৯৩৬ সালে সেন্ট জেভিয়ার কলেজ থেকে আই.এ, ১৯৩৯ সালে বি.এ এবং ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাস করেন। "শওকত ওসমানের কর্মজীবন মূলত ছাত্রজীবনেই শুরু হয়েছিল। অধ্যয়নই যে ছাত্রদের একমাত্র পেশা তা ছাত্রজীবনে শিল্পী ওসমানের কাছে সর্বৈব প্রযোজ্য ছিল না। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পড়াশোনা করতে গিয়ে ছাত্র-জীবনেই তাঁকে নানাবিধ কাজ করতে হয়েছে।" (অনীক, ১৯৯৫ : ৩৩) ১৯৪১ সালে কলকাতা কমার্স কলেজে শিক্ষক হিসেবে প্রবেশের পূর্বে তিনি বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাভাগের পূর্ব পর্যন্ত কলকাতার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করার সূত্রে কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং প্রগতিশীল কর্মধারার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। লেখক এ সময় প্রত্যক্ষ করেছেন ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা, মন্বন্তরের করাল থাবা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশ বিভাগের অস্থিরতা। স্মরণীয় যে, ভারতবর্ষীয় সমাজের সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলনের ঘটনাতরঙ্গই গল্পকারের সাহিত্যের উপকরণ যুগিয়েছে।

মুদ্রণ অক্ষরে শওকত ওসমানের প্রথম সাহিত্যকর্ম ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে মুহাম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার "সম্পাদিত 'বুলবুল' পত্রিকায় 'দিনের কবিতা' একই শিরোনামে তিনটি কবিতা প্রকাশিত"

(শওকত, ২০০৭ খ : ১৯২) হয়। 'বুলবুল' পত্রিকায় লেখা প্রকাশের সাথে সাথে 'দৈনিক আজাদ', 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকা অফিসেও তাঁর যাতায়াত বেড়ে যায়। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় 'প্রেম ও প্রতিভা কামাল জীবনের একটি অধ্যায়' শীর্ষক একটি গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। "কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই শওকত ওসমান অপূর্ব গল্প লেখা আরম্ভ করেন এবং পত্র-পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে তাঁর সেসব কথা-সাহিত্য। তাঁর প্রথম গল্প 'সাবেরা ও একটি মোটর গাড়ী' মাসিক মোহাম্মদী'তে ছাপা হয় পৌষ ১৩৪৬-এ।" (ইসরাইল, ২০০৮ : ১১৩) এরপর 'সানার', 'নিঃশ্বাস', 'বারমাস্যা', 'অজগর', 'আব্বাস' প্রভৃতি একাধিক গল্প প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন পত্রিকা অফিস এবং পত্রিকার সম্পাদকদের সাথে আন্তরিক যোগাযোগ তাঁর লেখকসত্তা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। লেখক জানিয়েছেন—

> ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৭-দেশ বিভাগের কাল পর্যন্ত আমার সাহিত্য জীবনের আবর্তন মোটামুটি 'বুলবুল পত্রিকা', 'দৈনিক আজাদ', 'মাসিক মোহাম্মদী' এবং 'মাসিক সওগাত' পত্রিকায় কেন্দ্রীভূত। এইসব আখড়া থেকেই সংগৃহীত আমার উত্তরকালের সহযাত্রী সুহৃদবর্গ। (ইসরাইল, ২০০৮ : ২২৪-২২৫)

শওকত ওসমানের ¯§ZLÐ : PÆMvg রচনা থেকে জানা যায়, বাংলাভাগের পূর্বেই ১৯৪৩ সালে চট্টগ্রামে ছাত্র ফেডারেশন আয়োজিত ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এ-সময় তাঁর সহযাত্রী ছিলেন নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায় এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক গীতা মুখার্জি। এ-সম্মেলনে যোগদানকালীন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) এবং মাহবুব উল আলম চৌধুরীর (১৯২৭-২০০৭) সাথে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। এরপর তিনি পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল একাধিক সংগঠনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'সীমান্ত' পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক এবং পরামর্শকও ছিলেন শওকত ওসমান।

১৯৪৪ সালে তিনি দুই অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক Z¯‹i j¯‹i রচনা করেন। এ নাটকে তিনি সমসাময়িককালের নৈতিক মূল্যবোধের স্খালনজনিত সামাজিক সঙ্কটকে শৈল্পিক রূপদান করেন। এছাড়া একই সময়ে তিনি শিশু-সাহিত্য I‡Ub mv‡n‡ei evs‡jv এবং ১৯৪৬ সালে প্রথম উপন্যাস eYv Av'g রচনা করেন। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বাংলা ভাগের কালসীমা পর্যন্ত লেখক যুক্ত ছিলেন বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের সাথে। বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের সাথে সম্পৃক্ততার সূত্রে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত একাধিক সভা এবং সেমিনারে যোগদান করেন। এর ফলে শওকত ওসমানের মধ্যে সাহিত্যপ্রীতি যেমন আরও প্রবল হয় তেমনি ব্যক্তি পর্যায়েও যোগাযোগের পথটিও বিস্তৃতি লাভ করে।

শওকত ওসমানের ব্রিটিশ কালপর্বে রচিত গল্পগুলো পরবর্তীকালে গল্পগ্রন্থভুক্ত হয়, এসব গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : wcRiv‡cvj (১৯৫১), Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí (১৯৫১), mv‡eK Kwnbx

(১৯৫৩) ও wbeMZ Kv‡ji Mí (১৯৮৭)। এখানে স্মতর্ব্য যে, শওকত ওসমানের সব গল্পগ্রন্থই পাকিস্তান ও বাংলাদেশ কালপর্বে প্রকাশিত। তবে লেখকের আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, গল্পগ্রন্থের ভূমিকাংশ-প্রস্তাবনা (লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত), বিভিন্ন ব্যক্তির স্মৃতিচারণ এবং গল্পের বিষয়বিন্যাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে গল্পগুলো ব্রিটিশ কালপর্বে রচিত। প্রথম তিনটি গল্পগ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে বশীর আল্ হেলাল উল্লেখ করেছেন— "এই গল্পগুলি তিনি লিখেছিলেন ১৯৩৯-৪০ এই বছরগুলিতে।" (বশীর, ১৯৯৫ : ১০০) যদিও wcRiv‡cvj গ্রন্থের গল্পগুলোর রচনাকাল সম্পর্কে কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ নেই তবুও লেখকের প্রথমদিকের রচনার বৈশিষ্ট্যানুসারে (সাধু ভাষার ব্যবহার, রোম্যান্টিক ভাব-তন্ময়তা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাল-চিত্র), বিষয়-বিচারে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, গ্রামীণ জীবন, বাংলাভাগ পূর্ব অস্থিরতা) বুঝতে অসুবিধা হয় না যে গল্পগুলো ব্রিটিশ কালপর্বেই রচিত। Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ হলেও "এই পুস্তকের গল্পের রচনাকাল গড়ে ১৯৪৬-৫১।" (বুলবন, ২০০৪ : ৫০) এছাড়াও লেখকের 'কথকতার আগে'র বয়ান থেকে জানা যায়— "অবশ্য প্রায় গল্প চার-পাঁচ বছর কি তারও বহু আগে লেখা।" (শওকত, ২০০৩ : ১৩০) mv‡eK Kwnbx গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৫৩ হলেও "এই পুস্তকের গল্পের রচনা-কাল ১৯৩৯-৪৩ খ্রিস্টীয় সন।" (শওকত, ২০০৩ : ৫৬) wbeMZ Kv‡ji Mí গ্রন্থের প্রকাশকাল যদিও ১৯৮৭ কিন্তু গল্পগুলো ব্রিটিশ কালপর্বে রচিত। গ্রন্থের "পূর্বকথা' অংশে লেখক স্মরণ করেছেন 'সব গল্পই চল্লিশ বছর পূর্বে লেখা।" (শওকত, ১৯৮৭ : ১) অর্থাৎ গল্পগুলো ১৯৪৭ সালের পূর্বে লেখা। বলা যায় এ সব রচনার মধ্য দিয়েই শওকত ওসমানের প্রথম পর্বের সাহিত্য রচনার পথচলা-সূচিত হয়।

শওকত ওসমানের গড়ে ওঠা এবং মনন বিকাশে সমকাল, আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পটভূমি সমভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। সমাজতান্ত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত নন– কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় আস্থাশীল লেখক সাহিত্যিক জীবনের শুরুতেই (ব্রিটিশ কালপর্ব) সুদূর এর পরিবর্তে সমকালকে অবলম্বন করে তাঁর সাহিত্য রচনার গতি-প্রকৃতি-লক্ষ্যকে চিহ্নিত করেছিলেন। তাই শওকত ওসমানকে উদ্দেশ্য করে রচিত কবি আবুল হোসেনের কবিতাংশ[৩] এখানে উদ্ধৃত করা যায় :

তুমি ক্ষত-বিক্ষত হয়েও
পিঠ ফেরাওনি মাঠে
কিংবা পাশ কাটিয়ে যাওনি
গায়ে আঁচ লাগাবার ভয়ে
অথবা আরাম করে
বিদগ্ধ জনের মতো ঘরে বসে
দেখনি নাটক, অন্ধকারে
নীরব দর্শক।

সুতরাং বলা যায়, শওকত ওসমানের ব্রিটিশ কালপর্বের সাহিত্যকর্ম সমকালশাসিত ও সমাজলগ্ন ব্যক্তিত্বের শিল্পযাপনের অনন্য প্রয়াস।

UxKv

১. মানবেন্দ্রনাথ রায় এম.এন.রায় নামে পরিচিত ছিলেন, তবে তাঁর প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (মোহাম্মদ হাননান, evOwj i BwZnvm, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৯৬)
২. ভারতের কমুনিস্ট পার্টির নেতা শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে ও মুজফ্ফর আহমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রের সাহায্যে ব্রিটিশ-রাজ উৎখাতের অভিযোগ করে সরকার এই সময় এক মামলা দায়ের করে। এটাই ঐতিহাসিক মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা বলে খ্যাতি অর্জন করে। (মোহাম্মদ হাননান, evOwj i BwZnvm, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ১০১)
৩. কবি আবুল হোসেন শওকত ওসমানের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কবি শওকত ওসমানের আশিতম জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে ‘আশির দরোজায় শওকত ওসমান’ শিরোনামে কুড়ি চরণের একটি কবিতা রচনা [৩১-১২-১৯৯৫] করে উপহার দিয়েছিলেন।

Mš I ceÜcwÄ

অনীক মাহমুদ (১৯৯৫)। evsjv K_vmvwn‡Z¨ kIKZ Imgvb, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী।

আনিসুজ্জামান (২০১১)। ‘ফিরে দেখা : ঊনিশশো সাতচল্লিশ’; †‘kfvM : ¯§wZ Avi ¯ÍäZv [সম্পা. সেমন্তী ঘোষ], গাঙচিল, কলকাতা।

আহমদ ছফা (২০১১)। wbewPZ ivR‰bwZK ceÜ, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা।

ইসরাইল খান (২০০৮)। ‘শওকত ওসমান স্মরণে’; e¨w³ I mwnwZ¨K kIKZ Imgvb [সম্পা. বুলবন ওসমান], দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা।

এ আর দেশাই (২০০১)। fviZxq RvZxqZvev‡`i mvgwRK cUfwg, কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা।

করুণাময় গোস্বামী (১৯৯৩)। ‘সঙ্গীত’; evsjv‡`‡ki BwZnvm 1704-1971, 3q LÐ [সম্পা. সিরাজুল ইসলাম], বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

কালিপদ বিশ্বাস (২০১২)। h³ evOjvi †kl Aa¨vq, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

খোন্দকার সিরাজুল হক (২০০৬)। gmwjg mvwnZ¨ mgvR : mgvR wPšÍv I mvwnZ¨ Kg©, সূচীপত্র, ঢাকা।

গোলাম মুরশিদ (২০০৮)। nvRvi eQ‡ii evOwj ms¯‹wZ, অবসর, ঢাকা।

বশীর আল হেলাল (১৯৯৫)। ‘বাংলাদেশের ছোটগল্প’; GK‡ki wbewPZ ceÜ 1963-1976 [সম্পা. মোবারক হোসেন], বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বুলবন ওসমান [সম্পা.] (২০০৩)। kIKZ Imgvb MÍmgM, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

বুলবন ওসমান (২০০৪)। K_v-mvwn‡Z¨ kIKZ Imgvb, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (২০০৪)। ‘বাঙলা সাহিত্যে বাঙালি ব্যক্তিত্ব’; evOjv‡`k [সম্পা. মনসুর মুসা], আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

মোহাম্মদ হাননান (১৯৯৯)। evOwj i BwZnvm, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৭)। evsjv‡`‡ki Dcb¨vm : welq I wkíiƒc, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শওকত ওসমান (১৯৮৭)। wbeMZ Kv‡ji Mí, বিউটি বুক হাউস, ঢাকা।
শওকত ওসমান (২০০৭ ক)। ivnbvgv 1 †Q‡j‡ejv I ˆK‡kvi †Kvjvnj, সময় প্রকাশন, ঢাকা।
শওকত ওসমান (২০০৭ খ)। ivnbvgv 2 Ab¨ iYcvšÍi I feb PZ‡i, সময় প্রকাশন, ঢাকা।
সিরাজুল ইসলাম [সম্পা.] (১৯৯৩)। evsjv‡‘‡ki BwZnvm 1704-1971, 3q LÐ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।
সুগত বসু (১৯৯৩)। ‘সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা, ১৮৫৭-১৯৪৭’; evsjv‡‘‡ki BwZnvm 1704-1971, 2q LÐ [সম্পা. সিরাজুল ইসলাম], বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।
হারুন-অর-রশিদ (২০০১)। evsjv‡‘k ivRbxwZ miKvi I kvmbZwšK Dbqb 1757-2000, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

wØZxq cwi‡”Q‘

wewUk Kvjc‡ei M‡íi Rxeb‰ewPÎ¨

শওকত ওসমানের সাহিত্যিক জীবন তিন কালপর্বে বিস্তৃত। তিনি দীর্ঘকাল নিবিষ্টচিত্তে সাহিত্যসাধনায় মগ্ন ছিলেন। স্ব-কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাস্রোত, শাসকবর্গের ক্ষমতার পরিবর্তন, ঘটনাবলির রূপান্তরশীলতা, পৃথিবীর অস্থির পালাবদল, ইতিহাস-ঐতিহ্য তাঁর মগ্নচৈতন্য ও সৃজনপ্রতিভায় আলোড়ন সৃষ্টি করে । সমাজ ও রাজনীতি সচেতন গল্পকার হিসাবে তিনি সময়ের নানামাত্রিক জটিলতাকে অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং এসবের সমবায়িতরূপের মাধ্যমে গড়ে তুলেছেন তাঁর সাহিত্যভুবন।

জীবনসন্ধানী লেখক তাঁর শেকড়ায়িত চেতনা দিয়ে ব্রিটিশ কালপর্বের ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে তা তুলে ধরেছেন গল্পের শিল্পভাষ্যে। ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধকাল তাঁর সাহিত্যিক মানসকে করেছে ঋদ্ধ এবং সাহিত্যের বিষয়কে করেছে বৈচিত্র্যময়। এ-পর্বে তিনি শিল্পের সততায় এবং ব্যক্তিক দায়বদ্ধতায় নিজেকে আবদ্ধ করে সাহিত্য সাধনার ব্রত গ্রহণ করেছেন। ফলে সমাজে ঘটে যাওয়া অসংখ্য ঘটনার সুসংগঠিত রূপায়ণ তাঁর রচনাতে লক্ষ করা যায়। "আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উল্লিখিত জটিল, দ্বন্দ্বময় ও বহুভঙ্গিম চারিত্রই" (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭ : ২৪) নির্মাণ করেছে তাঁর ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পের অবয়ব। সমাজবাস্তবতার নিবিড় রূপায়ণের মাধ্যমে তাঁর এ-পর্বের গল্পগুলো হয়ে উঠেছে কালের জীবন্ত সাক্ষী। শওকত ওসমান সাহিত্য সাধনার প্রথম পর্যায় থেকেই মধ্যবিত্তের উচ্ছ্বাসময় রোম্যান্টিক ভাবালুতাপূর্ণ জীবন-ভাবনার খোলস থেকে বেরিয়ে এসে সমকালভাবনার কঠিন মাটিতে চিন্তার জগতকে প্রসারিত করেছেন। "শওকত ওসমান দেশ-কাল-পাত্রকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, ফলে তাঁর গল্পে যুগ-জীবন ও পরিবেশ অত্যন্ত সূক্ষ্ম কায়দায় বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থতার মধ্য দিয়েই চমৎকারিত্ব লাভ করে।" (আজহার, ১৯৯৬ : ১০৫) তিনি এ-পর্বে শুধু ঘটনাস্রোতকেই অঙ্কন করলেন না, তীক্ষ্ণ ও গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপের মাধ্যমে তুলে ধরলেন মানবিক অনুভূতির লীলাচাঞ্চল্যকে। উল্লেখ্য যে, একটি নির্দিষ্ট কালপর্বই স্থির করে দেয় ওই পর্বে রচিত সাহিত্যের মৌল প্রবণতাসমূহ এবং বিষয়সমূহের গতিধারাকে। আমরা এ পর্বে শওকত ওসমানের ছোটগল্পে সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ তাঁর জীবনপ্রবাহের ওপর কীরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে সে বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস পাব। এ-কালপরিসরের গল্পগুলোর বিষয়বৈচিত্র্যকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা যায় :

এক : ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের বিভীষিকা।
দুই : সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।
তিন : রাজনৈতিক জটিলতা।
চার : শোষণ ও শ্রেণিসংঘাত।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ : নারী ভাবনা।
ছয় : ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য।
সাত : মানুষের পেশাজীবী জীবন।
আট : মানুষের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন।

GK : 1943 mv‡ji gšš͇ii wefxwlKv

ইতিহাস থেকে যতদূর জানা যায়, বঙ্গীয় ভূ-খণ্ডের জন-জীবন অনেকবারই চরম দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হয়েছে। ১৭৬৯ সাল থেকে অনেকগুলি দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা এদেশীয় সমাজজীবনে কঠোর আঘাত হেনেছে। এর মধ্যে ১৭৬৯-১৭৭০ (১১৭৬-১১৭৭ বঙ্গাব্দ), ১৮৮৬ (১২৯৩ বঙ্গাব্দ), ১৮৯৬-১৮৯৮ (১৩০৩-০৫ বঙ্গাব্দ), ১৯৪৩ (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) খ্রিষ্টাব্দের মন্বন্তরের ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে ১৭৬৯-১৭৭০ সালের পরে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ছিল চরম ভয়াবহ। সরকারি সূত্র অনুযায়ী "এ দুর্ভিক্ষে ১৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় এবং বেসরকারি হিসাব মতে ৩৫ থেকে ৩৮ লক্ষ মানুষ মারা যায়।" (সিরাজুল, ২০০৩ : ৩৮৪) রফিকুল ইসলামের মতে : "যুদ্ধের সময় ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে এই মন্বন্তরে বিশ লক্ষ বাঙালি অনাহারে প্রাণ দেয়।" (রফিকুল, ২০১১ : ৩০) তবে, এ-দুর্ভিক্ষ সংঘটনের মূলে মানুষ এবং প্রকৃতি উভয়ের ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত। "তৎকালীন নাজিমউদ্দিন মন্ত্রীসভার খাদ্যমন্ত্রীরূপে সোহরাওয়ার্দী দুর্ভিক্ষের মোকাবেলার চেষ্টা করেন। কিন্তু একদিকে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের অসহযোগিতা, অন্যদিকে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির কারণে মন্বন্তর এড়ানো সম্ভবপর হয়নি।" (রফিকুল, ২০১১ : ৩০) তৎকালীন বাংলা সরকার কর্তৃক গঠিত 'উইহেড কমিশন' যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাতে বলা হয় যে, "এই দুর্ভিক্ষের জন্য ভারত সরকার, হক মন্ত্রিসভা এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা সকলেই আংশিকভাবে দায়ী।" (রহীম, ২০০৫ : ৩৩৭) মনুষ্যসৃষ্ট কারণসমূহের মধ্যে দেশে কর্ডনিং প্রথা চালু, সর্বপ্রকার যানবাহনের জন্য অচলাবস্থা সৃষ্টি, জাপান কর্তৃক ব্রহ্মদেশ দখলের ফলে সেখান থেকে চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়া, দুর্ভিক্ষের আভাস পেয়ে ভারত সরকার কর্তৃক সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে গুদামজাত করার ফলে খাদ্য ঘাটতি, বিহার ও উড়িষ্যার সরকার কর্তৃক এ সময় তাদের উদ্বৃত্ত খাদ্য সরবরাহ করে বাংলা সরকারকে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানানো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হেতু বাংলায় বহু সংখ্যক বিদেশি সৈন্যের আবির্ভাব, খাদ্য সংগ্রহ অভিযান ও বন্টনের চূড়ান্ত অব্যবস্থা, সুযোগসন্ধানী অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক অধিক মুনাফা লাভের আশায় অধিক খাদ্যশস্য মজুত করে গোপনে তা চড়া মূল্যে বিক্রি করা, জাপানি আক্রমণে ভীত ব্রহ্মদেশবাসী লক্ষাধিক মানুষের শরণার্থী হিসেবে বাংলায় প্রবেশের ফলে খাদ্য সংকটের মাত্রা বৃদ্ধি এবং নানা প্রশাসনিক ত্রুটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে, প্রকৃতিসৃষ্ট কারণসমূহের মধ্যে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যার ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস, অসময়োচিত শৈত্যপ্রবাহ, পঙ্গপাল, ইঁদুর বা কীটের উপদ্রবে উৎপাদন হ্রাসের ঘটনাও উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৩ সালের মন্বন্তর যেমন সমকালে তেমনি পরবর্তী সময়েও সমাজ ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। ফলে, বাঙালি সমাজ এবং তাদের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আসে পরিবর্তন। সর্বোপরি কৃষক, শ্রমিক, মজুর, শিল্পী, সাংবাদিক, চিত্রকর, বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ এ-দুর্ভিক্ষে আলোড়িত হন। এদেশের কথাসাহিত্যিকেরাও এর বাইরে ছিলেন না। এ-সময় জীবনমুখী সমাজসচেতন লেখকেরা শিল্পীর দায়বদ্ধতা থেকে কলম ধারণ করে তাঁদের রচিত সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা। দুর্ভিক্ষ বিষয়ে রচিত সাহিত্য সম্পর্কে বিনতা রায় চৌধুরীর মূল্যায়ন এখানে উদ্ধারযোগ্য :

> মন্বন্তর সমাজের বুকে এক প্রবল বিপর্যয় সৃষ্টি করে। সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে তার ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব স্বভাবতই মন্বন্তর সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। সমাজের নানা স্তরে মন্বন্তর যে বহু বিচিত্র প্রভাব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে মন্বন্তর আশ্রয়ী সাহিত্যে তার পরিচয় মুদ্রিত হয়। (বিনতা, ১৯৯৭ : ১)

এদেশের সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতেও দুর্ভিক্ষের বিভিন্ন চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে বহুকৌণিক দৃষ্টিকোণ থেকে। "আকালের এই চিত্রই অতিশয় করুণ ও মর্মস্পর্শী রূপসহ পরিস্ফুটিত হয়েছে গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে-গানে-শিল্পে-চলচ্চিত্রে। একজন শিল্পী যেহেতু মানবজীবনের গৌরবময় মহিমাকে সর্বদা অন্বেষণ করেন, সেহেতু মানবতার এমন লাঞ্ছনা অমর্যাদা তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি অসহ্য ঠেকেছে, তাঁর আবেগকে করেছে প্রচণ্ডভাবে পিষ্ট ও দলিত-মথিত। শিল্পী-সাহিত্যিকদের রচনাকর্মে তাঁদের হৃদয়মথিত বেদনার এই বাণী ও রূপেরই ঘটেছে চিত্রায়ণ।" (আজিজুল, ১৯৯৮ : ২৮০) তাই বাস্তবনিষ্ঠ ও সমাজঘনিষ্ঠ দুর্ভিক্ষবিষয়ে রচিত সাহিত্যকর্মগুলো হয়ে উঠেছে প্রবহমাণ সমাজ ও ইতিহাসের অনন্য দলিল। এদেশের যে-সমস্ত কথাসাহিত্যিক তাঁদের ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরকে নির্বাচন করেছেন তাঁদের মধ্যে শওকত ওসমানের স্থান অগ্রগণ্য।

মন্বন্তরকালে বুভুক্ষু মানুষের ব্যাপারে বিত্তবানদের ভূমিকা ছিল খুবই নেতিবাচক মানবিকতাশূন্য। যে-সময় সামান্য খাদ্যের অভাবে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে, সে-সময় বিত্তবানরা শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দুর্ভিক্ষকবলিত মানুষগুলোর বেঁচে থাকার স্বপ্নকে ভেঙে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে। দুর্ভিক্ষকালীন পটভূমিতে বিত্তবান মানুষদের ভূমিকা কী ছিল এবং তার ফলে সমাজে বসবাসরত মানুষের অবস্থা কোথায় গিয়ে ঠেকেছিল তারই গুরুত্বপূর্ণ দলিল 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস' (॥cRi\‡cvj) গল্পটি।

গল্পের শিল্পভাষ্য থেকে জানা যায়— গ্রামের সহজ-সরল মানুষদের ফাঁকি দিয়ে মন্বন্তরকালীন পরিবেশে চোরাকারবারি মজুতদার আব্দুল জলিল তরফদার এবং পুলিন সাহা রাতের অন্ধকারে ধান-চাল নদী পথে পাচার করেন। গ্রামে তখন দুর্ভিক্ষ এবং কলেরার প্রাদুর্ভাবে মানুষের মাঝে আতঙ্ক বিরাজমান। পুলিশের ডেপুটি মুস্তাফিজ রাতে নদীপথে বিশ-তিরিশ মণ চালসহ জলিল তরফদারের

Dhaka University Institutional Repository

নৌকা আটক করেন। নদী-পথ পাহারা দিতে গিয়ে ডেপুটি সাহেব প্রত্যক্ষ করেন দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ রূপ। গল্পের ভাষায় : "মানুষের মড়া। এই অঞ্চলে লোক ত কম মরছে না। নদীতে ভাসিয়ে দেয়। চরে আটকালে শেয়ালেরা ঝোপে তুলে নিয়ে যায়।" (শওকত, ২০০৩ : ১০৫)

তাছাড়া ভিন্ন একটি চিত্র-দর্শনে বিস্ময়বিমূঢ় ডেপুটি সাহেবের মনে প্রতিজ্ঞার বীজ রোপিত হয়। তিনি প্রত্যক্ষ করেন, কাফনের কাপড়ের অভাবে এক যুবকের মৃত স্ত্রীকে সাদা চাদরে ঢেকে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য। হৃদয়বিদারক এ-দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন জলিল তরফদারের শাস্তি দিতে এবং গ্রামের মানুষের জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় গড়ে তুলতে। জলিল তরফদারের মামলার চূড়ান্ত রায়ের জন্য যখন একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য বাকি এবং চিকিৎসালয়ের নির্মাণ কাজ শেষ হতে যখন পনের দিন অবশিষ্ট— তখন তরফদারের ষড়যন্ত্রে ডেপুটি মুস্তাফিজের বদলির অর্ডার হয়। বদলির একমাস পরে সংবাদপত্রপাঠে তিনি অবগত হন তরফদার বেকসুর খালাস পেয়েছে। আরও এক বছর পরে তিনি নিমন্ত্রিত হন দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করার জন্য। কিন্তু সেখানে গিয়ে ডেপুটি সাহেব স্তম্ভিত হন অনাহার, রোগজর্জরিত মানুষগুলোকে দেখে। পুলিন সাহা এবং জলিল তরফদার ষড়যন্ত্র করে কৃত্রিমভাবে খাদ্য সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে দুর্ভিক্ষের পরিবেশকে আরও ভয়াবহরূপে বেগবান করে, তাতে প্রায় প্রতি সপ্তাহে পাঁচ-ছয়শ মানুষ মারা যায়। অথচ তারাই আবার চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপবিষ্ট। আর মঞ্চের সামনে স্লোগানরত মুনাফালোভী-কালোবাজারি লোকগুলোর শোষণের শিকার বুভুক্ষু মানুষের দল। গল্পের ভাষায় : "নরাকার মানুষের ভগ্নাংশেরা শোভাযাত্রা করে এগিয়ে চল্ছে। বিকলাঙ্গ, ভগ্ন-স্বাস্থ্য পাঁজর-নির্গত গ্রামের মানুষ।" (শওকত, ২০০৩ : ১১৩)

গল্পকার এখানে মন্বন্তরকালে বিত্তবান লোকদের নেতিবাচক ভূমিকা এবং সে-কারণে খাদ্যসংকট, বস্ত্রসংকট, অসংখ্য মৃত্যুর ঘটনাকে স্পষ্টভাবে রূপদান করেছেন। তাছাড়া গল্পে মানবতাবাদী ডেপুটি মুস্তাফিজ চরিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে গল্পকার দুর্ভিক্ষকালে বিবেকবান মানুষের ভূমিকাকেও তুলে ধরেছেন।

'ভাগাড়' (mv‡eK Kwnbx) গল্পটিকে গ্রামীণ পটভূমিতে স্থাপন করে শওকত ওসমান যুগপৎভাবে দুটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন। গল্পে একদিকে অঙ্কিত হয়েছে মন্বন্তরের পটভূমিতে গ্রামীণ মানুষের অসহায়ত্ব, অন্যদিকে অপশক্তিনিয়ন্ত্রিত সমাজ ও সমাজ-প্রধানের শাসন-শোষণের চিত্র।

'ভাগাড়' গল্পে শোষণের রূপটি স্পষ্ট না হলেও, জোতদার মনসব আলির কালোবাজারির ফলে সৃষ্ট গ্রামের সাধারণ মানুষের বিপর্যস্ত অবস্থা সহজেই বোঝা যায়। মন্বন্তরকালে মনসব আলি কুইনাইন, চাল, আটা, চিনি বিভিন্ন পণ্যের চোরাকারবারি ব্যবসা করে অঢেল সম্পত্তির মালিক হন এবং সাথে সাথে বিভিন্নভাবে গ্রামের মানুষদের দুঃখ-দুর্দশার পথে ঠেলে দেন। মন্বন্তরের আঘাতে গ্রামের যে

মানুষগুলো কিছুই খেতে পায় না, মনসব আলির ইচ্ছা জাগে তাদের মাংস খাওয়ানোর ব্যবস্থা করার। তার এ ইচ্ছা যতটুকু না মানবিকতাপ্রসূত ততোধিক ভয়প্রসূত। মনসব আলি চারটা গরু জবাই করে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অভুক্ত মানুষের মাঝে মাংস বিলিয়ে দিয়ে তার অভীষ্টসিদ্ধি করেন। মাংস বিতরণের দিনে মনসব আলির স্মৃতিতে ভর করে পুরনো ঘটনা— গঞ্জের দোকানে চালের জন্য ফজর আলির শেষ মিনতি, ক্রন্দনাকুল চোখ। শেষ পর্যন্ত ফজর আলি স্ত্রী-পুত্রের সামনে গলায় ফাঁস দিলে স্ত্রী পুত্ররাও নিরুদ্দেশ হন। লেখকের ভাষায় : "জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স মাত্র নয়। আর কোন খোঁজ নেই তাদের। কেউ বলে, নসিমন মিলিটারি ক্যাম্পে শেষে দেহ বিক্রি করেছিল। তার আগে বিক্রি করেছিল কাখের শিশু। সেও নাকি আত্মহত্যা করেছিল, ইতিহীন গুজব।" (শওকত, ২০০৩ : ১৮৫)

গল্পকার বর্তমান সময়ের সাথে অতীত কাহিনির যোগসূত্র স্থাপন করে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের তাৎপর্য উন্মোচন করেছেন। গল্পের পরবর্তী ঘটনা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক, নাটকীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ। বুভুক্ষু গ্রামবাসী মনসব আলির বাড়ি থেকে মাংস গ্রহণ করলেও পরের দিন সকালে তারা সব মাংস ভাগাড়ে নিক্ষেপ করেন। কারণ, নিরন্ন মানুষগুলোর বাড়িতে মাংস রান্না করার প্রয়োজনীয় কোনো উপকরণ অর্থাৎ লবণ, মরিচ, লাকড়ি কোনো কিছুই ছিল না। তাছাড়া চালের অভাবে অধিকাংশ মানুষই ছিল অনাহারী। সমস্ত ঘটনা দেখে মনসব আলির কাছে এটাই প্রতিপন্ন হয়— বুভুক্ষু মানুষগুলো তার দেয়া দয়া-দাক্ষিণ্য আবর্জনার মতোই ভাগাড়ে ছুড়ে মেরেছেন এবং তারা যে কোনো সময় তাকেও আবর্জনার মতো আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে মারতে পারেন। মনসব আলি ভেতরে ভেতরে অগ্নিগিরির মতো জ্বলতে থাকলেও তা বাইরে প্রকাশ করতে ভয় পান। কেননা, তখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছেন জঠরজ্বালায় ওষ্ঠাগত বুভুক্ষের দল। গল্পের বর্ণনানুসারে :

> একজন চেঁচিয়ে বলে : হুজুর, গুশত খাইতে বা'ত লাগে।
> ভাতের প্রয়োজনীয়তার উপর অন্য একজন জোর দিল।
> হুজুর হফ্‌তায় তিন দিন উয়াস (উপবাস) কন গুশতে কি হৈব?
> ...ভিড়ের ভেতর থেকে একজন কৃশ লোক এগিয়ে এলো : আমরা মানুষ নই? কন, চাই?
> সরম নাই আমাগো। ভিখ মাগ্‌ব। ইজ্জত নাই? (শওকত, ২০০৩ : ১৮৭)

কৃষক এবং সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধতার রূপ দেখে মনসব আলি সেখান থেকে ভয়ে-আতঙ্কে পিছু হটেন। কারণ মনসব আলি জানেন সমবেত শক্তির কাছে তার ক্ষমতা অতি নগণ্য। এ-গল্পের মধ্য দিয়ে লেখক দুর্ভিক্ষকালীন গ্রামীণ মানুষের করুণ চিত্র এবং শোষকের বিরুদ্ধে শোষিত জনগণের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদী রূপকে সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত করেছেন। লেখক জোতদারশ্রেণির বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের ঐক্যের রূপটি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন, যা খুবই অর্থবহ। ফলে, গল্পটি স্বল্প আয়তনের হলেও ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের গুরুত্বপূর্ণ চিত্র হিসেবে বিশিষ্ট।

'হুকুম নড়ে না' (mv‡eK Kwnbx) গল্পের পটভূমিকায় গ্রাম ও শহরের সহাবস্থান দেখানোর মাধ্যমে শওকত ওসমান ১৩৫০ সনের মন্বন্তরের একটি ভয়াবহ বাস্তবচিত্র এঁকেছেন। দুর্ভিক্ষ মানুষের স্নেহ-মায়া-মমতা কেড়ে নিয়ে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি করেছিল। ফলে মানুষ পরিণত হয় পণ্যে; ক্রয় ও বিক্রয়ের উপকরণ হিসেবে। দুর্ভিক্ষের পরিবেশে অর্থের বিনিময়ে খাদ্য পাওয়া না গেলেও পাওয়া যেত জীবন্ত নারী ও শিশু। স্নেহময়ী বাবা-মা কখনও অর্থের বিনিময়ে সন্তানকে অন্যের কোলে তুলে দিতেন। আবার কখনও জীবন বাঁচাতে তারা তাদের সন্তানকে কোনো অর্থ ছাড়াই তুলে দিতেন কোনো বিত্তবানের হাতে, এমনি এক কাহিনিকে লেখক এ গল্পে উপস্থাপন করেছেন।

আজিম মল্লিক ছিলেন নিঃসন্তান। তাই সন্তান ক্রয়ের অভিপ্রায়ে মন্বন্তরের বাজারে শহরে গমন করেন। কারণ দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের পণ্যে পরিণত হওয়ার বিষয়টি তিনি অবগত ছিলেন। তিনি শহরের অলি-গলিতে ভিক্ষার্থীরূপে বুভুক্ষুদের দেখতে পান, যাদের সঙ্গে আছে অর্ধাহারে-অনাহারক্লিষ্ট শিশু সন্তান। বাড়ি ফেরার পথে তিনি একটি দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ান— এক ভিখিরি মেয়ের সম্মুখে চাদরে ঢাকা তার মৃত স্বামী, পাশে উপবিষ্ট দুটি ক্ষুধার্ত ছেলে, ভিখিরি মেয়েটির কোলে ছয়মাসের ফুটফুটে ঈষৎকৃশ শিশু কন্যা এবং মানুষটির পাশে দর্শকের কৌতূহল-মাখা টাকা-কড়ি। চারপাশে সহানুভূতির অন্ত নেই, ভিখিরি মেয়েটির দীর্ঘশ্বাসক্লিষ্ট ফুঁপানির দৃশ্য আজিম মল্লিকের কাছে অসহ্য হওয়াতে তিনি দাঁড়ানো থেকে হাঁটা আরম্ভ করেন। এ-সময় আকস্মিকভাবে একটি ভিন্ন দৃশ্যের অবতারণা ঘটে :

> এমন সময় ভিখারিনি মেয়েটাকে দুই হাতে তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলে : কারো যদি দয়া হয়, হুজুর, মেয়েটাকে নিয়ে যান। আমার কাছে থেকে না খেয়ে মরে যাবে। কারো যদি মেহেরবানী হয়– ভিখারিনি মেয়েটাকে বুকের কাছে ঘেঁষিয়া চাপিয়া ধরে আর দর্শকের দিকে তাকায়। চারিদিকে তার দৃষ্টি কারো যদি দয়া হয়। (শওকত, ২০০৩ : ১৯১)

আজিম মল্লিক ভিখিরি মেয়েটির পাশে গিয়ে জানতে চান শিশুটিকে বিক্রয় করা হবে কি না। মেয়েটি মল্লিক সাহেবকে অবাক করে দিয়ে জানান : "মেয়ের জীবন বাঁচাতে, কোনো অর্থ ছাড়াই কন্যাকে কারও কোলে তুলে দিতে চায়।" (শওকত, ২০০৩ : ১৯২) আজিম কন্যাটিকে কোলে তুলে নেন পরম মমতায়। বিদায় মুহূর্তে ভিখারিনি কাঁদতে থাকেন এবং আজিম মল্লিকের চোখেও পানি আসে। এ ঘটনায় শিশু দুটির প্রতিক্রিয়া হয় আরো হৃদয়বিদারক :

> উপবিষ্ট এতক্ষণ-নীরব শিশু দু-টী হঠাৎ উঠিয়া মার নিকট ছুটিয়া আসে। তার কাঁধের কাপড় ধরিয়া দুইজনে চিৎকার করিয়া কাঁদে: কুচিকে নিয়ে গেল, মা-দেব না, দেব না কুচি বুবুরে-কুচি বুবুরে। (শওকত, ২০০৩ : ১৯২)

লক্ষণীয় যে, দুর্ভিক্ষ শুধু সমাজ-জীবনেই ভাঙন সৃষ্টি করে নি, তা স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালোবাসার জগতেও আঘাত করে ভাঙন সৃষ্টি করে। ফলে, সমাজ এবং পরিবারের মানুষ শ্রদ্ধা, মূল্যবোধ ও ভালোবাসার বাঁধন ছিন্ন করে হয়ে ওঠে সম্পর্কশূন্য।

শওকত ওসমানের ‘চুহা-চরিত’ (‡eMZ Kv‡ji Mí) গল্পটি দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ রূপ ধারণ করে আছে। গল্পটি একইসাথে দুর্ভিক্ষের বিভিন্নপ্রান্তকে ছুঁয়ে গেছে। লেখক এ গল্পে একই সাথে মন্বন্তরের তিনটি বিষয়কে তাৎপর্যপূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন— ক. রাজনীতিবিদদের ভূমিকা, খ. শহুরে বাস্তবতা, গ. বস্ত্র সংকট। প্রতিটি বিষয়কে তিনি চিত্রকরের মতো চিত্রিত করেছেন।

জাতীয় দুর্যোগ মুহূর্তে সাধারণ মানুষ জাতীয় নেতা বা সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বা রাজনীতিবিদদের নিকট থেকে ইতিবাচক ভূমিকা প্রত্যাশা করেন। কিন্তু ১৩৫০-এর মন্বন্তরকালে এ-জাতীয় মানুষদের ভূমিকা আশাব্যঞ্জক ছিল না। বরং অনেকক্ষেত্রেই তারা দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জীবনকে আরও ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য তৎপর ছিলেন। আলোচ্য গল্পে মূষিকদ্বয়ের আলোচনা থেকে জানা যায়, এ-দুর্ভিক্ষে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস-এর নেতৃস্থানীয়রা মন্বন্তরপীড়িত মানুষের পাশে থাকার চেয়ে কালোবাজারি ও মজুতদারির মধ্য দিয়ে অবৈধ পথে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়াটাকেই তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করেন এবং সে-ভাবে নিজেদের উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে ধর্মীয় লেবাস পরিধান করতেন এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করতেন। অথচ রাতের অন্ধকারে স্বার্থের কারণে তারা একত্র হন বাহ্যিক দ্বন্দ্ব ভুলে। দুর্ভিক্ষের সময় কৃত্রিমভাবে রাজনীতিবিদেরা খাদ্য সংকট এবং বস্ত্র সংকট সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে মৃত্যু-পথযাত্রী করে তোলেন। দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষ বস্ত্র সংকটে নিপতিত এবং অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে যাত্রা করলেও তারা নির্বিকার। এ-ক্ষেত্রে গল্পকার মূষিকদ্বয়ের কথোপকথনের মাধ্যমে তাদের স্বার্থান্বেষী মুখোশ উন্মোচন করেছেন :

> মনিব। আল্লার কাম। কি করার আছে। জানের মালিক আল্লা। ইসলাম ধর্মে আছে, আল্লার হুকুম ছাড়া আজরাইল জান কবজ করে না।... তিনি সমস্ত দেশের লোককে গান্ধীভক্ত করিয়া ছাড়িবেন। সেই জন্য কাপড় গুদামজাত করিয়াছেন। (শওকত, ১৯৮৭ : ৪১)

১৯৪৩ সালে মন্বন্তরের বিভীষিকা গ্রাম-শহরের উভয় জনপদকে আতঙ্কিত করে তোলে। গ্রাম থেকে শহরে মন্বন্তর ভিন্নমাত্রায় আঘাত করে। গ্রাম থেকে আগত নিরন্ন মানুষের ঢল নামে শহরের পথে পথে। কিন্তু শহরে কোনো লঙ্গরখানায় দিনে কিছু খাদ্যের সংস্থান হলেও তা জীবন ধারণের জন্য অপর্যাপ্ত ছিল। দুর্ভিক্ষে শহরে এসে অনেক নিরন্ন মানুষ হারান জীবন, লজ্জাশীল কুলবধূ হারান সম্ভ্রম। দুর্ভিক্ষকালীন পরিবেশে কালোবাজারি, মজুতদারদের দৌরাত্ম্য, ডাস্টবিন থেকে কাক ও কুকুরের সাথে মানুষের খাবার ভাগাভাগি করার দৃশ্য, অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু এ-যেন ছিল স্বাভাবিক চিত্র। মানুষের অবস্থা পশু-পাখি বা ইতর প্রাণী থেকেও নিম্নপর্যায়ে পৌঁছয়, যা মূষিকদ্বয়ের সংলাপের মাধ্যমে লেখক তুলে ধরেছেন :

> বাংলার ১৩৫০ (তেরশ পঞ্চাশ) সন খতম হইবার উপক্রম। তার আগে বহু মানুষ খতম হইয়া গেল। লঙ্গরখানার আশে-পাশে ঘুরিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতাম। ইহার চেয়ে, আমি বরং ভাল খাই। (শওকত, ১৯৮৭ : ৪৩)

মন্বন্তরকালের পটভূমিতে খাদ্য সংকটের পাশাপাশি বস্ত্রসংকটও তীব্রতর হয়ে ওঠে। এ-সময় "বস্ত্র সমস্যা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে মেয়েরা হয়ে পড়ে গৃহবন্দী।" (বিনতা, ১৯৯৭ : ২০২) বস্ত্রসংকট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সৈয়দ আজিজুল হক বলেন :

> সীমাহীন মুনাফালোভের বশবর্তী গুপ্তবাণিজ্যের ধারক-বাহকগণ দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনের সহযোগিতায় কৃত্রিমভাবে সূতা ও বস্ত্রের দুর্লভতা ঘটিয়ে গ্রামবাংলার নরনারীদের বিবস্ত্র করে ফেলে। খাদ্যাভাবের মতো বস্ত্রসংকটও পৌঁছে এক অসহনীয় পর্যায়ে। লজ্জা নিবারণের অপরাগতায় অসহায় আর্ত নরনারীর ক্রন্দনসিক্ত চিৎকারে বিদীর্ণ হয় সভ্যতার বিবেক। (আজিজুল, ১৯৯৮ : ৩২১-৩২২)

'চুহা-চরিত' গল্পে লেখক একইসাথে বস্ত্রসংকট এবং তা সৃষ্টির পিছনের পটভূমিকে চিহ্নিত করেছেন। রাজনীতিবিদদের নীতি-বিবর্জিত ক্রিয়া-কর্ম, ক্ষেত্রবিশেষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুখের কথা এবং মনের কথার মধ্যে ব্যবধান দুর্ভিক্ষকবলিত মানুষের জীবনকে আরও বিষিয়ে তোলে। মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ধর্মীয় ঝান্ডা উড়িয়ে এবং কংগ্রেসের নেতবৃন্দ গান্ধীজির আদর্শের ধুয়া তুলে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের বিবস্ত্র করতে অপতৎপরতায় চূড়ান্তভাবে লিপ্ত হন। ফলে খাদ্যসংকটের ওপর বস্ত্রসংকট তাদের জীবনকে সবদিক থেকে দুর্বিষহ করে আত্মহননের পথে ঠেলে দেয় : "কাপড়ের অভাবে বহু মেয়ে আত্মহত্যা করিল।" (শওকত, ১৯৮৭ : ৩৭)

'কাঁথা' (॥cRi\‡cVj) গল্পে লেখক মন্বন্তরজনিত পরবর্তী সংকট হিসেবে বস্ত্র-সংকটের চিত্র এঁকেছেন। খাদ্য-সংকট পরবর্তী বস্ত্র-সংকট যে মানব-সভ্যতাকে চরমভাবে বিষিয়ে তোলে তার চূড়ান্ত দলিল এ-গল্পটি। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ১৯৪৩ সালে মন্বন্তরকালে এবং পরবর্তী-সময়ে বস্ত্র-সংকটের তীব্রতাও সমাজ-দেহ ও মনুষ্য-সমাজকে ক্ষত-বিক্ষত করে। অস্তিত্ব সংকটের পাশাপাশি বস্ত্র-সংকট যে কত তীব্র হতে পারে তা গল্পকার 'কাঁথা' (॥cRi\‡cVj) গল্পে স্ফটিকায়িত করেছেন।

গল্পের সূচনাতে লেখক বস্ত্র-সংকটের সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপনে সযত্নে প্রয়াস হয়েছেন। গল্পের লতিফ চরিত্রটি গৃহস্থ চাষী। তার পরিবারের সবাই তীব্র বস্ত্রসংকটের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করেন। লতিফ এবং তার স্ত্রী বরু-বিবি গ্রামের বিভিন্ন মানুষের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে সামান্যতম শীত-বস্ত্র সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন। বরু-বিবির একটি মাত্র শাড়ি থাকার কারণে স্নানের পরে একটি কাঁথা শরীরে জড়িয়ে ভেজা কাপড়টি রৌদ্রে শুকিয়ে তোলেন– এ-কারণে স্বামী-স্ত্রীও অনেক সময় পরস্পর অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার মুখোমুখি হন। যেমন : "অনুরোধের ভঙ্গীতেই হঠাৎ লতিফ কাঁথা ধরিয়া টান দিল। একি! বরু-বিবি একদম উলঙ্গ। বিবস্ত্রতার চেয়েও বেশি লজ্জা পাইয়া কাঁথা ছুড়িয়া

Dhaka University Institutional Repository

দিল লতিফ স্ত্রীর উপর।" (শওকত, ২০০৩ : ১১৮) তবে এটি শুধু লতিফের পরিবারের মর্মস্পর্শী চিত্রই নয়— বরং সে-কালের বাংলার এক সাধারণ সংকট।

লতিফ উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতার মৃত্যুর পর একটি কাঁথা লাভ করেন। কিন্তু তার পিতা যক্ষারোগী হওয়ায় বরু-বিবি সে কাঁথা তার ছেলের ব্যবহারের ব্যাপারে অস্বীকৃত হন। ছেলে এবং স্ত্রীর কাপড় সংগ্রহ করতে ব্যর্থ লতিফ উপরন্তু তার স্ত্রীর কাছে লাঞ্ছিত হন চরমভাবে : "এক জোড়া পাছার কাপড় দিতা পারে না-মরদ, মরদ কয় এরে!" (শওকত, ২০০৩ : ১১৭) দৈনন্দিন সাংসারিক টানাপড়েনের মধ্যে বস্ত্র-সংকট লতিফ মিয়ার সামাজিক অবস্থান ও সম্মানকেও বিবস্ত্র করে। অবশেষে বরু-বিবি পুরাতন কাঁথাটি সেলাইয়ের উদ্দেশ্যে খুলে তার মধ্যে একটি নতুন শাড়ি আবিষ্কার করেন। নতুন শাড়ি পেয়েও বরু-বিবি কান্নাকাটি করেন। কারণ ছেলের জন্য কাঁথা সেলাই করতে গিয়ে প্রাপ্ত শাড়ি তিনি কি করে পরবেন ভেবে পান না। অথচ তারও লজ্জা নিবারণের জন্য আরেকটি শাড়ির প্রয়োজন। গল্পের ভাষায় : "মানুর তরে খুইলছিলাম। ওর কাঁথা বানামু। শক্ত ছিল কাপড়খান্। নিজের কামে লাগাইলাম। একডা পুলা। হে'ও থলি গায়ে দি' রাত কাটায়। আমারে মা কও।" (শওকত, ২০০৩ : ১১৯) এভাবে গল্পকার বহির্জগতের পাশাপাশি অন্তর্জগতকেও চিত্রিত করে সন্তানের জন্য মায়ের অন্তর্যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সমাজের নানাচিত্রকে শিল্পী-সাহিত্যিকরা তাঁদের শিল্পকর্মের প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করেন। কারণ সমাজের বিভিন্ন ঘটনাবর্তে তাঁরাও হন আলোড়িত, তাঁদের চিন্তার ব্যাকরণ জুড়ে থাকে বহমান সমাজ-প্রেক্ষাপট এবং বিভিন্ন ঘটনাপঞ্জি। "মন্বন্তরজনিত যন্ত্রণা, সমস্যা ও ক্ষয়ক্ষতির স্বরূপ অবিকলভাবে সব লেখকদের অন্তরকেই আলোড়িত ও প্রভাবিত করেছিল। আর তারই ছবি ফুটে উঠেছে তাঁদের সাহিত্যে।" (বিনতা, ১৯৯৭ : ভূমিকাংশ) শওকত ওসমানের মগ্নচৈতন্যেও মন্বন্তর গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল— তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা। তাঁর গল্পশরীরে সহজেই মূর্ত হয়ে উঠেছে দুর্ভিক্ষের বিপর্যয় এবং এর সাথে উঠে এসেছে দুর্ভিক্ষকালীন বিত্তবানদের ভূমিকা, নিরাপত্তাহীন নারীর অবস্থান, বস্ত্রসংকট, গ্রাম ও শহরে প্রতিফলিত দুর্ভিক্ষের নানাবিধ চিত্র।

‘B : mv¤c ‘wqK ‘v½v

ভারতীয় সভ্যতা বিভিন্ন কারণে বহুবার রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। এ উপমহাদেশের একটি বিস্ময়কর বিষয় হলো শত শত বছরের সহাবস্থানের পরেও এ অঞ্চলের প্রধান দুটি সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে রয়ে গেছে অনেক ব্যবধান। উভয় সম্প্রদায় একই জলে-বাতাসে-খাদ্যে-পরিবেশে কাছাকাছি বসবাস করেন কিন্তু হৃদয়গত দিক থেকে তারা অবস্থান করেন অনেক দূরে। ফলে, অনেক-সময় এ-বিভেদজাত অবস্থানের কারণে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘটিত হয় দাঙ্গা-

হাঙ্গামা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়— এদেশীয় সমাজ ব্যবস্থায় ১৯১০, ১৯৪২, ১৯৪৬, ১৯৫০, ১৯৬৪ এবং ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এ-সাম্প্রদায়িক ধ্বংসযজ্ঞের গভীরে কাজ করেছে হিন্দু-মুসলমানের উগ্রবাদী সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা, রাজনীতিবিদদের নেতিবাচক স্বার্থচিন্তা এবং ঔপনিবেশিক শাসনামলে এর পিছনে ইন্ধন যুগিয়েছেন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকচক্র।

এ-সব দাঙ্গার ধ্বংসযজ্ঞে ও পৈশাচিক হত্যালীলায় সমগ্র উপমহাদেশের জন-জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ-দেশের জনপদে সংঘটিত দাঙ্গাগুলির মধ্যে ১৯৪৬ সালের চিত্রটি ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। ১৬ আগস্ট কলকাতা শহরে সংঘটিত সাম্প্রদায়িকতার দাবানল সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে এবং এ-দাঙ্গায় "মর্মান্তিকভাবে প্রায় একলক্ষ আশি হাজার লোক প্রাণ হারায়।" (জয়া চ্যাটার্জী, ২০০৭ : ২৩৫) শওকত ওসমান কলকাতা কমার্স কলেজে চাকরিসূত্রে প্রত্যক্ষ করেছেন ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার ভয়াবহতা। দাঙ্গার সেই ভয়াবহ স্মৃতি স্মরণ করে লেখক আত্মজীবনীমূলক রচনা i√nb√g√ 1-এ উল্লেখ করেছেন :

> ১৯৪৬ সনে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ক্রমশ আকারে ব্যাপক এবং সহিংসতায় প্রচণ্ডতর মূর্তি ধারণ করল। তন্মধ্যে ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ সনে কলিকাতা মহানগরীর হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা পাশবতার এক অক্ষয় স্তম্ভ হয়ে রইল। তিন দিনে আঠারো হাজার বলিদান সম্পন্ন হলো। অগ্নিদাহ, লুণ্ঠন, ধর্ষণের সুষ্ঠু হিসাব আর কেইবা রেখেছে। সভ্যতার বিবর্তনের এক ঔজ্জ্বল্যময় প্রকাশ নগর। শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ সেখানেই দীপ্তিময় রূপ ধারণ করে। সেই নগরের বুকে দেখা গেল পশু পর্যায়ের বীভৎস দৃশ্য। আর পশুদের দেখা যায়, নরমাংস-নারীমাংস ভক্ষণের মহোৎসবে।...১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ থেকে ১৮ আগস্ট অবিভক্ত বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতা শহরের রাজপথে কাক, শিয়াল, শকুন প্রভৃতি প্রাণীর যথেচ্ছা বিচরণ এবং নর-মাংস আহার। (শওকত, ২০০৭ ক : ২৫৭)

মানবতাবাদী সমাজ-সচেতন গল্পকারগণ মানব সভ্যতার এ-কলঙ্কিত ইতিহাসকে তাঁদের সাহিত্যের উপকরণ করে এ থেকে উত্তরণের পথ সন্ধান করেছেন। এ-দাঙ্গার বহুমাত্রিক রূপ চিত্রিত হয়েছে শওকত ওসমানের ebx A√'g (১৯৪৬) উপন্যাসে এবং 'চুহা-চরিত' (‖eMZ K√‡j i Mí) গল্পে।

'চুহা-চরিত' (‖eMZ K√‡j i Mí) গল্পে সাম্প্রদায়িকতার সামান্য বিবরণ থাকলেও এ-থেকেই দাঙ্গার ভয়াবহতা অনুমান করা যায়। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের জন্য এ দেশে যে-সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জরুরি ছিল, সে-সময় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের উভয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনগণকে সেদিকে ধাবিত করার থেকেও ব্যক্তি-স্বার্থ উদ্ধারে বেশি সচেষ্ট ছিলেন। একদিকে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে হিন্দু-মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পথে ঠেলে দেন। অপরদিকে ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য একে-অন্যের সাথে হাত মেলান। মূলত উভয় দলের লক্ষ্য যে এক তা গল্পকার স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন : "ও কংগ্রেস হোক আর লীগ হোক, তার ফলাফল এক। ওই ছেড়াছেড়ি আর শ্রাদ্ধ।" (শওকত, ১৯৮৭ : ৪২) এখানে

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরে এদেশের উভয় সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর মুখে পতিত হন, তার ওপর আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অবশিষ্ট জীবিত মানুষগুলোকে আরেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি করে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভয়াবহরূপ ধারণ করে, তখন উভয় দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ-মানুষগুলোর জীবন নিয়ে নতুন খেলায় মেতে ওঠেন— 'শান্তি কমিটি' স্থাপন করে মিটিং-এর নামে টাকা সংগ্রহ করে নিজেদের ইহলোকের শান্তি স্থাপনে তৎপর হন। অন্যদিকে প্রতিদিন হাজার হাজার বাড়ি-ঘর ভস্মীভূত এবং হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান পরলোকের পথে যাত্রা করেন। ধ্বংস ও মৃত্যুর ভয়াবহতাও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বিচলিত করতে ব্যর্থ হয়। যেমন :

> শান্তি কমিটি গজাইতে লাগিল। মনিব (মুসলিম লীগ) প্রেসিডেন্ট, আর দাদার মনিব (কংগ্রেস) সেক্রেটারি। কোনো জায়গায় উলট-পালট। কিছু প্রচার পত্র ছাড়া হইল। সভা বসিল, বক্তৃতা ছুটিল। গ্রামে বহু হিন্দু-মুসলমান সর্ব্বশান্ত হইয়া গেল। দাদা অভয় দিলেন "স্বাধীনতা আসিতেছে। ইহা প্রসব বেদনার লক্ষণ মাত্র।" (শওকত, ১৯৮৭ : ৪৪)

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ব শর্ত ছিল হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। কিন্তু আন্দোলন দূরের কথা এ-দুই সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ না হয়ে ধর্মীয় কলহে লিপ্ত থেকেছে। এ-ধর্মীয় কলহ একসময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়ে এদেশ ও জাতিকে গভীর সংকটে নিপতিত করেছে। ঔপনিবেশিক শাসকদের ইন্ধনে এবং রাজনৈতিক আশ্রয়ে হিন্দু-মুসলমানের শান্তিময় পরিবেশে কীভাবে অশান্তির বিষবাষ্প ছড়িয়েছে তারই শৈল্পিক ভাষ্য 'চুহা-চরিত' গল্পটি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক হানাহানি একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। শওকত ওসমান একদিকে ছিলেন ইতিহাসসচেতন, অন্যদিকে সমকালদর্শী, উভয়ের সমবায়ে তিনি তাঁর ছোটগল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চিত্র নির্মাণ করেছেন। তাঁর এ-সব রচনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার কারণ, ফলাফল এবং তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব।

wZb : ivR‰bwZK RwUjZv

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সবচেয়ে বেশি প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদানের মধ্যে রাজনীতির অবস্থান সর্বাগ্রে। আর্থ-সামাজিক, ভূ-কাঠামো এমনকি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলও রাজনীতি দ্বারা আলোড়িত হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের কর্মকাণ্ডের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের সাধারণ অর্থে রাজনীতিবিদ নামে আখ্যায়িত করা হয়। অধিকাংশ সময় এ-রাজনীতিবিদদের দ্বারাই রাষ্ট্র পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। জ্ঞাত ইতিহাস আমাদের এই তথ্যই প্রদান করে, রাজনীতিবিদদের সুনিয়ন্ত্রিত-সুপরিকল্পিত এবং সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্র ও জন-সমাজে বয়ে আনে শান্তির বারতা । অপরদিকে অনিয়ন্ত্রিত,

অপরিকল্পিত ও বিশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় ও জন-সমাজে চরম দুর্ভোগের অন্যতম কারণ হিসেবেও চিহ্নিত হয়। প্রথাগত রাজনীতি বলতে যা বোঝায় শওকত ওসমান সেই রাজনীতির সাথে কখনও যুক্ত ছিলেন না। তবে সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না থেকেও তাঁর দেশ-রাজনীতি ভাবনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা একজন প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদের চিন্তা-চেতনা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর রাজনীতি এবং ইতিহাসসচেতনতার পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে যতীন সরকার যে মূল্যায়ন করেন তা এখানে উদ্ধারযোগ্য :

> সাহিত্যিকের শিল্পদৃষ্টি ও মননশীলতা নিয়ে শওকত ওসমান গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুসলিম বিশ্বের গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ের অন্দরমহলে যে-ভাবে প্রবেশ করতে পারেন ও এসবের নাড়ি-নক্ষত্রের পরিচয় টেনে বের করতে পারেন আশ্চর্য কুশলতায়, সে রকমটি একজন পেশাদার রাজনীতিকের পক্ষে সম্ভব নয়,— এমন কি তিনি মার্কসবাদের প্রতি নিবেদিতচিত্ত হলেও না। দেশ-বিদেশের অনেক মার্কসবাদী পণ্ডিত, তাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রনেতারাও যে নানা ধরনের প্রতিবন্ধের শিকার হয়ে অনেক অনর্থ ঘটান,— সে সবের দৃষ্টান্ত তো আমাদের চোখের সামনেই আছে। দেশী-বিদেশী সে সব দৃষ্টান্ত থেকে শওকত ওসমান সঠিক শিক্ষাটি তুলে ধরে সচেতনতার বিস্তার ঘটাতে চেয়েছেন। এখানেই পেশাদার ইতিহাসবিদদের থেকে শওকত ওসমানের পার্থক্য। (যতীন, ১৯৯১ : ১১২)

শওকত ওসমানের রাজনীতি এবং ইতিহাস-সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, রম্যরচনা সবক্ষেত্রে। তাঁর সাহিত্যে রাজনীতি বা ইতিহাস কোথাও প্রত্যক্ষ আবার কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এপর্বে তাঁর যে সমস্ত রচনাতে বাংলাবিভাগের চিত্র ফুটে উঠেছে তার মধ্যে AvZbv‘ (১৯৮৫) উপন্যাস, ‘আলিম মুয়াজ্জিন’ (wcRiv‡cvj), ‘চুহা-চরিত’ (weMZ Kv‡ji Mí) উল্লেখযোগ্য। এখানে উল্লেখ্য, উদ্ধৃত গল্পদুটিতে বাংলাভাগের পূর্ব ঘটনাবলির প্রতিচ্ছবি, গল্পকারের ভাষায় “দেশবিভাগের প্রসব বেদনার লক্ষণ” (শওকত, ১৯৮৭ : ৪৪) উপস্থাপিত হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের বাংলাভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাংলাভাগের মূলে ছিল সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক অভিশাপ এবং ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকচক্র তাদের বিভাজনমূলক শাসনের প্রয়োজনে যে ‘দ্বি-জাতি তত্ত্বে’র বীজ বপন করে, তারই ফল হিসেবে বাংলাভাগের আত্মপ্রকাশ। যুক্তি-বুদ্ধিহীন আবেগসর্বস্ব বাংলাভাগ দু-অঞ্চলের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের ভাগ্যে তীব্র আতঙ্ক ও অস্বস্তি বয়ে নিয়ে আসে। বাংলাভাগ ছিল “একই সাথে Triumph ও tragedy। সেই শোনিতলিপ্ত ঘটনাপরম্পরার সর্বাপেক্ষা বিয়োগান্তক পর্যায় ছিলো বাংলাদেশ ভুখণ্ডের পাকিস্তান অন্তর্ভুক্তি।” (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭ : ৪৩) বাঙালির জীবনে বাংলাভাগের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী বেদনাবহেরই আখ্যান হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। ১৯৪৭ সালে বাংলাভাগে ভারতীয় কংগ্রেস এবং ভারতীয় মুসলিম লীগের যে ভূমিকা ছিল শওকত ওসমান তাকে “বানরের পিঠা ভাগ” (শওকত, ২০০৭ ক : ২০৮) -এর সাথে তুলনা

করেন। কেননা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির পাতা ফাঁদে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়ই ধরা দিয়ে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে বাংলাভাগের গতিকে ত্বরান্বিত করেন। মূলত সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মানসিকতা এবং রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের শিকার ১৯৪৭ সালের বাংলাভাগ।

ধর্মভিত্তিক বাংলাভাগের বড় শিকার শওকত ওসমান এবং তাঁর পরিবার। এ-সময় তিনি গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটের প্রভাষক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলাভাগ পরবর্তীকালে তিনি নিজ দেশে পরবাসী হন এবং শেষ পর্যন্ত নিজ বাসভূমির সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে সপরিবারে পূর্ব বাংলায় চলে আসেন। এখানে স্মরণযোগ্য, "ছোটগল্প সমকালের স্বপ্ন, সংকট, সংকল্প, সংঘাত ও সংগ্রামের প্রতি সংসক্ত আপন স্বভাবধর্মেই। ফলে বাংলা ছোটগল্পের শতধা মুকুরে দুই বাংলাতেই বিম্বিত হয়েছে দেশবিভাগের অনিবার্য অভিঘাত।" (সানজিদা, ২০০২ : ৭) যুগযন্ত্রণার প্রত্যক্ষসাক্ষী হিসেবে শওকত ওসমানের শিল্পিমানসে বাংলাভাগের অন্তর্যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। তাই, তাঁর রচিত গল্পের অন্তর্বুননে সহজেই উপস্থাপিত হয়েছে বাংলাভাগজনিত যুগযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি।

'আলিম মুয়াজ্জিন' (wcRi‡cvj) গল্পটি বাংলাভাগের পূর্ব এবং পরবর্তী রাজনৈতিক জটিলতাকে ধারণ করে আছে। আলিম মুয়াজ্জিনের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনার মাধ্যমে গল্পের পট উন্মোচিত। "দেশবিভাগের অনেক গল্পে যাত্রার বিবেকের মতো চরিত্রের সন্ধান মেলে। যারা প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও অতন্দ্র জ্বালিয়ে রাখে মূল্যবোধ আর আদর্শের শিখা অনির্বাণ।" (সানজিদা, ২০০২ : ১৩৭) এ-গল্পে আলিম মুয়াজ্জিন সেই মূল্যবোধ-শাসিত আদর্শ-সমাজের বিবেকী-চরিত্রেরই প্রতিনিধি। গল্পকার অশুভশক্তির প্রতি নিন্দা ও শুভ শক্তিকে আহবান করে গল্পের পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের করাল গ্রাস, ১৯৪৬-এর রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলমান জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক অসহযোগিতা এবং নিজ বাসভূমি থেকে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার পরিবেশে স্বাধীনতার সুফল (?) উভয় অঞ্চলের জনগণের কাছে নিরানন্দভাবেই ধরা দেয়। এ-গল্পের আলিম মসজিদে মুয়াজ্জিন-এর পদে কর্মরত ছিলেন। তবে তার নামের সাথে 'পাগলা' খেতাবটি অনেকদিন ধরেই উচ্চারিত হয়। কিন্তু বাংলাভাগের প্রাক্কালে তিনি প্রকৃত অর্থেই পাগল হয়ে যান— উপাধির পাগল নয়, একদম ব্যাধির পাগল। জনতা থেকে জনান্তরে বৃদ্ধি পায় আলিমের গতিবিধি। তিনি পথে-ঘাটে নিজেকে কখনো হিন্দু আবার কখনো রিফিউজি বলে পরিচয় দেন। পথে ইটের লাল গুড়া বা রক্তের লাল দাগ দেখলে তিনি পথিককে সাবধানে পথ চলার জন্য সতর্ক করেন। মূলত এ-জাতীয় সতর্ক করার মাধ্যমে গল্পকার বিগত সময়ে সংঘটিত হিন্দু-মুসলমানের রক্তাক্ত দাঙ্গাকেই স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি পাগল হলেও তার বিবেকী উচ্চারণে পাঠক-শ্রোতা বিস্মিত হয়। যেমন : "আলিম নিজের মনে হাসে, আর অস্পষ্ট শব্দে বলে : হালা এক পাগ্‌লা ছিলা আল্‌মা মুয়াজ্জিন। এহন দেহি, ঢের পাগ্‌লা বাড়ছে। নিজের জায়গা মেলে না।" (শওকত, ২০০৩ : ১২৬) মাঝে

মাঝে তিনি রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অবশ্য আলিম মুয়াজ্জিন-এর ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাকে লেখক প্রতীকী পরিচর্যা হিসেবে ব্যবহার করেন। গল্পকার এজাতীয় পরিচর্যার মাধ্যমে বিবেকী মানুষদের সংঘাতের পথ পরিহার করে সঠিক পথে চলার বিষয়কেই ইঙ্গিত করেন। এ-সম্পর্কে সানজিদা খাতুনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> গল্পের আলিম মুয়াজ্জিন এক সময় সুস্থ, ধর্মপ্রাণ এবং আশাবাদী মানুষ ছিল। সেই আলিম মুয়াজ্জিন স্বাধীনতার নামে রক্তক্ষয়ী হানাহানি আর মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা দর্শনে মানসিক ভারসাম্য হারায়— কিন্তু তখনই সে হয় মানবধর্মে উত্তীর্ণ এবং পাগল আলিম সোচ্চারে নষ্ট সমাজের বিবেকের ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে ব্যঞ্জনাধর্মী রূপক ও প্রতীকের আশ্রয়ে শওকত ওসমান প্রায়ই প্রকাশ করেন তাঁর গতিশীল চিন্তাস্রোত এবং সে চিন্তাস্রোতে সিক্ত হয়ে ওঠে তাঁর পুরুষেরা, তাঁর নারীরা। সদর্থক চেতনায় উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর নায়কেরা প্রায়ই মানবিক মহিমায় জাগ্রত হয়। নেতি আর নাস্তির জগতে বাস করেও তারা ইতিবাচক জীবনবোধে উজ্জীবিত হয়ে ঘোষণা করে মানবিকতারই জয়গান। (সানজিদা, ২০০২ : ১৩১)

লেখক প্রতিকূলতার মধ্যেও আলোকের সন্ধান করেছেন, যে আলোক ধারায় সিক্ত হবে মানবতার মুক্তির পথ। গল্পের পরিসমাপ্তিতে পাগলা আলিম মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় মানবতাবাদের উদাত্ত আহবান— যেন তিনি আবার মুয়াজ্জিনের পদে অভিষিক্ত হয়েছে :

> আলিম বলে : চুপচাপ ক্যান? আজান দিতা আছিলা না? আজান দ্যাও।
> আদেশ-অনুরোধপুষ্ট কণ্ঠস্বর। কয়েকজন চিৎকার করে উঠে "আল্লাহো— ।"
> রীতিমত ধমক দিয়ে ওঠল আলিম : ও নয়। আজান দ্যাও।
> পাগলের অনুরোধই বটে।
> মিছিলের জোট-বাঁধা আওয়াজ শতধা তরঙ্গ তোলে : "হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই। দেশত্যাগী হবো না। দাঙ্গাবাজ বরবাদ হোক।" (শওকত, ২০০৩ : ১২৮)

সমাজসচেতন লেখক শওকত ওসমান 'আলিম মুয়াজ্জিন' গল্পের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের শিকার একজন রক্তাক্ত ব্যক্তির ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন। তবে তিনি একজন আলিম মুয়াজ্জিনের কথা উপস্থাপন করলেও তা শেষ পর্যন্ত একজনের হয়ে থাকেনি। বরং এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে সক্ষম হন যে, বাংলাভাগ শুধু মানুষের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর আঘাত করেনি, এর আঘাত ছড়িয়ে পড়ে মানুষের অন্তর্জগতেও। ফলে বাংলাভাগের প্রভাবে অনেকে হারায় মানবের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বা হয়ে পড়েছে পাগল বা উন্মাদ– যার বেদনাবহ সাক্ষী পাগলা আলিম মুয়াজ্জিন।

শওকত ওসমানের রাজনৈতিক জটিলতা প্রধান গল্পের মধ্যে 'চুহা-চরিত' (weMZ Kv‡ji Mí) অন্যতম নিরীক্ষাধর্মী এ-গল্পে লেখক ভিন্ন আঙ্গিকে একাধারে রাজনীতিবিদদের বৈশিষ্ট্য, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বাংলাভাগ প্রভৃতির চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্পটি পরিবেশিত হয়েছে মূষিকদ্বয়ের জীবনেতিহাসের বিবরণীতে। এ-গল্পে লেখক তাঁর বক্তব্যের নিরপেক্ষ-নির্মোহ রূপ দেওয়ার চেষ্টা

করেছেন। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীভক্ত, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের স্থানীয় ও জাতীয় নেতাদের কর্মকাণ্ড এবং তাদের স্বার্থ উদ্ধারের অপকৌশলের অনুপুঙ্খ বর্ণনা এ-গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া একই সাথে লেখক এ-জাতীয় স্বার্থপর নেতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্মোচনে তাদের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের বৈপরীত্যের ভাষাচিত্র নির্মাণ করেছেন।

গল্পকার 'চুহা-চরিত' গল্পে ঘটনাকে নিকট থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুবিধার্থে স্থানীয় মুসলিম লীগ সভাপতি ও কংগ্রেস সেক্রেটারির গৃহে অবস্থানরত দুটি মূষিককে ব্যবহার করছেন শিল্পকৌশল হিসেবে। লেবাসধারী রাজনৈতিক চরিত্রকে বিদ্রূপ করতে 'গুর্খা দাড়ি' ব্যবহৃত হয়েছে। ধর্মীয় লেবাস যে সাধারণ মানুষকে ধোকা দেওয়ার প্রধান অস্ত্র তা মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের নেতারা সহজেই অনুধাবন করেছিলেন। তাই মুসলিম লীগের নেতারা গোঁফ কেটে দাড়ি রাখেন, ধুতি-প্যান্ট ছেড়ে পাজামা পরিধান এবং পার্টি অফিসের প্রবেশ পথে সার্বক্ষণিক একটি কোরআন শরীফ রাখার ব্যবস্থা করেন। অপরদিকে কংগ্রেসের নেতারা গান্ধীজির আদর্শে বিশ্বাস করলেও বাস্তবে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। গল্পের ভাষায় : "আর জানোনা গান্ধীজীর শতকরা নিরানব্বই দশমিক নিরানব্বই জন ভক্ত মাছ-মাংস ছাড়ে নি। তবু গান্ধীভক্ত। শুধু থিয়রি মানলেই চলে। প্রাকটিস ছেলেবেলায় অঙ্কের ক্লাসে করেছে।" (শওকত, ১৯৮৭ : ৩২)

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বাঙালির অখণ্ড জাতিসত্তা এবং ভিন্ন মেজাজ ও বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয়েছে। কংগ্রেস খাতা-কলমে জাতীয়তাবাদী দল; কিন্তু হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে তাদের অবস্থান বিপরীত মেরুতে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ ধর্মীয় সংগঠন হয়েও তারা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ না করে ব্যক্তি-স্বার্থ উদ্ধারে তৎপর। গল্পকার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের একই শারীরিক অবয়ব ও মানসিকতাকে চিহ্নিত করেছেন মূষিকদ্বয়ের দ্বারা। ভিন্ন ভিন্ন দলের নেতারা ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য উপস্থাপন করলেও মানসিকভাবে যে তারা স্ব-গোত্রীয় এবং কোনোভাবেই যে তারা প্রজাহিতৈষী হতে পারে না তা মূষিকের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে লেখক স্পষ্ট করেছেন : "দুই সহোদরের দুই মনিব গলাগলি করিয়া দণ্ডায়মান। ঘরে চেয়ারে বসিয়া একে অপরের সিগারেট জ্বালাইয়া দিল।" (শওকত, ১৯৮৭ : ৪৮)। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যে স্বার্থবাদী এবং স্বার্থসিদ্ধির অপকৌশল ভিন্ন কিছু নয়— তা মুসলিম লীগ নেতার সন্তানদের স্ত্রীর মতের বিরুদ্ধে জোর করে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত : "বিবি। ইসলাম কইয়্যা তো মিটিং ফাডাও, পোলাপানে পাডাও আংরেজের স্কুলে। হ বুঝছি তোমার মুখ আর কথা-এক না।" (শওকত, ১৯৮৭ : ৩৩) তাছাড়া দুর্ভিক্ষের সময় নেতৃবৃন্দের নির্বিকার থাকা, নিজেদের নিরাপত্তার জন্য অধিক পরিমাণে খাদ্য-দ্রব্য গুদামজাত করা, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির নিমিত্তে রাজধানীর উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং শহরে সম্পত্তি ক্রয়ের মাধ্যমে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুচিহ্নিত। গল্পকার তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা ivnbvgv 1-এ দুই দলের রাজনৈতিক নেতার পরিচয় তুলে ধরেছেন : "দুই দলের নেতারাও তখন মুনাফেক— বাইরে এক এবং অভ্যন্তরে আর এক।

কংগ্রেসের নেতাদের পরিচয় তারা ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু বাস্তবে তা সকল নেতার জন্য সত্য নয়। সর্দার প্যাটেল নামক কংগ্রেস নেতা— পুরো নাম বল্লভভাই প্যাটেল তো মুসলমানদের জন্য কুখ্যাত ছিল তার সাম্প্রদায়িক প্রকাশ্য চাল-চলনের জন্যে। মুসলিম নেতারা একই পর্যায়ে পাল্লার উল্টো দিকে অবস্থানরত।" (শওকত, ২০০৭ ক : ২০৮)

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সমাজে দুর্ভিক্ষ, মহামারীকে দ্রুত প্রতিরোধ করতে না পারলেও এগুলোর ভয়াবহতাকে যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে দিতে পারে এ-বিষয়ে কারো দ্বি-মত নেই। তাদের চরিত্র পরিবর্তনের মতো সমাজে যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় না তা লেখক স্পষ্ট করেছেন গল্পের আধারে। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় ধর্মীয় ঝান্ডা উড়িয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল তার মূলে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের ইন্ধন ছিল তা গল্পকার তুলে ধরেছেন। মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে এ-দেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়ন করে স্বাধীনতার বন্দরে পৌঁছানো। কিন্তু তাদের নেতিবাচক ভূমিকার জন্য শেষ পর্যন্ত নিজেরাই ধর্মীয় কলহের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পথে এগিয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর এবং সাম্প্রদায়িকতার পথ ধরে কীভাবে ১৯৪৭ সালের বাংলাভাগের গতি ত্বরান্বিত হয় তা 'চুহা-চরিত' গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। তিরিশের দশকের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, ১৯৩৯-৪৫ সাল পর্যন্ত সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৩ সালের মহাদুর্ভিক্ষ, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত এবং পৃথক আবাসভূমির জন্য হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এ-দেশের সমাজজীবনকে বিষিয়ে তুলেছিল, এ-জাতীয় প্রতিকূল পরিবেশে বাংলাভাগ মানুষের মানবিকতার ওপর শেষ আঘাত হানে।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ছিল এদেশ থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শক্তিকে পরাজিত করে স্বাধীন ভারতবর্ষ গড়ে তোলা। কিন্তু অচিরেই ধর্মীয় উন্মাদনায় উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ সম্প্রীতিতে ফাটল ধরে। এর মূলে যেমন ছিল ব্রিটিশ শাসকদের কূটকৌশল, তেমনি ছিল এদেশের রাজনীতিবিদদের অদূরদর্শিতা। বাংলাভাগের ক্ষেত্রটি তৈরির পেছনে রাজনীতিবিদদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। তারা সবসময় আত্মস্বার্থে এবং রাজনৈতিক কলহে নিমগ্ন থেকেছেন। তারা সমাজের বাসিন্দা হয়েও সমাজ-সত্তা বিচ্ছিন্নতার পরিচয় দিয়েছেন। অথচ তাদের নিকট থেকে কাঙ্ক্ষিত এবং বাঞ্ছিত দিক নির্দেশনা পেলে বাংলাভাগের মতো একটি অমানবিক যন্ত্রণা থেকে উভয় সম্প্রদায়কে রক্ষা করা সম্ভব ছিল। অথচ তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কালোবাজারি, দুর্ভিক্ষের সময় 'শান্তি কমিটি' স্থাপন করে অবৈধ উপায়ে অর্থ-বিত্তের পাহাড় গড়েছেন। পক্ষান্তরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আবেগকে উস্কে দিয়েছেন সংঘাতের পথে চালিত করে, যার পরিণত হয় ভয়াবহ। গল্পের ভাষায় : "হিন্দুর শ্রাদ্ধ, মুসলমানের শ্রাদ্ধ।

দুর্ভিক্ষে কত শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। তবু এই পর্ব্ব মিটিতেছে না কেন? তখন দাদার কথা মনে পড়িত : স্বাধীনতা সন্নিকট। আরো শ্রাদ্ধ প্রয়োজন— আরো চল্লিশা দরকার।" (শওকত, ১৯৮৭ : ৪৭)

এ-দেশবাসীর কাছে বাংলাভাগ ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত এবং আশ্চর্যজনক ঘটনা। রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে উগ্রধর্মীয় আবেগে ভারতবর্ষকে দ্বি-খণ্ডিত করা হয়েছে। হঠাৎ করে "চিকিং ফাঁক, চিকিং ফাঁক রবে এক শুভ প্রভাতে বৃটিশের বুটের ধাক্কায় স্বাধীনতার দরজা খুলিয়া গেল। পনরই আগস্ট ১৯৪৭ উনিশ শো সাতচল্লিশ খৃষ্টীয় সন।" (শওকত, ১৯৮৭ : ৫০) এখানে স্মর্তব্য যে, আরব্য রজনীর 'চিকিং ফাঁক, চিকিং ফাঁক' শব্দগুচ্ছের মতো ধর্মীয় মাপকাঠিতে ১৯৪৭ সালে উভয় বাংলা 'দুই ফাঁক' বা দুই ভাগে রূপান্তরিত হল। কল্পনা-বিলাস ছাড়া বাস্তবে যেমন 'চিকিং ফাঁক' রবে দরজা খোলা সম্ভব নয়, তেমনি 'চিকিং ফাঁক' রবে ভারতবর্ষে যে স্বাধীনতার দরজা খুলেছিল তাতে উভয় সম্প্রদায়-মানুষের ভাগ্যের দরজা বাস্তবে কখনও খোলে নি। বরং এ-বাংলাভাগ উভয় সম্প্রদায় এবং অঞ্চলের মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে আরও বেশি দুঃখ-দুর্দশা-গ্লানি বয়ে এনেছে।

মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের রাজনৈতিক অফিস কক্ষে অবস্থানরত চুহাদ্বয় দুই রাজনৈতিক নেতার নিজ স্বার্থ উদ্ধারে প্রতারণামূলক বিভিন্ন দৃশ্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। মুসলিম লীগ নেতার মূলনীতি তার স্ত্রীর জবানিতে গল্পকার তুলে ধরেছেন : "দহলিজে কোরান ঝুলাইছ, পাজামা ধরেছো। পোলাদের পাডাও আংরেজের মকতবে– কিছু বুঝন পারি না।" (শওকত, ১৯৮৭ : ৩৪) । অন্যদিকে কংগ্রেস নেতা গান্ধীজীর অর্ধেক আদর্শে নামমাত্রে বিশ্বাসী– 'অহিংসা আর শান্তি'। মন্বন্তরকালীন উভয় নেতৃবৃন্দ অবৈধ পথে অর্থ-সম্পত্তির পাহাড় গড়ে তোলে। খাদ্যসংকটের পাশাপাশি দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষগুলো যখন বস্ত্রসংকটে নিপতিত হয় এবং তখনও তারা নির্বিকার গান্ধীজীর আদর্শের নামে— যার মধ্য দিয়ে গভীর ব্যঙ্গ বিদ্রূপই ফুটে ওঠে। যেমন : "গান্ধীজী নেংটি পরে। তার তুলনায় এরাতো পোকা-মাকড়। সুতরাং ন্যাংটো থাকা উচিত।...তাই বর্তমান বস্ত্রহরণ-নীতি তার মনিবের।" (শওকত, ১৯৮৭ : ৪২) শেষ পর্যন্ত দেশীয় দুই রাজনৈতিক দলের টানাপড়েন এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের ইন্ধনে 'চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক রবে এক শুভ প্রভাতে বৃটিশের বুটের ধাক্কায়' এ-দেশের মানুষের জীবনই দুই ভাগে (বাংলাভাগ) বিভক্ত হয়।

শওকত ওসমান রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে কখনও বিভ্রান্ত হননি, বরং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে তিনি তাঁর ছোটগল্পে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের আখ্যান রচনা করেছেন। সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ তাঁর চিন্তাশীল ও ভাবুক মনকে যেভাবে আলোড়িত এবং উদ্বিগ্ন করেছিল, সেভাবেই তিনি তাঁর গল্পের প্লট নির্মাণ করেছেন। তাই, তাঁর এ-জাতীয় গল্পগুলো হয়ে উঠেছে সমকালীন রাজনৈতিক জটিলতার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।

Pvi : †kvlY Ges †kÖYmsNvZ

সমাজ-বিকাশের প্রাথমিক স্তর (আদিম স্তরে) ব্যতীত সমাজের প্রতিটি স্তরেই (দাসতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ) শোষক এবং শোষিত শ্রেণির সন্ধান পাওয়া যায়। তবে প্রায় প্রতিটি সমাজেই শোষকশ্রেণির শোষণের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রয়োজন অনুসারে শোষকশ্রেণি তাদের শোষণের রূপ পরিবর্তন করেছে মাত্র। বর্তমান বিশ্বের বর্ধিত শ্রেণিবৈষম্য, দারিদ্র্য, আয় বৈষম্য, উঁচু-নিচু প্রভেদ এবং জীবন-যাত্রার মানের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তার মূলেও রয়েছে শোষক শ্রেণির ভূমিকা। সমাজাভিজ্ঞ শওকত ওসমানের ছোটগল্পে সমাজ এবং শ্রেণি শোষণের কিংবা নিপীড়ক ও নিপীড়িতদের বহুমাত্রিক চিত্র উন্মোচিত হয়েছে।

১৭৯৩ সালে ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশ শক্তি এদেশে নতুন জমিদারতন্ত্রের সৃষ্টি করে। তাদের বশীভূত এ দেশীয় জমিদার শ্রেণি বিভিন্নভাবে এ-দেশের জনগণের উপর শোষণ ও নিপীড়ন চালিয়েছেন। সমাজসচেতন গল্পকার শওকত ওসমান তাঁর ‘বকেয়া’ (mv‡eK Kwnbx) গল্পে জমিদারতন্ত্রের নিষ্পেষণের মর্মান্তিক কাহিনি তুলে ধরেছেন। জমিদারের সাবেক পেয়াদা পাঁচু জমিদারের কাছে সময়ের প্রবহমাণতায় বর্তমানে অপ্রয়োজনীয় এবং উচ্ছিষ্ট হয়ে পড়েন। দুই সনের খাজনা বকেয়া পড়ায় জমিদার তাকে ভিটে-মাটি ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেন। জমিদারের নিষ্ঠুর অত্যাচারে পাঁচু বিতাড়িত হন তার পৈতৃক বসত ভিটা থেকে। অন্যদিকে অনাহারে-বিনাচিকিৎসায় পাঁচুর ফুটফুটে শিশু টুনিও মারা যায় অকালে। সন্তানের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহের কারণে পাঁচু তার মেয়েকে কলা গাছের ভেলায় জমিদারের পুকুরে রাতের আঁধারে ভাসিয়ে দেন। টুনির মৃত্যুর জন্য যে জমিদার দায়ী, সেই আবার মৃত্যুর পরে পুকুরে ভাসমান টুনিকে আশীর্বাদ (সরস্বতীর উপঢৌকন) হিসেবে গ্রহণ করেন। যে জমিদার কুড়ি টাকার জন্য পাঁচু পেয়াদাকে তার বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদের নির্দেশ দেন, সেই আবার টুনির মৃত্যুর পর সরস্বতীর আশীর্বাদ ভেবে তিনশত টাকা খরচ করতে কার্পণ্য করেন না। জীবনের পাওনাগুলো টুনি যেন মৃত্যুর পরে জমিদারের কাছ থেকে মহাসমারোহে ভক্তি আর প্রণামের মাধ্যমে বকেয়া আদায় করেন।

লেখক এ-গল্পে জমিদারতন্ত্রের শোষণনীতি এবং ভণ্ডামিকে প্রতীকের অন্তরালে ফুটিয়ে তুলেছেন। বকেয়া গল্পের শিল্পসত্য সম্পর্কে বলা যায় : “এ-গল্পে নির্দয় শাসকের প্রতি একটি তির্যক ব্যঙ্গও নিক্ষেপ করা হয়েছে। যার নিষ্ঠুরতায় সমস্ত সীমা ছাড়িয়েছে তিনিই একটি কুসংস্কার অতিক্রম করতে পারেন নি।... মেয়ে বেঁচে থাকতে সে এতটুকু করুণা পায় নি জমিদার মহাজনের কাছ থেকে কিন্তু মৃত মেয়েটি বন্দিত হোল সরস্বতীর মত। গল্পাংশের এই Irony ট্র্যাজিক মহিমাকে উজ্জ্বল করেছে।” (খালেদা, ১৯৯৭ : ৮২)

বক্ষ্যমাণ গল্পে জমিদারের নিষ্পেষণে পাঁচু পেয়াদার বসতভিটা থেকে উৎখাত এবং টুনির জীবন থেকে পলায়নের চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে। জমিদারের অত্যাচারে একটি সাধারণ পরিবারে যে কি বিপর্যয় নেমে আসতে পারে তা গল্পকার পাঁচু পেয়াদা এবং তার মেয়ে টুনির পরিণতির মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন।

গ্রামের জোতদার জলিল তরফদার এবং পুলিন সাহা মন্বন্তরকালে গ্রামের মানুষের জীবনকে শোষণের মাধ্যমে কীভাবে বিষিয়ে তুলেছিলেন তা ‵দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস’ (ïcRiv‡cvj) গল্পে উঠে এসেছে। এ-গল্পে সমাজপতিদের সমাজবিরুদ্ধ পৈশাচিক মানসিকতার এবং মানবিকতাশূন্য কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। চোরাকারবারি-মজুতদার আব্দুল জলিল তরফদার এবং পুলিন সাহা ধান-চাল পাচারের মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষদের ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেন। জোতদারদ্বয়ের চোরাকারবারি ব্যবসায় পুলিশ ডেপুটি মুস্তাফিজ বাঁধা হয়ে দাঁড়ালে তরফদারের ষড়যন্ত্রে মুস্তাফিজকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করা হয়। এক্ষেত্রে উচ্চতর প্রশাসনযন্ত্রের সাথে জলিল তরফদার এবং পুলিন সাহার সম্পৃক্ততার পরিচয় গোপন থাকেনি। এক বছর পরে দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসনে বসে মুস্তাফিজ স্লোগানরত সাধারণ জনগণের করুণ অবস্থা দেখে স্তম্ভিত হন। এসময় একজন অফিসারের সাথে তার যে কথোপকথন হয় তা এখানে উল্লেখযোগ্য :

> ... কোথা থেকে এলো এই সব লোক? ম্যালেরিয়া আর আজরাইল দয়া করে এদের রেখে গেছে মনে হয়।
> - এরা এই এলাকারই লোক। ধান চাল কি কিছু ছিল যে বাঁচার মত বাঁচবে? বহু লোক মারা গেছে। এরা তার অবশিষ্ট। (শওকত, ২০০৩ : ১১৩-১১৪)

বিত্তবান লোকদের পক্ষে গ্রামের সাধারণ মানুষগুলোকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু তাদের স্বার্থান্বেষী মানসিকতা গ্রামের অসহায় মানুষগুলোকে রক্ষা করার পরিবর্তে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে। দুর্ভিক্ষে পতিত মানুষগুলো যখন অন্যের সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে জীবনধারণ করতে চেয়েছিলেন, তখন বিত্তবান সম্প্রদায় তাদের জীবনকে করে তুলেছিলেন আরও দুর্বিষহ এবং তাদেরকে পৌঁছে দিয়েছিলেন মৃত্যুর দুয়ারে।

শ্রমিকশ্রেণির প্রধান মূলধন শ্রম। শোষকশ্রেণির কাছে শ্রমিকশ্রেণির মূল্য ততক্ষণ, যতক্ষণ সে কায়িক শ্রম প্রদান করতে সক্ষম। শ্রমিকের শ্রমদানের ক্ষমতা নিঃশেষিত হলে শাসক বা শোষকশ্রেণির কাছে শ্রমিকের মূল্যও নিঃশেষিত হয়। কায়িকশ্রমের ক্ষমতা শেষ হলে, তখন জীবন-ধারণের অসহায়তা শ্রমিক ও তার পরিবারকে পঙ্গু করে দেয়। ‘দুই চোখ কানা’ (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí) গল্পে শ্রমিকশোষণের এ-অভিনব রূপটিই উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৈশ্বিক পৃথিবীর এক বিশাল পালাবদল ঘটে। সামাজিক-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ-সময় ব্যক্তি পর্যায়ে কারো জীবনে নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা এবং কেউ বা ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খোলার চাবি হাতে পায়। 'দুই চোখ কানা' গল্প পাঠে জানা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেকে রাতারাতি অনৈতিক-কালোবাজারির মাধ্যমে অঢেল সম্পত্তির অধিকারী হন। মালিক চৌধুরী এ-জাতীয় ভাগ্য পরিবর্তনকারী দলের প্রতিনিধি। যুদ্ধের পূর্বের অপরিষ্কার-নোংরা-অন্ধকারময়-ঘিঞ্জি পরিবেশের ছোট এক রুটির দোকানকে যুদ্ধের প্রারম্ভেই দ্রুত 'সর্ব্বনেতা বেকারী' নামে বড় ফ্যাক্টরিতে রূপান্তরিত করেন। লেখক জানাচ্ছেন :

> যুদ্ধের শুরুতেই কারখানা-ঘরে নতুন হাওয়ার ঝলক লাগল। খোলা পতিত জায়গার উপর এলো টীন, সুরকী, বাঁশের বদলে শালের খুটী। প্রসারণের জোয়ার লেগেছে কলেবরে।...আরো এক-বছরে ইট দরকার হোলো গাড়ি-গাড়ি। প্রায় পঞ্চাশ জন মিস্ত্রী ও ছোকরা খাটছে দিনরাত্রি। নরক রীতিমত জম-জমাট। মালের ডেলিভারী দিতে লরী ছাড়া চলে না। তিন-খানা ট্রাক কিনে ফেললেন চৌধুরী সাহেব। (শওকত, ২০০৩ : ১৬৮)

এ-কারখানায় মুন্শী নামে একজন গোমস্তার কাজ করেন মালিক চৌধুরীর কারবারের সূচনালগ্ন থেকে। কিন্তু ফ্যাক্টরির পরিসর বৃদ্ধি পাওয়াতে একসময় মালিকের কাছে মুন্শীর প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে আসে। ফ্যাক্টরির পরিসরে সেখানে প্রয়োজন হয় শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিকের। স্বল্প পরিসরের ফ্যাক্টরিতে মুন্শী যোগ্য শ্রমিক হিসেবে বিবেচিত হলেও বড় পরিসরের ফ্যাক্টরির জন্যে তিনি মালিকের কাছে অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হন। মালিক ফ্যাক্টরিকে আধুনিক রূপদানের জন্য দাপ্তরিক কাজে 'মাদ্রাজী এ্যাকাউন্ট্যান্ট' এবং টাইপের কাজে 'ফিরিঙ্গী মেয়েকে' নিয়োগ করেন। এ-ফ্যাক্টরি যার রক্ত-ঘামে তিল-তিল করে আজকের এ-অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে— সেই মুন্শীকে মালিক কাজ থেকে চিরতরে ছাটাই করেন। মুন্শী তার একমাত্র উপার্জনের পথ হারিয়ে বিপদ-সংকুল অবস্থায় নিপতিত হন এবং 'বুড়ো বয়সে ছেলে-পুলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে' তা তিনি বুঝতে পারেন না। মুন্শীর শত অনুনয়-বিনয় মালিকের মন গলাতে ব্যর্থ হয়। কারণ, মালিকের কাছে শ্রমিকের প্রতি মানবিকতা বড় নয়, শ্রমটাই বড়।

দাসনির্ভর সমাজ ব্যবস্থা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমাজ-সভ্যতায় বিভিন্ন ধরনের শ্রেণিবিন্যাস লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য যে, সমাজের প্রয়োজনেই আবিষ্কৃত হয়েছে উৎপাদনের বিবিধ কৌশল। অন্যদিকে শাসনপীড়ন এবং উৎপাদনের ভোগের প্রশ্নে একই বা ভিন্ন সমাজ-গোষ্ঠী-শ্রেণি-জাতির মধ্যে সংঘটিত হয়েছে সংঘর্ষ। উল্লেখ্য এ সংঘর্ষ শুধু শাসক ও শাসিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা শাসকে-শাসকে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে, উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত, ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। শওকত ওসমান "শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীসংঘাতের নানা পর্যায় পর্যন্ত অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে তাঁর ছোটগল্পে রূপায়িত করেছেন। কখনও এগুলো মুক্তিকামী মানুষের প্রতিবাদ হিসেবে বিবৃত হয়েছে-কখনও বা হয়েছে অনুপ্রেরণার আধার।" (অনীক, ১৯৯৫ : ১২৮)

ব্রিটিশ শাসনের অন্তিমলগ্নে শহরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবে গ্রামের সাধারণ জনগণ এবং কৃষকসম্প্রদায় নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। তার ফলে দারিদ্র্য-পীড়িত, বুভুক্ষু, নিঃসহায়ত্ব মানুষদের মধ্যেও বৃদ্ধি পায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা। সংঘবদ্ধ কৃষকদের প্রতিরোধে পরিবেশ হয়ে ওঠে উত্তপ্ত। শওকত ওসমানের ʹভাগাড়’ (mv‡eK Kwwnbx) গল্পে মন্বন্তরের পটভূমিতে বিত্তবান শোষক এবং শোষণের বিরুদ্ধে গ্রামের কৃষক ও সাধারণ মানুষের একতাবদ্ধ হওয়ার এ-জাতীয় চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। যথারীতি এ-প্রতিরোধ দমন করতে সেখানে উপস্থিত হন জোতদার মনসব আলি। কিন্তু সংঘবদ্ধ জনতা মনসব আলির রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তার ভীতিশূন্য হৃদয়ে ভয়ের সৃষ্টি করেন। গল্পকার জানাচ্ছেন :

> আরো ভিড় জমে। শানিত ব্যঙ্গভরা কৌতুহল দৃষ্টি চারিদিকে। ভয় পায় মনসব আলি।
> এত মানুষ কেন এক জায়গায় জমে। (শওকত, ২০০৩ : ১৮৭)

‘থুতু’[১] (wcRiv‡cvj) গল্পে প্রথম প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। নিজ বাসভূমে পরাধীনতার গ্লানি বহন এবং স্বজন হারানোর অন্তর্দহন থেকে এ-সুর ঝংকৃত। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় মানুষের জীবন-যাপনের পথ রুদ্ধ করে মৌলিক চাহিদা পূরণেও ইচ্ছাকৃত অচলাবস্থার সৃষ্টি করা হয়। একদিকে দারিদ্র্যের অসহনীয় যন্ত্রণা এবং অন্যদিকে দিন-যাপনে নানা প্রতিবন্ধকতা নিম্নবিত্ত মানুষগুলোকে প্রতিবাদের পথে ঠেলে দেয়, এ-প্রতিবাদের রূপই গল্পকার ‘থুতু’ গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন।

‘থুতু’ গল্পে অঙ্কিত হয়েছে নিপীড়িত সাধারণ মানুষের প্রতিচ্ছবি। এ-গল্পের “ফাদার জোহানেস এক সজ্জন এবং অশুভের ডুয়েল। অকল্যাণের কাছে পরাজিত দেবতুল্য যাজক।” (হুমায়ুন, ২০০৮ : ৯৩) এ-গল্পে ফাদার জোহানেস-এর গৃহভৃত্য মনসুরেরও ক্ষোভ বা প্রতিবাদের উৎসভূমি ঔপনিবেশিক শাসনামলের দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বৈষম্য-বঞ্চনা-নিপীড়ন-নির্যাতন। মনসুরের মা ও বোন পুষ্টিকর খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় পথ্যের অভাবে মারা যান। মা-বোনের মৃত্যু-স্মৃতি মনসুরকে প্রতিশোধপরায়ণ করে তোলে। তাই বিলেত থেকে বেড়াতে আসা জনস্টন পরিবার এবং ফাদার জোহানেস-এর খাদ্যে মনসুর তার নিজের শরীরে বাসা-বাঁধা যক্ষ্মার জীবানুমিশ্রিত থুতু গোপনে ছিটিয়ে দেন। ফাদার জোহানেসের জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি নির্দ্বিধায় খাবারে জীবাণু প্রয়োগের কথা স্বীকার করেন। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> ফাদার জোহানেস পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে বলেন : তোম মেরা খানামে থুক্ দেতা?
> —কভি কভি ফাদার।
> মনসুর নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিচ্ছে।

—কিঁউ এয়সা কাম করতা?
—মেরা বহেন কো আপনে দেখা। বেগায়ের খানা মেরা দেশকা বহুৎ আদমী— মেরা মা— মনসুরের গলা বুজে আসে। (শওকত, ২০০৩ : ৮৭)

মানবতার আদর্শে বিশ্বাসী, প্রতিহিংসা থেকে দূরে থাকা ফাদার জোহানেস মনসুরের কথায় ব্যথিত হলেও বিস্মিত হন না। তিনিও সহজে মনসুরের প্রতিশোধস্পৃহার কারণ অনুধাবন করতে পারেন। ফাদারের প্রতি মনসুরের শ্রদ্ধার কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রশমিত করতে এ-প্রতিবাদের কোনো বিকল্প পথ মনসুরের সামনে খোলা ছিল না। "ঔপনিবেশিক সমাজের সাধারণ মানুষ মনসুর তার এই প্রতিবাদ দুঃসাহসিক, বেপরোয়া, দৃপ্ত।" (সালাউদ্দীন, ২০০৮ : ২২) মনসুর এঘটনা দ্বারা জনস্টন পরিবার এবং ফাদার জোহানেসকে যে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, তার মধ্যে শুধু ব্যক্তিগত আক্রোশই সক্রিয় নয় এর মধ্যে বিজাতীয় বিদ্বেষও বিদ্যমান। তার এ-ক্ষোভ এবং বিদ্রোহ মূলত সামগ্রিক ঔপনিবেশিক শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরিত।

'পিঁজরাপোল' (wcÄiv‡cvj) গল্পেও ধনিক-শ্রেণির বিরুদ্ধে নিম্নবিত্ত-শ্রেণি মানুষের প্রতিবাদের কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। তবে প্রতিবাদের ভাষা তীব্র না হলেও ঔপনিবেশিক শাসনামলে জমিদার-শ্রেণির বিরুদ্ধে এ-প্রতিবাদ ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে। বক্ষ্যমাণ গল্পে পশু ও মানুষের সহাবস্থান তুলে ধরে গল্পকার প্রতিবাদের প্রধান কারণটিকে চিহ্নিত করেছেন। মূলত এ-গল্পে কালের অভিঘাত বা গল্পকারের ব্যক্তিগত ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

'পিঁজরাপোল' গল্পের পটভূমি বিহার অঞ্চল। যেখানে দুর্বল-রুগ্ণ-ভগ্নস্বাস্থ্য গরু-মোষের আবাসভূমি হিসেবে গড়ে উঠেছে একটি পিঁজরাপোল— যার আয়তন প্রায় পাঁচশ বিঘা। পিঁজরাপোল-এর প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ গণ্ডেরীরাম। পিঁজরাপোলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মহারাজা গণ্ডেরীরামের বাংলো, বাবুদের কোয়ার্টার। কিন্তু পশুগুলোকে দেখাশোনারত চাকরগুলোর জন্য কোনো পৃথক আবাসস্থল গড়ে ওঠেনি। গরু-মোষের জন্য নির্মিত কোয়ার্টারে (কুঠ্‌রি ঘর) চাকরেরা অবস্থান করেন। রাতের বেলায় গরু-মোষের জন্য মশারির ব্যবস্থা থাকলেও কর্মচারীদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই, বরং তাদেরকে পশুদের থেকেও নিম্ন-পর্যায়ে জীবন-যাপন করতে হয়। ধীরে ধীরে পিঁজরাপোলের অনেক কিছু পরিবর্তিত হলেও নিম্নবিত্ত মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে স্বয়ং লেখক গল্পের মধ্যে উপস্থিত হয়ে চাকরদের ভাগ্যের দিনলিপি বর্ণনা করেছেন :

> কিন্তু মারু মিয়ার মানস জগতের বিধাতারূপে শওকত ওসমান জানে যে, সে ভেবেছিল তার বেতন বাড়বে একদিন। এক কুড়ি টাকায় সে এই প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে। আরো কুড়ি বছর পরে পিঁজরাপোল বেড়েছে। কিন্তু মারু মিয়ার বেতন তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। (শওকত, ২০০৩ : ৯৫)

পিঁজরাপোলের প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই মারু মিয়া রুগ্‌ণ পশুদের সেবায় নিয়োজিত। কিন্তু তিনি কখনও নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। পিঁজরাপোলে সদ্য যোগ দেওয়া বিশ বছরের যুবক বাসেদ-এর সাহচর্যে সেও অধিকার সচেতন হয়ে উচ্চারণ করেন : "হুযুর কা এত্‌না মেহেরবানি, জানোয়ার কা তরফ দেখতা। আর আদ্‌মী কা উপর জুলুম।" (শওকত, ২০০৩ : ৯৭) তারপরেও দায়িত্বসচেতন মারু মিয়া কোনো অবস্থাতেই কাজে ফাঁকি দিতে রাজি হন না। বরং কাজের প্রতি অবহেলা লক্ষ করে তিনি বাসেদকে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করেন। কিন্তু প্রতিবাদী বাসেদও তার প্রশ্নের জবাব দেন তাৎক্ষণিকভাবে। তাদের দুজনের কথোপকথনের চিত্র :

> মারু মিয়া ঘাম মুছতে মুছতে বলে : সরকার কা পয়সা খাই হো, না কাম কারি হো?
> বাসেদ উঠে বসে, তারপর বলে : বড়ো-মিয়া সরকার কোন্‌? খানে দেতা হ্যায়? বিশ রুপেয়া মে জরু-বাচ্চা খা সাক্‌তা হ্যায়? জেয়সা পয়সা ঐসা কাম। (শওকত, ২০০৩ : ৯৬)

বাসেদ পিঁজরাপোলে রুগ্‌ণ গাভীর দুধ চুরি করে বিক্রি করেন এবং এ-কাজে তিনি মারু মিয়াকেও সাথি করেন। অবশ্য চুরি করে দুধ বিক্রি করার মাধ্যমে বাসেদ একসাথে দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে বদ্ধ-পরিকর— এক : দুধ বিক্রি করে অতিরিক্ত কিছু অর্থ উপার্জন এবং দুই : কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত গাভীর দুধ পরিবেশন করে উচ্চবিত্ত-মানুষদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ। গল্পের ভাষায় :

> দুধ বিক্রী করব। পয়সা আসবে, মজাসে দিন চলবে। তবে মনে রেখো, গরীবরা মরবে না। গরীবরা দুধ কিনে খাবে! ক্ষেপে গেছ, বড়ো মিয়া! দুধ কিনবে ঐ কোয়ার্টারের বাবুরা, গণ্ডেরীরাম, আর শহরের মাঝামাঝি গেরস্থরা। মরুক ওরা। আমি ওদের সহ্য করতে পারি না। গরীবের ছেলেরা দুধ খেতে পারে না, মায়ের শুক্‌নো মাই চোষে। ওরা চায়ে দুধ খায়। (শওকত, ২০০৩ : ১০১)

মূলত 'পিঁজরাপোল' গল্পের বাসেদ 'থুতু' গল্পের মনসুর-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ। মনসুর যেমন খাদ্যের সাথে থুতুর জীবাণু মিশ্রণের মাধ্যমে শোষক-শ্রেণির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, বাসেদও তেমন কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত গরুর দুধ পান করিয়ে শোষক শ্রেণিকে ধ্বংস করতে চেয়েছেন। কিন্তু মনসুর এবং বাসেদ উভয়েই প্রতিবাদ বা প্রতিশোধের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর পূর্বেই নিজের অবস্থান থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য হন। কিন্তু তারপরেও উভয় গল্পে প্রতিবাদের যে রূপ চিত্রিত হয়েছে তা ধীরে ধীরে অন্যান্য জনসাধারণের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে।

শওকত ওসমানের ব্রিটিশ কালপর্বে রচিত গল্পে শোষণ এবং শ্রেণিসংঘাতের চিত্র বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এ শ্রেণিসংঘাতের চিত্র ব্যক্তি পর্যায়ে সংঘটিত, সমষ্টি পর্যায়ে নয়। তবে, চরিত্রগুলো রাজনৈতিক সচেতন না হওয়ার কারণে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের বা প্রতিবাদের রূপটি এপর্বে তেমনভাবে প্রতিফলিত হয়নি। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে ব্রিটিশ শাসনশৃঙ্খলিত সমাজব্যবস্থা। তবে অবরুদ্ধ সমাজ-সময়ের মধ্য থেকেও ব্যক্তি পর্যায়ে রূপক-সাংকেতিক-নীরব প্রতিবাদের যে সুর ঝংকৃত হয়েছে, তা পরবর্তীকালে গোষ্ঠীবদ্ধ আন্দোলনে রূপ লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

cvP : bvix fvebv

সভ্যতা বিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নভাবে নারীরা শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়ে আসছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল প্রাকৃতিক নিয়মেই সমাজে নারীরা পুরুষের থেকে দুর্বল-অসহায় এবং তাদের কোনো পৃথক সত্তা নেই। প্রাগৈতিহাসিক বা আদিম সমাজে কৃষি-সভ্যতার প্রথম বীজ তারা বপন করলেও সমাজের উৎপাদনশীল কাজ থেকে তাদের অনেক দূরে রাখা হয়েছে। নারীদের মূল্যায়ন করা হতো বাড়ির কাজ এবং সন্তান জন্মদান ও তা প্রতিপালন করার নিরিখে। শৈশবে পিতার, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্রের কর্তৃত্বে নারীর বন্দিদশা নিরবধি| পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে গঠিত পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রে নারী সবসময় উপেক্ষিত থেকেছে। তাই নারীকে অশুচি-অপবিত্র-ডাইনি আখ্যায়িত করে গৃহবন্দি এবং কখনও ধর্মের বেড়াজালে অসূর্যম্পশ্য করে রাখা হয়েছে। নারীরাও প্রভূ-ভৃত্য সম্পর্ক বজায় রেখেই চেষ্টা করেছেন পারিবারিক ও দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে। “নারীদের পরিশ্রমের কোনো অন্ত নেই; শ্বশুর বাড়ি গেলে কাঁকালে ঘড়া, বাপের বাড়ি এলে ঢেঁকিতে বারা।” (হাবিবুর, ২০০৮ : ৬৯) সতের শতকের শেষে ইউরোপে কৃষিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতা শিল্পনির্ভর সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়। এ-সময়ই মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এছাড়া বিজ্ঞানের নব-নব আবিষ্কার মানুষের চিন্তার জগতে পরিবর্তনের সূচনা ঘটায়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উদ্ভব ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথে সাথে নারীর স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও অধিকারের প্রশ্নটিও বড় হয়ে ওঠে।

যুগ যুগ ধরে নারীরা যে অপরিসীম বৈষম্য ও দাসত্বের বলি হয়ে এসেছেন তার থেকে মুক্তির প্রশ্নটির সাথে সমাজে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি ভারতবর্ষীয় সমাজে-ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সময় থেকেই উত্থিত হয়। কিন্তু বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসে অনেক কিছু পরিবর্তিত হলেও এদেশীয় সমাজে নারীর প্রতি চিরাচরিত সামাজিক বৈষম্য এবং রীতি-নীতিগুলো খুব সামান্যই পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে, নারীমনের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, যন্ত্রণা ও অশ্রুময় আর্তি দীর্ঘকাল উপেক্ষিত থেকেছে। “শওকত ওসমান সমাজবীক্ষণের চারিত্র্যে নারীনিগ্রহ ও নারীর অবমূল্যায়ন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।” (অনীক, ১৯৯৫ : ২৩) তাঁর বিভিন্ন গল্পে নারী-ভাবনার যে-রূপটি ফুটে উঠেছে তা এ-অংশে উপস্থাপনের প্রয়াস পাব।

অনেক আলোচিত এবং সমালোচিত গল্প ‘জুনু আপা’ (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí)। বক্ষ্যমাণ গল্পকে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ-গল্পটি বিশ্লেষণের পূর্বে সমালোচকগণের অভিমতগুলো উদ্ধারযোগ্য :

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : দুর্গা যেমন বহুকাল হলো দিদির কায়েমি স্বত্ব নিয়ে আসন পেতে বসেছে, এই মেয়েটিও একটু ঝাপশা হলেও আরেকটি জায়গা দখল করে রয়েছে। এই বয়সেও c‡_i cvPvjx পড়ি আর ভাবি, দিদিটা আর কটা দিন বাঁচলেও তো পারতো। দুর্গা সোনার সিঁদুর কৌটা চুরি করেছিলো বলে দারুণ খারাপ লাগে। কিন্তু জুনু আপার জন্যে কষ্টটা কেবল বেদনা আর শোকে মসৃণ হয়ে থাকে না, এই কষ্ট একটু জটিল। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯১ : ১০৭)

সালাউদ্দীন আইয়ুব : 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প (১৯৫১) গ্রন্থের 'জুনু আপা' গল্পটি উল্লেখযোগ্য। বিভূতি বাবুর 'পথের পাঁচালী'র দুর্গার মতো 'জুনু আপা'র কথা মনে পড়ে অনেকেরই। সামন্ত সমাজ জীবনে নারীমানুষের যন্ত্রণা ও অশ্রুময় আর্তি এই গল্পে আছে। সামন্ত সমাজে জুনু আপার একটি সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সমাজকাঠামোর অসংগতি ও পীড়নমূলক মূল্যবোধ জুনু আপাকে মুহূর্তেই অস্তিত্বহীন ও উন্মুলিত করে দেয়। (সালাউদ্দীন, ২০০৮ : ১০৭)

অনীক মাহমুদ : "জুনু আপা" গল্পের জুনু চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি এক নারীর অন্ধকার জীবনের কথা বলেছেন। বাঙালি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিথ্যে কৌলীন্য অনেক সময় নারীর অমর্যাদার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, "স্ত্রীর পত্রে" সামাজিক কৌলীন্যের বাড়াবাড়ি আছে। "বিচারক" গল্পে হেমশশী প্রেমে ব্যর্থ হয়ে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। জুনু আপার জীবনেও এরকম অন্ধকার নেমে এসেছিল প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হবার পর। প্রেমে ব্যর্থ হয়েও জুনু আপা ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। এক বছরের মধ্যে ভেঙে গেছে সেই ঘর। পুরান প্রেমিক জসীমও তাকে গ্রহণ করে নি। এখান থেকেই শুরু হয় তার অন্ধকার জীবন। (অনীক, ১৯৯৫ : ১১৭-১১৮)

'জুনু আপা' গল্পপাঠে আমরা এসব মন্তব্যের যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারি। গল্পের শুরুতে লেখক জুনু আপার বর্তমান অবস্থার সাথে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেন। আবার গল্পসূচনার অল্পকাল পরেই লেখক পাঠককে নিয়ে গেছেন জুনু আপার অতীত জীবনে— যে-জীবনে আছে তার শৈশব-কৈশোর-প্রণয় সম্পর্ক-বৈবাহিক অবস্থা এবং গৃহত্যাগের স্মৃতি। এ-সব স্মৃতি অঙ্কনের মাধ্যমে লেখক জুনু আপার সমাজ-সংসার থেকে উন্মুলিত হওয়ার কাহিনি তুলে ধরেছেন। এছাড়াও বলা যায়, বাস্তবের প্রতিকূল পরিবেশ একজন নারীকে কীভাবে অস্তিত্বসংকটের পথে ঠেলে দেয় তারই শিল্পভাষ্য 'জুনু আপা' গল্পটি।

গল্পকথক সেলিমের মুখ থেকে জুনু আপা সম্পর্কে ইতিবৃত্ত জানা যায়। তিনি সেলিমদের পরিবারে আশ্রিতা। জুনু আপা সেলিমের মায়ের দূর সম্পর্কের বোনের মেয়ে। সামাজিকভাবে অনাথ হওয়ার কারণে যথেষ্ট মেধাবী এবং সুশ্রী হওয়া সত্ত্বেও পরিবারে তার চাওয়া-পাওয়ার কোনো মূল্য ছিল না। একপ্রকারের মানসিক যন্ত্রণা নিয়েই তিনি তার শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত করেন। অন্যদিকে জীবনের ভরা বসন্তে তিনি ভালোবেসেছেন গল্পকথকের চাচাতো ভাই জসীমকে। কিন্তু সমাজে শারীরিক সৌন্দর্য বা গুণ বিচারে নয়, মেয়েদের বিচার করা হয় বংশ মর্যাদা বা আর্থিক মানদণ্ডে। তাই প্রথাগত সমাজ-ব্যবস্থায় জুনু আপার স্বপ্ন-সাধ পুরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় জসীমের মায়ের যৌতুকলোভী মানসিকতা : "তার কলেজে পড়ুয়া ছেলে। সোনা-দানা, আনবে ঘরে, অনাথ মেয়েকে

Dhaka University Institutional Repository

গলায় ঘণ্টার মতো ঝুলিয়ে কী তার লাভ আছে?" (শওকত, ২০০৩ : ১৩৪) শেষ পর্যন্ত জসীমের মায়ের জিদের কাছে একজন নারীর সুখ-স্বপ্ন বিসর্জিত হয়। গল্পকারের ভাষায় :

> —না, তা হোতে দেব না। অমন হা-ঘরের মেয়ে আমার বৌ হয়ে আসুক, তা আমি চাই না। ওদের জাত-পাতের খবর জানিস? আমার একটা ছেলে। মা-বাপ খোয়া মেয়ে আমার দরকার নেই। (শওকত, ২০০৩ : ১৩৫)

পরে জুনু আপার বিয়ে হয় 'অমানুষ, দুশ্চরিত্র' প্রকৃতির এক লোকের সাথে। জুনু আপা সে-সংসারে এক বছর যুদ্ধ করে নিজে স্বামীকে তালাক দিয়ে আবার তার পরিবারে ফিরে আসেন। এ-বাড়িতে ফিরে আসার পরে তার উপর বিভিন্ন প্রকারের নির্যাতনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। অবশেষে অপমান-জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে জুনু আপা গোপনে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। এখান থেকেই জুনু আপার অন্ধকার জীবনের শুরু। প্রায় সাত বছর অন্ধকারজীবনের কানাগলিতে ঘুরে ঘুরে আবার নিরাপদ আশ্রয়ের প্রত্যাশায় বিয়ে করেন সামন্ত পরিবারের শেষ পুরুষ পঞ্চাশোর্ধ মালেক সাহেবকে। মালেক সাহেবকে বিয়ে করার মধ্য দিয়ে জুনু আপা ধীরে ধীরে আত্মক্ষয়ী-বিনাশের পথে এগিয়ে যান। স্রষ্টার কাছে মুখ দেখানোর ভয়ে তিনি আত্মহত্যা না করলেও একজন আত্মহন্ত্রীর সাথে নিজের জীবনকে বেঁধে নিজের সর্বনাশের পথ সুগম করেন। বাহ্যিক পরিবেশে নিজেকে সুখী দাবি করলেও প্রকৃত অর্থে তিনি কখনও সুখের সন্ধান পাননি। গল্পকার জুনু আপার মনোরাজ্যে শিল্পের আলো ফেলে তার অন্তঃসত্যকে আবিষ্কার করেছেন। গল্পকার জানাচ্ছেন :

> নির্বাসিত জীবন জুনু-আপার। এই জানালায় দাঁড়িয়ে জুনু আপা হয়ত কত চোখের পানি ফেলে। কেউ সাক্ষী থাকে না তার। বন্ধ্যা, ধূসর মরু-জীবন। অথচ এই জীবনে কত কিছু না বিকাশের পথ ছিল। প্রাণদায়িনী সঙ্গিনী, পুত্র-বৎসল জননী, স্নেহ-উৎসধারিণী ভগিনী, সেবা-পরায়ণা রমণী। সব মুছে গেল। সংসারের সামগ্রিক ক্ষতি কেউ উপলব্ধি করে না। মানুষের চেতনায় তার ছায়া পড়ে না। (শওকত, ২০০৩ : ১৩৯)

শওকত ওসমান 'জুনু আপা' গল্প-নির্মাণের মধ্য দিয়ে একজন নারীর অস্তিত্বসংকটের কাহিনিকে রূপদান করেছেন। সমাজ-সংসার থেকে বিসর্জিত হয়ে অন্ধকার-জীবনের কানাগলিতে জুনু আপা সুখের সন্ধান করেছেন। কিন্তু প্রথাগত যে সুস্থ-সমাজই তাকে সামাজিকভাবে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে অসুস্থ-সমাজের কাছে সুখ-সন্ধান করা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। একদিকে প্রথাগত সমাজ-কাঠামোর বিরুদ্ধ পরিবেশ, অন্যদিকে একজন নারীর সুস্থজীবনে বসবাসের আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু গল্পের আবহকে জটিল করে তুলেছে। গল্পের পরিসমাপ্তিতে মিথ্যা কৌলীন্য প্রথার গৌরব এবং সমাজ-ব্যবস্থার অসংগতির কাছে একজন নারীর সুখ-স্বপ্ন কীভাবে পরাজিত হয় তা গল্পকার জুনু আপা চরিত্র নির্মাণের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। লেখকের অনুভূতি এখানে রোম্যান্টিক হয়েও আলো ফেলে মধ্যবিত্তের আবেগের সত্তাকেন্দ্রে। তবে, তা মধ্যবিত্ত রোমান্টিসিজম-সঞ্জাত নয়— যা জুনু আপা চরিত্রের পরিণতির মাধ্যমে উপস্থাপিত।

'সাদা ইমারত' (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র স্বামী পরিত্যক্ত হাসিনা। স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হবার পর বাবার সংসারে গলগ্রহ হয়ে থাকার যন্ত্রণা এবং দারিদ্র্যের কশাঘাত একজন নারীর জীবনকে কীভাবে সংকটাপন্ন করে তোলে তারই ভাষাচিত্র এ-গল্পটি। লেখক বক্ষ্যমাণ গল্পটিকে চারটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে একজন নারীর দুঃখ-দুর্দশা এবং অবদমিত আকাঙ্ক্ষার মর্মন্তুদ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

হাসিনা গরিব পিতা কালু মিয়ার স্বামী পরিত্যক্তা কন্যা। পিতার অভাবের সংসারেই তার শেষ আশ্রয়। যে-পিতা দিনের আলোয় কায়িক শ্রমের মাধ্যমে অন্ন-বস্ত্রের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়ে রাতের আঁধারে চৌর্যবৃত্তির মতো একটি ঘৃণিত পেশায় লিপ্ত। নিস্তরঙ্গ জীবনে প্রতিদিনের ঘটনা হাসিনার কাছে পৃথক কোনো বার্তা বহন করে না। যদিও তার চারপাশে নির্মমতার বেড়ি পরানো থাকে। মায়ের মৃত্যু-পরবর্তীকালে ছোট দুই ভাই-বোন শাহাদ-মাজুর জন্য তাকে পালন করতে হয় মায়ের দায়িত্ব। পিতার সংসারে তিনি প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করেন অভাব-অনটনের রুক্ষ মূর্তি। "তাই দারিদ্র্যের পরিবেশেও সে কেবল মনের জোরে আনন্দ আহরণ করে। হৃদয়ে সাড়া নাই, তবু সে হাসে।" (শওকত, ২০০৩ : ১৪২) ব্যঞ্জনহীন ক্লিষ্ট দিনের কষ্ট লাঘবের জন্য দরিদ্র কৃষক-পল্লির ছেলেমেয়েদের সাথে তিনিও মাঠ থেকে শাক-পাতা সংগ্রহ করেন। কিন্তু এখানেই গল্পকার সযত্ন-প্রয়াসে মানবমনের অন্তর্গত রহস্য উন্মোচনে সচেষ্ট হয়েছেন। তাকে স্বপ্নের মতো হাতছানি দিয়ে ডাকে বাঁধের ওপারে বালিপুরের জেলা বোর্ডের হাসপাতালের সাদা ইমারতটি। সাদা ইমারত অবলোকন করে হাসিনার মধ্যে রোম্যান্টিক অনুভবময়তা কাজ করে। লেখক জানাচ্ছেন :

> হাসিনা সাদা ইমারতের দিকে আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। অচেনা অজানা অন্য কোন মানুষের নীড় তার বুকে আঁকা হইয়া যায়। (শওকত, ২০০৩ : ১৪২-১৪৩)

হাসিনার এ স্বপ্ন-সাধ তার অবদমিত আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন। বাস্তবে তার জীবনে যা ঘটেনি, যা পূরণ হয়নি, তা তিনি কল্পনার উপর ভর করে পেতে চেয়েছেন। তার এ মনোজটিলতার স্বরূপ উন্মোচনের জন্য আমরা আধুনিক মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষকদের পুরোধা সিগমুন্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) দ্বারস্থ হবো। তিনি তাঁর gbtmgx ÿ‡Yi fwgKv : ¯c^{2} গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করেছেন, "স্বপ্নেরা হল ইচ্ছাপূরণ।...অবদমিত ইচ্ছার বা কামনার আবেগ আর কেবলমাত্র এটিই স্বপ্নের রূপায়ণ সম্ভব করে তোলে। অন্যদিকে কল্পনার উদ্দেশ্য হল সমাজ-অস্বীকৃত ইচ্ছাগুলিকে প্রকাশ করা।" (সিগমুন্ড, ২০১১ : ১৪৭) হাসিনারও বাস্তবের সাথে কল্পনার স্বপ্নপূরণের যে ব্যবধান সে-সম্পর্কে তিনি সচেতন। তাই তিনি তার হৃদয়-বেদনাকে কিছুটা প্রশমিত করার অভিপ্রায়ে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। হাসিনার এ-কল্পনা তার অন্তর্লোকে হিমায়িত অচরিতার্থ কামনা-বাসনারই বহিঃপ্রকাশ। নিঃস্ব দিনমজুর কালু মিয়ার অবয়বে অদ্ভুত হিংস্রতা ফুটে ওঠে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে হাসিনার উপর। শত কষ্ট এবং অত্যাচার সহ্য করলেও বাবার প্রতি তার কোনো অভিযোগ নেই। বরং

রাতের আঁধারে কালু মিয়া চুরির উদ্দেশ্যে বাইরে গেলে তিনি সারারাত বাবার প্রতীক্ষায় জেগে থাকেন। মাঝে মাঝে তিনি নিজেও বাবার চৌর্যবৃত্তিতে সাহায্য করেন। যদিও এ-চুরিতে তার কোনো সমর্থন নেই। কিন্তু তারপরেও অনন্যোপায় হয়েই তিনি তার পিতার সহযাত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এমনি কোনো এক রাতে তার জীবনে ভয়াবহ বিপদের ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠে। বাবার সাথে চুরি করে ফেরার পথে তার পায়ে খেজুর গাছের কাঁটা ফুটে তিনি একেবারেই শয্যাশায়ী হন। শয্যাগত হয়েও তাকে সাংসারিক সব দায়িত্বই পালন করতে হয়। অবস্থার অবনতি হলে উপায়শূন্য হয়েই কালু মিয়া হাসিনাকে তার প্রতীক্ষিত বালিপুরের সাদা ইমারতের হাসপাতালে নিয়ে যান। পায়ের কাঁটার যন্ত্রণা থেকে তিনি মুক্তি পেলেও দেখা দেয় আরেক নতুন উপসর্গ বসন্ত রোগ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে হাসপাতাল থেকে মুক্তি দেন। কিন্তু জীবন-যুদ্ধে পরাজিত হাসিনা বাঁশের পাটাতনে শুয়ে পথের মধ্যে পৃথিবী থেকে না ফেরার দেশে যাত্রা করেন।

শওকত ওসমান 'ব্যবধান' (বিগত কালের গল্প) গল্পেও নারীর বেদনাময় অবমাননাকর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। "শ্রেণীবৈষম্যের কারণে আত্মীয়তা বিপন্ন হয়-জননীত্ব ম্লান হয়। এ প্রসঙ্গের স্ফূর্তি ঘটেছে e¨eav/b গল্পে।" (অনীক, ১৯৯৫ : ১২৬) নুরী বিবি তার বিধবা ও নিঃসন্তান ননদকে শ্বশুরের অনুরোধে নিজ পুত্র রাসেদীকে দান করেন পোষ্য-পুত্র রূপে। বহু বছর পর অভাবের দুর্দিনে জন্মদাত্রী নুরী বিবির কাছে আর্থিক সাহায্যের আশায় রাসেদীর আগমন ঘটে। কিন্তু সাহায্য প্রদানের ব্যর্থতাজনিত হাহাকার মাতৃহৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে, যা গল্পের সমস্ত অবয়ব জুড়ে বিদ্যমান।

'ব্যবধান' গল্পপাঠে জানা যায়, মানুষের স্বার্থবুদ্ধি, আত্মকেন্দ্রিকতা, সাহেবিপনা এবং উচ্চবিত্তের উন্নাসিকতাজনিত দূরত্ব রক্তের সম্পর্কের মাঝেও ব্যবধান সৃষ্টি করে। কিন্তু জননীর সাথে সন্তানের কখনও ব্যবধান সৃষ্টি হয় না। গল্পে বিত্তহীন রাসেদী তার বিত্তবান ভাইদের (একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, অন্যজন বড় ব্যবসায়ী) নিকট থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে আর্থিক বৈষম্যের কারণে। প্রতিপত্তির অধিকারীর ফলে রাসেদীর ভাইভাবীদের খোলস পরিবর্তন এবং রক্তের সম্পর্ক অস্বীকার করে সভ্য সমাজের বাসিন্দা দাবি করলেও মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন ভালোবাসা তখনও সন্তানের মঙ্গল কামনায় অপরিবর্তিত। নুরী বিবির দুই সন্তান যখন ঐশ্বর্যের অমরাবতীর ক্রোড়ে আরোহণ করছে—তখন "আর একজন নীড় পরিত্যক্ত শাবক ধুলার উপর জীবনের সুখস্বপ্নের সৌধ গড়িয়া আসিয়াছে।" (শওকত, ১৯৮৭ : ৬৭) কিন্তু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নুরী বিবির মাতৃহৃদয় হাহাকার করে ওঠে তার বিত্তহীন ছেলেটির জন্য এবং আরও বেশি যন্ত্রণাদগ্ধ হয় সন্তানের জন্য কিছু করতে না পারার অসহায়ত্বে। ঐশ্বর্যের যক্ষপুরীর মধ্যে নুরী বিবিও রাসেদীর মতো নিঃসঙ্গ। গল্পকারের ভাষ্যানুসারে :

> আমি কেউ নই, বাবা, এই বাড়িতে। হাত-তোলা বৌরা যা দেয় তারই অধিকারী। আমি কেউ নই।...একা নিচে পড়ে থাকি, কেউ খোঁজও নেয় না, বাবা। (শওকত, ১৯৮৭ : ৬৮-৬৯)

'ব্যবধান' গল্পটির জীবনবোধের তীব্রতা পাঠকের অন্তরকে ছুঁয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য, জননীর কাছে সন্তান চিরদিনই কাঙাল এবং মাতৃহৃদয়ও সব সময় সন্তানের মঙ্গলার্থে সমর্পিত। তবে এ-গল্পে "জননীর স্নেহধারা বিপন্ন হয়েছে বৈষম্যের কারণে। ঐশ্বর্যের পাহাড়ে বাস করেও জননী রাসেদীর মত কপর্দকহীন।" (অনীক, ১৯৯৫ : ১২৭) এ-দেশীয় সমাজ-ব্যবস্থায় নারীমনের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, যন্ত্রণা ও অশ্রুময় আর্তি চিরদিনই যে উপেক্ষিত থেকেছে তা গল্পকার 'ব্যবধান' গল্পে তুলে ধরেছেন। তবে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও যে, মাতৃস্পর্শ সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত থাকে তা গল্পের পরিণতিতে ব্যঞ্জনাময় পরিচর্যায় ফুটে উঠেছে। যেমন :

> এখানে বাহির দিগন্তের সীমানা, বিশাল মাঠের সূচনা। দশ-ক্রোশ পথ সম্মুখে। সড়কের পথে রাসেদী অনুভব করে সে আজ একা পরিব্রাজক নয়। তাহার দুই পাশে দুইজন যাত্রী। দুই জনের ছায়া-মূর্তি তার কাছে বাস্তব। একজন জান্নাৎ-বাসিনী জননী আর একজন ইহলোক বাসিনী মা-মা-। (শওকত, ২০০৩ : ৬৮)

'সাহেবালি সাহেব' (Dfk½) গল্পে ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজ তোষণের এবং খান বাহাদুর উপাধি পাওয়ার জন্য নারীকে কীভাবে পণ্যে পরিণত করা হয়েছিল তারই চিত্র উপস্থাপিত। সাহেবালি সাহেবের ঝুড়িতে সাফল্যের সবকিছু থাকলেও সে অধিকতর আর্থিক প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য ইংরেজ প্রদত্ত 'খানবাহাদুর' উপাধি পেতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। তিনি কৌশলে পাগলা মাজিস্ট্রেট নর্টনের দুর্বল দিকগুলো খুঁজে বের করে পরিকল্পনানুসারে অগ্রসর হন। তিনি নর্টনকে মদ সরবারহ করেন এমনকি উত্তরবঙ্গের শিবগঞ্জের সার্কিট হাউজে নিজের বিধবা বোনকেও নর্টনের হাতে তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করেন না। এরপর সাহেবালির 'খানবাহাদুর' উপাধি পেতে আর সময় লাগে না, কিন্তু ততদিনে তার বোনের নারীত্বের চরম সর্বনাশ ঘটে গেছে । গল্পের ভাষায় :

> সে বললে, 'খান বাহাদুর, আপনি জানেন প্রাচ্যরমণীর মূল কথা কী? ওরা হচ্ছে জেলী– soft and sweet – নরম এবং মিষ্টি।'...
> তুমি তোমার ভগ্নী জেরিনাকে সঙ্গে এনেছিলে, তা ত আগে বলোনি।... I must say to her credit, she is jelly too...soft and sweet।' (শওকত, ২০০৩ : ৪০৫)

স্বার্থান্বেষী সংকীর্ণচিত্ত মানুষ সামাজিক প্রতিপত্তি ও সুনাম অর্জনের জন্য যে নৈতিকতা বিবর্জিত অপকৌশল অবলম্বন করেন এবং স্বার্থোদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে নারীকে কীভাবে ব্যবহার করেন তারই ভাষাচিত্র রচিত হয়েছে 'সাহেবালি সাহেব' গল্পে।

ব্রিটিশ কালপর্বে রচিত শওকত ওসমানের গল্পগুলোতে নারীভাবনা সরলরেখায় প্রবাহিত। এ-পর্বের নারীরা যে বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে তা আবহমান বাংলারই নারী প্রতিনিধি। এ-ধারার গল্পগুলোতে আপনজনের শূন্যতায় নারীর নিরাপত্তাহীনতা, দারিদ্র্যের কশাঘাতে নারীর সাধ আর সাধ্যের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবধান, সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় মাতৃহৃদয়ের আকুতি এবং তা পূরণের ব্যর্থতা থেকে বেদনাবোধের ধারা প্রবাহিত হওয়ার চিত্র উপস্থাপিত।

Qq : agxq ˆewkó¨

সমাজ এবং মানুষ নিয়ন্ত্রণের প্রধান হাতিয়ার ধর্ম। সমাজ-রাষ্ট্র-ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রত্যেক ধর্ম বা মতাদর্শের উদ্ভব ঘটেছে। তবে ধর্মে আস্থাশীল ও ধর্মে আস্থাহীনতা, ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, আস্তিক ও নাস্তিক বিভিন্ন মানুষের মধ্যে তার বহিঃপ্রকাশগত দিক বিবেচনায় মাত্রাগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ এক ধর্ম অন্য ধর্ম থেকে এবং এক মতাদর্শ অন্য মতাদর্শ থেকে পৃথক। তাই সমাজে প্রচলিত ধর্ম যেমন স্রষ্টার আরাধনায় ব্যবহৃত হয়, তেমনি ধর্মের গোঁড়ামি রাজনীতি-সমাজশোষণ-মোল্লাতন্ত্র-সুবিধাবাদ বিভিন্ন কাজে অপব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ-দেশীয় বা বাঙালি সমাজ ব্যবস্থায় এর প্রভাব অত্যধিক। শওকত ওসমানের সাহিত্যকর্মে ধর্মীয় কুসংস্কার, “ধর্মের নামে ভণ্ডামি, ধর্ম নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি, শোষণের মাধ্যম হিসেবে ধর্মের ব্যবহার এবং ধর্মের কল্যাণকর কিছু চিত্র পাওয়া যায়।” (অনীক, ১৯৯৫ : ১৪৯) ধর্মীয় নানাবিধ চিত্র উন্মোচনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে আমরা ধর্মকেন্দ্রিক গোঁড়ামি-কুসংস্কার এবং অপব্যবহারের বিভিন্ন চিত্রের সন্ধান পাই।

উপমহাদেশীয় সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ম এবং রাজনীতির পাশাপাশি পথচলা নতুন কিছু নয়। “ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পর্বে রাজনৈতিক স্লোগানে বরাবরই ধর্মের লেবাস পরান হয়েছে।” (অনীক, ১৯৯৫ : ১৪৯) তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশীল লেখক শওকত ওসমানের দৃষ্টিতে সমাজব্যবস্থার এ-দ্বিবিধ চিত্র সহজেই ধরা পড়েছিল। তাঁর Ôমো’জেজা’ (mv‡eK Kwnbx) গল্পে ধর্মব্যবসা ও রাজনীতি ব্যবসার পারস্পরিক সম্পৃক্ততার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। ধর্মের নামে অধর্মের ব্যবহার এবং রাজনীতির নামে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করা এ-যেন শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার এক সাধারণ চিত্র। এখানে স্মতর্ব্য যে, ধর্ম যেমন সমাজ শোষণের হাতিয়ার— তেমনি রাজনীতির নিয়ন্ত্রকশক্তিও বটে। মুস্তাফা খানের নকলনবীশ ধার্মিকতা এবং জহুর মিয়ার ধর্মের নামে ভণ্ডামি যেন মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। বকধার্মিক জহুর মিয়ার সাথে নীতিহীন রাজনীতিবিদ মুস্তাফা খানের অন্তরঙ্গতার দ্বিবিধ চিত্র সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে অলৌকিকতারই নামান্তর। ধর্মের বাতাবরণে যে সাধারণ মানুষকে বোকা বানানো সম্ভব তা এ-গল্পের শিল্পভাষ্যে উপস্থাপিত।

ধর্মীয় লেবাস যে রাজনীতির একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত তা গল্পকার কলকাতায় অবস্থানকালেই প্রত্যক্ষ করেছেন। ভারতবর্ষীয় সমাজে রাজনীতির সাথে হিন্দু-মুসলমানের পোশাকেরও একটি বড় যোগ আছে। শওকত ওসমান তাঁর আত্মজীবনীতে স্মৃতিচারণ করেছেন :

> আমরা গাঁয়ে থাকতে ধুতি পরতাম। শহরেও হিন্দু-মুসলমানের অধিকাংশের ধুতি ছিল প্রধান লেবাস। পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের বহু চাঁইকে আমি ধুতি পরা দেখেছি। মরহুম সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, হাবিবুল্লাহ বাহার, এমনকি মুসলিম লীগের অন্ধ সেক্রেটারি আবুল হাশেমকে বান্দা ধুতি সজ্জিত দেখেছে। ১৯৩৫ সনে রাজনৈতিক বোখারের (জ্বর) সমান্তরাল মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে ধুতি গায়েব হতে লাগল। পাজামা তদস্থলে প্রতিনিধি। (শওকত, ২০০৭ ক : ১৮৬)

'মো'জেজা' গল্পে জহুর মিয়া গল্পকারের গ্রামে হঠাৎ আগত শতচ্ছিন্ন লুঙ্গি পরিহিত সাতাশ বছরের এক যুবক, যার মধ্যে অলৌকিক কেরামতির আবির্ভাব ঘটে। স্বয়ং জিব্রাইল এসে তার সাথে দেখা দিয়েছেন বলে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ। এরপরের ঘটনা খুবই দ্রুত ঘটে। গ্রাম পরিণত হয় তীর্থস্থানে, 'পীড়িত, আতুর, জীবন-বিতৃষ্ণ, ব্যর্থকাম বঞ্চিত মানুষের ভিড় আর থামে না।' ধর্মান্ধ গ্রামবাসীর কাছে নতুন পীরের কোনো চাতুরি ধরা পড়ে না। মক্তবের যে মৌলবী তাকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, সেই মৌলবীই আজ তার সাগরেদের ভূমিকায় অবতীর্ণ। দিনে দিনে ধর্মব্যবসার প্রসার ঘটে। তবে নতুন পীর সেখান থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে যান। তার এ-আকস্মিক তিরোধানেও সাধারণ জনগণ অলৌকিকতার সন্ধান পায়। গল্পকার জহুর মিয়ার তিরোধানের রহস্য আবিষ্কার করেছেন তার তিরোধানের পনের বছর পরে। লেখকের পূর্ব পরিচিত জহুর মিয়া 'জিব্রাইলের মানসপুত্র' নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিচিতি পেয়েছে হুজুর সাহেব নামে। তিনি ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন পরিবেশে পীরের পরিচয়ে সাধারণ জনগণকে বোকা বানিয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন । তার বর্তমান প্রভাব সাধারণ জনগণ থেকে রাজনৈতিক মঞ্চ পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই তিনি মুস্তাফা খানের নির্বাচনি সুপারিশনামায় উল্লেখ করেন :

> আমার পেয়ারা মুরিদান! এ-বার আপনাদের এলাকায় সদস্য পদ-প্রার্থী মৌলভী খান সাহেব, আমার সাচ্চা মুরিদান আপনাদের মতোই আমার পেয়ারা। পীর-ভাইএর ইজ্জৎ আপনারা রক্ষা করিবেন বলিয়া আমি আশা করি। আরজ গোজার শাহ সুফী। (শওকত, ২০০৩ : ১৮০)

'মো'জেজা' গল্পে পীরচরিত্র জহুর মিয়া এবং জেলা বোর্ডের সদস্য পদপ্রার্থী মুস্তাফা খানের জীবন বর্ণনায় গল্পকারের বাস্তবতাবোধের পরিচয় স্পষ্ট। এ-গল্পে জহুর মিয়া জীবিকার প্রয়োজনে এবং মুস্তাফা খান রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ধর্মকে আশ্রয় করেছেন। হঠাৎ করে মুস্তাফা খানের পোশাকের পরিবর্তন এবং দাড়ী সম্পর্কে জানতে চান। প্রত্যুত্তরে মুস্তাফা খান অন্তত বন্ধুর কাছে সত্যকথা প্রকাশ করেছেন : "নিশ্চয়। আমার বিরুদ্ধ পক্ষ ত আমাকে ঘায়েল করে দিয়েছে। ওরা বলে মিয়ার বয়স চল্লিশ, মিয়ার দাড়ীর বয়স ছ'মাস।...তবে রাজনীতি করতে গেলে এ-সব ফাঁদ দরকার।" (শওকত, ২০০৩ : ১৭৪) ধর্মের কুসংস্কারচ্ছন্ন পথে মুস্তাফা খানেরও যাতায়াত বেড়ে যায়। তার দাড়ী না থাকলেও কৃত্রিম দাড়ী লাগিয়ে ছবি তুলে নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহার করেন।

বক্ষ্যমাণ গল্পে "বিষয়াভ্যন্তরে শওকত ওসমান স্বার্থান্বেষী মানুষের লোক-দেখানো ভক্তিপ্রবণতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর ব্যঙ্গের খোঁচায় মানুষের আসল চেহারা বেরিয়ে আসে, পীর কেবলার মো'জেজা

বা অলৌকিক ক্ষমতার বুজরুকি ধরা পড়ে।” (আজহার, ১৯৯৬ : ১১০) তাছাড়া রাজনীতির অন্তরালে ধর্মকে অপব্যবহার করার যে মানসিকতা আমাদের সমাজে বিদ্যমান তা লেখক এ-গল্পে দৃশ্যমান করে তুলেছেন।

‘বকেয়া’ (mv‡eK Kwnbx) গল্পে মানুষের আচারসর্বস্ব ধর্মকেন্দ্রিক প্রতারণার চিত্র ফুটে উঠেছে। তাছাড়া জমিদারতন্ত্রের আড়ালে সনাতন ধর্মের অন্ধ-কুসংস্কারের দিকও শওকত ওসমান এগল্পে উপস্থাপন করেছেন। বক্ষ্যমাণ গল্পে জমিদার সামান্য বকেয়া খাজনার জন্য পাঁচু পেয়াদাকে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ এবং তার মেয়ে টুনিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার পর টুনিকে কেন্দ্র করে মনুষ্যত্বশূন্য-ধর্মহীন জমিদারের সরস্বতীর উপঢৌকনের ধুয়া তোলা, পূজার্চনা, সাত গ্রামের ব্রাহ্মণ খাওয়ানোর ভক্তিভাব হয়ে ওঠে অর্থহীন, ভণ্ডামি এবং লোক দেখানোরই অংশবিশেষ। জমিদার মহাসমারোহে ভক্তি আর প্রণামে তার ধর্মভাবকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করেন :

> জমিদার বাড়ির পুরোহিত বলিলেন : মা সরস্বতীর ছলনা। কার ভাগ্যে কোন জমিদারের ভাগ্যে এমন ঘটে, দেখছো না মার হাতে পদ্মের মৃণাল। জমিদার বাবু গলায় উড়ানি জড়াইয়া বার বার মাকে প্রণাম করিলেন। ভক্তিগদগদ হৃদয়। তাই দুই চক্ষুর অশ্রু উপচিয়া পড়িল। ...পাঁচশো কাঙালী ভোজন, সাত গ্রামের ব্রাহ্মণ চাই। মার পূজার ত্রুটি না হয়। পূজার পর আবার মাকে সমারোহে দূর নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। (শওকত, ২০০৩ : ১৮৪)

যে জমিদার সারাজীবন প্রজাপীড়ন, শোষণ, নিপীড়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সবসময় সীমা লঙ্ঘন করেছেন, তার ধর্মের অন্ধসংস্কার অতিক্রম করতে না পারার বিষয়টি আরও বেশি প্রতারণারই নামান্তর। মূলত এ-গল্পে সত্যিকারের ধর্মপালন নয়, ধর্মপালনের অন্ধসংস্কারকে গল্পকার তুলে ধরেছেন। আর শোষকশক্তি ধর্মীয় কুসংস্কারকে কীভাবে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন তারও দৃষ্টান্তও ‘বকেয়া’ গল্পে স্পষ্ট।

সমাজে মানুষের মনুষ্যত্ব, মানবিকতা প্রভৃতি যেন বড় নয়, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি যেন এখানে সবকিছুর নিয়ন্ত্রক শক্তি। শওকত ওসমান ‘হুকুম নড়ে না’ (mv‡eK Kwnbx) গল্পে ধর্মান্ধ সমাজের গোঁড়ামির এরূপ একটি চিত্র বাস্তবসম্মত দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। এ-গল্পে ধর্মজীবীদের সৃষ্ট বিধানের শিকার আজিম মল্লিক এবং তার পালিত কন্যা নূরজাহান।

‘হুকুম নড়ে না’ গল্পের পটভূমি ১৩৫০ সনের মন্বন্তরের একটি ভয়াবহ বাস্তবচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে লেখক গল্পের মর্মমূলে প্রবেশ করেন। দুর্ভিক্ষের সমস্যাসংকুল পরিবেশে নিঃসন্তান আজিম মল্লিক বাজারে গিয়ে এক ভিখিরির নিকট থেকে একটি কন্যা শিশু ক্রয় করেন। হৃদয়ধর্মে শুদ্ধ আজিম মল্লিক কন্যাটিকে অকৃত্রিম পিতৃবাৎসল্যে ধীরে ধীরে বড় করে তোলেন। কিন্তু পালিত কন্যার বিয়ের দিন মল্লিক সাহেব বিব্রতকর এক দুঃসহ যন্ত্রণার মুখোমুখি হন। নূরজাহানের প্রকৃত পিতার নাম না

জানার কারণে ধর্মীয় বিধানের অজুহাতে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। শেষ পর্যন্ত আজিম মল্লিকের অনুপস্থিতিতে একটি কাল্পনিক নাম ব্যবহার করে বিয়ের কার্যাদি সমাপ্ত করা হয়। এতদিন ধরে মল্লিক যে পিতৃস্নেহে নূরজাহানকে বড় করেন, সেই পিতৃবৎসল হৃদয়ের কোন মূল্য দেয়নি মৌলভিরা। গল্পের ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে আজিম মল্লিকের অন্তর্দ্বন্দ্বময়-রক্তাক্ত হৃদয়ের স্বরূপ :

> আজিম মল্লিক শাদীর মজলিশ ছাড়িয়া উঠিয়া গেল। দহলিজের পাশে একদিকে কতগুলি বড় পেঁপে গাছের সারি খাড়া। জায়গাটা ঘন অন্ধকার। নীরবে কান্নার জন্য এমন নির্জ্জনতাই শুধু আজিম মল্লিকের প্রয়োজন ছিল। (শওকত, ২০০৩ : ১৯৩)

'হুকুম নড়ে না' গল্পের বিশ্লেষণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মান্ধ সমাজে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার বন্ধন, শ্রদ্ধা, মায়া-মমতা অর্থহীন। যেখানে অন্ধ ধর্মীয়বোধ এবং ধর্মজীবীরা মানবতার উপর শিকড় গেড়ে বসে আছেন, সেখানে আজিম মল্লিক এবং তার পালিত কন্যা যে অবমাননাকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন এটাই স্বাভাবিক।

শওকত ওসমানের 'খোওয়াব' (mv‡eK Kwnbx) গল্পেও ধর্মীয় ভণ্ডামির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এ-গল্পে মৌলানা সাহ্ হরক তুল্লাহ জবরদস্ত আলেম এবং জবরদস্ত পীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ধর্মের নামে কীভাবে আত্মলালসা চরিতার্থ করার জন্য ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করেন তা গল্পকার অনুপুঙ্খভাবে উপস্থাপন করেছেন।

জবরদস্ত পীরের শিষ্য সওহর ঝোঁকের মাথায় তার সদ্য পরিণীতা স্ত্রী রাবেয়াকে তালাক দেন। কিন্তু শিষ্য তার ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় স্ত্রীকে ঘরে তুলতে চান। কিন্তু শরিয়া মোতাবেক চূড়ান্ত তালাকের পর মুরিদের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে পীর কেবলার সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই পীর আর রাবেয়াকে তালাক দিতে স্বীকৃত হননা। "যে পীর মুরিদের কাছে জাগতিকতার অসারতা প্রমাণের জন্য বেহেস্তের হুর-পরীদের গল্প করত-লোভ দেখাত, সেই পীরই নারীর প্রতি লোভাতুর হয়ে এরূপ হীনকর্ম সম্পাদন করল।" (অনীক, ১৯৯৫ : ১৫৪) গল্পের ভাষায় :

> দরখাস্ত মঞ্জুর হোলো। কিন্তু ফরিয়াদ মঞ্জুর হলো না। প্রথম রাত্রি যাপনের পর হুজুর বললেন, একজন বেকসুর বে-গোনা আওরৎকে তালাক দিয়ে গোনার ভাগীদার হোতে পারব না। মাল হাত বদল হোয়ে গেলো। তারপরই শ্রীমতি পীর সাহেবের হেফাজতে আছেন। সুন্নত আদায়ের শেষ মওকা দিয়েছেন বলে সওহর-রত্নর রাবেয়ার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। (শওকত, ২০০৩ : ১৯৪)

মৌলানা সাহ্ হরক তুল্লাহ তিন স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ধর্মকে পুঁজি করে অন্যের স্ত্রীকে গ্রহণ করলে আপন বিবেক তার কাছে শয়তানরূপে হাজির হয়ে ভয় দেখায় এবং তাকে বাতিকগ্রস্ত করে তোলে। এখানে স্মরণীয় যে, সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর *An Outline of Psychoanalysis (1938)* গ্রন্থে ভয় পাওয়া এবং বাতিকগ্রস্ত হওয়ার বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, মানুষের অনুভূতির শক্তি ক্রমাগত

ধাক্কা দিয়ে চলে, বেরিয়ে আসতে চায়, প্রকাশের কোনও পথ খুঁজে বের করতে চায় এবং নিহিত অনুভবটি ঘটনাচক্রে বেরিয়ে আসে। একটা নিহিতরূপে, শারীরিক উপসর্গরূপে অথবা একরকম ভয় বা বাতিক হয়ে। এ বিষয়টি একজন সমালোচকের ভাষায় বলা যায় : "একটি অন্যায় করলে মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তারই পরাবাস্তববাদী প্রকাশ।" (বুলবন, ২০০৪ : ৫৮) পীর কেবলার দৃষ্টিকোণ থেকে যা শয়তান, প্রকৃত অর্থে তা তার পরিচ্ছন্ন বিবেক। মূলত সেই বিবেকই পীর কেবলাকে সত্য-ধর্ম-ন্যায়-নীতি ও মিথ্যার মুখোমুখি দাঁড় করায়। কারণ, বকধার্মিক সাহ্ হরক তুল্লাহর পারলৌকিক ভাববিলাস প্রকৃতপক্ষে ইহলৌকিক জীবন ও যৌবন ভোগবিলাসের নামান্তর। উভয়ের মধ্যে মৌলানার কাছে ইহলৌকিক জীবনই বড় সত্য হয়ে দাঁড়ায়। তার দ্বান্দ্বিক দুটি সত্তার লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত মিথ্যার পৃষ্ঠপোষক সত্তাটি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। গল্পের ভাষায় :

> হুজুর হঠাৎ অনুভব করে কে যেন তার গলা টিপে ধরেছে। বুক বেয়ে দর দর ঘাম ছুটছে। শয়তানের ভয়ে টিমটিম আলো জ্বলত সারারাত্রি। হঠাৎ ঘুম-ভাঙ্গা চোখ খুললেন হুজুর। তার এক হাত নিজের গলদেশে অপর হাত রাবেয়ার শীর্ণ কণ্ঠে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন তিনি। রাবেয়ার জিব বেরিয়ে গেছে। নিস্পন্দ মুখগহব্বর থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। (শওকত, ২০০৩ : ১৯৭)

এ-গল্পে রাবেয়া তার স্বামী হরকতুল্লাহর ভোগ-বিলাস এবং নির্মমতার শিকার। ধর্মকে ঘৃণিত কর্মে ব্যবহার করে হুজুর কেবলা যে শয়তানির সূচনা করেছিল, তা শেষ পর্যন্ত শয়তানরূপে তাকেই তাড়া করে ফিরে। গল্পকার ভিন্ন মেজাজে 'খোওয়াব' গল্পের মূল সুরকে ব্যঞ্জিত করে ভণ্ডপীরের মুখোশ উন্মোচন করেছেন।

'বিবেক' (mv‡eK Kwnbx) গল্পে শওকত ওসমান চাষি-ব্যবসায়ী মিরাজ খাঁর জীবনলিপির মাধ্যমে ধর্মান্ধ সমাজের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। মিরাজ খাঁ বংশমর্যাদা বৃদ্ধিতে জামাইয়ের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু নীতিভ্রষ্ট জামাই তার মর্যাদা রক্ষা না করে তাকে পথে বসান। শেষ পর্যন্ত মিরাজ খাঁ জীবিকার প্রয়োজনে অল্প বেতনে শহরে চাকরি গ্রহণ করেন। শহরের পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে অবশেষে অসুস্থ হয়ে বাড়ির পথ ধরেন। কিন্তু নদীপথে মিরাজ খাঁ নৌকাতেই মারা যান। এসময় নৌকারোহীগণের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে জাতিপ্রথা। অসুস্থ মিরাজ খাঁকে নৌকায় আশ্রয় দিতে কারো কোনো সমস্যা না হলেও প্রাণহীন মিরাজ খাঁ ধর্মপুত্রদের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। মানবতাহীন ধর্মবিশ্বাসে আস্থাশীল নৌকারোহী সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ মৃত মিরাজ খাঁকে নদীচরে জনহীন প্রান্তরে ফেলে অতঃপর গন্তব্যে যাত্রা করেন :

> মাঝিরা লাশ লইয়া যাইতে আপত্তি জানাইল। নানাজাতির যাত্রী নৌকায়, মড়ার সাথে কেহ যাইতে রাজী নয়। এখনও চার মাইল দূরে গ্রাম।
> মাঝি শেষে বলিল, এক কাজ করুন, ঐ চরে আপনাদের দুজনকে নামিয়ে দিচ্ছি, গাঁয়ে আমি খবর দেব, পরে লোকজন এসে লাশ কাঁধে নিয়ে গাঁয়ে যাবেন। (শওকত, ২০০৩ : ২২৩)

প্রকৃতপক্ষে মিরাজ খাঁর মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনা গল্পকারের উদ্দিষ্ট নয়। তিনি এখানে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানের বিবেক ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে পরিশুদ্ধতার পথে ধাবিত হওয়ার ইঙ্গিত করেছেন। কেননা যে ধর্মবিশ্বাস মানুষকে মৃত্যুর পরেও প্রকৃত সম্মান দিতে জানে না সেই ধর্মে কি আসলেও কোনো বিবেক থাকে?

শওকত ওসমান ব্রিটিশ কালপর্বে রচিত ধর্মীয় চেতনা-আশ্রিত গল্পে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় আচার পালনের যে অন্ধত্ব ও কুসংস্কারের বাড়াবড়ি বা ধর্মবোধের অন্তঃসারশূন্যতা বিদ্যমান তা তুলে ধরেছেন। ধর্মীয় আচার যে কখনও কখনও মানবাচারের উর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়ায়, সে বিষয়কেই লেখক গল্পের ভাষ্যে নিয়ে এসেছেন। এছাড়া ধর্মকে কীভাবে সমাজে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, সে-দিকটিও একাধিক গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে।

mvZ : gvb‡li †ckvRxex Rxeb

পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষকে কোনো না কোনোভাবে বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত হতে হয় স্ব-প্রয়োজনেই— হতে পারে সে পেশা নৈতিক মানদণ্ডে বৈধ বা অবৈধ। তবে প্রত্যেকটি মানুষের পেশাগ্রহণের মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য বিদ্যমান। কেউ পেশা গ্রহণ করে বেঁচে থাকার তাগিদে, কেউ বা শখের বশে আবার কেউ দায়িত্ববোধ থেকে। শওকত ওসমানের গল্পে আমরা মাঝি, কবিরাজ, জেলে, কাবুলিওয়ালা, বর্গাচাষি, কারখানা শ্রমিক বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে পরিচিত হই। ব্রিটিশ কালপর্বে রচিত শওকত ওসমানের ছোটগল্পের বিষয় সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে উদ্ধারযোগ্য :

> গ্রামীণ যে দুর্দশার মধ্যে সে (শওকত ওসমান) বড় হয়ে উঠেছে— সেই দুর্দশার পটভূমিতে সাধারণ মানুষকে সে দেখতে চাইতো। এদের মধ্যে কৃষক ছিল, জননী ছিল, জমিদার ছিল, মাঝি ছিল, মহাজন ছিল এবং বারবনিতাও ছিল। সকলকেই সে মানুষ হিসেবে আবিষ্কার করার চেষ্টা পেয়েছে। (আলী আহসান, ১৯৮৪ : ১৭৯)

'ইলেম' (wcRi‡cvj) গল্পে লেখক দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত, বাহ্যিক আঘাতে এবং অন্তর্যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত একজন মাঝির জীবন-কাহিনি তুলে ধরেছেন। সাধারণ অশিক্ষিত মানুষ হিসেবে একজন মাঝির যে উপলব্ধি তা একজন শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও দুর্লভ। শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য জ্ঞান আহরণ, ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন এবং মানুষের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ সাধন করা। কিন্তু শিক্ষিত হলেই একজন মানুষের চারিত্রিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি এবং নৈতিকতার যে উন্নতি সাধিত হয় না, তা গল্পকার একজন মাঝির প্রেক্ষণবিন্দু থেকে উপস্থাপন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'ইলেম' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র জহির মিয়া। তিনি পেশায় মাঝি। নিজে নিরক্ষর হলেও তিনি তার পুত্র সমিরুদ্দিনকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে বদ্ধপরিকর। তিনি শত অভাব-অনটনের মধ্যেও সন্তানের শিক্ষার কোনো ত্রুটি রাখেন না। পুত্রকে কেন্দ্র করেই তিনি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত আলোকিত ভবিষ্যতের স্বপ্নের জাল রচনা করেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে সে স্বপ্ন-বাস্তবায়নে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নতুন বোধে উপনীত হন। এখানে উল্লেখ্য যে, 'রোগে, শোকে ও দুঃখে' এ-অঞ্চলের মানুষ আফিম সেবন করে। জহির মিয়াও ডাক্তারের ঔষধ পানে রোগ-মুক্তি থেকে ব্যর্থ হয়ে আফিম সেবন করেন। নদী-পথে কাস্টমস অফিসার এর সদস্যরা আফিম রাখার অপরাধে তাকে প্রহার করেন এবং থানায় নিয়ে যাওয়ার হুমকি প্রদান করেন। শেষ পর্যন্ত জহির মিয়া এক কনস্টেবলের পরামর্শক্রমে নগদ পাঁচ টাকায় মীমাংসার মাধ্যমে তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন। কিন্তু এই মীমাংসার পরে মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার আলোকে জহির মিয়ার কাছে প্রতীয়মান হয় "তার দৃষ্টি যেন এতকাল কিসের একটা মোহে আবিষ্ট ছিল। বাস্তব পৃথিবীর রুদ্র আলোয় সে পড়ল একটা নিদারুণ পাঠ— যারা জ্ঞানী, ভদ্র বেশ যাদের, তারা প্রকৃতপক্ষে কপট, অত্যাচারী, নির্দয়।" (খালেদা, ১৯৯৭ : ৮২) পরিত্রাণ লাভের পরে ভদ্রবেশী মানুষ এবং তাদের শিক্ষার প্রতি জহির মিয়ার মনে ক্ষোভ ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়। গল্পকারের ভাষায় :

> আরে বুট-সুট মারানীর পুত। তার পর আরো একটি অকথ্য গালি দিয়া বলিল : সুট পাছাৎ, গু'স মুখে, এই ইলেমের হৈব কী? বেজন্মার জাত। (শওকত, ২০০৩ : ৯৪)

প্রকৃতপক্ষে ইলেম জানা লোকেরা তার সে-স্বপ্নকে হরণ করলে তার চরিত্রে তীব্র ব্যঙ্গ ও শ্লেষ তীক্ষ্ণ রূপ পায়। যে শিক্ষা জহির মিয়ার আলোকিত ভবিষ্যৎ নির্মাণের স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটায়, সে শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে পুত্রকেও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে। তার ক্ষোভের উৎসভূমি ইলেম নয়, বরং সে-সব মানুষ যারা মানবিক মূল্যবোধে এবং শিক্ষার আলোয় নিজেদের আলোকিত করতে ব্যর্থ হয়। শিক্ষিত হলেই একজন মানুষের চারিত্রিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি এবং নৈতিকতার যে উন্নতি সাধিত হয় না, তা গল্পকার 'ইলেম' গল্পে একজন মাঝির প্রেক্ষণবিন্দু থেকে উপস্থাপন করেছেন। জীবন-কাহিনি উপস্থাপনে নয় বরং মাঝির বক্তব্যের মাধ্যমে লেখক নিজের ভাষ্যকেই তুলে ধরতে তৎপর ছিলেন।

'নতুন জন্ম' (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí) গল্পে নদী ও মানুষের (বিশেষ করে মাঝিদের) চিরন্তন সম্পর্ক আবিষ্কার করা হয়েছে। এ-গল্পটিকে অধিকাংশ আলোচক Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ গল্প হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। গল্পটির বিষয়-বিশ্লেষণের পূর্বে সমালোচকদের মন্তব্যগুলো এখানে উদ্ধারযোগ্য :

> আজহার ইসলাম : 'নতুন জন্ম' গল্পের বিষয়টি লেখকের পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবেশনায় সফল। এতে তিনি সম্ভবত তাঁর অভিজ্ঞতা-নির্ভর একটি আঞ্চলিক কাহিনিকে রূপ দিয়েছেন। এই গল্পের চরিত্র-পরিকল্পনা লেখকের কোনো খেয়াল থেকে জন্ম নেয় নি। ফলে ফরাজ আলী কিংবা তার পুত্র আব্বাস এমন

কি গোমতী নদীটিও শিল্পীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টির অনুসরণ হওয়ায় বহুলাংশে বাস্তবতার অনুগামী হতে পেরেছে।... শিল্প বিচারে শওকত ওসমানের তৎকালীন সৃষ্টি 'নতুন জন্ম' গল্পটি কথাশিল্পে তাঁর ভবিষ্যৎ সিদ্ধির এক নীরব ইঙ্গিত। নদীমাতৃক বাংলাদেশকে জীবনের তাৎপর্যে মণ্ডিত করে এক চমৎকার অভিব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত করেছেন তিনি তাঁর এই গল্পে। (আজহার, ১৯৯৬ : ১০৮-১০৯)

মাহবুবুল আলম : গল্পটি ভিন্ন ছাঁদের। গোমতী নদীর পাড়ের বাসিন্দা ফরাজ আলী কীভাবে নদীর মায়ায় অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল তাঁর চমৎকার বর্ণনা আছে এ গল্পে। ফরাজ আলী আর তার পুত্র আব্বাস নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা নদীর তীরেই বসবাস করে। এক সময় গোমতীর পাড় ভাঙ্গা শুরু হয়। ফরাজ আলীর শেষ আশ্রয়টুকুর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। তখন পিতাপুত্র দুজন নতুন জীবনের আশায় শহরের পথে যাত্রা করে। এই গল্পে বাংলাদেশের নদীর সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে গল্পটিকে সার্থক করে তোলা হয়েছে। (মাহবুবুল, ২০০৯ : ৪০২)

চঞ্চল কুমার বোস : 'নতুন জন্ম' গল্পটি নদীবিধৌত সংগ্রামশীল মানুষের আশাবাদী অস্তিত্বের প্রতীক। নতুন জীবনের অন্বেষায় শহরে যাবে বলে সে অপেক্ষা করে বাঁধের ওপর— নতুন ভোরের প্রতীক্ষায়। জীবন সম্পর্কে এই আশাবাদী চৈতন্য এই গল্পটিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। (চঞ্চল, ২০০৯ : ৭২-৭৩)

গল্পকার 'নতুন জন্ম' গল্পের প্রারম্ভেই নদী বা মৃত্তিকাসংলগ্ন মানুষের অস্তিত্ব সংগ্রামের স্থানিক রূপের পরিচয় তুলে ধরেছেন। গল্প-পরিচয়ের সূত্রে জানা যায়, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ফরাজ আলির পরিবারের একটি নিত্য সমস্যা। ফরাজ আলি এবং তার পুত্র আব্বাসের জীবিকার একমাত্র উৎস গোমতী নদী। তারা নৌকা চালিয়ে গোমতী নদীর ভাঙা-গড়া ও প্রতিকূলতার মধ্যে অবিচল চিত্তে বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত। মাঝে মাঝে গোমতীর ভয়ংকর মূর্তি গোমতীর পাড়ের মানুষের জন-জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। তাছাড়া গল্পের অন্তর্বুননে ফুটে উঠেছে ভূস্বামী কর্তৃক জলজীবীদের জীবনকে বিষিয়ে তোলার চিত্র। বেআইনিভাবে বসতিগড়ার অভিযোগে ওভার সীয়ার সাহেবের মতো ভূমিদস্যুরাও তাদের সংগ্রাম-মুখর জীবনকে আরও সমস্যা-সংকটের পথে ঠেলে দেয়। যেমন :

বসুন্ধরা কত কৃপণা, এখানে এলে বোঝা যায়। দিগন্ত-বিস্তার কত ছোট হয়ে গেছে। এক ফালি জায়গার বেশি ধরিত্রী তার শিশুদের আর কিছু ঋণ দিতে বিমুখ। ওভারসীয়ার সাহেব এসে বলেছিল, 'ফরাজ আলি, বে-আইনি ঘর তুলেছো'। 'হুজুর নদীর লগে হব গ্যাছে গ্যা'। তার মুখের কথা কেড়ে নিয়েছিল ওভারসীয়ার সাহেব, "জমিন টুকু শুধু বাকী। তা ঠিক। কিন্তু কিছু দিতে হয় যে—।" (শওকত, ২০০৩ : ১৫৩)

শওকত ওসমানের শিল্পীসত্তায় দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে বাস্তবতাবোধের বিষয়টি। গল্পকার শিল্পী-শিল্প এবং সমাজ-চেতনার দায়িত্ববোধ থেকেই তাঁদের সাহিত্যে তুলে এনেছেন ভূস্বামীদের সমাজ-শোষণ ও সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের এ-জীবনসত্য রূপটি।

জীবন-জীবিকা এবং আশ্রয় দুর্বিষহ হয়ে উঠলে আক্কাস ফরাজ আলিকে মাঝে মাঝে গোমতীর চর ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। আত্মসুখসন্ধানী পুত্রের নতুন প্রস্তাবের মধ্যে ভবিষ্যৎমুখী অগ্রসরতা ও নতুন জীবন নির্মাণের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। কিন্তু ফরাজ আলি কোনোভাবেই অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার বাঁধনে বাঁধা গোমতী নদী ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে অস্বীকৃতি জানান। এমনকি প্রতিবেশী ব্যক্তিটির শহরে যাওয়ার প্রস্তাবে ফরাজ আলি নির্বিকার চিত্তে জানিয়ে দেন : "যামু কোথা? এই হালীর লগে বড় পীরিত, আর কোথাও মন লয় না। দ্যাহো, চুলের লাহান স্রোতের গেরো। কণ্ঠস্বরে ফরাজ আলির অনুভূতি রূপ পায়। অবয়বে সে পাষাণের মতো অনড়।" (শওকত, ২০০৩ : ১৫৪) এদেশের "নদী ও মানুষের মধ্যে এই যে সম্পর্ক, এটি যুগ যুগ ধরে শিল্প-সাহিত্যের প্রধান বিবেচ্য বিষয়রূপে স্রষ্টার মননে ধরা দেয়, প্রেরণা দেয় তাঁকে নদী ও মানুষের চিরন্তন সম্পর্কের অনন্য চিত্রকল্প নির্মাণের।...গোমতী যে আসলে প্রকৃতি-কন্যা, এই চিত্রকল্প পাঠককে সেকথা ভুলিয়ে দেয়।" (আজহার, ১৯৯৬ : ১০৯)

কোনো এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের রাতে পুত্র আক্কাস ফরাজ আলিকে দিয়েছে নতুন জীবনের পাঠ : "মানসে এ্যাম্নে থাহে? তুমি সুসুণ্ডের বাচ্চা, না মানসের বাচ্চা? নদীর লগে লগে থাকার চাও, তোয়ার সরম করে না?...বিস্ময়ে তাকায় ফরাজ আলি পুত্রের মুখের দিকে।" (শওকত, ২০০৩ : ১৫৭)। অবশেষে ফরাজ আলি গোমতীর মায়া কাটিয়ে পুত্রের হাত ধরে নতুন জীবনের সন্ধান করেন। "ফরাজ আলি ও তার পুত্র শুধু একখানি গামছা আর কাঁথা সম্বল করে নতুন দিনের সূর্যের প্রতীক্ষা করেন। এ যেন এক জীবন থেকে অন্য জীবনে উত্তরণ। পুরোনো মূল্যবোধকে পেছনে ফেলে নবজন্ম লাভের শুভ সূচনা দেখা দিয়েছে দিগন্ত জুড়ে।" (খালেদা, ১৯৯৭ : ৮৭-৮৮)

'নতুন জন্ম' গল্পে সময়ের ব্যবধানের সাথে পিতা-পুত্রের চিন্তার মধ্যেও রূপান্তর ঘটেছে। এরই সূত্র ধরে গল্পটির মধ্যে দুই বিপরীতধর্মী পেশাকে মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে। গল্পে সময়ের পরিবর্তনে নদীনির্ভর সভ্যতা এবং নাগরিক সভ্যতার মধ্যে এক প্রকার দ্বন্দ্ব ও তাদের পারস্পরিক চাহিদার গুরুত্ব প্রকাশিত হয়েছে| গতানুগতিক জীবনচর্চার পরিবর্তে নতুন প্রজন্মের নগর সভ্যতার জীবনচর্চার প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং সভ্যতার আলোকিত অংশের দিকে যাত্রা বক্ষ্যমাণ গল্পে উপস্থাপিত। নদীনির্ভর সভ্যতা থেকে নাগরিক সভ্যতার দিকে ধাবিত হওয়ার চিত্র গল্পের পরিণতিতে প্রকাশিত। প্রকৃত অর্থে জলজীবীদের প্রতি গল্পকারের সমর্থন থাকলেও এ-গল্পে জীবিকাকে বড় করে নয়, বরং সংকেতময় ভাষায় জীবন ও সময়ের প্রেক্ষাপটে নতুন জীবিকা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকেই বড় করে তুলেছেন।

'সে কিরূপে স্বর্গে গেল' (mv‡eK Kwnbx) গল্পে বর্গাচাষী আবেদালির জীবনকাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের সাথে আধুনিক সভ্যতার বিশেষ করে শিল্পায়নের মিলিত প্রভাব কীভাবে কৃষিজীবী মানুষকে ভূমিচ্যুত করে মৃত্যুর গহ্বরে টেনে নিয়ে যায়— তার এক সাধারণ চিত্র আবেদালি

চরিত্রকে উপজীব্য করে গল্পে উঠে এসেছে। "সামাজিক স্তরবিন্যাসের নানা প্রক্রিয়ায় অবাধ শোষণের ফলে একজন চাষী দিনের পর দিন সচ্ছল কৃষক থেকে মধ্যকৃষককে, মধ্যকৃষক প্রান্তিক কৃষকে আর প্রান্তিক চাষী ভূমিহীন হয়ে কীভাবে ক্ষেত মজুরে পরিণত হচ্ছে এবং কপর্দকহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করছে— আবেদালি শওকত ওসমানের সেই চৈতন্যেরই প্রকাশ।" (অনীক, ১৯৯৫ : ১১৬)

জন্ম-জীবন-মৃত্যু নিয়ে যাদের গার্হস্থ্যজীবন সমর্পিত এবং কোনোরকমে খেয়ে-পরে টিকে থাকা যাদের সর্বচিন্তা— সেই সব মানুষের প্রতিভূ আবেদালি। "আবেদালির দেনা জমিয়া গিয়াছিল। প্রথম কিস্তি জমি হাতছাড়া হইয়া যায়। দ্বিতীয় দফা, হালের বলদ ও গাই-বাছুর। তৃতীয় কিস্তী বাকী।" (শওকত, ২০০৩ : ১৮৭) সে তার নিজের দোষে নয়, বরং ন্যায়ভিত্তিক সভ্যতার নীতিপ্রতিষ্ঠা ও সভ্যতার ইমারতে গড়া জটিল-কুটিল-রুক্ষ মানবপ্রাচীর বেষ্টিত হয়ে জীবনের সামান্য সাধ পূরণ করতে ব্যর্থ হন। পাইক-পেয়াদা, কাচারি, নালিশ, বরকন্দাজ, মোড়ল-মাতব্বর-সাক্ষী-সাবুদ, উকিল-হাকিম সবার হাতে নিষ্পেষিত আবেদালি। এ অচ্ছেদ্য চক্র থেকে মুক্তির উপায় স্বর্গলাভ। আবেদালির পার্থিব জীবনের ব্যর্থতা পারত্রিক জীবনের সৌধ নির্মাণের স্বপ্ন দেখিয়েছে কিন্তু সেখানেও মোল্লাতন্ত্রের মায়াবিজাল বিস্তার করা আছে।

কৃষি এবং কৃষককে বাঁচাতে শওকত ওসমান 'সে কিরূপে স্বর্গে গেল' গল্পে নতুন এক বোধকে উদ্বোধন করতে চেয়েছেন। কারণ শিল্পায়নের প্রভাবে কৃষি-কৃষক এবং আবাদি জমি সবই দিন দিন নিঃশেষিত হচ্ছে। ফলে আবেদালির মতো বর্গাচাষীদের নিজের জীবনকেই বর্গা রেখে পরপারে পাড়ি জমাতে হচ্ছে।

'প্রতীক্ষা' (mv‡eK Kwnbx) গল্পেও অঙ্কিত হয়েছে কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার চিত্র। বাকের কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রতিভূ। মাটিতে যারা ফসলের উপযোগী করে জীবনের ভিত্তি রচনা করেন, তিনি তাদেরই একজন। ঘামে আর শ্রমে জর্জরিত জীবনের পসরা খুঁজে তিনি শেষ পর্যন্ত রোগে আর শোকে, হতাশা-ক্লান্তিতে মাটির বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সমাজের শাসকশ্রেণি বাকেরের মতো প্রান্তিক মানুষের জীবন-আবেদন আর আর্তিকে অবলীলাক্রমে এড়িয়ে গিয়ে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করান। স্ত্রী তাহেরার চিকিৎসার্থে মখদুম সাহেবের কাছে মাত্র ষাট টাকায় তিন বিঘা জমি বন্ধক রেখে আট বছরের মধ্যেও সে-জমি আর তিনি ফেরত পান না। পাঁচজনের সংসারের বোঝা টানতে গিয়ে বাকেরও শেষ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। সামান্য ভূসম্পত্তির অধিকারী বাকের ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ও শয্যাশায়ী হয়ে দিন গণনা করে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। কৃষাণ-জীবনের মধুর তিক্ত গুঞ্জন তাকে আর আবেগায়িত করে না। তার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, ভালোলাগা, নিরাশা যেন জীবন থেকে হয়েছে বিসর্জিত। অথচ সচ্ছল না হলেও তার কৃষকজীবন ছিল দয়া-মায়ায় পরিপূর্ণ। মৃত্যুর পূর্বে

তার পীর মখদুম মুন্‌শীর মুরিদ হওয়ার প্রতীক্ষাও পূরণ হয় না। তার দৃষ্টি শুধু মাটির পৃথিবীর দিকে নিক্ষিপ্ত। মূলত তার এ-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গল্পকার কৃষিসভ্যতার ধ্বংসকেই উপস্থাপন করেছেন।

'দেনা' (mv‡eK Kwnbx) গল্পে অঙ্কিত হয়েছে কাবুলিওয়ালা আগা সলিমের বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি ও নিষ্ঠুরতার চিত্র। এদেশে একসময়ে প্রচলিত কাবুলিওয়ালাদের অত্যাচার এবং দৌরাত্ম্যের কথা সর্বজনবিদিত। তারা ঋণের টাকা আদায়ের থেকে সুদের টাকা আদায়ে বেশি মনোযোগী ছিলেন। কাবুলিওয়ালা কাপড়ের ব্যবসায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে এবং সেই সাথে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার করেন। তার দৃষ্টিতে হিন্দুস্থান 'কুফরস্থান' অন্যকথায় 'দারুলহরফ'। সুতরাং ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক সুবিধার্থে সে স্থান সুদ-ঘুষ হারাম নয় বলে কাবুলিওয়ালা প্রচার করেন। আগা সলিমের ব্যবসা বছরের পর বছর চলে, সেই সূত্র ধরে বকেয়া আদায়ও চলে সমসূত্রে।

গল্পপাঠে জানা যায়, সলিমের নির্দয়-নিষ্ঠুর ব্যবসার কাহিনি। এতিম শিশু ভুলীর জন্য তার নানি আবিদন বিবি যে জামাটা বকেয়ার মাধ্যমে ক্রয় করেন, তার মৃত্যুর দুবছর পরেও তিনি নির্মম-নির্মোহিতায় আদায় করেন আবেদন বিবির নিকট থেকে। যদিও তিনি (আগা সলিম) ভুলীর প্রতি সহানুভূতিশীল, তবুও তার মৃত্যু কিংবা আবিদন বিবির মাধুকরী বৃত্তি তার মনে দয়ার আঁচড় কাটতে পারেনি। সবকিছুকে পেছনে ফেলে তার স্বার্থবুদ্ধি এগিয়ে চলে, স্বার্থই যেন জগতের সকল শুভবুদ্ধির ঊর্ধ্বে। গল্পকার জানাচ্ছেন :

> সলিমও হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় নিশিগ্রস্ত রোগীর মত। আবিদন বিবির ঠোঁটে কি যেন বলার প্রচেষ্টা চলছিল। সলিম আর বিলম্ব করল না। চকচকে টাকাটা খপ করে হাতে তুলেই সে দ্রুত পদক্ষেপে পলাতক চোরের মত পৈঠা বেয়ে ভিটা থেকে নেমে পড়ে। (শওকত, ২০০৩ : ২১৭)

উল্লেখ্য, এ-গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের প্রচ্ছন্ন ছায়াপাত ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পে মমত্ব, মানবিকতা বড় হলেও শওকত ওসমানের গল্পে নিষ্ঠুরতা, স্বার্থচিন্তা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

'শেখজী' (\eMZ Kv‡ji Mí) গল্পে লেখক কাহিনি হিসেবে এক বিশেষ পেশাজীবী মানুষের চরিত্র অঙ্কন করেছেন। অবশ্য চরিত্রটিকে গল্পকার একটি আদর্শিক চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যে চরিত্রটির সাথে জড়িয়ে আছে জীবন-চলার পথের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। চরিত্রটির মহানুভবতা এবং পরার্থচিন্তা গল্পে ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়েছে।

শেখজী লঞ্চশ্রমিক, রাজমিস্ত্রী, কারখানার শ্রমিক কিংবা দিনমজুর প্রভৃতি কাজে সম্পৃক্ত হয়ে স্বার্থবুদ্ধি, চতুরতা বিষয়বুদ্ধিতাড়িত মানসিকতা লক্ষ করে মানুষের উপর আস্থা হারিয়ে পরিশেষে গ্রহণ করেন হাকিমি পেশা। প্রকৃতির উপর তার গভীর আস্থা। "গাছ-গাছড়া একদম লোকমান

Dhaka University Institutional Repository

হেকিমের মতো কাজ করে।” (শওকত, ১৯৮৭ : ১১) এ-বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে “বিদ্যেয় যতটুকু কুলোয় ফাঁকি দিই নি বাবা।”— এই সরল স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে।

শেখ্‌জীর ঔদাসীন্যের মূলে নিহিত তার প্রথমজীবনের সাংসারিক ব্যর্থতা। তাছাড়া পেশাগত কর্মে মানুষের বৈষয়িক বুদ্ধির চর্চা জীবন সম্পর্কে তাকে হতাশ করে তুলেছে। ব্যতিক্রমি পেশার মানুষ শেখ্‌জীর উপস্থিতি নিঃসন্দেহে গল্পে চমৎকারিত্ব তৈরি করে। কিন্তু গল্পে বিভিন্ন ধরনের পেশার প্রতি আস্থা হারিয়ে শেখ্‌জী শেষ পর্যন্ত কবিরাজি পেশার উপর আস্থা স্থাপন করেন। শুধু তাই নয় শেখ্‌জী তার সর্বশেষ পেশাকে নেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। স্ব-পেশার প্রতি অকৃত্রিম আস্থা ও বিশ্বাস তার স্বার্থবুদ্ধিকেও লুপ্ত করে দেয়। পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট আরাধনার স্তরটুকু শেখ্‌জী অকৃত্রিমভাবে গ্রহণ করে যা তার সাগরেদের উদ্দেশে উচ্চারিত উপদেশের মধ্য থেকে উদ্ধারযোগ্য : “একটা লফজ এদিক-ওদিক করো না বাবা, হিতে বিপরীত হয়ে যাবে।” (শওকত, ১৯৮৭ : ১২) এ-আদেশ ও তার ব্যক্তিগত আচরণ পরম বিশ্বাসের দ্যোতক।

প্রথম জীবনের পেশাগত ব্যর্থতা বা নৈরাশ্য শেখ্‌জী চরিত্রকে আধ্যাত্মিকতার পথে চালিত করে। শেখ্‌জী -চরিত্রের উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে নৈরাশ্য এবং উদ্দীপকের অনুভাব হিসেবে প্রকাশ পায় আধ্যাত্মিকতা। তাই শেখ্‌জীর চরিত্রের বিবর্তন সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। লেখক সময়ের ব্যবধানের সাথে সাথে শেখ্‌জী-চরিত্রেরও ক্রমবিকাশ দেখিয়েছেন। অনুমান করা যায়, শেখ্‌জী চরিত্র অঙ্কনে গল্পকারের ব্যক্তিগত বিশ্বাসেরই ছায়াপাত ঘটেছে। শেখ্‌জীর পেশা বিগত কালের গল্পের মতোই পুরোনো। সেকালের মানুষের প্রতি তার অকৃত্রিম আস্থা থাকলেও তার চরিত্র আদিমতামুক্ত।

শওকত ওসমানের ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের যে সমাবেশ ঘটেছে, বিশেষ করে হেকিম, কবিরাজ, নৌকাজীবী, জেলে, কৃষক, কাবুলিওয়ালা, পাইক-পেয়াদা, বরকন্দাজ, সাক্ষী-সাবুদ, উকিল-হাকিম, অল্প মূলধনের ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন-জনের জীবন চিত্রিত হয়েছে তাতে সামগ্রিক সমাজের একটি বিস্তৃত বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়।

AvU : gvb‡li ‘wi‘¨Kó Rxeb

বিভিন্ন সময় দারিদ্র্য আমাদের সমাজ এবং সভ্যতার বুককে বিদীর্ণ করেছে। দারিদ্র্যকে কখনও দেখা হয় অভিশাপরূপে আবার কখনও কর্মফলরূপে। প্রধানত সমাজস্থ মানুষই এর শিকার। এর সূত্র ধরে বলা যায়, “আর্থিক দৈন্য ভারতবর্ষীয় জীবনের এক বহুপ্রাচীন অনুষঙ্গ ; আজও পৃথিবীর এ-অঞ্চল দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর অভিশাপ থেকে অনেকাংশে মুক্ত নয়। সমাজজীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে-বাঁধা এই দারিদ্র্য সুপ্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত সর্বদা বাঙালি সাহিত্যিকদের নিকট বিষয় হিসেবে গুরুত্ব অর্জন করেছে।...চিরদিন দারিদ্র্য আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, বিনোদন, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা, মানসিক ব্যাপ্তি,

আয়তদৃষ্টি অর্জন– এই সবকিছুকে সংকীর্ণ, অপুষ্ট ও রক্তাক্ত করেছে।" (আজিজুল, ১৯৯৮ : ৭০) সমাজবাস্তবতার রূপকার শওকত ওসমানের ব্রিটিশ কালপর্বে রচিত গল্পের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে গ্রামীণ জীবনালেখ্য। গ্রামীণ জীবনের চিত্র অঙ্কনের সূত্রে গ্রামীণ অর্থনৈতিক সংকট এবং দারিদ্র্য অনিবার্যভাবে উঠে এসেছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। শওকত ওসমান তাঁর এ-পর্বের গল্পে দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষ এবং দারিদ্র্যের রূপ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন।

'দীর্ণ পত্র' (mv‡eK Kwnbx) গল্পে চিত্রিত হয়েছে দারিদ্র্যের করুণ রূপ। অন্ধ জমিরের জীবনচিত্র এবং তার অর্থ উপার্জনের পথটিকে গল্পকার নির্মম ও নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন। তিনি তার দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়ের পরিবারে আগাছার মতো আশ্রিত। প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের কশাঘাতে তিনি অন্ধদের স্কুলে ভর্তি হতে পারেননি। কারণ "অন্ধেরও বড়-লোক ছোট-লোক আছে।" বয়সবৃদ্ধির স্বাভাবিক ধারায় তার জীবনে এসেছে কামনা-বাসনা। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে সবকিছুই তার জীবনে অপূর্ণ থেকে যায়। আট বছরের পৃথিবী দেখার অভিজ্ঞতা অন্ধ জমিরকে তার পরিচিত ভৌগোলিক পরিবেশে চলাচলে সাহায্য করেছে। কিন্তু টিকে থাকার সংগ্রামমুখর জীবনে অন্ধত্বই তাকে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করেছে। অভাব আর দুর্ভিক্ষের কারণে জমিরের যখন ওষ্ঠাগতপ্রাণ, তখন এক দিনে জীবিকার প্রয়োজনে এক বিধবা মহিলার জন্য পাশের গ্রামে টাকা ধার করতে গিয়ে তিনি জীবনবিধ্বংসী এক ঝড়ের মুখোমুখি হন। সন্ধ্যার অন্ধকারে আশ্রয়চ্যুত অন্ধ জমির পরিচিত লোকালয়ের পথ হারিয়ে জীবনসমুদ্র পাড়ি দিয়ে পরপারের পথ ধরেন। গল্পকারের ভাষায় : "জমির সটান শুয়ে পড়ে রয়েছে। গোঙাতে লাগল সে, সদ্য জবাই করা কোরবাণীর গরু একটা কাৎরাচ্ছে যেন।" (শওকত, ২০০৩ : ২০৩) নিঃশেষিত হয়ে আসে তার জীবনের সব জ্বালা-যন্ত্রণা, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে বেহেস্তের আশায় জেগে থাকে পশ্চিমের কাবামুখী চেতনায়।

'তুচ্ছ স্মৃতি' (mv‡eK Kwnbx) গল্পে শওকত ওসমান স্মৃতিচারণের মাধ্যমে স্বল্প পরিসরে দারিদ্র্যের স্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। গল্পে দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত এক পরিবারের পাঁচ বছরের মেয়ে জাহানারার অকালপরিপক্বতা এবং অকালপ্রয়াণের কাহিনি স্থান পেয়েছে। তরমুজ ক্ষেতে গিয়ে বাবার বাৎসল্য রসের সাথে উঠে আসে তার কন্যার জীবনের অশ্রুসিক্ত করুণ কাহিনি। কচি মুখে এবং মস্তিস্কে যে ভাষা এবং চিন্তা গড়ে ওঠার কথা নয়— জাহানারার ছোট জীবনে তাই নিষ্ঠুরভাবে ফলেছে। "পাঁচ বছরের ওইটুকু মেয়ে জাহানারা। তার-ও কচি বুকে দারিদ্র্যের আঁচড় দাগ কেটেছিল।" (শওকত, ২০০৩ : ২১১)

অল্প বয়স্ক মেয়ে জাহানারা বাবা-মায়ের দারিদ্র্যের সংসারে সীমাবদ্ধতা ও কারুণ্য বুঝে ওঠেন। তিনি শিশুসুলভ আবেগ আবদার মুক্ত হয়ে বাবা মাকে আবদার পূরণের মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেও গুটিবসন্ত তাকে মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি দেয় নি। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তরমুজ খাওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

আবদারের মতো তুচ্ছ ঘটনা বাবার কাছে আজও তীক্ষ্ণ ও দুঃসহ স্মৃতি হিসেবে প্রতীয়মান হয়। জঠরের প্রয়োজনে তরমুজের বাণিজ্যিক চাষ পিতৃহৃদয়ে শিশুকন্যার আবেদনের স্মৃতিগুলো বাবাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। সে সময়ের দারিদ্র্যের কারণে সৃষ্ট অসহিষ্ণুতা এবং যন্ত্রণাময় তুচ্ছ স্মৃতিগুলো আবার নতুন করে তাদের মনোবেদনার কারণ হয়ে ওঠে। মূলত গল্পটির বাহ্যিক আবরণে দারিদ্র্যের চিহ্ন স্পষ্ট নয়, বোধের মধ্যে দারিদ্র্যের রূপ সতেজ।

ব্রিটিশ কালপর্বে রচিত দারিদ্র্য বিষয়ক গল্পে গল্পকার দারিদ্র্যের ভয়াবহ রূপ নয়, বরং দারিদ্র্যের স্বাভাবিক রূপচিত্র অঙ্কনে তৎপর ছিলেন। তাঁর এ-জাতীয় গল্পপাঠে প্রতীয়মান হয় যে, দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষগুলো তাদের জীবনে দারিদ্র্যকে স্বাভাবিক 'নিয়তি' বলেই মনে করেছে। তাই তারা এখান থেকে উত্তরণের কোন চেষ্টা করে নি বা তাদের সামনে সে-জাতীয় কোন পথও খোলা ছিল না।

ব্রিটিশ কালপর্বে শওকত ওসমানের সাহিত্যিক মন আবর্তিত হয়েছে এদেশের প্রকৃতি, সমাজ, জীবন ও তার পরিপার্শ্বকে ঘিরে। তাই স্বদেশের সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে তাঁর গল্পগুলোতে। সৃজননিরীক্ষার বৈচিত্র্যে সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তি-ধর্ম-সমাজ মানসের সত্য উদঘাটন প্রচেষ্টাই ছিল তাঁর এপর্বের সাহিত্য সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। লেখকের অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পরিশীলিত রুচিবোধ, নৈতিক মানবিকতাবোধ, সুতীক্ষ্ণ শিল্পজ্ঞান, সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ, আধুনিক ধ্যান-ধারণার সাহায্যে ভারতবর্ষীয় সমাজ তথা বাঙালি জীবনের অজ্ঞতা, সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাবনার সকল প্রান্তকে সাহিত্যিক-জীবনের সূচনাতেই আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিল। তিনি এপর্বে সুনির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গল্পরচনায় অগ্রসর হননি। ফলে এ-পর্বের গল্পে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গল্পকারের সাবলীল পদক্ষেপ সহজেই পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়। গল্পগুলোর উপকরণ নির্বাচনে নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবনের প্রাধান্য এবং মৃত্তিকামূলস্পর্শী জীবনাকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটেছে। গ্রামীণ জীবনালেখ্য এ-কালপর্বের গল্পের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে। গ্রামীণ জীবনচিত্র অঙ্কনের সূত্রে গ্রামীণ অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং দারিদ্র্যের প্রতিচ্ছবি অনিবার্যভাবে উঠে এসেছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। গল্পকার তাঁর এ-পর্বের গল্পে দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষ এবং দারিদ্র্যের রূপ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭-বাংলাভাগ পূববর্তী অস্থিরতা, মধ্যবিত্তের সংকট, রোম্যান্টিক ভাবাবেগ, দরিদ্র মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, শ্রেণিশোষণ, ধর্মীয় চালচিত্র, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, কুসংস্কারের প্রতি আঘাত, ভাববাদ বা ভক্তিবাদের প্রতি তীব্র আক্রমণ এবং গ্রামীণ সংকটকে তিনি এ-পর্বে ফুটিয়ে তুলেছেন।

UxKv

১. 'থুতু' গল্পটি প্রথমে 'ফাদার জোহানেস' নামে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে গ্রন্থভুক্ত করার সময় গল্পটির নামকরণ করা হয় 'থুতু'।

২. সিগমুন্ড ফ্রয়েডের *Introductory lectures on Psychoanalysis (1917)* গ্রন্থটি অরূপরতন বসু বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে ১৯৯৭ সালে প্রথম এবং ২০১১ সালে পঞ্চম সংস্করণ gbtmgxÿ‡Yi fwgKv : ¯c শিরোনামে কলকাতার দীপায়ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করেন।

Mš' I ceÜcwÄ

অনীক মাহমুদ (১৯৯৫)। evsjv K_vmwn‡Z¨ kIKZ Imgvb, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৯১)। 'শওকত ওসমানের প্রভাব ও প্রস্তুতি'; wbmM [সম্পা. সরকার আশরাফ], বাণী প্রকাশনী, বগুড়া।

আজহার ইসলাম (১৯৯৬)। evsjv‡'‡ki †QvUMí : welq-fvebv ¯i/c I wkígj¨, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

খালেদা হানুম (১৯৯৭)। evsjv‡'‡ki †QvUMí, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, চট্টগ্রাম।

চঞ্চল কুমার বোস (২০০৯)। evsjv‡'‡ki †QvUM‡íi wkíi/c, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

জয়া চ্যাটার্জী (২০০৭)। evOjv fvM nj, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

বিনতা রায় চৌধুরী (১৯৯৭)। cÂv‡ki gšš¿Íi I evsjv mvwnZ¨, বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স, কলকাতা।

বুলবন ওসমান (২০০৪)। K_v-mvwn‡Z¨ kIKZ Imgvb, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

মাহবুবুল আলম (২০০৯। evsjv‡'‡ki mvwnZ¨, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা।

মুহম্মদ আব্দুর রহীম ও অন্যান্য (২০০৫)। evsjv‡'‡ki BwZnvm, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (২০০৮)। M½vFwׁ †_‡K evsjv‡'k, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

যতীন সরকার (১৯৯১)। 'ইতিহাস-চেতন শওকত ওসমান'; wbmM [সম্পা. সরকার আশরাফ], বাণী প্রকাশনী, বগুড়া।

রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৭)। evsjv‡'‡ki Dcb¨vm : welq I wkíi/c, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম, বীরউত্তম (২০১১)। evsjv‡'‡ki ¯vaxbZv msMvg, ঐতিহ্য, ঢাকা।

শওকত ওসমান (১৯৮৭)। weMZ Kv‡ji Mí, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০০৩)। kIKZ Imgvb MímgM [সম্পা. বুলবন ওসমান], সময় প্রকাশন, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০০৭ ক)। ivnbvgv 1 : †Q‡j‡ejv I ˆK‡kvi †Kvjvnj, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০০৭ খ)। ivnbvgv 2 : Ab¨ iYcvš¿Íi I feb PZ‡i, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

সানজিদা আকতার (২০০২)। evsjv †QvUM‡í †'kwefvM, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সালাউদ্দীন আইয়ুব (২০০৮)। 'ছোটগল্পে শওকত ওসমান'; e¨w³ I mvwnwZ¨K kIKZ Imgvb [সম্পা. বুলবন ওসমান], দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা।

সিগমুন্ড ফ্রয়েড (২০১১)। gbtmgxÿ‡Yi fwgKv : ¯c, [অনুবাদ : অরূপরতন বসু], দীপায়ন, কলকাতা।

সিরাজুল ইসলাম (২০০৩)। evsjwcwWqv 4_ LÐ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক (১৯৯৮)। gwbK e‡›'¨vcva¨v‡qi †QvUMí : mgvR‡PZbv I Rxe‡bi i/cvqY, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (২০০৮)। 'শওকত ওসমান কথাসাহিত্যের পথিকৃৎ'; e¨w³ I mvwnwZ¨K kIKZ Imgvb [সম্পা. বুলবন ওসমান], দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা।

সৈয়দ আলী আহসান (১৯৮৪)। mZZ ¯vMZ, মুক্তধারা, ঢাকা।

ZZxq cwi‡"Q'
wewUk Kvjc‡ei M‡íi wkíixwZ

সমকালীন জীবন প্যাটার্নের সাথে সম্পর্কিত হয়েই সৃষ্টি হয় নব শিল্প প্যাটার্ন। প্রবহমাণ সময়কেই ধারণ করে শিল্প-সাহিত্য লাভ করে নতুন রূপাঙ্গিক এবং এর সাথে যুক্ত হয় লেখকের মানস প্রবণতা। এভাবেই লেখকের শিল্পমানস, স্বাতন্ত্রতার পরিচয় চিহ্নিত হয় এবং এ-থেকেই একজন সাহিত্যিকের শিল্পকৌশল অপর সাহিত্যিক থেকে সহজেই পৃথক করা সম্ভব হয়। শওকত ওসমানের শিল্পকৌশলও প্রবহমাণ সময়-স্রোতের সাথে একাঙ্গিক হয়ে গড়ে উঠেছে। সাহিত্যিকজীবনের শুরু

থেকেই তিনি গল্পের বিষয় বিন্যাসে যেমন ছিলেন নিরীক্ষাধর্মী, তেমনি গল্পের শৈলীবিচারেও ছিলেন পরীক্ষাপ্রবণ। ব্রিটিশ কালপর্বের প্রথম দিকের গল্পে লেখক কাহিনি বিন্যাসে, চরিত্রসৃষ্টিতে, পরিচর্যারীতিতে ভিক্টোরীয় প্রকরণ-শৈলীকে সাবলিলভাবে ব্যবহার করলেও এপর্বেরই শেষ দিকে রূপক-প্রতীক-সংকেত ব্যবহারের দিকে ঝুঁকেছিলেন। এপর্বের কয়েকটি গল্প চরিত্রপ্রধান এবং অধিকাংশ গল্পগুলো ঘটনাধর্মী।

GK

শওকত ওসমান বাঙালি জীবনের সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনার সকল ক্ষেত্র সাহিত্যিক-জীবনের শুরুতেই শনাক্ত করতে সমর্থ হন। তিনি স্ব-কালের সমাজসত্তার এই আন্তর বৈশিষ্ট্যকে বিষয়ভাবনার কেন্দ্রমূলে স্থাপন করেন। এ-পর্বের অধিকাংশ গল্পের কাহিনি বিন্যাস বর্ণনাত্মক এবং দীর্ঘ। এ-পর্বে তিনি ছোটগল্পের আখ্যান রচনায়, ঘটনাবিন্যাসে এবং ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে বর্ণনাধর্মী, ঘটনাধর্মী, প্রতীকী, নাট্যিক, কাব্যিক পরিচর্যা, আত্মজৈবনিক এবং ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতির সার্থক প্রয়োগ করেছেন। এছাড়াও তিনি কিছু গল্পে স্মৃতিকে গল্পের কাহিনি বিন্যাসে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন। শওকত ওসমানের ব্রিটিশ কালপর্বের রচনাসমূহের শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রফিকউল্লাহ খান উল্লেখ করেছেন :

> প্রথম পর্বের রচনাসমূহের বিষয় ও শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য সন্ধান করলে দেখা যাবে জীবনের সমগ্রতায় বিশ্বাস, সামন্ত জীবনমূল্যমান অতিক্রমের আন্তরিক প্রচেষ্টা, বুর্জোয়া জীবনচিন্তা-তথা স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে আস্থা, সামাজিক দায়িত্বচেতনা, ভিক্টোরীয় প্রকরণরীতি অনুসরণ– এবং-অবলোকনে এর প্রয়োগ শওকত ওসমানের জীবননীতি ও শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য। (রফিকউল্লাহ, ২০০৭ : ১৭২-১৭৩)

তাঁর এ-পর্বের অধিকাংশ গল্পের কাহিনি-বিন্যাস কালানুক্রমিক এবং ঘটনাক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে গতি লাভ করেছে। যেমন 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস' (wcRiv‡cvj) গল্পে গল্পকার দিন-মাস-বছর ধরে ধরে গল্পের জাল বিস্তার করেছেন। এ-গল্পের প্রধান চরিত্র ডেপুটি মুস্তাফিজের লিখিত ডায়েরির দুশো পৃষ্ঠার বর্ণনা থেকে গল্পের কালানুক্রমিক সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ডায়েরিতে উল্লিখিত ২৬শে জানুয়ারি রাত দশটা, ২৭শে জানুয়ারি রাত, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ৬ই ফেব্রুয়ারি, ৯ই ফেব্রুয়ারি, ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে পরবর্তী এক বছরের ধারাবাহিক বর্ণনা গল্পে উপস্থাপিত। এ-ধরনের বৈশিষ্ট্যে বিচার্য গল্পের মধ্যে 'ইলেম' (wcRiv‡cvj), 'সাদা ইমারত' (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí), 'নতুন জন্ম' (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí), 'সে কিরূপে স্বর্গে গেল' (mv‡eK Kwnbx), 'বিবেক' (mv‡eK Kwnbx), 'শেখ্‌জী' (weMZ Kv‡ji Mí), 'মূল্যদান' (weMZ Kv‡ji Mí) উল্লেখযোগ্য।

গল্পের অনুচ্ছেদ পরিকল্পনা শওকত ওসমানের গল্পের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। একটি গল্পকে একাধিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে গল্পের আখ্যানভাগকে এগিয়ে নিয়েছেন, তবে অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে ঘটনার এবং কালের পারম্পার্য রক্ষিত। তবে, এ-জাতীয় গল্পের যে বৈশিষ্ট্য সহজেই

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিগোচর হয় তা হচ্ছে— অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে সময়ের স্পষ্ট উল্লেখ। এ-ধরনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গল্পের মধ্যে 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস' (wcRiv‡cvj) গল্পকে ৬টি, 'সাদা ইমারত' (Rb Avcv I Ab¨vb Mí) গল্পকে ৪টি, 'শেখ্‌জী' (weMZ Kv‡ji Mí) গল্পকে ২টি, 'মূল্যদান' (weMZ Kv‡ji Mí) গল্পকে ২টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে প্লট নির্মিত হয়েছে।

কাহিনির দীর্ঘসূত্রিতা গল্পের একরৈখিকতাকে ব্যাহত না করলেও একঘেয়েমি তৈরি করে। ব্রিটিশ কালপর্বে রচিত wcRiv‡cvj (১৯৫১), Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí (১৯৫১), mv‡eK Kwnbx (১৯৫৩) এবং weMZ Kv‡ji Mí (১৯৮৭) গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পের আয়তনগত বিচারে দীর্ঘ। বর্ণনাত্মক এ-গল্পের বিস্তার দীর্ঘ হলেও একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনায়তন ও জীবনাবেগ রূপায়ণে এ জাতীয় কাহিনি-বিন্যাস লেখকের প্রকরণ-সতর্কতার সাক্ষ্য বহন করে।

গল্পকার উল্লেখ করার মতো কিছু গল্পে প্লট নির্মাণের পূর্বেই তাঁর স্বভাবজাত কিছু বর্ণনা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করেন, যদিও কাহিনির সংক্ষেপায়ন করা চলত সহজেই। এ-জাতীয় গল্পগুলো ঘটনাপ্রধান নয়, কাহিনিপ্রধান। এরূপ বৈশিষ্ট্যে রচিত গল্প পড়তে গিয়ে পাঠকের মধ্যে একঘেয়েমি আসলেও গল্পকার শেষ পর্যন্ত গল্পের আকর্ষণ ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছেন। বিশাল ক্যানভাসের গল্প হলেও কোথাও তা এলিয়ে পড়েনি, বিপন্ন হয়নি গল্পের একমুখী বৈশিষ্ট্য। একটা জটিলতার-আবহ গল্পকে নিয়ে গেছে অনায়াস পরিণতির দিকে। দীর্ঘ অবয়বে যে গল্পগুলোর প্লট গঠিত হয়েছে তার মধ্যে মধ্যে 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস' (wcRiv‡cvj), 'আলিম মুয়াজ্জিন' (wcRiv‡cvj), 'সাদা ইমারত' (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí), 'মো'জেজা' (mv‡eK Kwnbx), 'প্রতীক্ষা' (mv‡eK Kwnbx), 'বিবেক' (mv‡eK Kwnbx), 'শেখ্‌জী' (weMZ Kv‡ji Mí), 'চুহা-চরিত' (weMZ Kv‡ji Mí), 'ব্যবধান' (weMZ Kv‡ji Mí) স্মরণযোগ্য।

শওকত ওসমান এপর্বে সংক্ষিপ্ত পরিসরেও কিছু গল্প রচনা করেছেন। তবে, দীর্ঘ কাহিনিধর্মী গল্প রচনার পরে এ ধরনের গল্পরচনা গল্পকারের 'গ্রন্থিমোচন' হিসেবে কাজ করেছে বলে মনে হয়। তাছাড়া পরবর্তী কালপর্বের গল্পের অবয়বগত স্বল্পতা এ-জাতীয় গল্পশরীরে থাকা অস্বাভাবিক নয়। যে গল্পগুলো এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যে বিচার্য তার মধ্যে অন্যতম 'কাঁথা' (wcRiv‡cvj), 'বকেয়া' (mv‡eK Kwnbx), 'তুচ্ছ স্মৃতি' (mv‡eK Kwnbx), 'দেনা' (mv‡eK Kwnbx) অন্যতম।

শওকত ওসমানের ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পের মধ্যে দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে রচিত গল্পের কাহিনি বিন্যাসের সার্থক রূপায়ণ লক্ষযোগ্য। এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যের আলোকে রচিত গল্পের শুরু এবং শেষটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে গল্পকার তুলে ধরেছেন। এ ধরনের গল্পের প্লটের সংহতি এবং পরিমিতিবোধ নিশ্ছিদ্র, গল্পের আখ্যানভাগ নির্মাণে অতিরিক্ত কোন বর্ণনা বা গাল্পিক পরিচর্যা চোখে পড়ে না— যা গল্পের মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে বাঁধার সৃষ্টি করে। যেমন, 'ভাগাড়' (mv‡eK Kwnbx) গল্পের শুরুটা

হয়েছে এভাবে : "পশুবলি নরবলি আদিম মানুষের ত্রাস ও শঙ্কার আখ্যায়িকা। এবার-কার বকর-ঈদে মনসব আলির কোরবানী দেওয়ার নিয়ত এমনই ভয়প্রসূত, ভক্তি প্রসূত নয়।" (ভাগাড় ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৮৪) এরপর মনসব আলির স্মৃতিকাতরতা, স্মৃতির মধ্যে কালোবাজারি, দুর্ভিক্ষের চিত্র, বুভুক্ষু মানুষদের মধ্যে মাংস বিতরণ এবং ভাতের অভাবে বিতরণকৃত মাংস আবার ভাগাড়ে (রাস্তায়) নিক্ষেপের ঘটনা খুবই দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় :

> তহশীলদার তাকে ভিড়ের বাইরে টেনে আনলো।
> মাথার উপরে পাখনার শাঁই-শাঁই শব্দ আকাশে মুখ তুলে তাকায় মনসব আলী।
> বহু পাখনার শাঁই শাঁই শব্দ আরো একদল শকুন পড়ল ভাগাড়ে। (ভাগাড় ॥ শওকত, ২০০৩ : ১১৯)

এরূপ ছোট ছোট বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে গল্পকার নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে কাহিনি বিন্যাসে গতি সঞ্চার করেছেন। এ-জাতীয় গল্পের মধ্যে 'কাঁথা' (wcRiv‡cvj), 'হুকুম নড়ে না' (mv‡eK Kwnbx) এবং 'চুহা-চরিত' (weMZ Kv‡ji Mí) উল্লেখযোগ্য। তবে, এ ধরনের গল্পের বিন্যাসরীতি নাটকীয়। যেমন 'কাঁথা' গল্পে নাটকীয় এসেছে বরু বিবি কর্তৃক পুরনো কাঁথার মধ্যে একটি নতুন কাঁথা আবিষ্কারের মাধ্যমে। 'হুকুম নড়ে না' গল্পে মন্বন্তরকালে শহর থেকে কন্যাশিশু ক্রয়, আবার পরবর্তীকালে বিয়ের আসরে আজিম মল্লিকের পালিত কন্যা নূর জাহানের প্রকৃত পিতার নাম বলতে না পারায় নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও 'চুহা-চরিত' গল্পে লেখক ইতর প্রাণিকে মানুষের সমান্তরালে ব্যবহার করে নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছেন।

কাহিনি-বর্ণনবিচারে কিছু গল্প অসাধারণ শিল্পরূপ পেয়েছে। এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধারণকারী গল্পে ঘটনার ঘনঘটা গল্পগুলোকে নাটকীয় করে তুলেছে। অবশ্য এর পেছনে আছে কাহিনি বিন্যাসের অভিনবত্ব, উপস্থাপনের নতুনত্ব ও প্রকরণের কঠিন সংযত সৌষ্ঠব। গল্পে সরল বর্ণনার মধ্যে হঠাৎ করে নাটকীয়তা সৃষ্টি করে কাহিনি বিন্যাসে জটিলতা আনয়ন গল্পকারের স্বভাবজাত। যেমন, 'আলিম মুয়াজ্জিন' (wcRiv‡cvj) গল্পে আলিম মুয়াজ্জিনের হঠাৎ পাগল হয়ে যাওয়া, 'কাঁথা' (wcRiv‡cvj) গল্পে ছেঁড়া কাঁথার মধ্য থেকে বরু-বিবির একটি নতুন শাড়ি আবিষ্কার করা, 'নতুন জন্ম' (Rb Avpা I Ab¨vb¨ Mí) গল্পে পুত্র আক্কাসের তিরস্কারের মধ্য দিয়ে পিতার ফরাজ আলির মানসজগতের আমূল পরিবর্তন, 'বকেয়া' (mv‡eK Kwnbx) গল্পে পাঁচুর তিন বছরের মৃত মেয়ে টুনিকে জমিদারের পুকুরে কলা গাছের ভেলায় ভাসতে দেখে দেবীজ্ঞানে উদ্ধার, 'চুহা-চরিত' (weMZ Kv‡ji Mí) গল্পে চুহাদের (ইঁদুর) কথোপকথনে নাটকীয় সংবেদনা বিন্যাস লাভ করেছে।

শওকত ওসমান এ-পর্বে কিছু সংখ্যক গল্পে স্মৃতিকে গল্প-পরিচর্যায় ব্যবহার করেছেন। গল্পে যেখানে স্মৃতিধর্মিতা এসেছে, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই গল্পগুলো হয়ে উঠেছে ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতির আশ্রয়ী। যেমন :

> ছেলেবেলায় অ আ ক খ শেখানোর ভার ছিল তার উপর। ধমক দিত না সে কাউকে, কিন্তু এমন চালে কথা বলত, আমরা ভয়ে চুপ বসে থাকতাম। আবার হাসির পালা শুরু হোলো, কেউ পাল্লা দিতে পারত না জুনু-আপার সঙ্গে। শুধু হাসি নয়, পরিবেশ রচনার কৌশলও ছিল তার অপরূপ। (জুনু আপা ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৩১)

এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গল্পের মধ্যে 'জুনু আপা' (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí), 'মো'জেজা' (mv‡eK Kwnbx), 'দীর্ণ পত্র' (mv‡eK Kwnbx), 'তুচ্ছ স্মৃতি' (mv‡eK Kwnbx) অন্যতম। এগল্পগুলোর শুরুতেই গল্পকার বর্তমান সময়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু লেখক গল্পকে এগিয়ে নিয়েছেন ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতির মাধ্যমে, তবে সেখানে অনিবার্যভাবে স্থান করে নিয়েছে স্মৃতিময়তা।

শওকত ওসমান সমকালীন গল্প বর্ণনার ক্ষেত্রে তথ্যধর্মিতাকে আশ্রয় করেছেন। যেমন, 'চুহা-চরিত' (weMZ Kv‡ji Mí) গল্পে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস পন্থী রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র উন্মোচনে, চল্লিশ দশকের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর এবং দেশবিভাগের চালচিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তথ্যধর্মিতাকে ধারাবাহিকভাবে প্রধান করে তুলেছেন। যেমন :

> দাঙ্গা চলিতে লাগিল। শান্তি কমিটি গজাইতে লাগিল। অনেক লোক চিচিং ফাঁক হইয়া গেল। চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক রবে এক শুভ প্রভাতে বৃটিশের বুটের ধাক্কায় স্বাধীনতার দরজা খুলিয়া গেল। পনরই আগস্ট ১৯৪৭। (চুহা-চরিত ॥ শওকত, ১৯৮৭ : ৫৬)

এখানে স্মর্তব্য যে, প্রহসনধর্মী রচনার প্রধান হাতিয়ার ব্যঙ্গ হলেও আধুনিক ছোটগল্পে তা দুর্লক্ষ্য নয়। ব্যঙ্গ রচনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ব্যক্তি-রাষ্ট্র-সমাজকে সমালোচনার মাধ্যমে শোধন করা। ব্যঙ্গ রচনার অন্তরালে প্রযুক্ত হয় সমকালীন ব্যক্তি-রাষ্ট্র-সমাজের অসংগতিমূলক চিত্র। ব্যঙ্গ রচনা মানুষকে হাসালেও এর অন্তঃস্রোতে প্রবাহিত হয় বিবেকের তাপদাহ, যার আগুনে পুড়ে ব্যক্তি-রাষ্ট্র-সমাজ শুদ্ধতার পথে ধাবিত হয়।

শওকত ওসমান 'চুহা-চরিত' গল্পটি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যঙ্গাত্মক কৌশলকে আশ্রয় করেছেন। যদিও গল্পের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশ-বিভাগের মতো গূঢ়-গভীর বিষয়ের রূপায়ণ ঘটেছে সার্থকভাবে। তারপরেও শুধু লেখকের বর্ণন-কৌশলে গল্পটি শেষ পর্যন্ত একটি সার্থক ব্যঙ্গগল্প হিসেবেই স্বীকৃত। কাহিনি বিন্যাসরীতি সরল বর্ণনা প্রধান হলেও লেখকের সর্বজ্ঞ বিবরণের সঙ্গে ইতরপ্রাণির প্রেক্ষণবিন্দু সমীকৃত হয়ে স্বতন্ত্র পরিচর্যারীতি লাভ করেছে। পরিণতিতে এ গল্পে লেখকের তির্যক দৃষ্টিকোণ ও ব্যঙ্গাত্মক শিল্পরীতিই শানিত হয়ে উঠেছে। এই ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির গভীরে অন্তঃশীলা স্রোতের মতো বহমান গভীর কৌতুক। লেখক গল্পের প্রারম্ভেই নামকরণের ক্ষেত্রে হাস্যরস বা ব্যঙ্গ রসের ছোঁয়া এনেছেন। গল্পের নাম 'চুহা-চরিত'— যার শাব্দিক অর্থ মূষিক বা ইঁদুরের জীবনকথা বা জীবনস্মৃতি। পাঠকের সাথে গল্পকার মূষিকদ্বয়কে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে একটি মূষিককে স্থান দিয়েছেন মুসলিম লীগের এবং

অন্যটিকে কংগ্রেস-এর রাজনৈতিক অফিস কক্ষে। ভারতবর্ষের দুই রাজনৈতিক দলের অফিস কক্ষে অবস্থান করে মূষিকদ্বয় প্রত্যক্ষ করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কথা ও কাজের অসংগতি এবং তাদের গালভরা বুলির অন্তঃসারশূন্যতা। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের এই বৈপরীত্য বা অসংগতিকে লেখক চুহাদের জবানীতে তুলে ধরেছেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। গল্পের শুরুতে লেখক চুহাদের পরিচয় দান করেছেন এভাবে :

> আমি মূষিক-কুলোদ্ভব। প্রাচীন উনিশ শ' সাতচল্লিশ পূর্ব-বাঙালি মূষিক। পেশা উঞ্ছবৃত্তি ও ভাঁড়ার হইতে চুরি।...তিনি ও মূষিক-কুলোদ্ভব। আমাদের অবয়বে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু বড় একটি গরমিল ছিল। দাদার গুম্ফ টিকির উপর আমার থুৎনীর উপর। (শওকত, ১৯৮৭ : ২৮-২৯)

মূষিকদ্বয়ের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গল্পকার ব্যঙ্গাত্মকভাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের পরিচয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন— যা সহজেই অনুমেয়। শুধু গল্পকারের বর্ণনায় নয়, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আচরণ, কথোপকথন এবং তাদের ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছেদের মধ্যেও গল্পে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন :

> আমার মনিব অহিংসার ভক্ত। তবে মাছ-মাংসে অরুচি নেই।...মনিবের কণ্ঠস্বর ফেনাইয়া উঠিল। ইংরাজী-বাংলা মিশাইয়া পূর্ব্ব-পশ্চিম এক হইয়া গেল। কিপলিং নরক হইতে বোধ হয় চিৎকার করিতে লাগিল। মনিব চিৎকার দিয়া গলা ফাটাইলেন : "উই আর মুসলমান-পৃথিবী জয় করবে।" (শওকত, ১৯৮৭ : ৪১)

গল্পটির পরিণতি বিবেচনায় 'চুহা-চরিত' গল্পকে একটি শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের আখ্যা দেওয়া যায়। গল্প পরিবেশনে লেখকের বিচক্ষণতা এবং Wit ও Humour ব্যবহার গল্পের শরীরে ব্যঙ্গ রসের সৃষ্টি করেছে। গতানুগতিক গল্প রচনার পথ পরিহার করে তিনি মূষিকদ্বয়ের জবানিতে গল্প পরিবেশন করে নতুন পরীক্ষার পথে অগ্রসর হয়েছেন। দুই রাজনৈতিক দলের দুই মনিবের চারিত্রিক অসঙ্গতি গল্পে নবতর আবহ সৃষ্টি করেছে। ফলে বক্ষ্যমাণ গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বিভিন্ন দিক।

গল্পের নামকরণ সাধারণত গল্পের শরীর ও আত্মার সঙ্গে সমন্বিতসূত্রে নিরূপিত হয়। শওকত ওসমানের ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পের নামকরণও গল্পের রক্ত-মাংস-মজ্জা-প্রাণের সম্পর্কে বাঁধা। তাঁর এ-পর্বের গল্পের নামকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য কখনও বক্তব্যধর্মী, কখনও ব্যঞ্জনাধর্মী, আবার কোথাও নিতান্তই সাদামাটা। তবে বক্তব্যধর্মী গল্পগুলোর নামকরণই যথার্থ শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে। এ–ধরনের নামকরণে গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবকেই আঁকড়ে ধরে ঘটনাবিন্যাস এবং চরিত্রসমূহ গতি লাভ করেছে। এপর্বের উল্লেখযোগ্য কিছু গল্পের নামকরণের লক্ষ্য ভাবের অনুগামী হয়েছে। এ-ধরনের গল্পের

মধ্যে 'ইলেম' (wcRiv‡cvj), 'মো'জেজা' (mv‡eK Kwnbx), 'হুকুম নড়ে না' (mv‡eK Kwnbx), 'বিবেক' (mv‡eK Kwnbx), 'ব্যবধান' (weMZ Kv‡ji Mí) উল্লেখযোগ্য।

ব্যঞ্জনাধর্মী গল্পের নামকরণে তিনি চমৎকারিত্ব সৃষ্টির আশ্রয় নিয়েছেন। এ-জাতীয় নামকরণে গল্পের অর্থের দূরতম ব্যঞ্জনা লক্ষ্যযোগ্য। ব্যঞ্জনাধর্মী গল্পগুলোর মধ্যে 'নতুন জন্ম' (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí), 'দীর্ণ পত্র' (mv‡eK Kwnbx), 'বেকেয়া' (mv‡eK Kwnbx), 'মূল্যদান' (weMZ Kv‡ji Mí)। তবে, 'চুহা-চরিত' (weMZ Kv‡ji Mí) গল্পের নামকরণে গল্পকার একইসাথে চমৎকারিত্ব এবং অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন।

এ-পর্বের কিছু গল্পের নামকরণ করা হয়েছে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে। গল্পকার সচেতনতার পরিচয় দেননি। এ-গল্পগুলোতে বাহ্যিক ঘটনাপ্রবাহ কিংবা চরিত্রই মূখ্য হিসেবে আবির্ভূত এবং বক্তব্যের গভীরতা এবং ব্যঞ্জনাধর্মিতা তিরোহিত। এ বৈশিষ্ট্যের আলোকে যে গল্পগুলোর নামকরণ করা হয়েছে তার মধ্যে 'থুতু' (wcRiv‡cvj), 'পিঁজরাপোল' (wcRiv‡cvj), 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস' (wcRiv‡cvj), 'আলিম মুয়াজ্জিন' (wcRiv‡cvj), 'জুনু আপা' (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí), 'সাদা ইমারত' (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí), 'ভাগাড়' (mv‡eK Kwnbx), 'শেখ্জী' (weMZ Kv‡ji Mí) উল্লেখযোগ্য।

'B

শওকত ওসমান ব্রিটিশ কালপর্বে বা বাংলাভাগ পূর্ববর্তী গল্পের ক্যানভাসে মৃত্তিকামূলস্পর্শী মানুষের জীবনের পরিপ্রেক্ষিত, ব্যক্তির স্ফূরণের বহুবর্ণিল চিত্র নানা রঙে এঁকেছেন। শওকত ওসমানের এ-পর্বের গল্পগুলোতে গ্রাম-জীবন-নির্ভর চরিত্রের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে সমাজের নিচুতলার এবং মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কনে এ-পর্বে গল্পকারের নিবিষ্টতা উজ্জ্বলরেখায় প্রতিভাসিত হয়। লেখক এ-পর্বে "সমাজের মাত্রা ও ব্যক্তি মাত্রাকে তিনি অভিন্ন বোধের কেন্দ্রে স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন।" (রফিকউল্লাহ, ২০০৭ : ১৭১)

শওকত ওসমানের ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পগুলোর অধিকাংশ চরিত্র গ্রামীণ নিম্নবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। তবে মধ্যবিত্তের শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য নয়— মানুষ হিসেবে বিচিত্র মনোভঙ্গিই চরিত্রের উপজীব্য। স্বাভাবিক আবেগধর্মিতা এবং দারিদ্র্যের কশাঘাতে গল্পের চরিত্রগুলো পর্যুদস্ত। তাছাড়া এ-জাতীয় চরিত্রগুলোর অবস্থান নাগরিকতার বা আধুনিকতার ছোঁয়া থেকে বেশ দূরে। এ ধরনের চরিত্রের বিকাশে গল্পকার ভিক্টোরীয় রীতি, রোম্যান্টিক দৃষ্টিসুলভ মনোভাব, আবেগীয় পরিচর্যাকেই অনিবার্য করে তুলেছেন। তাছাড়া চরিত্রের অন্তর্জটিলতা অপেক্ষা বাহ্যসংকট-স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং চরিত্রের যদি কিছু গতিসাধিত হয়ে থাকে তা এসেছে কাহিনির প্রয়োজনে— ঘটনার প্রয়োজনে নয়।

প্রথম পর্বে গ্রাম-জীবনাশ্রিত wcRiv‡cvj, Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí, mv‡eK Kwnbx এবং weMZ Kv‡ji Mí গ্রন্থের চরিত্রগুলোও গ্রাম-জীবনাভিমুখী। এ-পর্বের গল্পের অধিকাংশ চরিত্রগুলো একরৈখিক, মীমাংসিত এবং চরিত্রগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলেও তা যেন সুনির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য স্থির। প্রতিটি গ্রন্থের “চরিত্রগুচ্ছ আদর্শায়িত, তত্ত্বাশ্রয়ী, কখনো বা নৈতিক আবেগে প্রাণিত। আদর্শিক অনুভব এবং বাস্তবতার মিশ্র ব্যঞ্জনায় গল্পের চরিত্রগুলো সমাজমানসেরই প্রতীক হয়ে উঠেছে।” (চঞ্চল, ২০০৯ : ৮৪) এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন চরিত্রের মধ্যে ‘থুতু’ (wcRiv‡cvj) গল্পের ফাদার জোহানেস, ‘ইলেম’ (wcRiv‡cvj) গল্পের জহির মিয়া, ‘পিঁজরাপোল’ (wcRiv‡cvj) গল্পের মারু মিয়া, ‘দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস’ (wcRiv‡cvj) গল্পের ডেপুটি মুস্তাফিজ, ‘সে কি রূপে স্বর্গে গেল’ (mv‡eK Kwnbx) গল্পের আবেদালি, ‘শেখ্‌জী’ (weMZ Kv‡ji Mí) গল্পের শেখজী গল্পগুলোর চরিত্র নির্মিত হয়েছে ভিক্টোরীয় আদর্শবাদের উপর ভিত্তি করে। এ সব গল্পের চরিত্রনির্মাণে গল্পকার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

‘থুতু’ (wcRiv‡cvj) গল্পের ফাদার জোহানেস মানবকল্যাণচিন্তায়-ক্ষমায়-ত্যাগে-স্নেহশীলতায়-ধৈর্যে-বিচক্ষণতায় দেবতুল্য যাজক। মূলত ফাদার জোহানেস চরিত্রটি একমুখী, প্রতিকূলতার মধ্যেও মানবকল্যাণচিন্তা তাকে একটি জায়গায় স্থির রেখেছে। তার প্রমাণ “গৃহভৃত্য মনসুর যখন ফাদারের খাবারে যক্ষ্মার বীজাণুযুক্ত থুতু মিশিয়ে দেয় তখনও ফাদার জোহানেসের স্থৈর্য ও মানবিক উদারতা ক্ষুণ্ন হয় না।” (চঞ্চল, ২০১১ : ৭৬) লেখক জানাচ্ছেন :

> ফাদার জোহানেস উঠে পড়েন চেয়ার ছেড়ে। মানবতার আদর্শে বিশ্বাসী, প্রতিহিংসার ছায়া পড়ে না ফাদার জোহানেসের বুকে। (থুতু ॥ শওকত, ২০০৩ : ৮৭))

‘ইলেম’ গল্পের প্রান্তিক চরিত্র জহির মিয়া সামাজিক এবং নৈতিকতার মানদণ্ডে সৃষ্ট। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চরিত্রটির বিভিন্ন প্রান্ত উন্মোচিত। অভাব-অনটনের মধ্যেও জহির মাঝির চরিত্রে কোনো জটিলতার সন্ধান পাওয়া যায় না। বরং আফিম রাখার মিথ্যা অজুহাতে পুলিশের শিক্ষিত কাস্টমস অফিসার পাঁচ টাকা আদায় করলে শিক্ষা এবং শিক্ষিত মানুষের প্রতি ক্ষোভ থেকেই তার মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি। গল্প-কাহিনির অর্ধেক পর্যন্ত জহির মাঝির চরিত্র ফ্লাটধর্মী; কিন্তু পুলিশের হাতে নির্যাতিত হওয়ার পরেই চরিত্রটি রাউন্ড চরিত্রে রূপ পরিবর্তন করেছে। যেমন :

> জহির মিয়া বলিয়া যায় : পইড়্যা হৈব কি? ইলেম-ইলেমের মার-সুই-বুট পাছায়, ফির গু’স চায়। ইলেমের দরকার নাই। উড্ পড়নের কাম্ নাই। উড্ জলদি।...মুখে তুপ্‌ড়ি ছোটে তার : হালার ইলেম। সুট বুট আর গু’স। (ইলেম ॥ শওকত, ২০০৩ : ৯৪)

মূলত এ চরিত্র নির্মাণের মাধ্যমে গল্পকার শিক্ষা এবং শিক্ষিত মানুষের দৃশ্যমান রূপের পাশে অদৃশ্যমান রূপটিকেও বাস্তবতার নিরিখে তুলে ধরেছেন। তাছাড়া লেখক জহির মাঝির জীবন-প্যাটার্ন উন্মোচনে বর্ণনার সাথে যোগ করেছেন নাটকীয়তা।

'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস' (¶cRiv‡cvj) গল্পের ডেপুটি মোস্তাফিজ চরিত্র পরিকল্পনায় নৈতিক আদর্শ এবং প্রতিবাদের সম্মিলন ঘটেছে। তবে, প্রতিবাদী জীবনচেতনাই চরিত্রটিকে গৌরবান্বিত করেছে। মোস্তাফিজ চরিত্রের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে যে অগ্রগতি লক্ষ করা যায়— তা ফুটিয়ে তুলতে গল্পকার কখনও সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণাশ্রয়ী, আবার কখনও চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করেছেন। এছাড়া পেশাগত দায়িত্বসচেতনতা, মানবিক স্বার্থচিন্তা এবং বাস্তবতার সংমিশ্রণে ডেপুটি মুস্তাফিজ চরিত্রের সৃষ্টি। "ডেপুটির আদর্শিক আবেগ চিত্রণে লেখক পৌনঃপুনিক বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন। চরিত্রটি আবেগাশ্রয়ী এবং সমগ্র গল্পে তার ভাবপ্রবণ প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করা হয়েছে।" (চঞ্চল, ২০১১ : ৭৮) গল্পকার জানাচ্ছেন :

> মুস্তাফিজ অনুভব করে, তার চারপাশে শুধু মানুষ। তাকে ঘিরে উল্লাস-ধ্বনি করে-তাদের মুঠি অন্ন নেই মুখে, পরিচ্ছদ নেই রৌদ্রবৃষ্টিস্নাত দেহে; তবু তাদের পর্বতগ্রাসী প্রাণ-বন্যার শক্তি অপরিসীম যার ঢেউ পৃথিবীর গলিত কুষ্ঠ-রূপ নিশ্চিহ্নে মুছে দেবে একদিন। (দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস ॥ শওকত, ২০০৩ : ৮৭)

শহুরে সভ্যতা বা শিল্পায়নের রাহুগ্রাসে বিপর্যস্ত গ্রামীণ সমাজ-সভ্যতানির্ভর মানুষের পরিণতিকে চিত্রিত করেছেন 'সে কিরূপে স্বর্গে গেল' (mv‡eK Kwnbx) গল্পের বর্গাচাষি আবেদালি চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে। চরিত্রটিকে গল্পকার নিরাসক্ত দৃষ্টির আঁচড়ে অঙ্কন করেছেন। গল্পকারের আন্তরিকতার স্পর্শ চরিত্রটিকে আবেগঘন করে তুলেছে।

অধ্যত্মবাদ, বিশ্বাস এবং নৈতিকতাকে আশ্রয় করেও শওকত ওসমান কিছু চরিত্র নির্মাণ করেছেন, যা ভিক্টোরীয় শিল্পরীতিতে চরিত্র নির্মাণেরই একটি কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। এ-জাতীয় চরিত্রের মধ্যে 'শেখজী' (¶eMZ Kv‡ji Mí) চরিত্র উল্লেখযোগ্য। লেখক সময়ের ব্যবধানের সাথে সাথে শেখ্জী-চরিত্রেরও ক্রমবিকাশ দেখিয়েছেন। শেখজী চরিত্রটি গোড়া থেকেই মীমাংসিত এবং লেখকের জীবনবোধের আদর্শরূপ হিসেবে উপস্থাপিত। অনুমান করা যায়, শেখ্জী চরিত্র অঙ্কনে গল্পকারের ব্যক্তিগত বিশ্বাসেরই ছায়াপাত ঘটেছে— যা শেখ্জীর ভাবনা-চিন্তায় প্রকাশিত :

> তবে, মানুষগুলো ভাল। মনুষ্যত্ব আছে ওদের। বেকায়দায় পড়ে অনেক খারাপ কাজ করে, কিন্তু ঈমান আছে ওদের। এদের ধুলো-কাদা মাখা ছেলেগুলো যদি মানুষ করা যেত ঠিকমত। দুনিয়ার রং ফিরে যেত। (শেখ্জী ॥ শওকত, ১৯৮৭ : ২৮)

কিছু গল্পে গল্পকার পাশাপাশি বিপরীতধর্মী চরিত্রসৃজনে তৎপর ছিলেন– যেমন : ‘থুতু’ (wcRiv‡cvj) গল্পের ফাদার জোহানেস এবং মনসুর, ‘পিঁজরাপোল’ (wcRiv‡cvj) গল্পের মারু মিয়া এবং বাসেদ, ‘দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস’ (wcRiv‡cvj) গল্পের ডেপুটি মোস্তাফিজ এবং জোতদার পুলিন সাহা। এ-সকল চরিত্র নির্মাণে গল্পকারের মূল অভীপ্সা জীবনচেতনার অনুষঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের বিপ্রতীপ অবস্থানকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে শ্রেণি অবস্থানকেও সুস্পষ্ট রূপদান।

‘থুতু’ (wcRiv‡cvj) গল্পের মনসুর, ‘পিঁজরাপোল’ (wcRiv‡cvj) গল্পের বাসেদ চরিত্র সৃষ্টিতে একইসাথে আদর্শবাদ এবং সময়স্রোতে তাদের প্রতিবাদী রূপটি লক্ষ্যযোগ্য। জীবনের সমগ্রতাবোধে সৃষ্ট মনসুর চরিত্রটি শৈশবাবধি দারিদ্র্যের তাপদাহ এবং বঞ্চিতের অন্তর্যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে তার মনিব ফাদার জোহানেসের খাবারে জীবানু প্রয়োগ করে। অন্যদিকে আবাল্য দারিদ্র্যপিষ্ট বাসেদও মনসুরের অনুরূপ কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত গরুর দুধ পান করিয়ে শোষক শ্রেণিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কিন্তু মনসুর এবং বাসেদ উভয়েই প্রতিবাদ বা প্রতিশোধের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর পূর্বেই নিজের অবস্থান থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য হয়। মূলত ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তিক এবং সামষ্টিক আন্দোলনের পরাজিত মূল্যবোধ, বাস্তবসময়জ্ঞানের সমন্বয়ে মনসুর এবং বাসেদ চরিত্র নির্মাণে-পরিণতিতে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

শওকত ওসমান ব্রিটিশ কালপর্বে উল্লেখযোগ্য কিছু গল্পে নারী-চরিত্র নির্মাণেও সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। “পিতৃতান্ত্রিক সমাজগহ্বরে বন্দী নারী অস্তিত্বের ক্রন্দন ও অন্তর্গত রক্তপাত উন্মোচনে শওকত ওসমানের শিল্পীর নিরাসক্তি ও জীবনাসক্তি বিস্ময়কর।” (রফিকউল্লাহ, ২০০৭ : ১৭২) ‘জুনু আপা’ (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপায়ণে গল্পকার সমবায়িতভাবে উত্তম পুরুষ এবং চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন। জুনু আপার চরিত্রটি মূলত তিনটি রেখায় বিন্যস্ত— ক. জসিমের সাথে প্রেম-বিরহ ও ব্যর্থতার চিত্র। খ. অন্যত্র বিয়ে ও বিচ্ছেদ। এবং গ. পঞ্চাশোর্ধ মালেক সাহেবকে বিয়ে করে অবশিষ্ট জীবনের স্বপ্ন রচনা। জুনু আপা চরিত্র নির্মাণে লেখকের চরিত্র সৃষ্টির স্বাভাবিক প্রবণতা অপেক্ষা আরোপিত বৈশিষ্ট্যগুলোই বেশি চোখে পড়ে। জুনু আপার অন্তর্জগতের চিত্র নির্মাণ অপেক্ষা, বাহ্যিক পরিবেশ নির্মাণেই গল্পকারের তৎপরতা স্পষ্ট। পঞ্চাশোর্ধ প্রৌঢ় ব্যক্তিকে বিয়ে করে সুখের বাসর রচনার আকাঙ্ক্ষা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ জুনু আপা চরিত্রের অন্তর্দহনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে :

> অনেক জায়গায় আশ্রয় ছেড়ে এখানেই রয়ে গেলাম চিরজন্মের মতো। শুধু দয়ার বন্ধনের জন্য।... খোদার কাছে মুখ দেখাতে হবে, তাই আত্মহন্ত্রীর সাথেই নিজের জীবনকে বেঁধেছি। আর কি উপায় আছে? (জুনু আপা ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৪১)

‘কাঁথা’ (wcRiv‡cvj) গল্পের বুরুবিবি চরিত্র নির্মাণে গল্পকার অনেকটা নির্লিপ্ততার পরিচয় দিয়েছেন। বরুবিবির সহজাত রসিকতা, কৌতুকবোধ, সন্তানবাৎসল্য দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে খাদ্য

ও বস্ত্রসংকটের মধ্যেও প্রাণাবেগ লাভ করেছে। একজন গার্হস্থ্য নারীর অসীম ধৈর্য, শত কষ্ট-যন্ত্রণার সহিষ্ণুতার প্রতীক হিসেবে বুরুবিবি চরিত্রটি উজ্জ্বল রেখায় উপস্থাপিত।

শওকত ওসমান ‘ব্যবধান’ (weMZ Kv‡ji Mí) গল্পে বিধবা নুরী বিবির চরিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে একজন নারীর বেদনাময়-অবমাননাকর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। নিঃসন্তান ননদকে নিজ পুত্র রাসেদীকে পোষ্য-পুত্র হিসেবে দান করার মধ্যে নুরী বিবির চারিত্রিক দৃঢ়তা যেমন প্রকাশিত, তেমনি পরবর্তীকালে সন্তানকে কোনভাবে সাহায্য করতে না পারার ব্যর্থতাজনিত মাতৃহৃদয়ের হাহাকার গল্পে উপস্থাপিত। ‘ঐশ্বর্যের যক্ষপুরীর মধ্যে নুরী বিবি’র মনোবেদনাকে তুলে ধরতে গিয়ে গল্পকার উত্তম পুরুষের ব্যবহার করেছেন। বিরূপ সময় ও সমাজবন্দি নরনারীর অন্তর্জাগতিক জটিলতা এবং তার অবচেতনা বহুভুজ রহস্যময় প্রবৃত্তির চিত্রণে গল্পকার বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যার আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন :

> কয়েদীর মতো সময় সময় খাবার দিয়ে যায়। হাত-খরচা বলে দুটো পয়সাও দেয় না। ছেলেগুলোকে যেন ভেড়া করে রেখেছে দুই বউ। (ব্যবধান ॥ শওকত, ১৯৮৭ : ৬৮-৬৯)

এ-দেশীয় সমাজ-ব্যবস্থায় নারীমনের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, যন্ত্রণা ও অশ্রুময় আর্তি চিরদিনই যে উপেক্ষিত থেকেছে তা গল্পকার নুরুবিবির চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

গ্রামজীবনের শঠতা, প্রতারণা, ধর্মের নামে ভণ্ডামি, দুর্ভিক্ষ, শোষণ, জমিদারের হৃদয়হীনতা mv‡eK Kwnbx গ্রন্থে বহুমাত্রিকতায় চিত্রিত হয়েছে। ধর্মকেন্দ্রিক চরিত্রনির্মাণে গল্পকার সাবলিল এবং ভাবাবেগহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এ-জাতীয় চরিত্রের মধ্যে ‘মো’জেজা’ (mv‡eK Kwnbx) গল্পের মুস্তাফা খান ও জহুর মিয়া এবং ‘খোওয়াব’ (mv‡eK Kwnbx) গল্পের মৌলানা সাহ্ হরক তুল্লাহ অন্যতম।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং সূক্ষ্মপর্যবেক্ষণশীল লেখক শওকত ওসমানের দৃষ্টিতে ধর্মীয় লেবাসের আড়ালে মানুষের দ্বৈতসত্তার স্বরূপটি সহজেই ধরা পড়ে। ‘মো’জেজা’ (mv‡eK Kwnbx) গল্পে গল্পকার শানিত শ্লেষ এবং বাস্তবতাবোধের সমন্বয়ে ধর্মব্যবসা ও রাজনীতি ব্যবসার সম্পৃক্ততার চিত্র নকলনবীশ মুস্তাফা খান ও মৌলবী জহুর মিয়া চরিত্রের মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন। লেখক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহারে চরিত্র দুটির নানাবিধ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। গল্পের ভাষায় :

> বন্ধুর মুখে দেখিলাম ফরাসী-ছাটাই এক গুচ্ছ শ্মশ্রু। সে-দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া বলিলাম, ওগুলো কী ভোটের আগে আবাদ করেছ?
> বন্ধু জবাব দেওয়ার আগে একচোট হাসিয়া লইলেন।
> -শোনো! কি করা যায়। ভোট সংগ্রহের মতো ন্যাষ্টি জিনিষ আর নেই। করতে হোলো বাধ্য হোয়ে। (মো’জেজা ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৭৪)

মৌলবী জহুর মিয়া চরিত্রটিও সাধারণ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিকশিত হয়েছে। "হঠাৎ করে জহুর পাগলার ওপর জিব্রাইলের ভর এবং রাতারাতি তার ওলিউল্লাহ্‌য় রূপান্তর গ্রামীণ সমাজ-মানসিকতারই প্রতিফলন। শওকত ওসমান পীর চরিত্র-চিত্রণে ব্যবহার করেছেন অশিক্ষিত, ধর্মভীরু, অজ্ঞ গ্রামীণ মানুষের সরল ধর্মবিশ্বাসকে।" (চঞ্চল, ২০১১ : ৭৯-৮০) ধর্মান্ধ সমাজ এবং ব্যক্তিস্বার্থে ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার মুখোশ উন্মোচনে মুস্তাফা খান এবং মৌলবী জহুর মিয়া চরিত্র অঙ্কনে গল্পকারের চরিত্র-নির্মাণ সার্থক হয়েছে।

ব্রিটিশ কালপর্বের শ্রেণিচরিত্র নির্মাণে শওকত ওসমানের বাস্তবদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে মন্বন্তরকালীন বুর্জোয়া-জোতদার-শোষক- চরিত্রগুলো নির্মাণে গল্পকার নিরাসক্ত মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস' (wcRiv‡cvj) গল্পের জলিল তরফদার, 'ভাগাড়' (mv‡eK Kwnbx) গল্পের মনসব আলি চরিত্র নির্মাণে গল্পকার জোতদার এবং শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে তাদের ক্রুর ও অমানবিক রূপকেই বড় করে তুলেছেন। 'ভাগাড়' গল্পে মনসব আলি সামাজিক শোষণ-নীপিড়ন-অত্যাচারের প্রতিনিধি চরিত্র। মূলত অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে এ-চরিত্রটি নির্মিত। গল্পকার প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মনসব চরিত্রের অন্তর্জগত ও বহির্জগত নির্মাণ করেছেন। মনসব চরিত্রের ইতিবৃত্ত অঙ্কনে লেখক ব্যাখ্যাধর্মী বর্ণনার আশ্রয় করেছেন। শওকত ওসমান চরিত্রের মনোজগতে আলো ফেলে চিত্রিত করেছেন মনসব আলির মানসিক জগতকে। লেখক জানাচ্ছেন :

> গ্রামে এলে মনে পড়ে তার কুইনাইন গুদামের কাহিনি। এক পাউণ্ড কুইনাইন সে পাঁচ শ ছ'শ টাকায় বেচেছে। শুধু কুইনাইন? চাল, আটা, চিনি কত রকমের ব্যবসা তার গঞ্জে, শহরে। টাকা লুটেছে সে হাজার, লাখ। লুটের মরশুম আরো কিছুদিন থাকলে হয়ত সে ভয়ের হাঙ্গামা চুকে যেত।...দশ খানা গাঁয়ে সেইত একমাত্র মাথা। (ভাগাড় ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৮৪)

তবে, দুর্ভিক্ষকেন্দ্রিক রচিত গল্পে দুর্ভিক্ষের শিকার চরিত্রের বা প্রান্তিক শ্রেণি চরিত্রের নাম পাওয়া যায় না। হয়ত মন্বন্তরপীড়িত-ছিন্নমূল মানুষগুলোকে নামহীন রেখে তাদের উন্মূলিত হওয়ার বিষয়কেই লেখক প্রাধান্য দিয়েছেন। এ-ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গল্পের মধ্যে 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস' (wcRiv‡cvj), 'ভাগাড়' (mv‡eK Kwnbx), 'চুহা-চরিত' (weMZ Kv‡ji Mí) উল্লেখযোগ্য। গল্পকার শুধু 'বিরাট', 'অগণিত', 'অসংখ্য', 'হাজার হাজার', 'বহু' শব্দের মাধ্যমে এ-চরিত্রগুলোকে তুলে ধরেছেন। এ-জাতীয় শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে শওকত ওসমান সমষ্টির দুর্ভোগকে প্রাধান্য দিয়েছেন, ব্যক্তির দুর্ভোগকে নয়। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> বিরাট মিছিল এগিয়ে আসছে। মানুষের মিছিল? না, মানুষ নয়। নরাকার মানুষের ভগ্নাংশেরা শোভাযাত্রা করে এগিয়ে চলছে। বিকলাঙ্গ, ভগ্নস্বাস্থ্য পাঁজর-নির্গত গ্রামের মানুষ। (দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস ॥ শওকত, ২০০৩ : ১১৩)

অন্যদিকে প্রান্তিক চরিত্রগুলোও এ-পর্বে স্বমহিমায় চিত্রিত। তবে এ-জাতীয় চরিত্রগুলো একরৈখিক। এ-ধরনের চরিত্রের মধ্যে 'কাঁথা' (wcRiv‡cvj) গল্পের লতিফ, 'সাদা ইমারত' (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí) গল্পের কালু মিয়া, 'বকেয়া' (mv‡eK Kwnbx) গল্পের পাঁচু, 'দীর্ণ পত্র' (mv‡eK Kwnbx) গল্পের অন্ধ জমির, 'প্রতীক্ষা' (mv‡eK Kwnbx) গল্পের বাকের অন্যতম। এ-জাতীয় চরিত্র-পরিকল্পনায় গল্পকার সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহারে চরিত্রের স্বরূপকে উন্মোচন করেছেন। যেমন :

> পূর্ব্বে গ্রামে বেশ ছিল জমির। অনেকজন গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে ভিক্ষা বা জীবিকার অন্বেষণে। জমির গাঁ ছেড়ে যায় নি। আজকাল ভারী কষ্টে দিন যায়। জমির এখন তার আত্মীয়ের পরিবারভুক্ত আগাছা। (দীর্ণ পত্র ॥ শওকত, ২০০৩ : ২০০)

'চুহা-চরিত' (wеMZ Kv‡ji Mí) গল্পের চরিত্র-নির্মাণ সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। শওকত ওসমান চুহাকেই (ইঁদুর) চরিত্রের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে উত্তম পুরুষে গল্প-কাহিনি বর্ণনা করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, "শিক্ষা ও আনন্দ এই যুক্তবেণীতেই মানুষের গল্পরচনা আরম্ভ। নীতিগল্পের জন্যে সে প্রধানত আশ্রয় করেছে জীবজন্তুর রূপককে; আর আনন্দের প্রয়োজনে এসেছে রাক্ষস-খোক্কস, অত্যাচারী, বন্য হিংস্র জন্তু অথবা জিঘাংসু সরীসৃপের শত্রুতা, শঠতা ও প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে সুখ সৌভাগ্য লাভের কাহিনি।" (নারায়ণ, ২০০১ : ৩) অবশ্য চরিত্র হিসেবে পশু-পাখির ব্যবহার সুদূর জাতক কাহিনি থেকে। এ সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন : "সমস্ত গল্পের জন্মভূমি ভারতবর্ষ। জাতক, পঞ্চতন্ত্র, বৃহত কথা, দশকুমার চরিতের গৌরবিনী জননী। এইখান থেকে কীভাবে গল্পকথা পৃথিবীতে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছিল, তার প্রামাণ্য ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে গেছেন ম্যাকসমূলার থেকে আরম্ভ করে রবিনসন পর্যন্ত বহু বিশ্রুতকীর্তি পণ্ডিত।" (নারায়ণ, ২০০১ : ১৪) তবে, আলোচ্য গল্পে শওকত ওসমান মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসপন্থী দুটি চুহা-চরিত্র সৃষ্টি করেছেন কোনো আদর্শ প্রচারের জন্য নয়— বরং এ-দুটি চরিত্রসৃষ্টি ও তাদের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে গল্পকার মুসলিম লীগ-কংগ্রেস নেতাদের নীতিহীন-রাজনীতি ও মানবিকতা বিবর্জিত ক্রিয়াকর্ম, ১৯৪৩ এর মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বাংলাভাগের আসন্ন ভাঙনকেই উজ্জ্বল রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পকার মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস-এর লেবাসি এবং স্বার্থবাদী মুখোশ উন্মোচন চুহাদ্বয়কে যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। যেমন : "গান্ধীজী নেংটি পরে। তার তুলনায় এরাতো পোকা-মাকড়। সুতরাং ন্যাংটো থাকা উচিত।" (চুহা-চরিত ॥ শওকত, ১৯৮৭ : ৪১)

তাছাড়া আঞ্চলিক ভাষার বা উপভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগ এ-পর্বের গল্পগুলোকে যেমন বিশিষ্টতা দান করেছে, তেমনি চরিত্রগুলোকে দিয়েছে পৃথক মহিমা। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ভাষা ব্যবহারে বিভিন্ন চরিত্র একটি বিশেষ অঞ্চলের বা বিশেষ পেশার প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র হিসেবে গল্পে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ-জাতীয় চরিত্র নির্মাণে আঞ্চলিক ভাষাই চরিত্রের নিয়ন্ত্রণ শক্তি বা চালিকা শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন 'নতুন জন্ম' (Rb Avcv ও Ab¨vb¨ Mí) গল্পের ফরাজ আলির সংলাপ বা বক্তব্যের মাধ্যমে লেখক তার পেশা এবং অঞ্চলকে চিত্রিত করেছেন। যেমন :

> ফরাজ আলির মুখ বন্ধ হয় না : "দুলা বাইয়ের লগে মসকরা করতাছস? আঁই মরদ। বুজ্‌ছনি হালী? মহাজনের কেরায়া নাউ, নইলে দ্যাহাইতাম হালী নাউ চালান কারে কয়।" (নতুন জন্ম ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৫৫)

এ-ধরনের বৈশিষ্ট্যে বিচার্য চরিত্রের মধ্যে 'থুতু' (wcRi‡cvj) গল্পের মনসুর, 'ইলেম' (wcRi‡cvj) গল্পের জহির মিয়া, 'কাঁথা' (wcRi‡cvj) গল্পে বরুবিবি ও লতিফ, 'গেঁহু' (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí) গল্পের জব্বার উল্লেখযোগ্য।

কোনো "চরিত্রের বিশেষ মানস-পরিস্থিতির উন্মোচনে কিংবা আসন্ন কোন ঘটনার আভাস নির্মাণে প্রকৃতি-আশ্রয়ী পটভূমির ব্যবহার চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের গল্পে প্রথার মতো গৃহীত হয়েছে। এ-জাতীয় পটভূমি-পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার কখনো কখনো গল্পে এনেছে শ্রাব্যকল্পময়তা, চিত্রধর্ম। রেখায়িত প্রকৃতির উপস্থাপনা কাহিনিতে চরিত্রপ্রতিম হয়েছে।" (চঞ্চল, ২০১১ : ১০৮) শওকত ওসমানও তাঁর গল্পে প্রকৃতিকে চরিত্র বিকাশের সহায়ক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি 'ব্যবধান' (weMZ Kv‡ji Mí) গল্পে রাসেদীর অন্তর্বেদনাকে তুলে ধরতে গিয়ে প্রকৃতির ব্যবহার করেছেন। যেমন :

> রাসেদী দহ্‌লিজের মধ্যে একটি কার্পেটের উপর শুইয়া পড়িল। ক্ষুধা-ক্লান্ত শরীরে ঘুমের তীব্রতাও বেশি। দহ্‌লিজের আলো এককোণে মিটমিট করিয়া আলোক বিতরণ করিতেছিল। (ব্যবধান ॥ শওকত, ১৯৮৭ : ৬৮)

নিরীক্ষাধর্মী "পরিব্রাজকের দৃষ্টি দিয়ে শওকত ওসমান মানবজীবন ও সমাজ-চৈতন্যের নানা প্রান্তকে উন্মোচন করার প্রয়াসী। সময়, সমাজ ও ইতিহাসের নিবিড় শুশ্রূষায় তাঁর গল্পের জীবন বিমিশ্র। জীবনের বিচিত্র কল্লোল ও কোলাহলে তাঁর গল্পের মানুষেরা উচ্চকিত।...গ্রামীণ সমাজমূলস্পর্শী মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ তাঁর গল্পে মুখ্য হয়ে উঠেছে। লেখকের গভীর জীবনবোধে চরিত্রগুলো হৃদয়স্পর্শী। বাঙালি জীবনের একান্ত অনুষঙ্গে তাঁর সৃষ্ট মানুষেরা মুখরিত।" (চঞ্চল, ২০১১ : ৭৫-৭৬) শওকত ওসমান ব্রিটিশ কালপর্বে বিভিন্নধর্মী চরিত্র সৃজনের মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনা-পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং সময়ের সাথে পাঠকের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন।

wZb

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এবং সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ একটি বিশেষকালের শিল্পকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট করে তোলে এবং এর মাধ্যমে প্রকাশ পায় একজন লেখকের শিল্পদৃষ্টির বৈশিষ্ট্যসমূহ। ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পে লেখক বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিকোণ ব্যবহারের মাধ্যমে ঘটনা-চরিত্রের অন্তর্বাস্তবতা অপেক্ষা বহির্বাস্তবতা অঙ্কনে বেশি তৎপর ছিলেন।

ছোটগল্পের শিল্পকলার সর্বাপেক্ষা গূঢ় উপাদান হলো দৃষ্টিকোণ বা প্রেক্ষণবিন্দু (Point of view)। অন্যভাবে বলা যায়, ব্যক্তির অস্তিত্ব-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের ক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণের ব্যবহার গল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ রীতি বা অনুষঙ্গ। চরিত্র কিংবা লেখকের সর্বজ্ঞ প্রেক্ষণবিন্দুর কারণে গল্পের আভ্যন্তর পাঠ বিকাশ লাভ করে, উন্মোচিত হয় চরিত্রের প্রচ্ছন্ন মনস্তত্ত্ব। শওকত ওসমান গল্প-প্রকরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ-শিল্পভাবনাকে সর্বতোভাবে ব্যবহার করেছেন। ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পে গ্রামীণ বৃত্তে আবর্তিত জীবন, বাঙালি মুসলিম সমাজ-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংকট, নিম্ন মধ্যবিত্তের আবেগীয় মূল্যবোধ, বুর্জোয়া ও প্রান্তিক চরিত্রের অবস্থান, শ্রেণি-সংঘাত, ধর্মজীবীদের মুখোশ উন্মোচনে শওকত ওসমান সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ (Omniscient point of view), উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ, ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিকোণ (Comedy structure) এবং চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করেছেন।

এখানে উদ্ধারযোগ্য যে, "কাহিনি বিন্যাসে আবেগময় নাটকীয়তা ও ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহার চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের গল্পের মৌল বৈশিষ্ট্য। ফ্ল্যাটধর্মী একাধিক কাহিনির বিন্যাসে স্বভাবতই এই পর্বের লেখকেরা সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের আশ্রয় নিয়েছেন। সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের পাশাপাশি অনেকক্ষেত্রে গল্পকাররা কথক চরিত্রের (Teller character) মাধ্যমে ঘটনা বর্ণনা করেছেন।" (চঞ্চল, ২০১১ : ১০৮-১০৯) কথক চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হওয়ায় কাহিনিতে কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ণনার পাশাপাশি বিশ্লেষণও জায়গা করে নিয়েছে। শওকত ওসমান ব্রিটিশ কালপর্বের অধিকাংশ গল্পে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহারে প্রাণবন্ত। এ-পর্বে যে-সব গল্পে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহার উজ্জ্বল রেখায় প্রতিভাসিত তার মধ্যে 'পিঁজরাপোল' (wcRiv‡cvj), 'আলিম মুয়াজ্জিন' (wcRiv‡cvj), 'সাদা ইমারত' (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí), 'গেঁহু' (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí), 'দুই চোখ কানা' (Rb Avcv Ab¨vb¨ I Mí), 'বকেয়া' (mv‡eK Kwnbx), 'সে কিরূপে স্বর্গে গেল' (mv‡eK Kwnbx), 'হুকুম নড়ে না' (mv‡eK Kwnbx), 'দীর্ণ পত্র' (mv‡eK Kwnbx), 'প্রতীক্ষা' (mv‡eK Kwnbx), 'তুচ্ছস্মৃতি' (mv‡eK Kwnbx), 'দেনা' (mv‡eK Kwnbx) এবং 'ব্যবধান' (weMZ Kv‡ji Mí) গল্প উদ্ধারযোগ্য। তাঁর গল্পে ফ্ল্যাটধর্মী সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহারের নমুনা :

> মাঠে কোথাও-কোথাও ক্ষেত শূন্য। ফসলের মৌসুম শুরু হোয়েছে। পল্লীর কিনারায় খামারে খামারে উঁচু ধানের গাদা। দূর থেকে চাষীদের উঠান আর খামার চিত্রপটের মত স্বপ্নের আবেশ তোলে। শীতঋতুর বিষণ্ন বৈকাল-ছাওয়া বাংলাদেশের গ্রাম। (দেনা ॥ শওকত, ২০০৩ : ২১৩)

শওকত ওসমান এ-কালপর্বে রচিত ২৬টি গল্পের মধ্যে ১৩টি গল্পেই নিখুঁত সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহার করেছেন। গল্পকারের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহারের মাধ্যমে নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনপ্রবাহ, প্রবহমাণ সময়-সমাজ ও ঘটনার বাহ্যিক বিবরণ, বুর্জোয়া-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত-প্রান্তিক মানুষের জীবনপ্যাটার্ন এবং অস্তিত্বসংগ্রামরত মানুষের স্থানিক পরিচয় ফুটে উঠেছে। সরল বর্ণনার পাশাপাশি

গল্পকারের সর্বজ্ঞাশ্রয়ী দৃষ্টিকোণের বহুল ব্যবহার ব্রিটিশ কালপর্বে শওকত ওসমানের প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে।

কাহিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে এ-কালপর্বের কয়েকটি গল্পে লেখক উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণকে আশ্রয় করেছেন। এ-জাতীয় গল্পের মধ্যে 'জুনু আপা' (Rb AvcV I Ab¨vb¨ Mí), 'শেখ্‌জী' (weMZ Kv‡ji Mí) এবং 'চুহা-চরিত' (weMZ Kv‡ji Mí) অন্যতম। উত্তম পুরুষে বর্ণিত গল্পের উদ্ধৃতি :

> জুনু আপার বিয়ের দিন আমি বাড়ী ছিলান না। স্কাউট-ছেলেদের সঙ্গে অনেক দূর বন-ভোজনে বেরিয়েছিলাম। বিয়ের দু'মাস আগেকার কথা, আমার আবছা মনে পড়ে। জুনু আপা আজকাল বড় গম্ভীর। আর আমাদের পড়ার ভার তার উপর নেই। উপর ক্লাসে উঠেছি বছর-বছর। বিদ্যার তরল পারদে আমরা সবাই অতি-মসৃণ শরীর, তাই জুনু আপার হাত থেকে ধীরে ধীরে পিছলে পড়ছি। (জুনু আপা ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৩৩)

উত্তম পুরুষে বর্ণিত গল্পগুলোতে ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ পাওয়া যায়। গল্পকারও এ-পর্বে উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে ঘটনার বাহ্যিক প্রত্যক্ষ-বিবরণ এবং ঘটনা-চরিত্রের অভ্যন্তরীণ সত্যেরও উন্মোচন করেছেন। তাছাড়া এ-পর্বের কিছু গল্পে "লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের সঙ্গে চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দুর সমন্বয়ে বহির্জগৎ হয়ে উঠেছে দৃশ্যমান, রূপময়।" (চঞ্চল, ২০১১ : ১১২) গল্পের আখ্যান রচনা, ঘটনার বিস্তার, চরিত্রের ভাবনা-চিন্তা গল্পকারের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত হলেও চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দুই প্রধান হয়ে উঠেছে। এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যে বিচার্য গল্পের মধ্যে দাতব্য 'চিকিৎসালয়ের ইতিহাস' (wcRiv‡cvj), 'নতুন জন্ম' (Rb AvcV I Ab¨vb¨ Mí) অন্যতম। 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস' গল্পে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের পাশাপাশি ডেপুটি মোস্তাফিজের দৃষ্টিকোণ ব্যবহারে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ এবং স্থানিক পরিবেশকে বাঙ্ময় করে তোলা হয়েছে। আবার 'নতুন জন্ম' গল্পে পুত্র আব্বাস চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে গল্পকার পিতা ফরাজ আলি ভবিষ্যৎ মানস-জগতের পরিণাম নির্দেশ করেছেন। যেমন :

> তারপর জোর-করে রুষ্ট পুত্রকে পাশে বসিয়ে বলে, "বয়। ঠিক কইছস। বিয়ান আইতে দে। আমিও যামু তর লগে। মহাজনের নাউ দিয়া দিমু।" (নতুন জন্ম ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৫৭)

শওকত ওসমানের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের পাশে সংলাপধর্মিতা আশ্রয় নিয়েছেন। কাহিনি-বিন্যাসের বিস্তারে গল্পকার সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের এবং প্লট-এর গতিসাধনে সংলাপধর্মিতাকে উপজীব্য করেছেন। ফলে গল্পের কাহিনি-বিন্যাসে যেমন ফ্লাটধর্মিতা এসেছে, আবার অন্যদিকে চরিত্রের মুখে সংলাপ-সংযোজনের কারণে আখ্যানভাগও হয়ে উঠেছে গতিশীল। এ-ধরনের গল্পের মধ্যে 'থুতু' (wcRiv‡cvj), 'ইলেম' (wcRiv‡cvj), 'কাঁথা' (wcRiv‡cvj), 'ভাগাড়' (mv‡eK Kwnbx), 'খোওয়াব' (mv‡eK Kwnbx) স্মতর্ব্য। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> লতিফ উবু হইয়া বসিয়া হুকাঁ টানিতেছিল। সামান্য খুকখুক্ কাশির পর স্ত্রী বরু-বিবির উপর তার নজর পড়ে।
> -কাইল বন্দরে যাওন দরকার, বরু-বিবি।
> -ক্যান?
> -আলু-বীজ কেনা লাগ্‌ব।
> -অ।
> -কাইল মানুর লগে শুইয়ো।
> মানু ইহাদের বালক পুত্র। অনেক আগেই সে মেঝের এক প্রান্তে নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে। দম্পতির দৃষ্টি তার দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। মানু নির্বিবাদে ঘুমাইতেছে। তার গায়ে কাঁথা নাই। (কাঁথা ॥ শওকত, ২০০৩ : ১১৪)

শওকত ওসমানের গল্পে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিকোণের ব্যবহার একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। তিনি তিন কালপর্বের গল্পরচনায় এ-ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। শওকত ওসমান ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিকোণের ব্যবহারে সমাজের অসঙ্গতি এবং ব্যক্তির অসামঞ্জস্য দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেন। তাছাড়া প্রবহমাণ সময় এবং ঘটনার অন্তঃসত্য আবিষ্কারেও গল্পকার ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিকোণ প্রশংসার যোগ্য। তাঁর ব্রিটিশ কালপর্বের কিছু গল্পে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিকোণের ব্যবহার স্পষ্ট। এ-ধর্মী গল্পের মধ্যে 'আলিম মুয়াজ্জিন' (wcRiv‡cvj), 'দুই চোখ কানা' (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí) এবং 'চুহা-চরিত' (weMZ Kv‡ji Mí) উল্লেখযোগ্য। এখানে উল্লেখ্য, 'চুহা-চরিত' গল্পে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিকোণের ব্যবহারের ফলে পাঠক যেমন একটু বাড়তি আনন্দরস উপভোগ করে, তেমনি গল্পে বাস্তব পরিবেশও মূর্ত হয়ে ওঠে :

> মহকুমা মুসলীম লীগের অফিস। এক কোণে গর্তের ভিতর বিনা ভাড়ায় আমি কয়েক বছর বাস করিতেছি।... আমার বাসার মালিক লীগের লোকাল প্রেসিডেন্ট। স্বামী না হইলেও গৃহস্বামী, এই জন্যে তাহার নাম উচ্চারণ করতে পারিলাম না। বহুদিন তাহার নিমক খাইয়াছি। আজ লবণ-হারামী করিতে চাই না। (চুহা-চরিত ॥ শওকত, ১৯৮৭ : ৩০)

শওকত ওসমানের শিল্পদৃষ্টি ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পে বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যে সিক্ত। এ-পর্বে তিনি ছোটগল্পের আখ্যান রচনায়, ঘটনাবিন্যাসে এবং ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে বর্ণনাধর্মী, ঘটনাধর্মী, প্রতীকী পরিচর্যা, নাট্যিক পরিচর্যা, কাব্যিক পরিচর্যা, আত্মধর্মিতার সার্থক প্রয়োগ করেছেন। এছাড়াও তিনি কিছু গল্পে স্মৃতিকে গল্পের পরিচর্যায় প্রধান করে তুলেছেন। গল্পের পরিচর্যারীতি ভিক্টোরীয় প্রথাগত ফর্মের ব্যবহার হলেও— শওকত ওসমানের গল্পে তা নবমূল্যে উদ্ভাসিত।

শওকত ওসমানের ব্রিটিশ কালপর্বের অধিকাংশ গল্পের পরিচর্যারীতি বিবরণধর্মী (Narrative)। তাই কাহিনি নির্ভর গীতময় বিবরণধর্মী আবেগীয় পরিচর্যা রীতিই ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পে অনিবার্যভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। এ-পর্বের গল্পে বিবরণধর্মিতার প্রতি গল্পকারের আগ্রহ স্পষ্ট। কাহিনি বিন্যাসে, ঘটনা-চরিত্র ও পরিবেশের বাহ্যিক পরিচয় প্রতিপাদনে বর্ণন বৈশিষ্ট্যের সরলীকরণ এ-পর্বের গল্পে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত। তাছাড়া গল্পের দীর্ঘ কাহিনি, দীর্ঘ বাক্য এবং সাধু

গদ্যের ব্যবহার বিবরণধর্মী পরিচর্যারীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। মূলত গ্রামীণ নিস্তরঙ্গ ঘটনাপ্রবাহ, নিম্নবিত্ত-উন্মূলিত-প্রান্তিক মানুষের জীবনকাহিনি উপস্থাপনে লেখক বিবরণধর্মিতাকে পরিচর্যা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এ-পর্বে যে-সব গল্পে বর্ণনাত্মক পরিচর্যার প্রাধান্য লাভ করেছে তার মধ্যে 'থুতু' (wcRiv‡cvj), 'পিঁজরাপোল' (wcRiv‡cvj), 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস' (wcRiv‡cvj), 'আলিম মুয়াজ্জিন' (wcRiv‡cvj), 'সাদা ইমারত' (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí), 'গেঁহু' (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí), 'দুই চোখ কানা' (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí), 'সে কিরূপে স্বর্গে গেল' (mv‡eK Kwnbx), 'খোওয়াব' (mv‡eK Kwnbx), 'প্রতীক্ষা' (mv‡eK Kwnbx), 'বিবেক' (mv‡eK Kwnbx), 'শেখ্‌জী' (weMZ Kv‡ji Mí), 'ব্যবধান' (weMZ Kv‡ji Mí) অন্যতম। ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পে বর্ণনাত্মক পরিচর্যার উদাহরণ :

> ছোট অন্ধকার একটি ঘরে ছেঁড়া কাঁথার উপর বাকের শুইয়া আছে। ম্যালেরিয়া জ্বরে ছ'মাস সে ভুগিতেছে। আজ জ্বর নাই। জ্বর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের নির্যাসটুকু অন্তর্হিত হইয়াছে। হাতী খাওয়া বেলের মত কাঠামো বজায় আছে। আজকাল উঠিবার শক্তিটুকু নাই। (প্রতীক্ষা ॥ শওকত, ২০০৩ : ২০৩)

শওকত ওসমানের ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পগুলোতে কাব্যিক পরিচর্যার (Poetic treatment) বহুবিধ ব্যবহার সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁর গল্পে গীতধর্মী-কাব্যিক পরিচর্যা উপমা-উৎপ্রেক্ষা অলংকার-আশ্রয়ী। ক্ষেত্র বিশেষ জীবন-প্রতিরূপের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে কাব্যিক বর্ণনা। গল্পকারের এ-কাব্যিক পরিচর্যার মধ্যে কবিতার সংক্রমণ লক্ষযোগ্য, তবে এ নিছক কবিত্ব নয়— এর মধ্যে সাংকেতিকতারও প্রকাশ আছে, কখনও তা প্রগাঢ় আবার কখনও সংবেদনস্পর্শী। হয়ত সাহিত্যিক-জীবনের প্রথম দিকের কবিতা রচনার ঝোঁক এ-পর্বের গল্পের পরিচর্যা রীতিতে প্রভাব বিস্তার করা অস্বাভাবিক নয়। তাঁর গল্পে কাব্যিক পরিচর্যার কিছু নমুনা :

> (ক) সূচীভেদ্য অন্ধকার বাইরে পৃথিবীতে। ঘরের জানালা উন্মুক্ত। নিস্প্রভ তারকার ইশারা হারিয়ে যায় বাগানের ওপারে। দূরে পাহাড়তলীর বুকে বনানীর কালো কার্পেট। তারই পটভূমি জুড়ে গীর্জার উত্তুঙ্গ ক্রেস্ট অসীমের ইঙ্গিত করে দূরে বিলীয়মান। (থুতু ॥ শওকত, ২০০৩ : ৮৭)
> (খ) দিগন্তের ঘন অন্ধকারের নিঃশব্দ বিস্তার রাঙা মাটির গিরিশ্রেণীর ধূসর স্তব্ধতায় বিভীষিকার প্রলেপ আঁকিতেছে। পাতলা মেঘরাশি পাহাড়ের শীর্ষে; প্রস্তর ও তরুশ্রেণীর কায়ালোক প্রতিবেশীর মমতাসন্ধানী। চকিত ইশারায় একটি নক্ষত্র অস্তিত্বের পরিচয় দিয়া পুনরায় হাবসী জুলুমের মুখে আত্মসমর্পণ করিল। (ইলেম ॥ শওকত, ২০০৩ : ৮৮)

তবে, এ-পর্বের গল্পে কাব্যিক পরিচর্যার সাথে প্রকৃতি ব্যবহারের একটি যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয়। গল্পের রস-পরিণাম নির্দেশে, কাব্যিক লিরিক সৃষ্টিতে প্রকৃতি আত্মীয়ের মতো পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। জীবনের জটিল-কঠিন-সরল প্রাত্যহিক রূপের প্রকাশার্থেও নান্দনিক ব্যঞ্জনা নিয়ে প্রকৃতি এ-পর্বে আভাসিত। যেমন :

(ক) শান্ত পৃথিবীর ক্রোড়ে প্রাভাতিক ঐক্যতান আরম্ভ হইয়াছে। পাখির ডাক, ছোট ছাগল-ছানার মাতৃ-সম্বোধন, সড়কে খড়ের গাড়ির চাকার আওয়াজ, দূরাগত ট্রেনের হুইসেল, আরো নানা কাকলীর তরঙ্গ। (ব্যবধান ॥ শওকত, ১৯৮৭ : ৫১)
(খ) ঠিকানাহীন আশ্বিনের মেঘ। কালো হোয়ে গেল চতুর্দ্দিক নিমিষে। গোঠের গরু-ছাগল হাম্বা-রব তুলছিল। ঝঞ্ঝার পৃষ্ঠারোহী বৃষ্টির শর বর্ষণ শুরু হোতে পারে, তারই ভয়ে গাছাপালা স্তব্ধ, অকস্মাৎ কেঁপে উঠল। (দীর্ণ পত্র ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৯৭)
(গ) তারপর মাঠের অভিসার দিগন্তের দিকে। ফসল–ভরা প্রান্তরের কোলে ওপারের গাঁ-গুলো রূপ-কথার দেশের মত হাতছানি দেয়। বাতাসে রূপ-সাগরের তরঙ্গ আত্মোৎসর্গের উন্মাদনায় সঙ্গীত-কল্লোল রচনা করে। (দেনা ॥ শওকত, ২০০৩ : ২১৫)

শওকত ওসমানের এ-পর্বের একাধিক গল্পে প্রতীকী পরিচর্যার ব্যবহার লক্ষযোগ্য। গল্পকার “গল্পের মৌলিক বোধ, অভিপ্রায় কিংবা পরিণামী বাস্তবতাকে দ্যোতিত করার তাগিদে প্রতীকতার আশ্রয় নেন।” (চঞ্চল, ২০১১ : ৬২) গল্পকার তাঁর ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পে প্রতীকী পরিচর্যাকে অনেকটা ইঙ্গিতধর্মিতায় পরিণত করে দূরাগত অর্থের হাতছানিকে ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছেন। তাঁর এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যে রচিত গল্পের মধ্যে ‘নতুন জন্ম’ (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí) অন্যতম। এ-গল্পে পুত্র আক্কাসের চিন্তা-ভাবনার কাছে পিতা ফরাজ আলির অসহায়ত্ব এবং পরিণাম নির্দেশক হিসেবে প্রতীকধর্মিতার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। গল্পের পরিণতিতে ‘আঁই তোয়ার পোলা ন’ এবং ‘ভোরের প্রতীক্ষা’ করা শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে পিতা-পুত্রের চিন্তার নবপ্রান্তকে উন্মোচন করা হয়েছে প্রতীকধর্মিতার আবরণে। যেমন :

ফরাজ আলি সস্নেহে তা-কে কাঁথার ভিতর মুড়ি দিয়ে নিতে-নিতে অপরাধীর মত বলে “সরম না করস। আঁই তোয়ার পোলা ন, বা-জান?”
বিবস্ত্র পিতার পাশে গামছা-পরিহিত পুত্র। দুই জনে ভোরের প্রতীক্ষা করে। (নতুন জন্ম ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৫৮)

আবার ‘ভাগাড়’ গল্পেও জনসাধারণের ঐকবদ্ধ হওয়ার সংকেত কিংবা সম্মিলিত প্রতিরোধ, জোতদার মনসব আলির পতনকে লেখক প্রতীকী চিত্রকল্পের সাহায্যে গল্পের পরিণাম নির্দেশ করেছেন। শোষকের বিরুদ্ধে গণমানুষের অভ্যুত্থান চিহ্নিতকরণে লেখক অসামান্য প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন গল্পের শেষ পর্যায়ে। তাছাড়া এ-গল্পে মন্বন্তরপীড়িত মানুষের সমবায়ী প্রচেষ্টার কাছে বুর্জোয়া মনসব আলীর পতনের অনিবার্য পরিণতির ইঙ্গিত আভাসিত প্রতীকী ভাষায় :

মাথার উপরে পাখনার শাঁই-শাঁই শব্দ আকাশে মুখ তুলে তাকায় মনসব আলী।
বহু পাখনার শাঁই-শাঁই শব্দ আরো একদল শকুন পড়ল ভাগাড়ে। (ভাগাড় ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৮৭)

এছাড়া 'ব্যবধান' (wbeMZ Kv‡j i Mí) গল্পে রাসেদীর উপর মাতৃস্নেহের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রতীকী পরিচর্যাকে প্রধান করে তুলেছেন। তিনি ইঙ্গিতধর্মী ব্যঞ্জনাময় ভাষায় রাসেদীর উপর দুই মায়ের অগাধ ভালোবাসাকে দুটি বাক্যের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> সম্মুখে ধূসর প্রভাতের দিগন্ত। তাহারা তিনজন হাঁটিতেছে। আয়াৎ আত্তাহিয়াতোর পর সালাম ফিরাইতেছে যেন রাসেদী। দুই স্কন্ধে-পার্শ্বে দুই জননীর সহিত তাহার চোখাচোখি হইল। (ব্যবধান ॥ শওকত, ১৯৮৭ : ৬৮)

শওকত ওসমানের ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পে ঘটনাধর্মী পরিচর্যা বিশেষভাবে প্রকাশিত। এ-পর্বে ঘটনাধর্মী পরিচর্যা কখনও গল্প-কাহিনিকে আবার কখনও গল্প-চরিত্র-চিত্রকে বাঁক পরিবর্তনে যোগসূত্র স্থাপনে সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ। তবে গল্পে ঘটনাধর্মী পরিচর্যার সাথে নাট্যিক পরিচর্যা একই সম্পর্কসূত্রে গাথা— অনেকটা 'হাত ধরাধরি' করে অবস্থান করার মতো। মূলত গল্পকার নাট্যিক পরিচর্যার মাধ্যমেই গল্পে ঘটনাধর্মিতা আনয়ন করেছেন– এর ফলে গল্পের আখ্যান লাভ করেছে গতি, চরিত্র হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত, পরিবেশ অঙ্কিত হয়েছে সাবলিল ধারায়। যেমন 'ইলেম' (wcRiv‡cvj) গল্পে নদীপথে কাস্টমস পুলিশ কর্তৃক জহির মাঝির গ্রেপ্তার হওয়া, পরে উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে মুক্তি লাভের মধ্যে যেমন নাটকীয়তা বিদ্যমান, তেমনি ইলেমের প্রতি ঘৃণাবোধ থেকে পুত্রের পুস্তক ছেঁড়ার মধ্যেও গল্পে নাটকীয়তা প্রগাঢ় রূপ পেয়েছে। 'বকেয়া' (mv‡eK Kwnbx) গল্পে পাঁচুর মেয়ে টুনির মৃতদেহ কলা গাছের ভেলাতে জমিদারের পুকুরে ভাসানোর মধ্যে যেমন নাটকীয়তা রয়েছে– তেমনি তাকে কলা গাছের ভেলা থেকে উদ্ধার করে দেবীরূপে পূজা-অর্চনার মধ্যে নাটকীয়তা আরও ঘনীভূত হয়েছে। তবে, বিভিন্ন নাটকীয়তার মধ্যে যে-সব গল্পে ঘটনাধর্মিতা প্রধান হয়ে উঠেছে তার মধ্যে 'ভাগাড়' (mv‡eK Kwnbx) এবং 'চুহা-চরিত' (wbeMZ Kv‡j i Mí) অন্যতম।

Pvi

ভাষা ছোটগল্পের শৈলীবিচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। কেননা, গল্পের বিষয় বিন্যাস, চরিত্রায়ণ কৌশল, পরিচর্যারীতিকে স্পষ্ট করে তোলে ভাষা। শওকত ওসমানের ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পের ভাষা বিচারে ছাব্বিশটি গল্পের মধ্যে তেরটি গল্প সাধু ভাষায় এবং তেরটি গল্প চলিত ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। "প্রথম দিকের গ্রামীণ নিস্তরঙ্গ জীবনচেতনায় সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে ভাবের সাধুতা আর গভীরতার সংমিশ্রণ ঘটাতে তিনি সাধুরীতির ব্যবহার করেছেন।" (অনীক, ১৯৯৫ : ২৫২) তাঁর ব্রিটিশ কালপর্বে রচিত যে-সব গল্পে সাধু ভাষার ব্যবহার সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলো 'ইলেম' (wcRiv‡cvj), 'কাঁথা' (wcRiv‡cvj), 'সাদা ইমারত' (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí), 'মো'জেজা' (mv‡eK Kwnbx), Ôবকেয়া' (mv‡eK Kwnbx), 'সে কিরূপে স্বর্গে গেল'

(mv‡eK Kwwnbx), 'হুকুম নড়ে না' (mv‡eK Kwwnbx), 'প্রতীক্ষা' (mv‡eK Kwwnbx), 'বিবেক' (mv‡eK Kwwnbx), 'ব্যবধান' (weMZ Kv‡j Mí) 'শেখজী' (weMZ Kv‡ji Mí), 'চুহা-চরিত' (weMZ Kv‡ji Mí) 'মূল্যদান' (weMZ Kv‡ji Mí) উল্লেখযোগ্য। তবে, তাঁর সাধুগদ্যও চিত্রধর্মী এবং অলঙ্কারমণ্ডিত:

> হাসিনা যেন রহস্যপুরীর দিকে চাহিয়া আছে।...দূরে প্রতীক্ষ-মাণ ইমারত, থমথমে স্তব্ধ রাত্রির প্রাঙ্গণে অভিসারিকা যেন তরুলতার ফাঁক দিয়া হাতছানি দিতেছে। (সাদা ইমারত ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৪২-১৪৩)

কবিতা চর্চার মধ্য দিয়ে শওকত ওসমান সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন এবং এ-কবিতা রচনার অনিবার্য প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর ছোটগল্পের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে। ভাষা ব্যবহারের কারুকার্য প্রবহমাণ নদীর মতো স্বাভাবিক ছন্দে এগিয়ে গেছে। শওকত ওসমান সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে এবং তাঁর সমগ্র সাহিত্যিকজীবনে যে কবিতা রচনার প্রতি একটি স্বাভাবিক আগ্রহ বজায় ছিল তা এ-গল্পের ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। ভাষাকে বিভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করে গল্পকার চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন। ভাষা ব্যবহারের নমুনা :

> (ক) আমার অস্তিত্ব মেঘলা অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। (শেখ্জী ॥ শওকত, ১৯৮৭ : ১২))
> (খ) বাতাসের মৃদু ঝাপটা এতক্ষণ যেন আত্মগোপন করিয়াছিল। (ব্যবধান ॥ শওকত, ১৯৮৭ : ১৯)
> (গ) মেঘের বুকে যেন হাজার ফাটল দেখা দিয়েছে। (মূল্যদান ॥ শওকত, ১৯৮৭ : ২২)
> (ঘ) আম্র-বীথির উপর দিয়ে চন্দ্রিকার জোয়ার চল্ছে। নিচে আদিম প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার। ঝিল্লী-স্বরে রাত্রির পেয়ালা শুধু ভরে ওঠে। (পিঁজরাপোল ॥ শওকত, ২০০৩ : ১০২)

শওকত ওসমান বাল্যকালে গ্রামের মাদ্রাসায় এবং কলকাতায় আলিয়া মাদ্রাসায় স্কুলজীবন অতিবাহিত করার কারণে আরবি ভাষার সঙ্গে পরিচিত হন এবং বেশ কিছু উর্দু, হিন্দি ও ফারসি শব্দ রপ্ত করেন; ফলে তাঁর কিছু কিছু গল্পে এ-সব ভাষার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। শওকত ওসমান একাধিক গল্পে আরবি–ফারসি-হিন্দি ও উর্দু ভাষার ব্যবহার করেছেন কাহিনি কিংবা চরিত্রের প্রয়োজনে। "ইসলাম ধর্মের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় তাঁর মননের গভীরে যে প্রভাব বিস্তার করেছে তারই বহিঃপ্রকাশ রূপে তাঁর গল্প-উপন্যাসে ধর্মীয় শব্দসমূহের এমন স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।" (আজহার, ১৯৯৬ : ১০৬) তাছাড়া "যখন তিনি বিদেশী শব্দ প্রয়োগ করেন— এ কেবল ভাষাকে গহনা পরাবার সখ মেটানো নয়, তীব্র প্রতিক্রিয়াকে শানিত করে বলাই এ ধরনের শব্দ ব্যবহারের একমাত্র লক্ষ্য।" (আখতারুজ্জামান, ১৯৯১ : ১১২) এ-জাতীয় ভাষা ব্যবহার একদিকে গল্পের প্লট গঠনে যেমন সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে, অন্যদিকে কাহিনি-চরিত্র অপেক্ষা এ-ধরনের ভাষা ব্যবহার হয়ে উঠেছে গল্পের নিয়ন্ত্রক শক্তি। যেমন :

> (ক) তোম মেরা খানামে থুক দেতা?

–কভি কভি ফাদার।
–কিউ এয়সা কাম কাম করতা?
– মেরা বহেন কো আপনে দেখা। বেগায়ের খানা মেরা দেশকা বহুৎ আদমী– মেরা মা। (থুতু ॥ শওকত, ২০০৩ : ৮৭)
(খ) সরকার কা পয়সা খাই হো, না কাম কারি হো?
–বড়ো মিয়া সরকার কোন্? খানে দেতা হ্যায়? বিশ রুপেয়া মে জরু-বাচ্চা খা সাক্তা হ্যায়? জেয়সা পয়সা ঐসা কাম। (পিঁজরাপোল ॥ শওকত, ২০০৩ : ৯৬)
(গ) আরে ও ভি জায়েগা। চৌধুরী ফৌধুরী। সব-সাব জায়েগা। এক ভি নেহি রহেগা।
হাতের পেশী ফুলিয়ে সদম্ভে সে চিৎকার করে, "দেখো, হামলোগ হ্যায় আওর রহেঙ্গে, আলবৎ আলবৎ...হামলোগ যো আপনা সে খাতে পিতে...আওর কুই নেহি রহেগা।" (দুই চোখ কানা ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৭০)
(ঘ) এই বুড়ঢী, তোম খরিদে-গা? পয়সা দেনে সাকে-গা?
সলজ্জ কণ্ঠে বুড়ি জবাব দেয় : আর বছর।
তব নেহি বেচে-গা। (দেনা ॥ শওকত, ২০০৩ : ২১৫)

আঞ্চলিক ভাষার বহুল ব্যবহার এ-কালপর্বের গল্পের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। এ ভাষার অনুষঙ্গেই বাস্তবঘনিষ্ঠ প্রাকৃত রূপ নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গল্প-শরীর। আঞ্চলিক ভাষার বা উপভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগ এ-পর্বের গল্পের চরিত্রগুলোকে পৃথক মহিমা দান করার সাথে সাথে গল্পগুলোকেও বিশিষ্টতা অর্জনে সাহায্য করেছে। "কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যজীবনে উপভাষার ব্যবহার তাঁর রচনায় লক্ষ করা যায় না। পূর্ব বঙ্গে আসবার পর থেকে গল্প-উপন্যাসের কথোপকথনে তিনি বরাবর পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন।" (অনীক, ১৯৯৫ : ২৫২) তাঁর যে-সব গল্পে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার সহজেই দৃষ্টিগোচর হয় তার মধ্যে 'ইলেম' (wcRiv‡cvj), 'কাঁথা' (wcRiv‡cvj), 'নতুন জন্ম' (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí), 'ভাগাড়' (mv‡eK Kwnbx) উল্লেখযোগ্য। এপর্বের গল্পে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের কিছু নমুনা :

(ক) –বা'লো হয়ি বইয়ো, মিয়া। পানির মদ্দি যাআঁর চাউ নঅ?
...আঁঅর মন আছে? ইডা কি কও, মিয়াঁ? হফ্তা পারায়। গ'রৎ এক্গুয়া চৈল ন আছিল। (ইলেম ॥ শওকত, ২০০৩ : ৮৮)
(খ) হ্যালার কবাল দ্যাহো। একডা পোলা, তারও গায় কাঁথা জোড়ে না।
...কাইল মুলুবী-সাবে কইমু পানি-দম কইর‍্যা দ্যাওনের জন্নি।
-পানি-দম! উতে প'হা লাগে না। উতে অইব কি, গোরার ডিমা? (কাঁথা ॥ শওকত, ২০০৩ : ১১৫)
(গ) তুমি সুসুঙের বাচ্চা, না মানসের বাচ্চা? নদীর লগে-লগে থাকার চাও, তোয়ার সরম করে না? সুসুঙের বাচ্চার লাহান খালি...। (নতুন জন্ম ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৫৭)
(ঘ) একজন চেঁচিয়ে বলে : হুজুর গুশত খাইতে বা'ত লাগে।
ভাতের প্রয়োজনের উপর অন্য একজন জোর দিল।
হুজুর হফতায় তিন দিন উয়াস (উপবাস) কন গুশতে কি হৈব?... সরম নাই আমাগো। ভিগ মাগ্‌ব। (ভাগাড় ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৮৭)

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে শওকত ওসমান ছিলেন শ্রেণি সচেতন। শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে লেখকের পরিমিতিবোধ ও বাস্তবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের বিষয়ানুগ ভাষা ও সংলাপ রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর এ-পর্বের গল্পে স্পষ্টভাবে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত মানুষের মুখের ভাষা ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য সহজেই পরিলক্ষিত হয়। এজাতীয় ভাষা ব্যবহার একদিকে যেমন শ্রেণিস্তরকে চিহ্নিত করে, তেমনি গল্পের বাস্তবতাবোধের পরিচয়কেও স্পষ্ট করে তোলে।

নিম্নবিত্ত চরিত্রগুলোর মুখে গল্পকার এপর্বে সচেতনভাবে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার দেখিয়েছেন। এ ধরনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভাষা ব্যবহার নিম্নবিত্ত মানুষগুলোর শ্রেণি অবস্থানকে স্পষ্ট করার সাথে সাথে তাদের বাস্তব অবস্থার চিত্রকেও বাঙ্ময় করে। যেমন :

(ক) —বুড়া অইলে আক্কলের মাথা খাইয়্যা বয়ে। কাঁথা ফেইল্যা আইলো। আজ আমাগো পোলা খালি গায় রাত কাডায়। (কাঁথা ॥ শওকত, ২০০৩ : ১১৫)
(খ) ফরাজ আলির এক প্রতিবেশী প্রায় বলত, "চলেন মিয়া যাই, চইল্যা যাই এহান থেইক্যা। (নতুন জন্ম ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৫৪)

সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবহার, ভাষার মধ্যে রোম্যান্টিকতাসুলভ মনোবৃত্তি, বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণ, কখনও কখনও হালকা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মিশ্রিত ভাষার ব্যবহার শওকত ওসমানের ব্রিটিশ কালপর্বের মধ্যবিত্ত শ্রেণি-চরিত্রের ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত :

(ক) সেই রাত্রি আমারও সহজে ঘুম আসে না। জানালার ধারে আপা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে নিশুত রাত। চাঁদ ছিল আকাশে। ঠাণ্ডা নৈশ হাওয়ার অলস সঞ্চরণে বুনো ফুলের গন্ধ জড়িয়ে থাকে। (জুনু আপা ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৩৬)
(খ) বন্ধুর মুখে দেখিলাম ফরাসী-ছাঁটাই এক গুচ্ছ শ্মশ্রু। সে-দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া বলিলাম, ওগুলো কী ভোটের আগেই আবাদ করেছ? (মো'জেজা ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৭৪)

এ-পর্বের গল্পে উচ্চবিত্ত শ্রেণি-চরিত্রের মুখের ভাষা আভিজাত্যপূর্ণ বা গুরুগম্ভীর নয়। এমনকি ভাষার মধ্যে ভাবের গভীরতা তিরোহিত। অধিকাংশ সময় উচ্চবিত্ত শ্রেণিচরিত্র যেমন বৈষয়িক স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা চালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়, অনুরূপ এপর্বের উচ্চবিত্ত শ্রেণি-চরিত্রের ভাষা ব্যবহারের মধ্যেও তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয় :

(ক) জানো ফরাজ আলি, আমাদের আবার ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে দিতে হয়। এই দেয়া নেয়ার খেলা চলছে দুনিয়ায়। দিবে আর নিবে, মিলিবে মিলাবে...। (নতুন জন্ম ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৫৩)
(খ) দেখুন, মুনশী সাহেব, এ কারবার কি আপনি আর দেখতে পারেন? লাখ লাখ টাকার হিসেব। ও জাবদা খাতায় কুলোয় না। আমি মাদ্রাজী এ্যাকাউন্ট্যান্ট ঠিক করেছি। (দুই চোখ কানা ॥ শওকত, ২০০৩ : ২২)

তবে খুব সূক্ষ্মভাবে গল্পের মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ব্যবহার লেখকের ভাষা-ব্যবহারের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত। তবে তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কাউকে কশাঘাত করে না। বরং তা পাঠককে সমাজের অসঙ্গতিগুলোকে বুঝতে বা ধরিয়ে দিতে সাহায্য করে। যেমন :

(ক) কাপড়ের অভাবে বহু মেয়ে আত্মহত্যা করিল।... আমার কর্তা গান্ধীভক্ত। তিনি সমস্ত দেশের লোককে গান্ধী–ভক্ত করিয়া ছাড়িবেন। সেই জন্যই কাপড় গুদামজাত করিয়াছেন।...মানুষের এত কাপড় লাগে নাকি? গান্ধীজী নেংটী পরে। তার তুলনায় এরা ত পোকা-মাকড়। সুতরাং ন্যাংটো থাকা উচিত। (চুহা-চরিত ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪২)

(খ) রাবিদের বয়ান মতে খোদা এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর পাঠিয়েছিলেন। আর এক জনের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে আল্লার শেষ পয়গম্বর হোতেন আমাদের এই মৌলানা। (খোওয়াব ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৯৩)

(গ) আট বছর সে পৃথিবীকে দেখেছিল। তারপর অন্ধ। এক আত্মীয়ের বিবাহে আতস-বাজির কল্যাণে সে দুই চোখ হারায়। (দীর্ণ পত্র ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৯৮)

শওকত ওসমানের ভাষা-ব্যবহারের কুশলতায় গল্পের ভাষা হয়ে উঠেছে অলঙ্কারময়। এপর্বের গল্পে একাধিক ধরনের অলঙ্কারের ব্যবহার চোখে পড়ে। তবে, গল্পকারের অলঙ্কার ব্যবহার কোনো শিল্পকৌশল হিসেবে নয়— গল্পের কাহিনি বা চরিত্রের অনিবার্য প্রয়োজনসূত্রেই অলঙ্কারের সার্থক ব্যবহার করেছেন। তাঁর বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার ব্যবহারের নমুনা উপস্থাপন করা হলো :

Dcgv

(ক) জানালায় নিশ্চল প্রতিমার মত স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বৃদ্ধ শ্রমণকুল-তিলক। (থুতু ॥ শওকত, ২০০৩ : ৮৭)

(খ) তবু অন্ধকারের জনতা গরীব আত্মীয়ের মত মানবিক দম্ভের প্রাসাদ-চত্বরে প্রতীক্ষমান। (ইলেম ॥ শওকত, ২০০৩ : ৮৮)

(গ) নর্তকীর মত ইশারার ঝিলিকের পর মিষ্টি হাসি চেপে মুখের উপর পাৎলা মেঘের ওড়না টেনে নিচ্ছে। (আলিম মুয়াজ্জিন ॥ শওকত, ২০০৩ : ১২৩)

(ঘ) বেড়ার ওপারে তার অভিনন্দনের হাসি বিদ্যুতের মত খেলে যায়। (জুনু আপা ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৩৭)

(ঙ) শ্রাবণের মেদুর আকাশের মত তার মুখে কালো ছায়া। (সাদা ইমারত ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৪৩)

(চ) গেঁছে যাওয়া মদের ফেনার মত চৌধুরী সাহেবের কারবার ফেঁপে উঠল। (দুই চোখ কানা ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৬৮)

(ছ) অন্ধকারে অট্টহাসি পিছলে পড়ে লিকলিকে সাপের মতো। (খোওয়াব ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৬৮)

(জ) ফসল–ভরা প্রান্তরের কোলে ওপারের গাঁ-গুলো রূপ-কথার দেশের মত হাতছানি দেয়। (দেনা ॥ শওকত, ২০০৩ : ২১৫)

Dr‡cÿv I mgv‡mvw³

কবিতার ন্যায় শওকত ওসমান গল্পের পরিচর্যায় সমাসোক্তি এবং উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের ব্যবহার করেছেন। এ-আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহার তাঁর ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত। যেমন :

Dr‡cÿv

(ক) বাইরের আকাশ বাতাস যেন উৎসুক দৃষ্টিতে তার দিকে দৈত্যের মতমুখ-গহবর মেলে চেয়ে আছে। (পিঁজরাপোল ॥ শওকত, ২০০৩ : ১০২)

(খ) কয়েকটা অক্ষরের আঁচড়, শৃঙ্খলের বজ্র যেন। (জুনু আপা ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৩২)

(গ) চেতনা যেন উটের মত ঝড়ো-নিঃশ্বাসের গন্ধ পায়। (জুনু আপা ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৩৪)

(ঘ) দূরে সাদা প্রতীক্ষ-মান ইমারত, থমথমে স্তব্ধ রাত্রির প্রাঙ্গণে অভিসারিকা যেন তরুলতার ফাঁক দিয়া হাতছানি দিতেছে। (সাদা ইমারত ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৪৪)

(ঙ) সরু তরমুজের লতাগুলি রৌদ্রে ধূসর, গোল গোল তরমুজগলি যেন রৌদ্র পোহাইতেছিল। (ব্যবধান ॥ শওকত, ১৯৮৭ : ৫৬)

mgv‡mv³

(ক) নিস্প্রভ তারকার ইশারা হারিয়ে যায় বাগানের ওপারে। (থুতু ॥ শওকত, ২০০৩ : ৮৭)

(খ) রাত্রির কৃষ্ণচ্ছায়া জিভ মেলিতেছে। (ইলেম ॥ শওকত, ২০০৩ : ৮৮)

(গ) গোমতী যেখানে বাইজীর মত কোমর বাঁকায় নৃত্য-ছন্দে। (নতুন জন্ম ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৫৩)

(ঘ) ধূমায়িত মন আগুনের হল্‌কা নিক্ষেপ করে। (দুই চোখ কানা ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৬৭)

(ঙ) বিজলির ঝিলিকে ঝিলিকে যুযুধ-মান বর্ব্বর মেঘ পঙ্গপাল সংহারের নান্দী পুরাণ লিখছে আকাশ চত্বরে। (দীর্ণ পত্র ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৯৭)

(চ) বাতাসে রূপ-সাগরের তরঙ্গ আত্মোৎসর্গের উন্মাদনায় সঙ্গীত-কল্লোল রচনা করে। (দেনা ॥ শওকত, ২০০৩ : ২১৫)

(ছ) খড় বোঝাই কয়েকটি নৌকা কেবল প্রতীক্ষমাণ তখনও। (শেখ্‌জী ॥ শওকত, ১৯৮৭ : ৯)

(জ) পায়ে বৃষ্টির শীকর মাথা কুটিতেছিল। (শেখ্‌জী ॥ শওকত, ১৯৮৭ : ১০)

(ঝ) কালো মেঘ-জালে সূর্যের মৃত্যু-দৃশ্য ঢাকা পড়িয়া থাকিবে। (চুহা-চরিত ॥ শওকত, ১৯৮৭ : ১০)

(ঞ) টিনের দেওয়ালে লেজ ঝাপটায় বাতাস। (ব্যবধান ॥ শওকত, ১৯৮৭ : ১১)

(ট) জলাভূমির চারিদিকে উঁচু বন্যারোধী বাঁধ গ্রাম-বনানীর কোলে আত্মগোপন করিতেছে। (মূল্যদান ॥ শওকত, ১৯৮৭ : ১৬)

শওকত ওসমান প্রকৃত অর্থেই একজন জীবনশিল্পী, আর জীবনশিল্পীর চিন্তার ব্যাকরণের সাথে সম্পর্কিত হয়েই ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে জীবনের নানামাত্রিক রূপ এবং শিল্পাঙ্গিক। জীবনবৈচিত্র্য বা বিষয় নির্বাচনের মতোই এপর্বের গল্পের শিল্পকৌশল সমকালস্থিত। সাহিত্যিক জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে গল্পকার ভিক্টোরীয়রীতি ও আদর্শকে গল্পের রূপকল্প নির্মাণে ব্যবহার করলেও এপর্বেরই শেষপ্রান্তে এসে প্রথাগত শিল্পাঙ্গিক থেকে বেরিয়ে আসার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বর্ণনাত্মক ও নাটকীয় পরিচর্যার সাথে ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতি এবং সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের বহুল

ব্যবহার এপর্বের গল্পে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। এপর্বের গল্পে কোথাও লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণে কাহিনি বিন্যাস ঘটেছে, আবার কোথাও গল্পের কেন্দ্রীয় দৃষ্টিকোণে আবার কোথাও প্রান্তিক চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ব্যবহারের মাধ্যমে গল্পের আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। গল্পের প্রধান প্রধান চরিত্র গ্রামীণ পটভূমিকায় উপস্থাপিত। নানা ধর্ম-বর্ণ-পেশার এবং শোষক ও শোষিতের চরিত্রের কোলাহলে এপর্বের গল্পগুলো আন্দোলিত। কিছু কিছু গল্পের ভাষা ব্যবহারে ব্যঙ্গের ছোঁয়া থাকায় কিছু কিছু চরিত্রও ব্যঙ্গাত্মক হয়ে উঠেছে। সাধু-চলিত, আরবি-ফারসি-উর্দু, আঞ্চলিক এবং কাব্যিক ভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগে এপর্বের গল্পগুলো সিক্ত। মূলত বিশ শতকের তিরিশ-চল্লিশের দশকের সমাজও সময়ের বিসর্পিল বিকাশ, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঘটনাপ্রবাহ, সভ্যতার সঙ্কট ও অন্তঃসারকে স্বীকরণ করে শওকত ওসমানের জীবনবোধ ও শিল্পাদর্শ অর্জন করে এক গৌরবময় ও স্বকীয় মাত্রা।

Mš I ceÜcwÄ

অনীক মাহমুদ (১৯৯৫)। evsjv K_vmwn‡Z¨ kIKZ Imgvb, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৯১)। 'শওকত ওসমানের প্রভাব ও প্রস্তুতি'; wbmM [সম্পা. সরকার আশরাফ] বাণী প্রকাশনী, বগুড়া।

আজহার ইসলাম (১৯৯৬)। evsjv‡'‡ki †QvUMí : welq-fvebv ¯i/c I wkígj¨, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

চঞ্চল কুমার বোস (২০০৯)। evsjv‡'‡ki †QvUM‡íi wkíi/c, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০১১)। evsjv‡'‡ki K_vmwnZ¨ Ges Ab¨vb¨, শব্দকোষ প্রকাশনী, ঢাকা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (২০০১)। mwn‡Z¨ †QvUMí, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা।

রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৭)। evsjv‡'‡ki Dcb¨vm : welq I wkíi/c, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০০৭)। gvB‡Kj iex›'bv_ I Ab¨vb¨, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা।

শওকত ওসমান (১৯৮৭)। weMZ Kv‡ji Mí, বিউটি বুক হাউস, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০০৩)। kIKZ Imgvb MímgM [সম্পা. বুলবন ওসমান], সময় প্রকাশন, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq Aa¨vq
cvwK¯Ívb Kvjce

c_g cwi‡”Q'
cvwK¯Ívb Kvjce : cÂvk I lv‡Ui 'kK
mgKvjxb cwi‡cwÿZ

ivR‰bwZK cwigÐj

ব্রিটিশ শাসন-শোষণের বেড়াজাল ছিন্ন করে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত নামে এ উপমহাদেশে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র ভিত্তিতে হাজার মাইল

ব্যবধানে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমানে পাকিস্তান) নিয়ে সৃষ্টি হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের। সূচনালগ্ন থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশের জনগণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে শোষণের মাধ্যমে এ দেশের মানুষকে বিভিন্নমুখী বৈষম্য এবং নির্যাতনের মুখে ঠেলে দেয়। পাকিস্তান সরকার সুপরিকল্পিতভাবে প্রথম আঘাত করে পূর্ব বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির উপর। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ১৯৪৮ সালেই উর্দুভাষাকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মোহভঙ্গ হয় এবং ভাষার প্রশ্নে সরকারের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। বাঙালি জাতি ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বুকের তাজা রক্ত ঢেলে রাজপথ রঞ্জিত করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মাতৃভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফলেই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে ভাষা ও সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির আত্মজাগরণের সুদৃঢ় ও সুসংবদ্ধ প্রকাশ এবং স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সোপান।

ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে এদেশের মানুষের মধ্যে যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় এদেশের পরবর্তী প্রতিটি সাংস্কৃতিক জাগরণ, স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে। একুশের ভাষা আন্দোলন পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে যে সঞ্জীবনী-শক্তি দান করে, তা থেকে এদেশের মানুষ অধিকার ও রাজনৈতিক সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে পূর্ব-বাংলার জনগণ মুসলিম লীগ সরকারের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে একত্র হয়ে রাজনৈতিকভাবে তাকে মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দলের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে যুক্তফ্রন্ট (১৯৫৩, ৪ ডিসেম্বর)। যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে জহির রায়হান মন্তব্য করেন : "পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকদের দালাল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের ঐক্যজোট যুক্তফ্রন্ট।" (জহির, ২০০৯ : ৫৯) ২১ দফা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষিত হয় এবং ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ২৩৭টি মুসলমান আসনের মধ্যে ২২৩টিতে নির্বাচিত হয়ে সরকার (১৯৫৪, ৩ এপ্রিল) গঠন করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলার জনগণ প্রমাণ করে তারা স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের প্রশ্নে আপসহীন এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বৈষম্য ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন-নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে ঐক্যবদ্ধ। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি বিজয় ছিল মূলত কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির রাজনৈতিক উত্থান।

যুক্তফ্রন্টের বিজয় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে আতঙ্কিত করে তোলে। "শুরু হলো একের পর এক প্রাসাদ-রাজনীতির চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে ভরা অধ্যায়। কী করে বাংলাকে দাবিয়ে রাখা যায়। কী করে

বাঙালিকে শোষণ করা যায়।" (জহির, ২০০৯ : ৫৯) যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পর পূর্ব বাংলায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়, তার মধ্যে চন্দ্রঘোনা কর্ণফুলী পেপার মিলে বাঙালি ও বিহারি শ্রমিকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হকের স্মৃতিঘেরা কলকাতা শহরে সফর (১৯৫৪, ৩০ এপ্রিল) ও সফরকালীন বিভিন্ন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ পশ্চিম পাকিস্তানের বেতার-পত্র-পত্রিকাতে বিকৃতভাবে উপস্থাপন, ২মে কেন্দ্রীয় কারাগারের সম্মুখে স্থানীয় জনগণ ও কারাগার কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ এবং ১৫ মে ঢাকার অদূরে আদমজি পাটকলে বাঙালি ও অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। "এভাবে সরকার গঠনের ৫৬ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ৩০ মে (১৯৫৪) পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২(ক) ধারা বলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত এবং পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন কায়েম করা হয়। ফজলুল হককে পাকিস্তান রাষ্ট্রের একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আখ্যায়িত করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়।" (হারুন, ২০০১ : ১৯৩-১৯৪) যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করেই পাকিস্তান সরকার ক্ষান্ত হয় নি। তারপর এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনকে ঘিরে তারা নানা ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা অব্যাহত রাখে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সৃষ্টি করে হিংসা ও বিভেদের সংকীর্ণতা। প্রকৃতপক্ষে "১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সাল এই চারটি বছর ধরে পাকিস্তানের ইতিহাস হচ্ছে গুটিকয়েক ক্ষমতালিপ্সু, কায়েমি স্বার্থবাদী, আমলা মুৎসুদ্দি, সামন্তপ্রভু, ধনপতি, মদ্যপ বদ্ধোন্মাদ রাজনৈতিক স্বার্থশিকারির প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ইতিহাস।" (জহির, ২০০৯ : ৫৯) কিন্তু শত প্রতিবন্ধকতার পরেও বাংলার মানুষ বিভিন্নভাবে সংগঠিত হওয়ার প্রয়াস অব্যাহত রাখে। ১৯৫৭ সালের ৬-১০ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারিতে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়— যা ইতিহাসে 'কাগমারি সম্মেলন' নামেই পরিচিত। ১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর পাকিস্তানের সেনাবাহিনি প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান রাজনৈতিক দল ও নেতাদের মতপার্থক্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে কৌশলে সামরিক শাসন জারি করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রকে বাতিলের মাধ্যমে আইয়ুব সরকার বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সভা-সমিতি করার অধিকারসহ এক কথায় পূর্ব বাংলার মানুষের সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করে। এ.কে. ফজলুল হককে তাঁর টিকাটুলির বাসায় নজরবন্দি করা হয় এবং মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠনো হয়। কূটকৌশলী আইয়ুব খান ক্ষমতাগ্রহণের অল্পসময়ের ব্যবধানে জনগণের আস্থা অর্জন ও জনসমর্থন লাভের অভিপ্রায়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর ক্ষমতাগ্রহণের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তার নিজস্ব চিন্তাধারা সম্বলিত 'মৌলিক গণতন্ত্র' (Basic Democracy) ঘোষণা করে। যদিও তার এ 'মৌলিক গণতন্ত্র' না ছিল 'মৌলিক' না ছিল 'গণতন্ত্র'। মূলত তার 'মৌলিক গণতন্ত্র' ছিল 'মৌলিক প্রতারণা' এবং উদ্দেশ্য ছিল তার অনুগত রাজনৈতিক আজ্ঞাবহ একটি শ্রেণি সৃষ্টি করা। ১৯৬০ সালের ২৩ মার্চ আইয়ুব খান সামরিক আইন প্রত্যাহার করে একটি শাসনতন্ত্র প্রচলন

এবং পাকিস্তানের রাজধানী করাচি থেকে ইসলামাবাদে স্থানান্তর করেন। অপরদিকে ঢাকাকে নামমাত্র দ্বিতীয় রাজধানীর মর্যাদা প্রদান করা হয়। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধেও পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদ ব্যক্ত হলে পাকিস্তান সরকার দমনমূলক নীতির আশ্রয়গ্রহণ করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেক নেতাকে গ্রেফতারের মাধ্যমে পুনরায় কারাগারে নিক্ষেপ করে। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর নিপীড়ন-নির্যাতন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে তারা পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী, দেশদ্রোহী এবং বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী আখ্যা দিতেও কার্পণ্য করেনি।

পাকিস্তান কালপর্বে ষাটের দশক মূলত রাজনীতির ক্রান্তিকাল হিসেবে বিবেচিত। নিপীড়ন-নির্যাতন-বৈষম্য-গ্রেফতার-ছাত্রআন্দোলন-গণআন্দোলন এ দশকের ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এ দশকেই পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ আইয়ুববিরোধী আন্দোলনকে শেষাবধি গণঅভ্যুত্থানে রূপদান করে। প্রধানত ১৯৫৯ সালের ৫ জানুয়ারি গঠিত শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট, ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি আকস্মিকভাবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতার, ১৯৬২ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের 'মৌলিক গণতন্ত্রে'র ধারণার উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের নতুন শাসনতন্ত্র জারি, ১৯৬২র ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বিদ্রোহ-বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। বাঙালিদের প্রতি শাসকশ্রেণির বৈষম্যমূলক আচরণ, পাকিস্তানের দুই অংশের প্রতি ক্রমবর্ধমান সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক শোষণ পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজকে আরও বেশি ক্ষুব্ধ করে তোলে। তাছাড়া ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলাকে অরক্ষিত এবং নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রাখার জন্য আইয়ুব শাসন বিরোধী ছাত্র আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলের জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তির সনদ 'ছয়দফা' প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিশ্ব ইতিহাসে ফ্রান্সে যেমন ফরাসি বিপ্লব, ইংল্যান্ডে যেমন ম্যাগনাকার্টা গুরুত্বপূর্ণ; বাংলা বা বাঙালির ইতিহাসে 'ছয়দফা' তেমনি অর্থবহ। 'ছয়দফা' ছিল বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তি ও অধিকার আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শেখ মুজিবুর রহমান 'ছয়দফা' কর্মসূচি উত্থাপন করেননিশ্চুপ থাকেন নি, তিনি এ দাবিকে দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে অধিকার বঞ্চিত বাঙালিকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। পূর্ব বাংলায় 'ছয়দফা' আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষের সব ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সঞ্জীবনীশক্তি দান করে। 'ছয়দফা' কর্মসূচির মধ্যেই বাঙালি খুঁজে পায় পশ্চিম পাকিস্তানের শৃংখল থেকে বাঁচার মুক্তির সনদ। 'ছয়দফা' কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বাঙালি আরও বেশি সংগঠিত হয়। ছয়দফাকেন্দ্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে সারা বাংলার মানুষের মধ্যে অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে এক গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। ১৯৬৬ সালের ৮মে শেখ মুজিবুর রহমানসহ ক-জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নেতাকর্মীকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হলে পূর্ব বাংলায় আন্দোলনের বহ্নিশিখা তীব্র আকার ধারণ করে। পাকিস্তান সরকার এ আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে

ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার ধুয়া তুলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৪ জনকে আসামি করে পাকিস্তান সরকার 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে। এরপর শুরু হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে দুর্বার আন্দোলন। শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি এবং পূর্ব বাংলার মানুষের নিপীড়ন-নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। ৮ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থানে নতুন মাত্রাযোগ করে বিরোধী দলগুলোর সমন্বয়ে গড়া 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' বা Democratic Action Committee (DAC)। আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলার প্রাত্যহিক কার্যবিবরণি যতই বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হয়, বাংলার মানুষ ততই বিক্ষুব্ধমূর্তি ধারণ করে। পূর্ব বাংলার জনগণ ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন, পুলিশ, সেনাবাহিনি. ই.পি.আরের বাধা উপেক্ষা করে রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই পটভূমিতে ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্রনেতা আসাদ শহিদ হন এবং ২৪ জানুয়ারি সৃষ্টি হয় গণঅভ্যুত্থান। "২৪ জানুয়ারি পুলিশের বুলেটে নবকুমার ইনস্টিটিউটের দশম শ্রেণির ছাত্র মতিউরের মৃত্যু, ১৫ ফেব্রুয়ারি বন্দী অবস্থায় ঢাকার সেনানিবাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হকের গুলিবদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুবরণ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ই.পি.আরের গুলিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ড. শামসুদ্দোহার শাহাদত বরণ ইত্যাদি মর্মান্তিক ঘটনা সমগ্র পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে।" (হারুন, ২০০১ : ২৭৩-২৭৪) অবশেষে ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান শাসকচক্র শেখ মুজিবুর রহমানকে নিঃশর্ত মুক্তিদান ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্সে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে যে নবচেতনার উন্মেষ ঘটে, তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে। ১৯৭০ সালের ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত[১] নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান অংশের জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। সত্তরের নির্বাচনের ফল মূলত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের শাসন-শোষণ ও অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে এক ঐতিহাসিক রায়। প্রকারান্তরে সত্তরের নির্বাচনের চূড়ান্ত বিজয় বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের পথকে প্রশস্ত করে। এ রায়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র-আমলা-শিল্পপতি-সেনানায়করা শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন অজুহাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে কালক্ষেপণের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রের নতুন জাল বিস্তার করে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পূর্ব বাংলাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য পাকিস্তানি শাসকচক্রের নির্দেশে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনি এদেশের নিরীহ-নিরস্ত্র জনগণের উপর পাশবিক ধ্বংসের উল্লাসে ঝাপিয়ে পড়ে।

A_%bwZK Ae¯'v

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টিতে পূর্ব বাংলার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছিল। নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তির যে স্বপ্ন জেগেছিল তা দ্রুতই ভেঙে যায়। যদিও পূর্ব বাংলায় অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা ছিল অফুরন্ত। পাকিস্তানি কূটকৌশলী শাসকচক্রের হাতে সেই সম্ভাবনার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। পাকিস্তান সরকার এদেশের জনগণকে যেমন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিকভাবে শোষণ করেছিল তেমনি অর্থনৈতিকভাবেও করেছিল বঞ্চিত। "প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের প্রাথমিক যুগের পরিসংখ্যান একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই।" (আকাশ, ১৯৯৩ : ১১১) ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছায়। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাত্র ২৪ বছরের মাথায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের পতনের পিছনে যে কারণগুলো উল্লেখ করা হয় তার মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই পাকিস্তান সরকার সীমাহীন বৈষম্য ও দুর্নীতির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে নব্য উপনিবেশবাদ কায়েম করে। পূর্ববঙ্গের উৎপাদিত কাঁচামালে গড়ে ওঠে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পকারখানা। গুরুত্বপূর্ণ অফিস-আদালত ও প্রশাসনিক কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৪৯-১৯৫০ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাত্রা ছিল ১৯%, ১৯৫৯-১৯৬০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩২%, ১৯৬৪-১৯৬৫ সালে ৪৬% এবং ১৯৬৫-১৯৬৬ সালে উভয় অঞ্চলের মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য ছিল ৫৫%। "১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বেড়েছিল মাত্র শতকরা ০.৪% হারে, যা ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম।" (মমতাজ, ১৯৯৩ : ৫৩২) যদিও পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬ অংশের বাস ছিল পূর্ব বাংলায়, তবুও সবদিক থেকে এদেশের মানুষকে বঞ্চিত করা হতো। ব্যাংক, বীমা, শিল্প, কল-কারখানার মালিকানা সব চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। উভয় অঞ্চলে চাকুরি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও বৈষম্য সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বস্তরে নিযুক্ত কর্মকর্তা- কর্মচারীর শতকরা ৯৬ জন পশ্চিম পাকিস্তানের এবং শতকরা ৪ জন পূর্ব পাকিস্তানের। এভাবে শিক্ষা-শিল্প-কৃষি-ব্যাংক-বীমাসহ সকল সুযোগ সুবিধা থেকে পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করা হয়। পাকিস্তানের মোট রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অবদান ছিল পূর্ব পাকিস্তানের। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বৈদেশিক মুদ্রার বেশিরভাগই ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। উন্নয়ন খাতের ৩০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের এবং ৭০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল। ১৯৫০-এ বিদ্যুৎশক্তি খাতে পশ্চিম পাকিস্তানে অধিক অর্থ বিনিয়োগের ফলে ১৯৫৯-৬০ সালে বিদ্যুতের মাথাপিছু ব্যবহারের পরিমাণ ২৮.৮ কিলোওয়াটে উন্নীত হয়— বিপরীতদিকে একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ স্থির থাকে ১.৬ কিলোওয়াটে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৯-৭০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে জি.ডি.পি-তে শিল্পের প্রবৃদ্ধি ১৬%-এ উন্নীত হয় এবং একই সময়ে পূর্ব বাংলায় তখন শিল্পের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় মাত্র ৮.৯%। "পূর্ব বাংলাকে যে শুধু তার ন্যায্য বৈদেশিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তা নয়, বৈদেশিক সাহায্য বাবদ যে ক্রমবর্ধমান ডেট-সার্ভিসিং-এর বোঝা সমগ্র পাকিস্তানের অর্থনীতির উপর চেপে বসেছিল তার একটা বড় অংশ পূর্ব বাংলার রপ্তানিলব্ধ আয় দিয়েই মেটানো হয়েছে।" (আকাশ, ১৯৯৩ : ১৩৩)

স্বল্পমূল্যে শিল্পকল-কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা প্রদানের প্রধান দপ্তরটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে। এছাড়া যাঁরা ঐ সময়ে প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি ছিলেন, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানির অধিকার শুরুতে শুধু তাঁদেরকেই প্রদান করা হয়েছিল। এসব সুবিধা প্রাপ্তির কারণে শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। এর ফলে পাকিস্তান সরকার দুই অঞ্চলের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে, তাতে পশ্চিম পাকিস্তানে একটি পুঁজিপতি-শিল্পপতি-ব্যাংকার-ধনবান শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এ-শ্রেণিও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধিকাংশ সম্পদ কুক্ষিগত করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিশেষত ধনিকশ্রেণিকে উদ্দেশ্য করে যে অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন করেছিল, তার কুফল প্রতিফলিত হয়েছিল ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক বৈষম্যের মধ্যে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এম.এম. আকাশ এ সম্পর্কে উল্লেখ করেন :

> ১৯৬২ সাল নাগাদ সারা পাকিস্তানে ব্যক্তিমালিকানাধীন ফার্মের অধীনে মোট যত সম্পদ ছিল তার ৭৩ শতাংশ সম্পদও ছিল এই ৪৩টি পরিবারের করায়ত্ত। ম্যানুফেকচারিং খাতে ৭৭ শতাংশ সম্পদ ছিল এই ৪৩টি পরিবারের দখলে। এই ৪৩টি পরিবারের মধ্যে অবশ্য বাঙালি পরিবার ছিল একটি— জনাব এ. কে খানের পরিবার। এই ৪৩টি পরিবার পাকিস্তানের ব্যাঙ্ক ও ইন্সুরেন্সের সিংহভাগ সম্পত্তির মালিক।...৭ জন পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতি সকল ব্যাঙ্ক জামানতের ৬০ শতাংশের মালিক এবং ৪৯ শতাংশ ব্যাঙ্কসম্পদ তাঁদের করায়ত্ত ছিল। পূর্ব বাংলায় যে সব শিল্পপতি ছিলেন তাঁদের মধ্যে বাঙালিদের অধীনে ছিল মোট শিল্পসম্পদের মাত্র ১৮ শতাংশ। পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদের দখলে ছিল ৪৭ শতাংশ এবং রাষ্ট্রের অধীনে ছিল বাকি ৩৫ শতাংশ। (আকাশ, ১৯৯৩ : ১৩২)

তবে, রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও পূর্ব বাংলার অর্থনীতিতে বিকাশের অনিবার্য প্রক্রিয়ায় কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। "শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়েছে, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে, পুঁজির মালিক ক্ষুদ্র একটি শ্রেণী ও ক্রমবর্ধিষ্ণু শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম হয়েছে, শহরের সঙ্গে শহরের, দেশের সঙ্গে বিদেশের সংযোগ ঘটেছে। গ্রাম-সমাজের ভাঙন ও অবক্ষয়ের ফলে মানুষ শহরমুখী হয়েছে। উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটায় শিক্ষিত বেকার ও মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীর উদ্ভব ঘটেছে।" (সাঈদ-উর-রহমান, ২০০১ : ৪) কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থনৈতিক বৈষম্যও তীব্র থেকে তীব্রতর এবং উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জীবন-যাত্রার মানেরও ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। পাকিস্তান সরকার অর্থনৈতিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে পূর্ব বাংলাকে বার বার অনগ্রসর করে রাখার নীতি গ্রহণ করে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও দুই অঞ্চলের মধ্যে পাকিস্তান সরকার বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে। সমগ্র পাকিস্তান কালপর্বেই কৃষি-উৎপাদনের মাথাপিছু লভ্যতা

পূর্ব বাংলায় ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। জহির রায়হান পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান সরকারের অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্যের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য :

> কমার্স ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল বোর্ড। ডেভেলপমেন্ট বোর্ড। সেন্ট্রাল এডুকেশন বোর্ড। তাতে একটিও বাঙালি নেই। সব অবাঙালিদের দিয়ে ভরা। সব বাঙালি অবাক হয়ে দেখলো। যদিও কেন্দ্রীয় পাক সরকারের আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ আসে পূর্ব পাকিস্তান থেকে। তবু। শিক্ষা খাতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্যে ব্যয় করা হলো মাথাপিছু ৪ টাকা ৬ আনা ৩ পাই। আর পূর্ব বাংলার জন্যে মাথাপিছু ১ পাই। শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্যে ৭১ টাকা ৪ আনা ১৫ পাই। আর পূর্ব বাংলার জন্যে মাথাপিছু ৫ টাকা ১২ আনা ৫ পাই। সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য মাথাপিছু ৫ টাকা ২ আনা ৭ পাই। আর পূর্ববঙ্গবাসীদের জন্য মাথাপিছু ৯ আনা ৬ পাই। কী নিদারুণ বৈষম্য। কী ভয়াবহ শোষণ।...ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে বছর মাত্র ৭০ লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে সে বছরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য দেওয়া হয়েছে ৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।... একটি বীমা কোম্পানিও নেই। সব অবাঙালিদের হাতে। আর দেশরক্ষা বিভাগ? শতকরা ৯১.৯ ভাগ অবাঙালি। আর। শতকরা ৮.৯ ভাগ বাঙালি। (জহির, ২০০৯ : ৫৮-৫৯)

সামরিক বাহিনী এবং বেসামরিক প্রশাসনের মূল কর্তৃত্ব পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে ন্যস্ত ছিল। "১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি প্রণীত এক হিসাবে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের সচিবালয়ের উর্ধ্বতন কর্মচারীদের মধ্যে বাঙালিদের অংশ ছিল : পরিকল্পনা বিভাগে ২৩.৭ শতাংশ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিদপ্তরে ২৩.৪ শতাংশ, শিল্প বিভাগে ৩৬.৩ শতাংশ এবং কৃষি বিভাগে ১৪.২ শতাংশ।" (আকাশ, ১৯৯৩ : ১৪২) প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানকে রাখা হয় সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায়। প্রতিরক্ষা বাহিনির ৩টি সদরদপ্তরই পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়। সামরিক বাহিনিতে যোগদানকৃত সদস্যের মধ্যে ১০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের এবং ৯০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের।

পাকিস্তান কালপর্বে অর্থনৈতিক বৈষম্য শুধু ব্যয়-বন্টনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ববাংলার সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে অব্যাহতভাবে পাচার হয়েছে। এসবের মূলে ছিল পাকিস্তান সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট নীতি ও বরাদ্দমূলক সিদ্ধান্তসমূহ। পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙালিরা পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক খাতকেও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করত এবং ব্যবসায়ে অর্জিত লভ্যাংশ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করত। "১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত দুই দশকে মোটসম্পদ পাচারের হিসাব করেছেন পূর্ব বাংলার তদানীন্তন নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদগণ এবং তাঁদের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, এর মোট পরিমাণ ছিল ৩১১২ কোটি টাকা অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছর পূর্ব বাংলার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১০ শতাংশ এসময় পশ্চিমে পাচার হয়ে যাচ্ছিল।" (আকাশ, ১৯৯৩ : ১৪৬) পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলায় তাদের শাসন ও শোষণের মাত্রা যত বৃদ্ধি করেছে বাঙালির প্রতিরোধের সংগ্রামও তত বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগ্রাম একসময় একই স্রোতধারায় মিলিত হয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামকে আরও বেগবান করেছে।

mgvR-ms¯‹…wZ

পাকিস্তান কালপর্বে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। বাঙালি এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে ১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগ বড় ধরনের সংকট সৃষ্টি করে। পাকিস্তানি সরকার বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশের পথকে নানাভাবে ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে এদেশের মানুষ ক্ষণিকের জন্য হলেও ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদে আস্থা স্থাপন করেছিল, কিন্তু বাংলাভাগের পরে খুব দ্রুত সেখান থেকে সরে এসে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদে আস্থা স্থাপন করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। 'এক জাতি, এক ধর্ম, এক সংস্কৃতি, এক ভাষা, এক আদর্শ, এক রাষ্ট্রে'র আওয়াজ তুলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তাদের তৎপরতা ছিল সুদূরপ্রসারী। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংহতি প্রতিষ্ঠার নামে এদেশের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আচরিত মূল্যবোধ বিলুপ্তির অভিপ্রায়ে এখানে উর্দু ভাষা, ইসলামি সাহিত্য, পশ্চিম পাকিস্তানের আচরিত মূল্যবোধ সৃষ্টির জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানোর মানসে বেতার, দূরদর্শন, ডাকঘর, সরকারি পত্র-পত্রিকা এবং তথ্য ও প্রচার বিভাগের অপব্যবহার করেছিল সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে। এছাড়াও পাকিস্তান কাউন্সিল, বাংলা একাডেমীসহ, নজরুল একাডেমী, সরকারি সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকার হীনস্বার্থে ব্যবহার করে।

১৯৪৮ সালে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এসময় পাকিস্তান শাসক চক্র হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তির রেখা দাঁড় করাতে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে ঘোষণা করেন : "আমরা হিন্দু বা মুসলিম যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা-প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।" (আসাদ, ২০০৯ : ২৩৬)

পূর্ব বাংলার ভাষা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, দর্শন থেকে শুরু করে সঙ্গীত পর্যন্ত যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তা স্বতঃসিদ্ধ নিয়মে-প্রকৃতির সংস্পর্শে-স্বভাবের প্রেরণায়-প্রাণধারণের সহজাত প্রবৃত্তি থেকে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার আবহমান বাংলার বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের সম্মিলিত সাধনায় বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য নতুন চক্রান্তে মেতে ওঠে। পাকিস্তানি শাসকচক্র পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ধ্বংস করার জন্য যে অপচেষ্টা চালায় বা পরিকল্পিত সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে লিপ্ত থাকে সে সম্পর্কে আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন :

> অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী চক্র-যার নেতা মার্কিন সরকার-পাকিস্তানকে যেভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল— তেমনি পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির উপর চেপে বসতে চেয়েছিল হিমবাহের মতো। (ফজলুল হক, ২০০৫ : ৩০)

কোনো একটি দেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি রক্ষার প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে সে দেশের মাতৃভাষা। স্ব-ভাষা ধ্বংস হওয়ার অর্থই সে দেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ধ্বংস হওয়া— এ সূত্র ধরেই পাকিস্তানি শাসকচক্র পূর্ব বাংলার শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে অবজ্ঞা করে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করার অপতৎপরতায় লিপ্ত থাকে। “ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার থেকে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্ যে ভাষায় আঘাত দিতে চেষ্টা করেননি, দু’শো বছরের ইংরেজ শাসনে যে ভাষা আক্রান্ত হয় নি— স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরের বছরই সে-ভাষা প্রবলভাবে আক্রান্ত হলো।” (আসাদ, ২০০৯ : ২৩৫) কিন্তু সচেতন বাঙালি সমস্ত ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে ১৯৫২ সালের (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, ৮ ফাল্গুন) ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্বের ইতিহাসে জীবনোৎসর্গের প্রতিদানে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে মাতৃভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। “একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে বিজয়ের, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পথে রক্তলাল তোরণদ্বার। আমাদের জাতির অন্তরে সঞ্চিত অগ্নিপ্রভ স্বদেশপ্রেমের প্রখর জ্বালামুখ, আমাদের জাতীয় অন্তরে সঞ্চিত অমৃতধারার সংলাপিত ঝরনা।” (ছফা, ২০১১ : ৪১) ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালির সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা নবোদ্যাম লাভ করে। এর ফলে একদিকে বাঙালির বাংলা ভাষার যেমন জয় ঘোষিত হয়, অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যেও গতি সঞ্চারিত হয়। নাটক, সংগীত, নৃত্য, চলচ্চিত্র, চিত্রাঙ্কন, কবিতা— সংস্কৃতির এসব শাখাও ধীরে ধীরে গতি ফিরে পায়। পাকিস্তান কালপর্বে অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও bxj‘cY, wmivRD‡Ïšjv, mvRvnvb নাটক বার বার মঞ্চস্থ হয়েছে। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) ১৯৫৩ সালে বন্দি অবস্থায় জেলে বসে রচনা করেন চেতনাসঞ্চারী প্রতিবাদী নাটক ‘কবর’।

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেই (১৯৪৭, জুলাই) আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দীন আহমদ হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশের অনুকরণে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে যে বিতর্ক উস্কে দিয়েছিলেন তা পাকিস্তান কালপর্বে আরও জোরালো রূপলাভ করে। পাকিস্তান সরকার শিক্ষানীতি-শিক্ষাসংস্কারের নামে বাঙালি জাতিকে তার প্রবহমাণ ঐতিহ্যের বন্ধন থেকে, আবহমান সংস্কৃতির শেকড় থেকে উপড়ে ফেলার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কে আহমদ ছফা মন্তব্য করেন :

> পাকিস্তান সরকারের এই নীতির সঙ্গে হিটলারের শিক্ষানীতির তুলনা করা যেতে পারে। নাৎসিরা আর্যামির ধুয়া তুলে দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য এবং শিল্পকলার যা কিছু উগ্র রণংদহি জার্মান জাতীয়তাবাদকে প্রোৎসাহিত করে না সে সকল খারিজ করে দিয়েছিল। তেমনি পাকিস্তানি প্রভুরাও যা কিছু মুসলিম জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের অনুধারণার পরিপন্থী তা সমস্ত বর্জন করার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছিল। (ছফা, ২০১১ : ২৬)

পাকিস্তান সরকার বাঙালির চেতনা থেকে বাংলা বর্ণমালাকে মুছে ফেলার জন্য আরবি হরফে বাংলা বর্ণমালা লেখার প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৪৮ সালে করাচিতে নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলনে পাকিস্তানের শিক্ষাসচিব ফজলুর রহমান বাংলা ভাষার জন্য আরবি হরফের অনুরূপ হরফসৃষ্টির প্রস্তাব করেন। ১৯৪৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় আরবি হরফকে পাকিস্তানের একমাত্র হরফ করার জোর সুপারিশ করা হয়। একই বছরের নভেম্বর মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান আরবি সংঘ' আরবিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করে। ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ পূর্ব বাংলায় ভাষা সংস্কারের জন্য 'পূর্ব বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি' গঠন করা হয়। এ কমিটিও গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে হিন্দুয়ানি ভাষার ভাবধারা থেকে বের করার ধুয়া তুলে মুসলমানি ভাষায় রূপান্তর করার প্রস্তাব উত্থাপন (১৯৫০, ৭ ডিসেম্বর) করে। এ পরিস্থিতিতে ১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলায় আরবি হরফে বাংলা শেখানোর জন্য ২০টি শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রক্তক্ষয়ী ভাষা আন্দোলন নতুন চেতনা সঞ্চার করলেও শাসকচক্র বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেকে সরে যায়নি। ভাষা বিষয়ক ষড়যন্ত্র নতুন মাত্রা পায় ১৯৫৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর। এ সময় আইয়ুব খান পাকিস্তানের সব ভাষাকে রোমান হরফে রূপদানের মাধ্যমে একটি সাধারণ ভাষা সৃষ্টির প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মুহূর্তের মধ্যে এ প্রস্তাবের বিপক্ষে পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৭ সালে (৬-১০ ফেব্রুয়ারি) টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত কাগমারি সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন কারণে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি বহু পণ্ডিত ব্যক্তির উপস্থিতি অনুষ্ঠানের ঔজ্জ্বল্য ছড়ায়। রাজনৈতিক ছদ্মাবরণে এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনায় গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। সম্মেলনে পরিবেশিত হয়েছিল তসর আলীর দল, বান্দুয়ার দল, রংপুরের শিল্পীগোষ্ঠী, আব্বাস উদ্দীন ও তাঁর দল, রেডিও পাকিস্তান, চট্টগ্রাম সাংস্কৃতিক দল ও পশ্চিম পাকিস্তান লোকনৃত্য দলের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং লালন শাহের গান ।

পাকিস্তানি শাসকচক্র পূর্ব বাংলার বা বাংলাভাষী মানুষের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ রবীন্দ্রসাহিত্য, রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশনে এবং রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। 'বাঙালি আদর্শ ও ভাবধারার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়'— এই অজুহাতে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলেই বেতারে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। রবীন্দ্রবিষয়ে বাংলাভাষী বুদ্ধিজীবীগণ এর প্রতিবাদ করলে কিছুসংখ্যক সরকারি অবস্থানের পক্ষ নিলে তাঁরা স্পষ্টত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়েন। শাসকশ্রেণির রবীন্দ্রসাহিত্য ও সংগীত নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান মন্তব্য করেন—

> পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও রাজনৈতিক আক্রমণ চালিয়েছিলেন। রবীন্দ্র সংগীত বন্ধ করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রবীন্দ্রচর্চা খর্ব করা, আমাদের সংস্কৃতির বিলোপ সাধনের পথে তাদের

> একটি প্রধান অস্ত্র। কিন্তু তারা কিছুই করতে পারলেন না। শুধু বাঙালিদের মনে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অধিকতর বিতৃষ্ণার ভাব গড়ে তুললেন। যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কবি হিসেবে বাঙালিদের উৎসাহ-গর্ব ছিল সেই রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম পাকিস্তানিদের অপকৌশলের ফলে বাঙালিদের জাতীয় আদর্শে পরিণত হল। (আলী আহসান, ২০০৯ : ২৯৭)

হাজার বছরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে ঐতিহ্য, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির (১৯১৩) মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষাকে বিশ্বভাষাগোষ্ঠীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া বাংলা ভাষাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করার ক্ষেত্রে বাঙালির কাছে তাঁর মূল্যায়ন স্বীকৃত। তাই পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে বাঙালিকে যত দূরে রাখার অপচেষ্টা চালিয়েছে বাঙালির মধ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যপ্রীতি তত বৃদ্ধি পেয়েছে, তার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় ১৯৬১ সালের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠান পালনের ঘটনায়। "সরকারের ভ্রূকুটি বা গোষ্ঠী বিশেষের প্রচারণা ফলপ্রদ হয় নি। ফালগুন-চৈত্র-বৈশাখ মাসব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে সারা প্রদেশে সেমিনার, সাহিত্য-প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি-সংগীতানুষ্ঠান, গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য-নাটক মঞ্চায়ন চলতে থাকে এবং বহুদিনের জড়তা ও নিস্তব্ধতা কেটে গিয়ে সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রবল প্রাণস্পন্দনের সৃষ্টি হয়। ...বিভিন্ন বক্তা রবীন্দ্রসাহিত্যের সর্বজনীনতা, মুসলমানদের সমস্যা পর্যালোচনায় তাঁর সহানুভূতি এবং তাঁর সাহিত্যে পূর্ববাংলার জনজীবন ও প্রকৃতির অবদান উল্লেখ করেন।" (সাঈদ-উর-রহমান, ২০০১ : ৮১) রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকের পথ ধরেই সৃষ্টি হয় 'ছায়ানট' (১৯৬১) সংগঠন। পরবর্তীকালে 'ছায়ানট' প্রতিষ্ঠানটি পয়লা বৈশাখ, পঁচিশে বৈশাখ, এগারোই জ্যৈষ্ঠ, বাইশে শ্রাবণ, বর্ষা, শরৎ, বসন্ত ঋতুর প্রথম দিন উদযাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতির অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় আইয়ুব খান বিশেষ কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার স্বার্থান্ধ এবং ধর্মান্ধ বুদ্ধিজীবীদের বিরাট এক অংশকে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে ব্যবহার করে এবং এক অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে ভারত থেকে যাবতীয় পুস্তক আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এমনকি এদেশে প্রচলিত ভারতের যাবতীয় পুস্তকের পুনর্মুদ্রণও বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে শাসকচক্র চেয়েছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তকের সাথে পূর্ব বাংলার মানুষের স্থায়ী বিচ্ছেদ ঘটানো। এ উদ্যোগের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ তীব্র আন্দোলন গড়ে তুললেও পাকিস্তান সরকার তা গ্রাহ্য করেনি।

পূর্ব বাংলার সাহিত্যিক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন সময় একত্র হয়ে পাকিস্তান সরকারের সংস্কৃতি বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভা-সম্মেলন অব্যাহত রাখে। মূলত ষাটের দশকে বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলন গণজাগরণের তুঙ্গ-শীর্ষে অবস্থান করে। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, সচেতন ছাত্রসমাজ, নানা শ্রেণি- পেশাজীবী মানুষ সম্মিলিতভাবে আন্দোলনকে আরও বেগবানরূপে প্রবাহিত করে এবং পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার

সংরক্ষণ কমিটি' প্রতিষ্ঠিত করে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা ও সংরক্ষণের সূত্র ধরে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা অধিকতর প্রবল হয়ে ওঠে। এ সময় আফ্রো-এশীয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কাজী নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা নতুন মাদকতার সৃষ্টি করে, সৃষ্টি হয় গণনাটক-গণসংগীত এবং প্রচলন ঘটে পথনাটকের। বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী কবিতাগুলো অনূদিত হয়ে এদেশের সাংস্কৃতিক গণআন্দোলনে উচ্চারিত হতে থাকে। ১৯৭১ সালের ৫ মার্চ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীগণ শহীদ মিনারের পাদদেশে উপস্থিত হয়ে দুঃসময়ে জাতিকে প্রেরণা দেওয়া ও মুক্তির বাণী শোনানোর প্রত্যয়ে আহমদ শরীফের নেতৃত্বে শপথ গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে সাংস্কৃতিক গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানের পথে এগিয়ে চলে।

পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির উপর পাকিস্তানি শাসকচক্রের আগ্রাসন ও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সংস্কৃতিসচেতন বাঙালি জাতি দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে তোলে সাংস্কৃতিক সংগঠন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তমুদ্দন মজলিস (১৯৪৭), সংস্কৃতি সংসদ (১৯৫১), পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (১৯৫২), বুলবুল ললিতকলা একাডেমী (১৯৫৫), পাকিস্তান লেখক সংঘ (১৯৫৯), ছায়ানট (১৯৬১), নজরুল একাডেমী (১৯৬৪) প্রভৃতি। এছাড়াও সারা দেশে সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয় ভাষা- সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সভা-সম্মেলন।

পাকিস্তান কালপর্বে সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সাথে সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন। উল্লেখ্য, বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাঙালির জনসচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাঙালি জাতি চূড়ান্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তি সংগ্রামে।

e¨³-cwi‡ek

বাংলাদেশের সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য অর্জনে ১৯৪৭ সালের বাংলাভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এটা বলা যায় যে, বাংলাভাগের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের লেখকদের স্বতন্ত্র শিল্প ও সাহিত্যচর্চার পথ প্রশস্ত হয়। এ-সম্পর্কে অশ্রুকুমার সিকদারের মূল্যায়নটি প্রণিধানযোগ্য :

> ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানের কাছে দেশ বিভাগের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা। তাদের কাছে এই স্বাধীনতা ছিল দ্বিগুণ স্বাধীনতা; একবার ইংরেজের শাসন থেকে, সঙ্গে সঙ্গে এতদিনকার চেপে বসা হিন্দুদের আধিপত্য থেকে। দেশভাগের ফলে বাঙালি মুসলমান মধ্যশ্রেণীর বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল এবং পূর্ব বাংলায় এই শ্রেণী লাভবান হয়েছিল। আর এই লাভবান মধ্যশ্রেণীর ভিতর থেকেই লেখকেরা উঠে এসেছিলেন। (অশ্রুকুমার, ২০০৯ : ১৯২)

১৯৪৭ সালের বাংলাভাগোত্তর এ ভূখণ্ডের সাহিত্যিকদের মধ্যে শওকত ওসমানের নাম অগ্রগণ্য। লেখক হিসেবে শওকত ওসমানের পরিচিতি বা স্বীকৃতি ঘটে বাংলাভাগের পূর্বেই। কলকাতাকেন্দ্রিক

পরিমণ্ডল তাঁকে লেখক হিসেবে পরিচিতি প্রদান করলেও পরবর্তীকালে তাঁর লেখার পরিপুষ্টিদানে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের পরিবেশই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

শওকত ওসমান ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতা সরকারি কমার্স কলেজ থেকে অপশান দিয়ে চট্টগ্রাম কমার্স কলেজে যোগদান করেন। শওকত ওসমান যেমন ১৯৪৭ পূর্বকালে কলকাতাকেন্দ্রিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করেন, তেমনি চট্টগ্রামে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে উষ্ণ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। তারপর একটানা তিনি চট্টগ্রামে এগার বছর (১৯৪৭-১৯৫৮) কাটিয়েছেন। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রগতিশীল আন্দোলনেও নিবেদিত-প্রাণ ছিলেন। এ সম্পর্কে অনীক মাহমুদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন 'সংস্কৃতির বৈঠক'। এখানে ইবনে গোলাম নবী, গোপাল বিশ্বাস, মাহবুবুল আলম চৌধুরী, কলিম শরাফী প্রমুখ গুণীজনের সঙ্গে শওকতের হৃদতা জন্মে। প্রবীণ সাহিত্যিক মাহবুবুল আলম, ওহীদুল আলমের সঙ্গেও শওকত ওসমানের ভাল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চট্টগ্রামের 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের' ভাইস প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন। পঞ্চাশের দশকের 'রেলওয়ে ইনস্টিটিউট' (পরে ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউট) থেকে প্রকাশিত 'পরিচিতি' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন শওকত ওসমান। (অনীক, ১৯৯৫ : ৪১)

১৯৫০ সালে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় ভয়ংকর দাঙ্গা সংঘটিত হলে তাঁর পরিবারের সবাই চট্টগ্রামে তাঁর সাথে যোগদান করেন। সরকারি বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও তিনি এ সময় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। "১৯৫২ সালের আগস্টে পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কুমিল্লায়। শওকত ওসমান এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে রাজনৈতিক মঞ্চেও শওকত ওসমান আবির্ভূত হন। ১৯৫৭ সালে কাগমারিতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধটি 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' শিরোনামায় উপস্থাপিত হলেও এর ভেতরকার বেশির ভাগ কথাবার্তাই ছিল বাঙালি জাতীয়তা বিকাশের প্রেরণা সঞ্চারক।" (আজাদ, ২০০০ : ৭২)

প্রবহমাণ সমাজকে উপকরণ করে তিনি সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হন। এসময়ে রচিত সাহিত্যে সমকালীন সমাজভাবনাকে তিনি বিভিন্ন রূপাঙ্গিকে তুলে ধরেন। পঞ্চাশের দশকে তিনি একাধিক নাটক রচনা করেন। পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট রূপক নাটক evM'v‡'i Kwe (১৯৫০)-এর মধ্য দিয়ে তিনি সামাজিক অবিচার এবং রাজনৈতিক নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি নিজে সরকারি চাকুরিজীবী হওয়া সত্ত্বেও Avgjvi gvgjv (১৯৫২) নাটকে সরকারি কর্মকর্তাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। তাছাড়া KvKigwb (১৯৫২) নাটকে তিনি সমাজের উপরিতলার মানুষের (বিত্তশালী) জীবনাচরণ তির্যকভঙ্গিতে এবং Rb¨-Rbvš—i (১৯৬০) নাটকে সমাজের অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন।

শওকত ওসমান ১৯৫৮ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ঢাকা কলেজে বদলি হয়ে আসেন এবং ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে আরও বেশি সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি ঢাকা শহরে আসার পর পর-ই রাষ্ট্রীয় বিরূপ পরিবেশের মধ্যে নিপতিত হন। এ সময় জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রকে বাতিল করে বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সভা-সমিতি, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু শিল্পী-সাহিত্যিকগণ এমন বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যেই সাহিত্য-রচনা থেকে দূরে না থেকে নানা রূপক-প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ এবং কৌশলপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শওকত ওসমানও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

আপসহীন, সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতন, ইতিহাস-ঐতিহ্যমনস্ক লেখক হিসেবে শওকত ওসমান বরাবরই ছিলেন ধর্মীয় মৌলবাদ, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, সামাজিক কুসংস্কার এবং সামরিক স্বৈরাচারের তীব্র সমালোচক। সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তিনি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অসারতা প্রমাণ করেছিলেন ইতিহাসের আলোকে। ষাটের দশকে শওকত ওসমান রূপকের ছদ্মাবরণে পাকিস্তান সামরিক শাসকদের ব্যঙ্গ করে রচনা করেন বিখ্যাত µxZ'v‡mi nvwm (১৯৬২) উপন্যাস। অথচ তিনি এ উপন্যাসটির জন্যই ১৯৬২ সালে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন, যা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নিজ হাতে লেখকের হাতে তুলে দেন। তিনি একই সালে ছোটগল্পে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। তিনি পুনরায় কেন্দ্রের শাসনকর্তা আইয়ুব খান এবং পূর্ব বাংলার শাসনকর্তা মোনায়েম খানকে নিয়ে রচনা করেন রূপকাশ্রয়ী †PŠi mwÜ (১৯৬৬) উপন্যাসটি এবং পুনরায় ১৯৬৭ সালে সাহিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ লাভ করেন প্রেসিডেন্টের প্রাইড অব পারফরমেন্স পদক। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাস mgvMg। এ উপন্যাসে তিনি বিভিন্ন মনীষীর (মহাকবি আলাওল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জর্জ বার্নাড শ, রমা রোঁলা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হাজী মুহম্মদ মহসীন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং লিও টলস্টয়) সমাগম ঘটিয়েছেন, যাঁরা সারা জীবন মানবতার জয়গান গেয়েছেন এবং যুদ্ধবিরোধী চেতনায় বিশ্বাস করতেন। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি কলকাতায় থেকে রচনা করেন Rvnvbg nB‡Z we'vq উপন্যাসটি। মূলত এ উপন্যাসটিতে পাকবাহিনি কর্তৃক ধ্বংসযজ্ঞ, গণহত্যা, লুণ্ঠনের চিত্র এবং একই সাথে তাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে সাধারণ মানুষের প্রাণান্তকর ছোটাছুটির কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে।

ষাটের দশকে শওকত ওসমানের একাধিক গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়– তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : c¯Íi djK (১৯৬৪), Dcjÿ¨ (১৯৬৫), †bÎc_ (১৯৬৮), Dfk½ (১৯৬৮)। এ কালপর্বে গল্পের প্রধান বিষয় হিসেবেও তিনি নির্বাচন করেছেন সমকালকে। ফলে সমকালের ব্যক্তি-সমাজ এবং রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নানামাত্রিক জটিলতা, সমাজ-সংস্কৃতির নানাচিত্র এপর্বের গল্পে উঠে এসেছে। এছাড়াও

তিনি এ পর্বে এইচ.জি. ওয়েলস-এর UvBg †gwkb (১৯৫৯), লিও টলস্টয়ের পাঁচটি কাহিনি (১৯৫৯), †¯ú‡bi †QvUM í (১৯৬৫), gwj‡q‡ii cvPwU bvUK (১৯৬৫) অনুবাদ করেন। শওকত ওসমান পাকিস্তান কালপর্বেও সমকালকেই তাঁর লেখার উপজীব্য করেন। তিনি কখনও সাহিত্যের মাধ্যমে 'বিনোদনকারীর' ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নি। সমকালের শৃঙ্খলিত শাসন ব্যবস্থা, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িকতা, বাংলাভাগ পরবর্তী প্রতিক্রিয়া, ধর্মীয় চালচিত্র, ব্যক্তিক জটিলতা তাঁর এপর্বের রচনাতে স্থান পেয়েছে। "সমকাল তাঁকে স্বস্তি দেয় নি, দেয় নি বন্ধুত্বের স্নিগ্ধ স্পর্শ।...মনে হয় যেন তাঁর একা বুকে তিনি ধারণ করে চলেছেন সারা দেশের, সমগ্র সমাজের বঞ্চনার জ্বালা।" (জিল্লুর রহমান, ২০০৪ : ৪০) এ-প্রসঙ্গে শওকত ওসমানকে উদ্দেশ্য করে রচিত কবি রবীন্দ্র গোপের কবিতাংশ[২] এখানে উদ্ধারযোগ্য :

মানবতার সুন্দর ফোটাতে চেয়ে ক্লান্ত কলম চাষি
ধারালো কোদালে কেটেছে আঁধার ঢাকা সময়
সময় কাটতে কাটতে, আঁধার কাটতে কাটতে
ফুল ফোটাতে চেয়েছিলেন সোনার বাংলায়
শরতের কাশবনের কাফন ঢাকা হৃদয়ে
কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে শুয়ে আছেন ক্লান্ত পথিক।

প্রতিকূল পরিবেশ সাহিত্যচর্চার পথে যে অনতিক্রম বাধা নয়, তার প্রমাণ সময়-সমাজ-রাজনীতি সচেতন গল্পকার শওকত ওসমান রেখেছেন পাকিস্তান কালপর্বেও।

UxKv

৩. জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ১৯৭০ সালের ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত ৩০টি আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি (ড. হারুন-অর-রশিদ, evsjv‡'k ivRbxwZ miKvi I kvmbZwšK Dbqb 1757-2000, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৮০)
৪. কবি রবীন্দ্র গোপ শওকত ওসমানের মৃত্যুতে GK Kjg Pwl শিরোনামে আঠারো চরণের এ-কবিতা রচনা করেন।

Mš I ceÜcwÄ

অনীক মাহমুদ (১৯৯৫)। evsjv K_vmvwn‡Z¨ kIKZ Imgvb, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী।
অশ্রুকুমার সিকদার (২০০৯)। 'ভাঙা বাঙলার সাহিত্য'; †'kfvM : ¯§wZ Avi ¯ÍäZv [সম্পা. সেমন্তী ঘোষ], গাঙচিল, কলকাতা।
আবুল আজাদ (২০০০)। bRiæj BmjvgÑ kIKZ Imgvb mgKvjÑms¯'wZ, রাইটার্স ফাউন্ডেশন–বাংলাদেশ, ঢাকা।
আবুল কাসেম ফজলুল হক (২০০৫)। gw³ msMvg, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

আসাদ চৌধুরী (২০০৯)। 'সংস্কৃতির বিকাশ ধারা'; i³v³ evsjv [সম্পা. বিজলী প্রভা সাহা], মুক্তধারা, ঢাকা।

আহমদ ছফা (২০১১)। wbew©PZ ivR‰bwZK ceÜ, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা।

এম.এম. আকাশ (১৯৯৩)। 'সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা : পাকিস্তান আমল'; evsjv‡`‡ki BwZnvm 1704-1971, 2q LÐ [সম্পা. সিরাজুল ইসলাম], বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

জহির রায়হান (২০০৯)। 'পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ'; i³v³ evsjv [সম্পা. বিজলী প্রভা সাহা], মুক্তধারা, ঢাকা।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (২০০৪)। 'শ্রদ্ধাঞ্জলি'; kIKZ Imgvb ¯§viK MÖš' [সম্পা. সেলিনা বাহার জামান], বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

মমতাজ উদ্দিন আহমেদ (১৯৯৩)। 'সাতচল্লিশ-উত্তর সময়ে শিল্প এবং শিল্পসম্পর্ক'; evsjv‡`‡ki BwZnvm 1704-1971, 2q LÐ [সম্পা. সিরাজুল ইসলাম], বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

সাঈদ-উর রহমান (২০০১)। ce evsjvi ivRbxwZ-ms¯'wZ I KweZv, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

সৈয়দ আলী আহসান (২০০৯)। 'বাংলাদেশ আন্দোলন : সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে'; i³v³ evsjv [সম্পা. বিজলী প্রভা সাহা], মুক্তধারা, ঢাকা।

হারুন-অর-রশিদ (২০০১)। evsjv‡`k ivRbxwZ miKvi I kvmbZvwš¿K Dbqb 1757-2000, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

wØZxq cwi‡”Q`

cwK¯Ívb Kvjc‡ei M‡íi Rxeb‰ewPÎ¨

যে সব রাজনৈতিক ঘূর্ণিস্রোত জাতীয় জীবনে ব্যাপকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে শিল্পী-সাহিত্যিকেরা সে সব ঘটনা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না। উপর্যুপরি সেখান থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত হন। শওকত ওসমানও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি ছিলেন পাকিস্তান কালপর্বের বিভিন্ন ঘটনার উত্থান-পতনের এবং জনজীবনের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষী। এ পর্বে তিনি রচনা করেন c¯Íi djK (১৯৬৪), Dcjÿ¨ (১৯৬৫), †bÎc_ (১৯৬৮), Dfk½ (১৯৬৮)। তাই, পাকিস্তান কালপর্বে তাঁর গল্পের প্রধান বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে বাংলাভাগের অন্তঃসারশূন্যতা, ভাষা আন্দোলন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মান্ধ সমাজের গোঁড়ামি, সামরিক শাসনের নানামুখী চিত্র, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, নরনারীর সম্পর্ক, মধ্যবিত্তের সংকট, হাস্যরসাত্মক কাহিনি প্রভৃতি। সমকালীন রাজনৈতিক ঘূর্ণিস্রোত শওকত ওসমানের পাকিস্তান কালপর্বে রচিত ছোটগল্পে সমকালীন জীবনপ্রবাহে কীভাবে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে তার তাৎপর্য

বিশ্লেষণই এ অংশের অন্বিষ্ট। এ-কালপরিসরের গল্পের বিষয়বৈচিত্র্যকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা যায় :

এক : দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষ।
দুই : রাজনীতিমনস্কতা।
তিন : নর-নারীর সম্পর্ক।
চার : মনস্তত্ত্বমূলক বা মানব প্রকৃতিমূলক।
পাঁচ : ধর্ম ও ধর্মতন্ত্র।
ছয় : ভাষা ও শিক্ষা।
সাত : কৌতুক, হাস্যরসাত্মক বা ব্যঙ্গপ্রধান।
আট : পেশাজীবী মানুষ।
নয় : রূপকধর্মী ।

GK : ‘wf ÿ I ‘wi‘¨Kó gvbl

শওকত ওসমানের পাকিস্তান কালপর্বে রচিত গল্পেও ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের চিত্র অমলিন। কারণ এ-পর্বে এসেও লেখক দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতাকে বিস্মৃত হতে পারেন নি। গল্পকার স্মৃতিকথা বা গল্পচ্ছলে এপর্বে দুর্ভিক্ষের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তবে এ-পর্বে রচিত গল্পে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া অঙ্কিত হয়েছে ভিন্ন মাত্রায় এবং এর সাথে যুক্ত হয়েছে দারিদ্র্যের সীমাহীন ক্লেশ।

প্রতিটি "আকাল ও মহামারী দুঃস্থ ও দরিদ্র মেয়েদের ঠেলে দিয়েছে দাসীবৃত্তি ও দেহব্যবসার দিকে।" (হাবিবুর, ২০০৮ :৭০) অন্যভাবে বলা যায়, দুর্ভিক্ষ নারীকে পণ্যে পরিণত করেছিল। অন্যান্য বস্তুর মতো নারীকে হাত বদল হতে হতো প্রতি রাতে। তবে কেউ স্বেচ্ছায় এ পথে আসেনি, একান্ত বাধ্য হয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য তাদের এ অন্ধকার জগতে আগমন। এ মন্বন্তরে অসংখ্য নারী অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে এবং পরিবারকে মৃত্যুযাত্রা থেকে রক্ষা করতে বারবনিতার পথ বেছে নিয়েছিল। দুর্ভিক্ষকালীন কলকাতায় নারীদের এ পথে আসতে বাধা প্রদানের লক্ষ্যে 'বেশ্যাবৃত্তি প্রতিরোধ কমিটি'ও গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু মানুষের পেটের ক্ষুধা যেখানে তীব্র, প্রচলিত নীতিবোধ সেখানে অচল; এমনই এক প্রেক্ষাপটকে ধারণ করে আছে শওকত ওসমানের 'উদ্‌বৃত্ত' (c¯Íi djK) গল্পটি।

মন্বন্তরে রোগ-শোক, ক্ষুধা-দারিদ্র্য, গ্রাম্য শোষকের অত্যাচার, কালোবাজারিদের দৌরাত্ম্যে গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ে। এসময় নারীরা আরও বেশি অসহায় হয়ে পড়ে, যার প্রতিনিধি হিসেবে আলোচ্য গল্পের আমিরণ চরিত্রটি অঙ্কিত। আমিরণ জঠরজ্বালা নিবৃত্ত করার জন্য শহরে গিয়ে

বারবনিতার পেশাকে গ্রহণ করেন নিজের এবং পরিবারের ভরণপোষণের জন্য। আমিরণের বাবা-মা জানেন তার মেয়ে শহরে সাহেবের বাসায় আয়ার কাজ করেন। অথচ আমিরণকে নিজের শরীর অন্যের ভোগ্যপণ্যে পরিণত করে জোটাতে হয় মুখের আহার। আমিরণ মনে মনে নিজেকে 'ভাঙা মাজারের' সাথে তুলনা করেন। কিন্তু তিনি বাবা-মা এবং পাড়াপড়শীদের কাছে এক বিস্ময়। তার বাবা-মা, প্রতিবেশীরা আমিরণের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া করেন : "যেহানেই থাহিস, আল্লা যেন তরে দ্যাহে।" (শওকত, ২০০৩ : ২৪৫) সবার এ প্রার্থনা যেন আমিরণের জীবনে বিপরীত ফল বয়ে নিয়ে আসে, এখানেই আমিরণ চরিত্রটির ট্র্যাজেডি। আমিরণের প্রাত্যহিক দিনযাপনের মধ্যে সুশৃঙ্খল ব্যস্ততা থাকলেও মনোজগতে তিনি উৎকেন্দ্রিক। গল্পের ভাষায় :

> বাড়ী-ভাড়া, বাড়ীওলি আর গুণ্ডাদের খাঁই মিটিয়ে কটা টাকা আর থাকে? খামাখা আন্দেশা বা-জানের। আমাকে দেখার লোকের অভাব হয় না। সা'ব বাবু দালাল, কন্ট্রাক্টার, যাচনদার, বহু আছে আমার অভিভাবক। (শওকত, ২০০৩ : ২৪৬)

আমিরণ শহরজীবনের গ্লানি ভুলতেই গ্রামে আসেন। গ্রামে বাবা-মা, প্রতিবেশীরা তাকে সমাদরের সাথে আশ্রয় দিলেও তিনি মনের দিক থেকে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েন। এ-গল্পে আমিরণ সে-সব নারীদের প্রতিনিধি, যারা দুর্ভিক্ষে হারিয়েছেন সংসার এবং সামাজিক মর্যাদা। তবু হৃতসর্বস্ব স্নেহাতুর পল্লির মেয়েটির জন্য ঔৎসুক্য জাগে এবং করুণা হয়। কারণ জঠরের তাগিদ তার একার নয়, ক্ষুধার অন্ন জোগাতে হয় তার পরিবারের জন্যও। দারিদ্র্য ও মন্বন্তরের কাছে মানবতা ভূলুণ্ঠিত। "অভাব কিংবা দারিদ্র্য কেবল একটি তথ্য মাত্র, কিন্তু খাদ্যাভাব একটি বাস্তবতা। মানুষের নীতি, নৈতিকতা, আদর্শবোধ, দাম্পত্যপ্রেম, বাৎসল্য— সকল কিছুই এর কাছে তাৎপর্যহীন।" (রফিকউল্লাহ, ২০১৩ : ৪৫৪) ক্ষুধার আগুনে পুড়ছে স্নেহের নীড়, হৃতসর্বস্ব হচ্ছে নারীর সম্ভ্রম, এ বাস্তব সত্য গল্পের পরিসরে লেখক উপস্থাপন করেছেন।

'আজব জীবিকা' (c¯Íi djK) গল্পের প্রারম্ভেই গল্পকার গল্পের কালগত (তেরশ পঞ্চাশ বঙ্গীয় সন) পটভূমি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। লেখকের সাথে মুদি দোকানদার এবং নৈশ প্রহরীর কথোপকথনের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে দুর্ভিক্ষকালীন গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা। বাস্তবতার নানা পরতকে খুলে খুলে আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিতে গল্পকার উজ্জ্বলরেখায় বাঙ্ময় করে তুলেছেন মন্বন্তরের জীবন-বাস্তবতাকে।

১৯৪৩ সনে মন্বন্তর যখন আঘাত হেনে নিঃশব্দে জনপদ গ্রাস করে চলছিল, তখন গল্পকার গ্রাম সীমান্তে জেলা বোর্ডের (সম্ভবত চাঁদপুর জেলা) পাশে এক রাতের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন। গল্পকার দিনের বেলায় লক্ষ করেন গায়ের মেঠোপথ ধরে অসংখ্য নর-নারী, শিশু দুমুঠো খাদ্যের সন্ধানে শহর অভিমুখে গমন করেন। দোকানির (নৈশপ্রহরী) কাছ থেকে তিনি আরও অবগত হন, দিনে রৌদ্রের জন্য অনেকে শহরে যেতে পারেন না, তাই চাঁদনি রাতে দল বেঁধে অধিক সংখ্যক

গ্রামবাসী শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দোকানির দোকানে এবং তার পরিবারেও দুর্ভিক্ষের থাবা স্পষ্ট। গল্পকার নৈশপ্রহরী নফিসের কাছ থেকে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা সম্পর্কে যে তথ্য পান তা এখানে উদ্ধারযোগ্য :

> রাস্তার ধারে দূরে দেখলাম, একটা মেয়ে পড়ে আছে— আজকাল কহতের দিনে কত লোকত মরছে। দূর থেকে দেখলাম একটা কাক বার বার মেয়েটার কাঁধে ঠোকর দিয়েই দু-তিন হাত দূরে পালাচ্ছে। আবার এগোচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখি একটা মরমর মেয়ে, কোলে মরা ছেলে। কাকে তার চোখ ঠুকরে বের করে নিয়ে নিয়েছে। মেয়েটা যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল। (শওকত, ২০০৩ : ২৮৩)

এখানে উল্লেখ্য যে, "শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের চিত্রকর্ম দেখলে যেমন দুর্ভিক্ষ কী তা স্বচক্ষে দেখার দরকার হয় না" (মোহন, ১৯৯৯ : ১২২), তেমনি গল্পকার এ অংশে বর্ণনার মাধ্যমে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতাকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তার ফলে দুর্ভিক্ষকে পাঠকের নতুন করে প্রত্যক্ষ করার প্রয়োজন পড়ে না। গল্পের শেষে গল্পকার পাঠককে আরও চমকপ্রদ সংবাদ প্রদান করে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। নফিসের রাতের দায়িত্বকে গল্পকারের কাছে আজব বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ, তার নৈশ দায়িত্ব দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষগুলোকে আত্মহত্যার পথ থেকে রক্ষা করা। ইতঃপূর্বে জঠরজ্বালা চিরতরে নিভিয়ে দিতে পাশের প্রবহমাণ সরু নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনেক নিরন্ন মানুষ জীবন দেন। ওই রাতেই গল্পকার প্রত্যক্ষ করেন শিশুসহ এক নারীর আত্মহত্যা-প্রচেষ্টাকে। মূলত দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে এমন ঘটনা সেখানে অহরহ ঘটে চলে। নফিসের ভাষায় :

> এই আকালে আশ-পাশের অভাগীরা পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে এইখানে আসে ছেলে মেয়ে নিয়ে আত্মহত্যা করতে— আগেও প্রতিমাসে দশ বিশ এইখানে আত্মহত্যা করে মরত। তারপর ত সরকার এই চাকরী দিলে। (শওকত, ২০০৩ : ২৮৪)

এ-গল্পের মাধ্যমে লেখক একটি বিশেষ অঞ্চলের দুর্ভিক্ষকালীন গ্রাম্য জীবনের পরিবেশকে চিত্রায়িত করলেও তা শেষ পর্যন্ত একটি অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের কাহিনি হয়ে থাকেনি। কারণ, এ-জাতীয় একটি কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে গল্পকার মন্বন্তরপীড়িত সমস্ত অঞ্চলকেই নির্দেশ করেছেন। ফলে, 'আজব জীবিকা' গল্পটি ধারণ করে আছে দুর্ভিক্ষের এক সার্বজনীন বাস্তবতা।

'ব্লাক আউট' (†bÎc_) গল্পে মন্বন্তরকালীন শহর জীবনের বিভিন্ন চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। লেখক এ-গল্পে পাঠককে রূঢ় বাস্তবসত্যের সম্মুখীন করেন। এ-গল্পেও দেখা যায় গ্রাম থেকে আগত নিরন্ন মানুষ শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে চলেন খাদ্যের সন্ধানে। তারা গ্রাম থেকে শহরে গমন করেন এক মুঠো ভাতের আশায় বা শুধু ভাতের ফ্যান প্রাপ্তির আশায়। অথচ ভাতের ফ্যান প্রাপ্তি থেকেও তারা বঞ্চিত হন। তারপরেও 'কিছু ফ্যান দেন গো মা, কিছু ফ্যান' শব্দের আর্তনাদে শহরের আকাশ-বাতাস, দালান-কোঠা প্রকম্পিত হলেও শহরবাসী অনেক বিত্তবান মানুষের

কর্ণকুহরে তা প্রবেশ করতে বা তাদের মানবিকবোধকে জাগ্রত করতে ব্যর্থ হয়। পূর্বে গ্রাম থেকে খাদ্যশস্য শহরে আসত, আর এখন গ্রাম থেকে শহরে সমাগম ঘটছে বুভুক্ষু জনতার মিছিল। শহরে এসে অনেকে ঢলে পড়েন মৃত্যুর হিম-শীতল আঙিনায়। শহরের বিভিন্ন স্থানে খড়কুটোর মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে অনাহারে, বিনাচিকিৎসায় মৃত মানুষের লাশ। শহরে তখন যে ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় পরিবেশ বিরাজ করছিল, লেখক তা উপমাসহকারে তুলে ধরেছেন :

> মৃত্যু তখন কঙ্কাল-রূপে লাঠি হাতে ঘুরে বেড়াত, বেড়াত পথে-ঘাটে মাঠে শহরের ফুটপাতে অলিতে-গলিতে। হাহাকার করে বেড়াত চারদিকে। শুনতে পাওয়া যেত কেবল কান্নার রোল। তারপর তাও ধীরে ধীরে কমতে লাগল। কারণ, কাঁদার জন্যে গলা, গলা লাগে, তাগদ লাগে। তা ফুরিয়ে যাচ্ছে, কান্নাও কমে আসতে লাগল। ধুঁকে ধুঁকে যেটুক কাঁদা যায়, তা-ই শেষ আশ্রয়। (শওকত, ২০০৩ : ৩৫৪)

মন্বন্তরকালীন পটভূমিতে নারীরা ছিলেন দারুণভাবে অসহায়। তারা দুর্ভিক্ষে স্বজনদের (বাবা-মা, স্বামী-সন্তান) হারিয়ে আর্থিক নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং নিরাপদ আশ্রয় সবই হারান। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে লজ্জাশীল কুলবধূরা হারান তাদের সম্ভ্রম। নারীশরীরকে পণ্যে পরিণত করে তোলার এই ঘৃণিত মানসিকতা খাদ্য সংকটকবলিত সমাজের অভিশাপকে যেমন চিহ্নিত করে, তেমনি পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত এই সমাজে নারীর নিরাপত্তাহীন, অবহেলিত ও অসম্মানজনক অবস্থানকেও প্রকাশ করে। 'ব্লাক আউট' গল্পেও লেখক দুর্ভিক্ষকালে নারীদের পণ্যে পরিণত হওয়ার কাহিনিকে উপস্থাপন করেছেন, যা মন্বন্তরকালীন শহর-জীবনের একটি সাধারণ চিত্র। এ-দুর্যোগের সময় নারীরা প্রথমে ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে তাদের জীবন ধারণের চেষ্টা করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে তারা দেহপসারিণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হন। এসব চিত্র দুর্ভিক্ষকালীন বিশৃঙ্খল পরিবেশেরই সাক্ষ্য বহন করে।

শওকত ওসমান 'সৌদামিনী মালো' (Dfk½) গল্পের প্রধান চরিত্র সৌদামিনী মালোর স্মৃতিচারণের মাধ্যমে মন্বন্তরের ভয়াবহতার চিত্র অঙ্কন করেছেন। গল্পে দুর্ভিক্ষের চিত্র ক্ষণিক বিজলি-আলোর মতো হলেও তা ১৩৫০-এর বাস্তবতা প্রকটভাবেই প্রতিনিধিত্ব করে। অন্নাভাবে দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যু-পথযাত্রী হন তা ইতিহাস থেকে জানা যায়। এ-গল্পেও দুর্ভিক্ষ-কবলিত একটি পরিবারের নিঃস্ব হওয়ার কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে।

দুর্ভিক্ষের চিত্রকে তুলে ধরতে গিয়ে গল্পকার সৌদামিনী মালোর দৃষ্টিকোণকে ব্যবহার করেছেন। সৌদামিনী মালো বাড়ি ফেরার পথে (হরিশচক থেকে আলোকডাঙ্গা) যে প্রতিচ্ছবি অবলোকন করেছেন, তারই মধ্যে ধরা পড়েছে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা। তিনি পঞ্চাশের 'পুরো কোটাল'-এ সোনার ফসলের মাঠে সোনার মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু-দৃশ্য দেখেন, যা যে-কোনো বিবেকবান মানুষকে আবেগায়িত করে দুর্ভিক্ষের ভয়াল পরিবেশকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> আমার সামনে একটা ধানক্ষেত, ধান পেকে গেছে।...হঠাৎ শুনলাম ধানক্ষেত থেকে শিশুর কান্না আসছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। দেখলাম একটা লোক জমিন আঁকড়ে মরে পড়ে আছে, মুখে দাড়ী। তার পাশে একটা মরা মেয়ে। তার পাশে একটা ছেলে বসে মরা মায়ের বুকে মাথা রেখে কাঁদছে থেকে থেকে, আবার উঠে বসছে। (শওকত, ২০০৩ : ৩৯৭-৩৯৮)

শওকত ওসমান একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতাকে তুলে ধরলেও তা একটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। কেননা, দুর্ভিক্ষের সময় এ-পরিস্থিতি সব অঞ্চলেই বিরাজমান ছিল এবং শবযাত্রা ছিল নিত্যকারই একটি ঘটনা, যা 'সৌদামিনী মালো' গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে।

Óআখেরী সংক্রান্ত' (Dfk½) গল্পে দুর্ভিক্ষের কোনো প্রত্যক্ষচিত্র গল্পকার অঙ্কন করেননি। দুর্ভিক্ষের সূত্র ধরে দারিদ্র্যের যে কশাঘাত জনজীবনে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে তা গল্পপাঠে সহজেই অনুমান করা যায়। তবে দুর্ভিক্ষ এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও গল্পকার গল্পের শরীরে যে অসাম্প্রদায়িক চিত্র এঁকেছেন তা Óআখেরী সংক্রান্ত' গল্পের একটি উজ্জ্বল দিক।

দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী সময়ে সলিম চাচার আগ্রহে পাড়ায় মুসলমানদের মহররম উৎসব উপলক্ষে তাজিয়া বের করার জোর আয়োজন চলে। ধর্মীয় বিবেচনায় প্রত্যেকে তাদের সামর্থ্য মতো চেষ্টা করেন এ আয়োজনকে সফল করে তুলতে। কিন্তু তাদের সম্মিলিত শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের আয়োজন ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হয় ঢুলির অভাবে। একদিকে দুর্ভিক্ষ এবং অন্যদিকে দারিদ্র্য ঢুলিদের বাধ্য করেছে পেশা পরিবর্তনে। এছাড়াও বাংলাভাগের কারণে অনেকে এ দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যান। জীবনযুদ্ধে যারা তখনও পৈতৃক ভিটায় টিকে আছে, যারা এককালে ঢুলি ছিলেন তাদেরও 'সখবখ হব গ্যাছেগা।' ঢুলিদের পাড়ার বর্ণনা থেকে তাদের বর্তমান অবস্থা অনুমান করা যায় :

> বেশীর ভাগ ভিটে খাঁ খাঁ করছে। লোক আছে বা নেই। এক ভিটেয় উঠতে গিয়ে বাঁ দিকে শেয়াল পড়ল, পালাচ্ছে।...ভিটায় উঠে ডাকাডাকি করলে সাড়া পাওয়া যায় না। এক জায়গায় জোর করে উঠলাম। অনেক হাঁকাহাঁকির পর এক বুড়ী বেরুল। হাড্ডিসার চেহারা। চিঁ চিঁ শব্দে কী যেন জবাব দিলে সেই জানে। (শওকত, ২০০৩ : ৪৫৮)

অবশেষে কথক অনেক কষ্টে অশীতিপর বৃদ্ধ গোবিন্দ জলদাস নামে এক ঢুলির সন্ধান পান। তবে দারিদ্র্যের চিহ্ন তাদের শরীরে এবং সংসারে প্রকট। তারা ঢুলি হলেও আজ তাদের কোনো ঢোল নেই। কিন্তু তারপরেও মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে গোবিন্দ জলদাস তার পুত্র গগন জলদাস ঢোলের পরিবর্তে হাঁড়ি বাজিয়ে তাদের আয়োজনকে পূর্ণতা দিতে সানন্দচিত্তে এগিয়ে আসেন। এখানে উল্লেখ্য, দুর্ভিক্ষ এবং "বিভাগপরবর্তী কালে জীবনযুদ্ধে দলিত, পীড়িত দুজন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দরিদ্র মানুষের আর এক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসবে এভাবে সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসার কাহিনি সত্যিকার অর্থেই উৎসাহব্যঞ্জক। বিরোধের বিদ্বেষ-সঙ্কুল রক্তাক্ত খরস্রোতের ওপার থেকে সহযোগিতার যে হাত বাড়িয়ে দেয় গোবিন্দ আর গগন জলদাস— তাতে এ সত্য নতুন করে

প্রতিষ্ঠিত হয় যে, মানুষে মানুষে সম্প্রীতিই চিরন্তন— বিরোধ নয়।" (সানজিদা, ২০০২ : ১৭৫) মূলত, ধর্মীয় বিদ্বেষ ভুলে, একে অপরের জন্য এগিয়ে আসার যে চিত্র গল্পকার 'আখেরী সংক্রান্ত' গল্পে এঁকেছেন তা দুর্ভিক্ষকালীন পরিবেশকে জয় করার সদর্থক চেতনায় উজ্জীবিত।

ʻরাতা' (Dfk½) গল্পে গ্রামজীবনের পটভূমিকায় মানবেতর জীবন-যাপনকারী মানুষের আশা-হতাশার স্বরূপ অঙ্কনে শওকত ওসমানের শিল্পশক্তির প্রকাশ ঘটেছে। করিমা বিবি ও সাজেদের 'কড়া রোদের ভুবনত্রাসী দাপটের মধ্যে যাত্রা' নব জীবনান্বেষণেরই অভিযাত্রা। প্রবীণ ও নবীন প্রজন্মের দুই অংশভাগী, একজন কষ্টের আগুনে পোড়ার শেষমন্ত্র উচ্চারণ করছেন, আর একজন অনাগত ভবিষ্যতের আসন্ন কষ্টের শিক্ষা নিচ্ছেন এ-যাত্রায়। তবে, উভয়ের কষ্টের সাথে দারিদ্র্যের সংযোগ সুতীব্র।

'জোড়াতালির পৌনপুনিকতায় সমৃদ্ধ' করিমা বিবি তার নাতি সাজেদকে সঙ্গে করে মেয়ের বাড়িতে যাত্রা করেন। তাদের শতছিন্ন পরিধেয় বস্ত্রে দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট হলেও মনোবল তাদের সুতীব্র। তাদের নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও মেয়ের কষ্ট লাঘরের জন্য তারা সাথে করে একটি রাতা (মোরগ) নিয়ে যান। রাতাটিকে জবাই করে করিমা বিবি ভক্ষণ করতে চাননি, বরং সেটি বিক্রি করে মেয়ের হাতে কিছু টাকা দিতে চেয়েছেন। "মাতৃত্বের নিখাদ বন্ধন ও আকর্ষণে করিমার হৃদয় কাঁদে, তার সন্তানকে অন্তরের উষ্ণতায় বাঁধতে চায়, মনটা আনচান করে, সে একসময় ছুটে আসে বটে কিন্তু তার অকৃত্রিম মাতৃত্বের সাথে গোপনে ক্ষুধাকেও নিয়ে আসে।" (শোয়েব, ১৯৯১ : ৫২) তাদের আগমনে মেয়ের দারিদ্র্যজর্জর সংসারে যেন নতুন কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হয় সাথে রাতা নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে সেরকম একটি গোপন অভিপ্রায় কাজ করে করিমা বিবির মনে। কিন্তু মাঝপথে সাজেদের হাত থেকে রাতাটি পালিয়ে যাওয়ায় তাদের আশা দুরাশায় পরিণত হয়। তারা অনেক কষ্টে রাতাটিকে ধরতে পারলেও রাতাটি মৃত্যুন্মুখ হয়ে পড়ে। অবশেষে করিমা বিবি এক গৃহস্থ বউয়ের সাহায্যে রাতাটি জবাই করে মেয়ের বাড়িতে যাত্রা করেন। এঅবস্থায়, তাদের উদরচিন্তা তাদেরকে আবার নতুন করে ভাবিয়ে তোলে। গল্পের ভাষায় :

> হেরাও আমাগো লাহান গরীব, বাই। রাতাডা লইছিলাম। কোন মিয়া বাড়ী বেইচ্যা দু-তিন ট্যাহা পাইবো, আমাগোর খাওয়াইতে কোন তক্‌লীফ অইব না। মাইয়ার মুখডা দেইখ্যা আসা যাইব। কি অইল, দ্যাহো? (শওকত, ২০০৩ : ৪৫০)

তবে, চরম দারিদ্র্যও যে করিমা বিবির আত্মসম্মান কেড়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে তা বিভিন্ন উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। এ গরিব মানুষগুলো দারিদ্র্যের কাছে পরাজিত হতে পারে কিন্তু কখনো সম্মানবোধকে বিকিয়ে দিতে শেখে নি, এর প্রমাণ মেলে দারিদ্র্য সত্ত্বেও মেয়ের বাড়িতে মোরগ নিয়ে যাওয়া ও গৃহস্থ বধূর কাছ থেকে ভিক্ষা নিতে অস্বীকৃতি জানানোর মধ্যে। এখানে উল্লেখ্য যে, মার্কসীয় আদর্শের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে দারিদ্র্য সম্পর্কে শওকত ওসমানের মধ্যে একটি

স্বতন্ত্রবোধের জন্ম হয়েছিল। এক্ষেত্রে তিনি অতিসূক্ষ্মভাবে ব্যঙ্গের আবরণে দারিদ্র্য সম্পর্কে শোষক বা বিত্তবান ব্যক্তিদের মনোভাবও তুলে ধরেন : "দরিদ্র মানে তোমার বংশ-মর্যাদার কোনো দাম নেই। দরিদ্র মানে তুমি সমাজের কোনো নীচু স্তরের জীব। দরিদ্র মানে ভালো খাওয়া-পরা তোমার কাছ থেকে দূরে থাকবে। সকলের পদতলে তোমার অবস্থান।" (শওকত, ২০০৭ : ৫২) কিন্তু এ জাতীয় কথাগুলো প্রকৃত অর্থে ভিত্তিহীন। লেখক বিশ্বাস করেন, "দারিদ্র্য মানুষের জন্যে অবধারিত নয়। নসীব, অদৃষ্ট— এমন জাতীয় শব্দ মূলে ভিত্তিহীন। যারা মানুষকে শোষণ করে, তারাই এ জাতীয় কুয়াশা ছড়িয়ে রাখে পৃথিবীতে।" (শওকত, ২০০৭ : ৫১)

'স্বগতোক্তি' (Dfk½) গল্পে দারিদ্র্যের চিত্রটি প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। বারো বছরের কিশোর মতলেব আলী ওরফে মতুর জীবনকাহিনি বর্ণনসূত্রে দারিদ্র্যের পরিচয় প্রকাশিত। মতু সন্দীপের তুফানে মা-বোনকে হারিয়ে নতুন অকৃতদার অফিসার সাদেক চৌধুরীর বাসায় আশ্রয় লাভ করেন। মনিব অন্তপ্রাণ মতু সাংসারিক যাবতীয় কাজের মাধ্যমে চৌধুরী সাহেবের মন জয় করলেও, দুঃখ-দারিদ্র্যের কাছে তার মন অজেয় থেকে যায়। মতুর কিশোর মনের দারিদ্র্যভাবনা তাকে সবসময় বিষণ্ন করে রাখে । এমনকি স্বপ্নের মধ্যেও দারিদ্র্যকে জয় করার একটি সংগ্রামে লিপ্ত হতে দেখা যায়, যা ঘুমন্ত অবস্থায় স্বগতোক্তিরূপে প্রকাশ পায়। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> ...বা-জান দোয়া করেন, জলদি জলদি বড় হৈয়া যাই...আবার ফিইরা আসুম। আমি আপনেরে রোজগার কইরা খাওয়ামু...কাঁদেন না বা-জান...সাব দম টিয়া বেতন ধরছেন...বাড়াইয়া দেবেন...আমি কামে ফাঁকি দিই না...দইজ্জা, ও দইজ্জা মারে নিলি, আমারে নিলি না ক্যান...কাঁদেন না বা-জান, আপনের কাঁদনে, আমার কাঁদন আসে। (শওকত, ২০০৩ : ৪২৩)

মতুর দারিদ্র্যচিন্তাটি তার স্বপ্নের মধ্যেও ক্রিয়াশীল। 'স্বগতোক্তি' গল্পে দারিদ্র্যের ছোঁয়া থাকলেও তা গল্পে তীব্র নয়, বরং দারিদ্র্যের চিহ্নটি বহির্বাস্তবতা অপেক্ষা অন্তর্বাস্তবতায়ই প্রবল।
শওকত ওসমান মৌলিক অধিকার বঞ্চিত দারিদ্র্যপীড়িত শিশুদের জীবনজিজ্ঞাসার রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন 'নেমক-হালাল' (Dfk½) গল্পে। দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানরত পথশিশুরা শুধু আর্থিকভাবে নয়, সামাজিকভাবে যে অরক্ষিত তা গল্পের ভাষ্যে উপস্থাপিত। জীবন তাদের ছিন্নমূল না করলেও জীবিকা তাদের সভ্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ছিন্নমূল আখ্যা দিয়েছে। নিরাপত্তাহীন-ঐক্যহীন-মমতাহীন-অসুন্দরের উৎসব যেন এ-ছিন্নমূল শিশুদের জীবনে সত্য হয়ে ওঠে।

সামাজিক-আর্থিকভাবে অরক্ষিত ভবঘুরে শিশুরা তাদের জঠরজ্বালা জুড়াতে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। পরিধানে শতছিন্ন বস্ত্র, জঠরে অগ্নিদাহ এমন ছিন্নমূল শিশুদের জীবিকার মূল উৎস যাত্রীদের ফেলে দেওয়া খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ। যাত্রীদের ফেলা দেওয়া ডাবের খোলা, মিষ্টির ঠোঙার মধ্যে তারা খাদ্যের সন্ধান করেন। যাত্রীদের কাছে তারা আর্থিক সাহায্য চেয়ে গালমন্দ ছাড়া আর কিছু

পান না। আর এ অবস্থায় তাদের শিক্ষালাভ করা শুধু অসম্ভবই নয়, অবান্তরও বটে। গল্প থেকে উদ্ধারযোগ্য :

> –মাদ্রাসা যাস না কেন?
> –পাডাবো কোন হালা?
> –তোর বাপ নাই?
> –হে হালা থাকলেই বা কী? খাওয়ানোর পারে না, হে হালা মাদরাসা পা-ডাইবো? (শওকত, ২০০৩ : ৪৬৮)

শিশুদের এ-গালি যেন গোটা সমাজব্যবস্থার উপরই নিপতিত হয়েছে 'নেমক-হালাল' গল্পে। প্রবহমাণ সমাজস্রোতে ভেসে চলা এ জাতীয় ভবঘুরে পথশিশুদের কাছে হারাম-হালাল বড় প্রশ্ন নয়, বড় প্রশ্ন দুমুঠো খাদ্য-সংস্থানের নিশ্চয়তা। আর্থিক কারণে শিশুরা যে, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা এবং চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত তা গল্পকার এ গল্পে সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন।

পাকিস্তান কালপর্বের গল্পে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা থাকলেও তার চিত্র প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। এ-পর্বের গল্পে দুর্ভিক্ষকালীন বিত্তবানদের ভূমিকা, মৃত্যুযাত্রা, নিরাপত্তাহীন নারীর অবস্থান, বস্ত্রসংকট, গ্রাম ও শহরে প্রতিফলিত দুর্ভিক্ষের নানাবিধ চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে কখনো স্মৃতিভাষ্যে আবার কখনও মন্বন্তরের প্রতিক্রিয়াজনিত গল্প-কথনে। এ পর্বের গল্পে দুর্ভিক্ষ এবং দারিদ্র্য একই সূত্রে গাথা। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ কালপর্বের মতো এ-পর্বেও দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কনে লেখক সহানভূতিশীল ।

‘B : ivRbxwZgb¯‹Zv

সময় এবং সমাজসচেতন কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান তাঁর সময়কার উত্তাল বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ শৈল্পিকভাবে তুলে ধরেছেন ছোটগল্পে। "তাঁর অসংখ্য ছোটগল্পে এদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন, বিবর্তনের বিচিত্র ধারাক্রম রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্বস্ততার সঙ্গে।" (সানজিদা, ২০০২ : ১৭৬) বাংলাভাগোত্তর ঘটনাপ্রবাহ এবং পাকিস্তান সরকারের বিভিন্নমুখী নেতিবাচক কার্যক্রমের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে এ পর্যায়ের গল্পে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে পরোক্ষ রাজনৈতিক বক্তব্যগুলো গল্পকার রূপক-সাংকেতিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে পাকিস্তান কালপর্বে রচিত তাঁর অনেক গল্পেই পাকিস্তান পর্বের অনেক বিষয়ই ফুটিয়ে তুলেছেন রূপকের অন্তরালে। মূলত গল্পকার নতুন কালের প্রতিক্রিয়াকে ব্যক্ত করতে গিয়ে রূপক-প্রতীক-ইঙ্গিতধর্মিতাকে অনুষঙ্গ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এটা উল্লেখ্য যে, সভ্যতার ক্রান্তিকালে-রাজনৈতিক অস্থিরতায়-ব্যক্তিক নিরাপত্তাহীনতায় শিল্পী-সাহিত্যিকগণ সরলরেখায় অনেক কিছু প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন এবং এ সময় প্রকাশের যথার্থ মাধ্যম হিসেবে রূপক-প্রতীকের বহুবিধ ব্যবহার করেন, কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানও এর ব্যতিক্রম নন।

১৯৪৭ সালের বাংলাভাগের প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া বাঙালি জীবনে বেদনাবহ ও সুদূরপ্রসারী। "স্বাধীনতার আগে-পরে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা আর দুর্ভিক্ষপীড়িত ভিটেমাটি ছাড়া মানুষের স্রোতে যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল এই উপমহাদেশ। আর দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত, নিজ বাসভূমি থেকে উৎক্ষিপ্ত, স্বজনহারা, সর্বস্বহারা উপার্জনহীন অনেক মানুষের কাছে দেশবিভাগের আনন্দ চরম দুঃখের প্রতীক হয়ে এসেছিল।" (সানজিদা, ২০০২ : ৪১) বাংলাভাগের অব্যবহিত পরে উভয় অঞ্চলেই উদ্বাস্তু বা ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের নিরাপত্তাজনিত অভাব চরমভাবে পরিলক্ষিত হয়। একদিকে জন্মভূমি-ত্যাগের যন্ত্রণা, অন্যদিকে নতুন একটি অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের জন্য বিরামহীন জীবনসংগ্রাম, এই দুয়ে মিলে বাংলার উভয় অঞ্চলের মানুষের জীবন ছিল চরম সঙ্কটময়। ভয়ার্ত-ক্ষুধার্ত-স্বদেশত্যাগী বিশাল জনগোষ্ঠীর আর্থিক এবং সামাজিক সংকটের পাশাপাশি আত্মমর্যাদাগত সমস্যা, পুরুষের সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড, নারীদের ভোগ্যপণ্যে পরিণত করা ও বাসস্থানজনিত সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। উদ্বাস্তু সমস্যা-সংকট এবং তাদের মানবেতর জীবন-যাপন এ-উপমহাদেশের মানবসভ্যতার বিবেককে ক্ষত-বিক্ষত করে। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের প্রত্যক্ষ শিকার শওকত ওসমানের ছোটগল্পে বাংলাভাগের পরবর্তী প্রতিচ্ছবি পাকিস্তান কালপর্বে বিভিন্নভাবে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে।

বাংলাভাগ পরবর্তীকালে উদ্বাস্তু মানুষগুলো শহরের অলি-গলি, ফুটপাত এবং রেলস্টেশনসহ বিভিন্ন জায়গায় দল বেঁধে ভিড় করে। এ-ধরনেরই একটি চিত্রের সাহায্যে 'গেঁহু' (Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí) গল্পটি রচিত। এ-গল্পে উদ্বাস্তু সমস্যার মানবেতর জীবনাচরণের বিভিন্ন দিক উপস্থাপিত হয়েছে। লেখক ভারতের ইউপি রাজ্যের আজমগড় জেলা থেকে আগত একটি পরিবারের অন্ন-বস্ত্র এবং বাসস্থান সমস্যার বাস্তবচিত্র এঁকেছেন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে।

গল্পকার 'গেঁহু' গল্পের প্লট রচনায় বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়েছেন। বাংলাভাগ-উত্তর উদ্বাস্তু সমস্যাকে তুলে ধরতে গিয়ে গল্পকার একটি পরিবারের আশ্রয় হিসেবে দেখিয়েছেন রেলগাড়ির পরিত্যক্ত একটি বগিকে, যেখানে পরিবারের সদস্যরা উদ্বাস্তু মানুষে রূপান্তরিত হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন বসবাসের অযোগ্য একটি জায়গায়। "মাল-গাড়ীর গুহা তবে বগি নয়? মানুষের আবাস। নরাকার ছায়া কোন আদিম গোষ্ঠী নয়।" (শওকত, ২০০৩ : ১৫৮)। বাংলাভাগের অসারতা প্রমাণের জন্য গল্পকার এ-পরিবারের উদাহরণ পাঠকের সামনে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাছাড়া রেলগাড়ির বগিতে পরিবারটিকে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে গল্পকার সাধারণ মানুষের অনন্ত ছোটাছুটিকে নির্দেশ করেছেন, যেমন রেলগাড়ি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে চলে।

ভারত থেকে আগত হিন্দিভাষী পরিবারটির সাথে আছে অবাঙালি জব্বার, তার সত্তর বছরের মা, স্ত্রী খয়রন, ছেলে, ছেলে বউ, সাত বছরের এক নাতনি, চার-পাঁচ বছরের নাতিন, পাঁচ-ছমাসের শিশু

সন্তান এবং একটি ছাগল। রাজনৈতিক দুর্বিপাকের শিকার হয়ে তাদের বর্তমান আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয় পূর্ব বাংলার রেলগাড়ির পরিত্যক্ত এক বগি। তাদের এই সংসারে দারিদ্র্যের চিহ্নটি স্পষ্ট। চিকিৎসাজনিত সঙ্কটের কারণে জব্বারের স্ত্রীর নানাবিধ রোগের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলে। তাছাড়া সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও উপকরণের অভাব, রান্নার জ্বালানির সংকট সর্বোপরি অনেকগুলো মানুষের বাসস্থানের সমস্যা তাদের জীবনকে বিষিয়ে তোলে। অন্যদিকে বৃদ্ধ মাতা সারাক্ষণ গেঁহুর (রুটি তৈরির জন্য গমের আটা) জন্য জব্বারকে অস্থির করে তোলেন। গেঁহু না নিয়ে আসার কারণে কোনো এক রাতে বৃদ্ধ মাতা জব্বারের উপর রাগ করে কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন এবং জব্বারও তার মাতাকে অনুসরণ করেন। মা মধ্যরাতে পরম মমতায় জব্বারকে ঘুম থেকে জাগিয়ে পুত্রসহ খাদ্য গ্রহণ করেন এবং গেঁহুর কথা আর তুলবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেন— “হাঁ, ব্যাটা। গেঁহু কা মু মে ঝাড়ু মারো।” (শওকত, ২০০৩ : ১৬৪)

গল্পকার এ-গল্পে বোঝাতে চেয়েছেন যে, শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সন্তানের প্রতি মায়ের চিরন্তন ভালোবাসা কখনো নিঃশেষিত হয় না। তবে, বাংলাভাগ সাধারণ মানুষের জীবনে যে অশান্তির বিষ-বাষ্প বয়ে এনেছে লেখক তা প্রতীকী চিত্রকল্পে ‘গেহু’ গল্পের পরিণাম নির্দেশ করেছেন :

> একটু পরে বগির মুখ বন্ধ হয়ে গেল। নিভে গেল ল্যাম্প।...শ্রাবণের ঝিল্লী ঝঙ্কৃত রাত্রি....চারিদিকে অন্ধকার।... এখন শুধু গুহা আর গুহা। (গেহু ॥ শওকত, ২০০৩ : ১৬৫)

‘মন্ত্রগুণ’ (†bÎc_) গল্পে খ্রিষ্টান ভদ্রলোক লরেন্স মজুমদারের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাভাগোত্তর স্বাধীনতা দিবসের আলো ঝলমলে পরিবেশের কথা চিত্রিত হয়েছে। ভদ্রলোক বিদেশি হলেও এখন মনে-প্রাণে তিনি নিজেকে এদেশি মনে করেন। তিনি শহরের পরিবেশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপলব্ধি করেন স্বাধীনতার মন্ত্রগুণে আততায়ী-গুণ্ডাদের পরিবর্তিত হওয়ার ইতিবৃত্ত। যারা এতদিন আদিম জিঘাংসায় শহরের পরিবেশকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রেতায়িত ছায়াতঙ্কে রূপান্তর করেছিলেন, তারাই আজ নতুন যুগের পালাবদলের অংশীদার। গল্প থেকে উদ্ধারযোগ্য :

> এতদিন গোলাম ছিলাম, কাইজ্যা করছি। আর তো গোলাম না, স্বাধীন মানুষ।...এই আমার দেশের মানুষ। ঘুমন্ত দৈত্যদল এক নিমিষে এক মন্ত্রে জেগে উঠেছে। কাল বিকেলেও যার চোখে ছিল খুনের আঁচড়, হাতে ছোরা; আজ সে গোলাপ-পাশ-ধারী। এদের দিয়েই দুনিয়ার সমস্ত অসাধ্যসাধন সম্ভব। (শওকত, ২০০৩ : ৩৬৯)

বাংলাভাগের মূলে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত এবং ধর্মীয় প্রেরণা থাকলেও তারই মধ্যে দেশকে স্বাধীন করার স্পৃহা এবং ভবিষ্যৎ কল্যাণকর রাষ্ট্রগঠনের আকাঙ্ক্ষাও সক্রিয় ছিল এবং সক্রিয় ছিল গভীর দেশপ্রেম। তাই, খ্রিষ্টান লরেন্স ধর্মপরিচয় জলাঞ্জলি দিয়ে দেশপ্রেমের আনন্দস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে আনন্দোদ্বেলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেন : “আমি আজাদ-আমি কি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকব, আমি কোলাকুলি করব না?” (শওকত, ২০০৩ : ৩৬৯)

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শওকত ওসমান ছিলেন ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রসৃষ্টির বিরোধী এবং বাংলাভাগেরও বিপক্ষে। কিন্তু তিনি সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা, নতুন দেশ সৃষ্টির আনন্দ প্রভৃতির বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ফলে 'মন্ত্রগুণ' গল্পটিকে তাঁর চিন্তার সঙ্গে স্ববিরোধী মনে হলেও গল্পকার হিসেবে বাস্তবতা চিত্রণের ক্ষেত্রে তিনি সততার পরিচয় দিয়েছেন। এ-গল্পে বাংলাভাগোত্তর স্বাধীনতা দিবসের আলো ঝলমলে পরিবেশ, সাধারণ মানুষের সাথে খ্রিষ্টান লরেন্সের দিবসটি পালনের আনন্দোৎসবের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা ওই বাস্তবতাকেই তুলে ধরে। তবে, এক্ষেত্রে বলা যায়, শওকত ওসমান তত্ত্বের বাইরে গিয়ে অথবা স্বচিন্তা থেকে ভিন্ন বোধে উপনীত হয়ে সামাজিক বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছিলেন এবং যার চিত্র ফুটে উঠেছে 'মন্ত্রগুণ' গল্পে।

পাকিস্তান সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে শাসকগোষ্ঠী ধর্মীয় বাতাবরণে এদেশের মানুষের চলা-বলা, আনন্দ-বিনোদনকে একটি নিয়মের মধ্যে বেঁধে দেন। জীবন উপভোগের বিষয়টি নির্ভর করত শাসকশ্রেণির মর্জির উপর। স্বল্প পরিসরে হলেও এ অচলায়তন ভাঙার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে 'দীক্ষায়ণ' (c¯Íi djK) গল্পে ব্যঙ্গের আবরণে। পাকিস্তানের নিয়ম-নীতির কারণে আনন্দ-উপভোগের জন্য রাতের আঁধারে গাড়ি করে হবিব খান, শফিউল্লা, মওজসহ পাঁচজন রাজকর্মচারী ও ব্যবসায়ী বেরিয়ে পড়েন। তারা একত্রে মদ্যপান এবং নাচানাচি করেন। এসময় এক গরিব চাষী মহাজনের একদল ভেড়া নিয়ে যাওয়ার সময় আনন্দরত হবিব খানেরা তাকে মদপান করার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তিনি মদপান করা থেকে বিরত থাকেন এবং 'তৌবা তৌবা' করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তারা চাষীকে বাদ দিয়ে তার ভেড়াদের জোর করে মদ পান করায়। গল্পের ভাষায় :

> "তোমা দুঃখ আমার দুঃখ।...অথচ এদেশে বাস করতে হবে।...মানুষকে ত শরাব খাওয়ানো গেল না। এসো ভেড়াকে শরাব পান করাই।"
> তারপর রক্তিমের ভংগীতে শফীউল্লা চীৎকার দিলে, "অথচ এদেশে বাস করতে হবে... বন্ধুগণ... আসুন... আমরা ভেড়া দিয়েই শুরু করি... আসুন... বিসমিল্লা... ।" (শওকত, ২০০৩ : ২৬০-২৬১)

মূলত 'দীক্ষায়ণ' গল্পে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার বাইরে গিয়ে একটি নতুন শিক্ষায় বা একটি নতুন সমাজ গড়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। বিশেষ করে জীবনের আধুনিক উপভোগের জায়গাগুলো থেকে ধর্মীয় বিধি-নিষেধের জাল অপসারণ করার এবং শৃঙ্খলিত পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ম-নীতি ভাঙার কথা বলা হয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পরে বিভিন্ন কারণে এদেশের ব্যক্তি এবং সমাজজীবনে বিচিত্রমুখী পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কেউ রাতের আঁধারে স্বদেশ ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি জমান আবার কেউ বা অন্য দেশ থেকে এসে এদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয় মানুষের দেশান্তর হওয়ার সাথে সাথে সম্পদেরও হাতবদল ঘটে। পূর্বের ঠিকানা ও সম্পত্তি ঠিক থাকলেও পুরোনো মালিকানার স্থলে নতুন মালিকের আবির্ভাব ঘটে। 'গন্তব্য' (c¯Íi djK) গল্পের স্বল্প অবয়ব থেকে জানা যায়,

সাংবাদিক মাবুদ চৌধুরী সাংসারিক টানাপড়েনের কারণে অলঙ্কার বিক্রির উদ্দেশ্যে শহরে গমন করেন এবং গন্তব্যে পৌঁছে প্রত্যক্ষ করেন সম্পত্তির মালিকানা পরিবর্তনের দৃশ্য। যেমন :

> কাগজে লেখা ছিল :
> গৌর চন্দ্র পোদ্দার।...নং নবাবপুর।
> নম্বর ঠিক ছিল শুধু সাইন বোর্ড আলাদা। গৌর পোদ্দারের জায়গায় : শের আলী খান।
> দোকান এখনও খোলেনি। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।
> এখানেই ত সে আসতে চেয়েছিল। (শওকত, ২০০৩ : ২৬২)

এ গল্পে মাবুদ চৌধুরীও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সমর্থন করেন কিন্তু তার সেই স্বপ্নভঙ্গ হতে যে বেশি সময় লাগেনি, তা গল্পকার স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। নতুন রাষ্ট্রের জন্মের মাধ্যমে শুধু কয়েকজনের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় এবং অধিকাংশ মানুষের স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। ফলে সাধারণ মানুষের স্বপ্নপূরণের ব্যর্থতাকে লেখক গল্পের নামশব্দ 'গন্তব্য' ব্যঙ্গার্থে ব্যবহারের মাধ্যমে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করেন। অর্থাৎ যার যেখানে থাকা উচিত ছিল কিংবা যার যেখানে যাওয়া উচিত ছিল, সেখানে না থেকে বা না গিয়ে ভিন্ন গন্তব্যে উপনীত হওয়াকে লেখক 'গন্তব্য' শব্দের প্রায়োগিক রূপ দেখিয়েছেন।

'শরিকান' (†bÎc_) গল্পের স্বল্প আয়তনে প্রান্তিক কৃষিজীবী মানুষের নিরাশ্রয়তার এবং বাংলাভাগের সময় ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তির ভোগ-দখলের চিত্র ফুটে উঠেছে। ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাভাগের প্রাক্কালে নয়াবাদের জমিদার চৌধুরীর পরিত্যক্ত 'তিরিশ-চল্লিশ কানি জমি, ছয়-সাত বিঘা বাগান, শান বাঁধানো পুকুর এবং বসত বাটী'কে কেন্দ্র করে কৃষকপল্লিতে নতুন স্বপ্নের চাষ আরম্ভ হয়। কিন্তু তাদের সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে ব্যর্থ হয় ভূমিদস্যুদের জন্য। কৃষকেরা যখন পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নিজেদের অংশ নিষ্পত্তি করেন, তখন সে বণ্টনে নতুন শরিকান (অংশীদার) এসে উপস্থিত হন। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> -আমরা দেখব না তো কে দেখবে? এসব আমরা আমাদের সম্পত্তির সঙ্গে বদল করেছি। এখানে ব্রিক-ফিল্ড-ইটকল বসাব, তাই দেখতে এলাম।
> আমাদের দিকে না তাকিয়েই তারা পুকুর পাড় ধরে সদলবলে এগুতে থাকে।
> আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। (শওকত, ২০০৩ : ৩৬০)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত সুযোগসন্ধানী, সুবিধাভোগী মানুষ নকল দলিলের মাধ্যমে অন্যের বাস্তভূমি দখল করে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত। মূলত 'শরিকান' গল্পে যুগপৎভাবে বাংলাভাগ-পরবর্তী জন্মভূমি থেকে উন্মূলিত হওয়া এবং ভূমিহীন কৃষকদের দুর্দশার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

শওকত ওসমানের 'শিকারী' (c¯Íi djK) গল্পেও অতি সূক্ষ্মভাবে রূপকের অন্তরালে রাজনৈতিক চিত্র উপস্থাপিত। গল্পের বাহ্যিক অবয়বে পাখি শিকারের কথা উঠে এলেও গল্পশরীরে মূলত আইয়ুব খানের মার্শাল ল-এর উত্তাল রাজনৈতিক সময়স্রোতই বিধৃত হয়েছে।

তাজু খান এবং আয়াজ চৌধুরী দুই বন্ধু; তারা পাখি শিকার করতে যান। তাজু পাকা শিকারী এবং আয়াজ প্রকৃতিপ্রেমিক। আয়াজ পাখি শিকারের জন্য নয়, পাখি দেখার জন্য বন্ধুর সাথে হাওড়ে যান। আয়াজ হাওড়ের বিচিত্র পাখি দেখে বিস্মিত হন, অপরদিকে তাজু ক্রমশ পাখি শিকারের জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠেন। তাজু জলপিঁপি এবং হাঁস শিকার করে জলাভূমির শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করে তোলেন। জলের আলোড়ন, পলাতক পাখিদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ, জখমি পাখিদের আর্তনাদ জলাভূমির নিস্তব্ধ পরিবেশকে ভারী করে তোলে। তাজু একটি পুরুষ হাঁসকে শিকার করে নৌকা করে নিয়ে আসেন, তাকে ঘিরে তার সঙ্গী স্ত্রী হাঁসটি মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছিল এবং তারস্বরে আর্তনাদ করে। তাজু স্ত্রী হাঁসটিকে মারতে গিয়ে পিছলে পড়ে যান এবং বন্দুকের গুলি তার পাঁজর বিদ্ধ করে বেরিয়ে যায়। মৃত্যুর পূর্বে সে উচ্চারণ করে : "The murderer is murdered thus-খুনীরা এইভাবে খুন হয়।" (শওকত, ২০০৩ : ২৪২)

'শিকারী' গল্পে গল্পকার তাজু খানের মৃত্যুকে দেখিয়েছেন প্রতীকী অর্থে। প্রকৃত অর্থে যে শাসকচক্র এদেশের শান্ত পরিবেশকে মার্শাল ল দিয়ে অশান্ত এবং গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, তাদের সে সিদ্ধান্ত যে আত্মঘাতী হয়ে তাদেরই প্রাণসংহার করবে তা গল্পকার রূপকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান গল্পটিতে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে।

'ভ্রূণাঙ্ক' (c¯Íi djK) গল্পটি রূপকধর্মিতার দিক থেকে অভিনব। "গল্পটিতে ম্যাকনিসের G †cqvi we‡dvi ev_ কবিতার ছায়াপাত ঘটেছে।" (হুমায়ুন, ২০০৮ : ৯৩) এ গল্পে রূপকের অন্তরালে লেখক একটি নতুন বোধ সঞ্চার করেছেন। "মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হয় নি, এমন এক সুপ্ত মানবভ্রূণ গল্পকারের অনিন্দ্য শিল্পকলায় চরিত্রকল্প হয়ে উঠেছে। সমাজ-অস্বীকৃত এক অবৈধ সন্তানের তীব্র সামাজিক মানবিক অসহায়ত্ব উন্মোচনের মৌল অভীপ্সা থেকেই যেন লেখক উত্তম পুরুষে কাহিনি বর্ণনা করেছেন।" (চঞ্চল, ২০০৯ : ১৩৩) গল্পের শিল্পভাষ্যে উঠে এসেছে ভূমিষ্ঠ না হওয়া এক মানব শিশুর অন্তর্যন্ত্রণা। মূলত এ মানবভ্রূণটি আর কেউ নয়, অনেক সংগ্রামের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে চলা বাংলাদেশ নামক ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র।

হাবিব এবং রাফেজার প্রণয়ের ফসল মানবভ্রূণটি, যে ভ্রূণটি জঠরের নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ভেদ করে পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখার জন্য অস্থির। তার লসিকা-নালীর আশেপাশের রক্তের স্রোত তাকে

নিত্য মুক্ত জগতে বেরিয়ে পড়ার আহবান জানাচ্ছে। ভ্রূণাঙ্কটি মুক্ত পৃথিবীর আলো-বাতাসের স্পর্শে আসার জন্য স্পন্দিত। গল্পের ভাষায় :

> সমস্ত সর্পিলতার বেড়া ছিঁড়ে আমি বাইরে আসতে চাই। আমি জননীর মুখ, পৃথিবীর মুখ দেখার প্রয়াসী। দুই ঋতু আমাকে অস্থির করে তুলেছে। বউলে-মুকুলে, পত্রঝরা মিমির আওয়াজে, নীড়কারিগর পাখির কলভাষে, শীর্ণ স্রোত-লগ্ন চরের বালু-ঝিকিমিকি-রেখায় সমন্বিত. কি মধুর এই মধুমাস। কত মধুরভারনম্র পৃথিবীর ধুলি ঋত্বিকের গুহাবাস নয় আর। (শওকত, ২০০৩ : ২৫৪)

কিন্তু হাবিব এবং রাফেজার অসংযত প্রণয়ের ফসলটির দায়ভার বহনে সবাই অক্ষমতার পরিচয় দেন। এরকম পরিস্থিতিতে তাদেরকে দ্বারস্থ হতে হয় ক্লিনিকের সার্জনের কাছে। মানবগর্ভস্থ মানবভ্রূণটি প্রাজ্ঞ চরিত্রের ন্যায় মাতৃজঠর থেকেই যে আবেগীয় বাণী উচ্চারণ করেছে তা এখানে উদ্ধারযোগ্য :

> জীবন্ত মাংস আবার নিস্প্রাণ। যা-ই হোক, আমি আর তখন চেতন-সমন্বিত নরশিশু নই, তোমার সন্তান ত নই.ই।... আল্লাহকে ধন্যবাদ, আমার এখনও জন্ম হয় নি। (শওকত, ২০০৩ : ২৫৭)

মূলত রূপকের আড়ালে গল্পকার বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির জন্ম-যন্ত্রণার কথাই 'ভ্রূণাঙ্ক' গল্পে উপস্থাপন করেছেন। ১৯৪৭ সালে 'দ্বি-জাতি' তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রযন্ত্রের সৃষ্টি হয়। নতুন রাষ্ট্রসৃষ্টির শুরু থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশবাসীকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষণ-নির্যাতনের দুঃসহ পথে ঠেলে দেন। তাই এদেশবাসী আবার এক নতুন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে কিন্তু পাকিস্তানি শাসকচক্রের ষড়যন্ত্রে তা বার বার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। "অবশেষে 'ভ্রূণাঙ্ক' গল্প লেখার সাত বছর পর এই শিশুটির জন্ম হয় এদেশে, যার নাম : বাংলাদেশ।" (বুলবন, ২০০৪ : ৬১)

সভ্যতার কোনো ক্রান্তিকালে মানুষেরা নিশ্চেতন হয়ে পড়ে এবং এ সুযোগে অপশক্তি আরও বেশি করে মাথা তুলে দাঁড়ায়। সু-নীতির স্থান দখল করে কু-নীতি এবং প্রাগসর মানুষের জায়গা দখল করে অনগ্রসর মানুষ। তবে কোনো এক অনুকূল পরিবেশে সচেতন জনগণ আবার জেগে ওঠে, এমনি এক প্রেক্ষাপটকে ধারণ করে আছে শওকত ওসমানের 'গোর-নিদ্রা'[১] (c¯Íi djK) গল্পটি। অতিলৌকিকতার আবহে রচিত এ গল্পে রূপকের আড়ালে পাকিস্তান রাষ্ট্রে সচেতন মানুষের জেগে ওঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

উত্তম পুরুষে বর্ণিত গল্পটি থেকে জানা যায়, কথক রাতের আঁধারে এক জনশূন্য রাস্তায় জনচতুষ্টয়কে এক লাশ বহন করে নিয়ে যেতে দেখেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি লক্ষ করেন শববাহকেরা একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েন এবং শবটি খাটের উপর উঠে বসেন। অলৌকিক বিষয় প্রত্যক্ষ করে

কথক জীবিত শবটির কাছে শঙ্কিত চিত্তে এগিয়ে যান এবং তখন ঘটে চিন্তা থেকেও আরও বেশি অলৌকিক ঘটনা। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> সে আমাকে আঙুল বাড়িয়ে এক-একটার কাছে নিয়ে গেল।
> আশ্চর্য, চারজনই মড়া। মাথার মগজ মাংস বহুদিন উধাও। স্যাঁতলা দাগ পড়ে গেছে। খুলির মধ্যে দাঁতগুলো বিকট। (শওকত, ২০০৩ : ২৬৮)

এখানে শববাহকেরা উৎপীড়ক পাকিস্তান শাসক শ্রেণিপ্রতিনিধি যারা সুযোগ বুঝে এদেশের জনগণকে বোকা বানিয়ে দেশ শাসন করছে এবং শব হচ্ছে এদেশের নিপীড়িত শ্রেণি তারা সচেতনতার অভাবে অনেক কিছু বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে তবে, কোনো এক সময় তারা আবার অসচেতন অবস্থা থেকে সচেতন হয়ে ওঠেন। মূলত সেনাশাসন কবলিত সময়ে রচিত সাংকেতিক এবং দ্যোতনাব্যঞ্জক 'গোর-নিদ্রা' গল্পে পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে এদেশের জনগণের জেগে ওঠার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে।

'দাওয়াই' (Dcjÿ¨) গল্পের সাধারণ মনোভঙ্গিতে কর্মবিমুখতা, অতিকথনপ্রিয়তা এবং মিথ্যা-মেকীর দ্বন্দ্বে জীবন-জীবিকা অন্বেষণের চিত্র উপস্থাপিত। কিন্তু গল্পের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পাকিস্তানি শাসক শ্রেণির পেশীশক্তির জোরে আত্মপ্রতিষ্ঠার লোভ এবং ভুয়া প্রলোভন দেখিয়ে কিংবা ত্রাণকর্তারূপে নিজের আবির্ভাব ঘটিয়ে সাধারণ নাগরিক সমাজকে অনুগামী ভেড়া কিংবা নির্বোধ ছাগলে পরিণত করার বিষয়টি স্পষ্ট। পরিণতিতে সাধারণ জনগণ 'খালি ভ্যা ভ্যা ভ্যা আর ম্যা ম্যা ম্যা' রবে নিজেদের নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত পরিচয় দেন।

গল্পকথকের চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে শাসক শ্রেণির কথা ও কাজের মধ্যেকার ব্যবধানের চিত্রটি। এটা যেন একটা 'সাংঘাতিক রোগ'-এ পরিণত হয় এবং শাসকশ্রেণি তা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে তৎপর। কিন্তু সচেতন জনগণ এ রোগের 'দাওয়াই' চায়।

Ôপরিচয়' (Dcjÿ¨) গল্পে আলো-আঁধারি পরিবেশ সৃষ্টি করে আত্মভোলা বাঙালির সংকটকে প্রতীকায়িত করা হয়েছে। তবে এ গল্পে একই সাথে দেশের দুর্যোগময়কাল এবং মানুষের বিবেকিসত্তাকে সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গল্পকথকের ভাষায় : "আমার বাংলার চারিদিকে অমাবস্যার রাত্রি বিধায় ভোর বেলাও কিছু দেখতে পেলাম না, হাজার চোখ তাড়া সত্ত্বেও।" (শওকত, ১৯৬৫ : ৩১) আমাদের দেশের অনেক কিছুই বিজাতি-বিভাষি দ্বারা লুট হয়েছে যা, পাগল মেহের আলির ভাই এর "সব টুটা হ্যায়, সব লুটা হায়।"— উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। এখানে উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে পাগলা মেহের আলি রাত জেগে "তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।" রবে মানুষকে সাবধান করেছে। সমাজসচেতন কথাশিল্পী শওকত ওসমান প্রতীকী অর্থে সেই জাগরণি সত্তাকে এ গল্পে ব্যবহার করেছেন দেশপ্রেমিক মানুষকে জাগ্রত করতে। পাগলা মেহের আলিরা আর কেউ নয়,

মানুষের জাগরণি-বিবেকি সত্তা, যাঁরা যুগ যুগ ধরে মানুষকে অন্ধকার জগৎ থেকে-বিপদ থেকে আলোর পথের সন্ধান দিয়েছেন। পাকিস্তান কালপর্বের অন্ধকার সময়কে অতিক্রম করে আলোকের দিকে যাত্রা করার ইঙ্গিত বিদ্যমান পাগলা মেহের আলির ভাইয়ের কণ্ঠে।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনকে উপলক্ষ করে স্বার্থান্বেষী মানুষের চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'বোন-বিবির কেচ্ছা' (Dfk½) গল্পে। ভোট নাগরিক অধিকার বলে স্বীকৃত হলেও তা যে স্বার্থরক্ষার আরেক হাতিয়ার তা এ গল্পের সংক্ষিপ্ত কলেবরে ফুটে উঠেছে।

নির্বাচনকে উপলক্ষ করে মানুষের মধ্যে আদর্শিক দ্বন্দ্বের চেয়েও স্বার্থ রক্ষার দ্বন্দ্ব যে প্রকট হয়ে ওঠে তা এ গল্পের সরকারি চাকুরিজীবী মোহসীন আলী এবং তার স্ত্রী সাজেদার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত। মোহসীন মুসলিম লীগের সমর্থক এবং সাজেদা যুক্তফ্রন্টের সমর্থক, তারা উভয়ই নিজ দলের জয় দেখতে চান। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারাদেশে দুদলের 'যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ' এবং 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ' প্রচারাভিযান যখন তুঙ্গে, তখন তাদের ঘরের বিবাদও উত্তেজনার সর্বোচ্চ শিখরে। কিন্তু তারা পৃথক পৃথক দলের সমর্থক হলেও স্বার্থের দিক থেকে একই জায়গায় অবস্থান করেন। কেননা মোহসীন আলী মুসলিম লীগের এবং সাজেদা যুক্তফ্রন্টের সমর্থক হওয়ায়, যে কোনো দলের জয়ই তাদের স্বার্থ পূরণের সহায়ক হবে বলে তারা মনে করেন। গল্পের ভাষায় : "তুমি ত আছ-ই তার হেলালী কাণ্ডার নীচে। তোমার চাকরি ছোঁয় কে?" (শওকত, ২০০৩ : ৪৩০) নির্বাচনের চূড়ান্ত দিনে দেখা যায়, ভোটার তালিকায় সাজেদার নাম নেই। তখন মোহসীন দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে তার স্ত্রীকে নিজের বোন রোকেয়া খাতুন সাজিয়ে ভোট প্রদানে সাহায্য করেন। আর এভাবেই স্বার্থপর মানুষের স্বার্থরক্ষার চিত্র প্রকাশিত হয়েছে 'বোন-বিবির কেচ্ছা' গল্পে।

Ôথেরী-সন' (†bÎc_) গল্পে প্রকৃতিপ্রেমিক কথক গ্রীষ্মকালের দুপুরে প্রচণ্ড রৌদ্র মাথায় নিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকনের জন্য চাটগাঁর শহরতলী পেরিয়ে গ্রামে প্রবেশ করেন। প্রকৃতি দেখতে গিয়ে খালাসি কাজে ইঞ্জিন রুমে এক পা হারানো গ্রাম্য খঞ্জবৃদ্ধের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তারা উভয়ই একটি 'ছায়া-বুঁদ' গাছের নীচে বিশ্রাম করেন। খঞ্জ বৃদ্ধের দেহের ক্লান্তি মনে কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি, বরং তার মুখাবয়বে এনে দিয়েছে দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা। কিন্তু বৃদ্ধ বেশিক্ষণ বসতে চান না, এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন : 'আর একটু এগিয়ে প্রয়োজন মতো বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে।' এরপর বৃদ্ধ এবং গল্পকথকের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তা এখানে উদ্ধারযোগ্য :

> —যাবেন কোথায়?
> —বোটের লাই (বোটের জন্য)
> আশেপাশে নদী নেই। তাই বিস্ময়ে আরো ধাক্কা খাই।
> শেষে সে আমাকে আছড়ে ফেলে দিল।
> —'ভুট না ভোট-না, বোট, কি আপনেরা কন্– তা-ই দিতে যাই।' (শওকত, ২০০৩ : ৬৮)

"দেশে তখন মার্শাল ল। গণতন্ত্র নেই। নেই নির্বাচন। শওকত ওসমান এ-ভাবে জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি তুলেছেন" (বুলবন, ২০০৪ : ৬৮) 'থেরী-সন' গল্পে। মূলত খঞ্জ বৃদ্ধের ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষা সমকালীন প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে গণতান্ত্রিক পরিবেশের প্রত্যাশা করেছেন।

'চিড়িমার' (†bÎc_) গল্পে "স্বৈরশাসনের শৃঙ্খলে বন্দি অপরাহত মানুষের অব্যক্ত যন্ত্রণার সতর্ক প্রকাশ" (সানজিদা, ২০০২ : ৪১) ঘটেছে । রূপকধর্মী এ রচনার মাধ্যমে গল্পকার 'গানের পাখি' এবং 'চিড়িমার' (শিকারী) শব্দদ্বয়কে সাংকেতিক অর্থে ব্যবহার করেছেন যথাক্রমে দেশপ্রেমিক মানুষ এবং নির্যাতনকারী শাসকশ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনালগ্ন থেকে স্বৈরাচারি শাসকশ্রেণি এদেশের জনগণের কণ্ঠরোধ করতে তৎপর ছিল। গল্পকার রূপকের আড়ালে পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক কণ্ঠরোধের একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন 'চিড়িমার' গল্পে।

'চিড়িমার' গল্পের পটভূমি চট্টগ্রাম অঞ্চলের কেরলডাঙার অরণ্যবেষ্টিত পরিবেশ। কথক প্রতিদিন গ্রামের পাখিদের কলকাকলিতে মুগ্ধ হন এবং অনেকক্ষণ সেখানে প্রকৃতির সান্নিধ্যে সময় অতিবাহিত করেন তাদের অভিনন্দনের জবাবে। দৈনন্দিন জীবনে পাখির রাজ্য তাঁকে বিনোদনের খোরাক জোগায়। কিন্তু হঠাৎ করেই তাঁর এ অভ্যস্ত জীবনে ছেদ পড়ে চিড়িমারের হাতে গানের পাখি ডাহুক, ঘুঘু, শ্যামা, টিয়া, মণিয়া, কোকিল, দোয়েল প্রভৃতি খাঁচায় বন্দি হওয়ার মধ্য দিয়ে। বন্দি পাখিদের আর্তনাদে নিস্তব্ধ বন বিষণ্নতায় ভরে ওঠে। কথকও তাদের ব্যথায় সমব্যথী।

> —তোমরা কে?
> —আমরা চিড়িমার।
> —কি করো?
> —চিড়িয়া ধরে বাজারে বেচি।
> ....
> শুধালাম, "এই গানের পাখি ধরে তোমাদের কী হবে?"
> —কী পাখি? একজন জবাব দিলে।
> —কোকিল দোয়েল।
> —এদের নিশ্চয় ধরব।
> —কিন্তু এই গানের পাখি ধরে তোমাদের কী হবে?
> —সাহেব, সেই জন্যেই তো এদের আগে ধরা উচিত। এরা গান গাইলে, গান শুনে শুনে জঙ্গলের সমস্ত পাখি নড়েচড়ে, লাফালাফি করে। (শওকত, ২০০৩ : ৩৭৪)

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক শাসন জারি করেন এবং ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব 'মৌলিক গণতন্ত্র' নাম দিয়ে আন্দোলনকারী মানুষদের বিনা

অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপের মাধ্যমে তাদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেন। 'চিড়িমার' গল্পে গানের পাখিদের ধরে খাঁচায় ঢোকানোর মাধ্যমে আইয়ুব সরকারের অত্যাচারের কাহিনি রূপকাকারে বিন্যস্ত হয়েছে। গল্পে রাজনৈতিক চিত্র পরোক্ষ হলেও তা খুবই অর্থবহ।

Ôভারতীয় গোয়েন্দা' (Rb¥ hw' Ze e‡½) গল্পে পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্র সৃষ্টির অন্তঃসারশূন্যতা এবং একই সাথে পূর্ব পাকিস্তান অংশের প্রতি পাকিস্তানি শোষকদের বিমাতাসুলভ আচরণ বাঙালি ক্যাপ্টেন সৈয়দ আলী মজুমদারের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে উপস্থাপিত। তাছাড়া পাকিস্তান রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য এদেশীয় কিছু কবি-সাহিত্যিক যে পাকিস্তানি শোষকদের পক্ষ অবলম্বন করেন তাও এ গল্পে উপেক্ষিত নয়।

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তানের সতের দিনের যুদ্ধের দামামা পূর্ব পাকিস্তান অংশের মানুষের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এ অংশে পাকিস্তানি শাসকদের কী ভূমিকা ছিল তা বাঙালি ক্যাপ্টেন সৈয়দ আলী মজুমদারের জবানিতে প্রকাশিত। এ যুদ্ধের সময় পশ্চিম অংশে নিরাপত্তাবলয় তৈরি করে সে-অঞ্চলের মানুষদের রক্ষার সব ব্যবস্থা করা হলেও পূর্ব অংশকে রাখা হয় সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায়। তাছাড়া এ-অঞ্চলের কবি-সাহিত্যিকগণকে কৌশলে পাকিস্তানি রাষ্ট্রের পক্ষে জোর প্রচার করার কাজেও ব্যবহার করা হয় তা ক্যাপ্টেনের ভাষ্যে প্রতিফলিত : "আর সবচেয়ে জোস দেখালে তোমাদের কবি সাহিত্যিকেরা। একজন বেতারে চিৎকার দিলে, আরাকান থেকে তুরখাম– বগুড়া থেকে বেলুচিস্তান– আমরা সব এক হ্যায়, ভাই হো, ভাই হো।" (শওকত, ২০০৩ : ৫০৭) তাছাড়া ভারতীয় গোয়েন্দা আটক করার নামে এদেশের 'সাধারণ জনগণ, ভিক্ষুক, পাগল-উন্মাদদের' নির্যাতনের মাধ্যমে কীভাবে বন্দি করে রাখা হতো তার চিত্রও এ গল্পে উপস্থাপিত :

> জবাব দিলে দারোগা, "লোকটা গ্রামে হাটের মধ্যে প্রেসিডেন্টকে গাল দিচ্ছিল।" কী গাল? তারও জবাব দিলে ওসি। "আইয়ুব খান মাদার্চোদ, ভুট্টো বেটিচোদ– আরো নানা রকম খিস্তি।"...
> শুনে খান বললে, 'ইয়ে শালা এডুকেটেড হ্যায়। ইসি সে পাত্তা চলতা, ইয়ে শালা স্পাই হ্যায়। ইন্ডিয়ান লোগ্ খালি চালাকি—সে কাম লেতা।"...
> শোনো, জহির। সেদিন আরো কয়েকটা ফাঁড়ি দেখলাম। মোদ্দা কথা, যত পাগল ছিল পথে-ঘাটে সবগুলো এনে হাজতে ঢুকিয়েছে। পাঞ্জাবীদের উৎসাহ অনির্বাণ, যদি হিন্দুস্তানী কিছু পাওয়া যায়। (শওকত, ২০০৩ : ৫০৮-৫০৯)

পাঞ্জাবি সৈন্যরা শুধু বন্দি করার মধ্যেই তাদের অভিযান সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং বন্দি পাগল-উন্মাদদেরও ভারতীয় গোয়েন্দার নামে পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বীকারোক্তির জন্যে বর্বরোচিত অত্যাচার করেন। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> খান তার সঙ্গী অফিসারকে বললে, "দেখো, ইয়ে বাংগালী শালা কিয়া বোলতা? ইসকো মুখ মে পাকিস্তানি নেহী আতা।"... মাহবুব আলী পালটা ধমক দিলে, "চুপ খামুশ শালা পাঞ্জাবী।"...তারপর দুই

> দিকে খিস্তির বন্যা। দুই অফিসার গোয়েন্দাকে এলোপাতাড়ি বুটসুট লাথি এবং কিল ঘুষি একত্রে চালাতে থাকে। আসামীর নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। (শওকত, ২০০৩ : ৫০৯)

উল্লেখিত উদ্ধৃতাংশের মাধ্যমে পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্যাতনের বিষয়টি প্রতীকায়িত। আর এভাবেই যে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন অজুহাতে অমানবিক অত্যাচার-নির্যাতনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার অনেক সুস্থ মানুষকে অসুস্থতার এবং উন্মাদনার পথে ঠেলে দেন তা ইতিহাস আমাদের সাক্ষ্য দেয়। মূলত, 'ভারতীয় গোয়েন্দা' গল্পে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এবং পাঞ্জাবি সৈন্যদের বুদ্ধিহীনতা ও পাগলের সাথে পাগলামি করার মতো হীনকর্ম ছাড়াও বাঙালির প্রতি তাদের বিতৃষ্ণার প্রতিফলন ঘটেছে।

শওকত ওসমান সরাসরি রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট একটা ধারণা ছিল। আর এ কারণেই তাঁর রাজনীতি-চিন্তা ও সাহিত্যভাবনা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত— তাঁর রাজনীতি-ভাবনা ও সৃষ্টিকর্ম একাত্ম হয়ে আছে। পাকিস্তান কালপর্বে রচিত রাজনীতিবিষয়ক গল্পের একদিকে উভয় অঞ্চলের মানুষের বাংলাভাগ পরবর্তী যন্ত্রণা এবং এর কিছুদিন পরে নব্যপাকিস্তান রাষ্ট্রের খড়গাঘাতের বেদনা উন্মোচিত হয়েছে। আর এর সমবায়িত দ্বিবিধ যন্ত্রণার চিত্রই ধারণ করে আছে এ পর্বের গল্পগুলো। শওকত ওসমান এ পর্বের রাজনৈতিক সময়স্রোতকে গল্পে প্রকাশ করতে গিয়ে অতি সূক্ষ্মভাবে রূপকের ব্যবহার করেছেন। গল্পকার রাজনৈতিক চিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে পাকিস্তানের সামরিক সরকারের যেমন স্বৈরাচারী মনোভাব তুলে ধরেছেন, তেমনি এদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আশু-অভ্যুদয়ের ইঙ্গিতও রূপকের অন্তরালে ফুটিয়ে তুলেছেন।

wZb : bi-bvixi m¤úK

এ কালপর্বের গল্পে নরনারীর বিচিত্র সম্পর্কের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এসব সম্পর্কের মধ্যে আছে একান্ত রোম্যান্টিক প্রেম, দাম্পত্য সম্পর্ক, ইতিহাসাশ্রিত প্রেম প্রভৃতি। তাছাড়া এ জাতীয় গল্পে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসহীনতার ছবিও গল্পকার বিশ্বস্ততার সাথে তুলে ধরেছেন।

'চূর্ণালয়' (c¯Íi djK) গল্পে এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দুজন যুবক-যুবতীর প্রেমকে চিত্রিত করা হয়েছে চট্টগ্রামের নির্জন টিলার পাদদেশে। গল্পের নায়ক ববি রোজারিও ব্যাঙ্কের জুনিয়র অফিসার এবং নায়িকা ডায়ানা ডিসুজা স্টোর কিপার। তারা ফিরিঙ্গি পাড়ায় বাস করেন। তারা একে অপরকে ভালোবাসলেও তা প্রকাশের পথ পায় না। অবশেষে সব জড়তা কাটিয়ে তারা টিলার মনোরম পরিবেশে দেখা করেন। প্রকৃতির বসন্ত বাতাস, সোঁদা মাটির গন্ধ, পাখির কলতানের সমন্বয়ে সৃষ্টি এক মায়াময় পরিবেশ তাদের পরস্পরকে আরও কাছাকাছি করে দেয়। উত্তাল নিঃশ্বাস, স্পন্দিত বক্ষ, শক্ত মুঠির পারস্পরিকতার প্রচণ্ড আবেগী মুহূর্তে তাদের জীবনে নেমে আসে বিপত্তি।

> পনর-বিশজনের একটা দঙ্গল জমে গেছে পনর-বিশ হাত দূরে উপরের টিলায়। বোঝা যায়, এতক্ষণ তারা দর্শকরূপে খাড়া ছিলেন। এবার একজন সক্রিয় মুখপাত্র মুখ ব্যবহার করলে : "এই হারামীর ফ্যুৎ– ।"
> রোজারিও বাংলা ভাল বোঝে, সুতরাং গালটা হজম করলে।
> মুখপাত্র আবার চীৎকার দিয়ে উঠল : "এই জারগুয়া ফ্যুৎ...ইডা খ্রিস্টানর মুল্লক নঅ...বেশরা-বেহায়া কাম ইন্দি চইলব ন।"
> সেই মুহূর্তে ডায়ানা তার হাতে হেঁচকা টান দিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "ববি come on, quick ! (শওকত, ২০০৩ : ২৭৫)

তারা দুজনেই সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করেন— কারণ ততক্ষণে তাদের উপরে নিক্ষিপ্ত ঢেলাবৃষ্টি প্রথমে পাটকেল বৃষ্টিতে এবং পরে তা শিলাবৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়। তাদের দুজনের কাছে প্রণয়ের দৃষ্টিতে সব কিছু স্বাভাবিক মনে হলেও ভিন্ন জনপদে ভিন্ন মানুষের কাছে পশ্চাদ্‌পদ মানসিকতার কারণে তা অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। তাই দুজন নর-নারীর ভালোবাসা প্রকাশের প্রথম স্মৃতি পারিপার্শ্বিকতার কারণে হয়ে থাকে ভয়ার্ত এবং আতঙ্কময়।

ঙউভসঙ্গী' (c¯Íi djK) গল্পে দাম্পত্যজীবনের এক বিশ্বাসহীনতার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। ধনসম্পদ বা প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও যে মানুষ দাম্পত্যজীবনে অসুখী হয়ে ওঠেন তার বিশ্বস্ত বর্ণনা গল্পকার উভসঙ্গী' গল্পে তুলে ধরেছেন। পারস্পরিক আস্থা এবং বিশ্বাস দাম্পত্যজীবনকে যেমন মধুময় করে তোলে, তেমনি পারস্পরিক অনাস্থা ও বিশ্বাসহীনতা যে সাংসারিক জীবনকে বিষিয়ে তুলতে পারে তারই আলেখ্য 'উভসঙ্গী' গল্পটি।

কুহেলী ও সেহেলী দুই বান্ধবী, তারা একই সাথে স্কুলে, কলেজে পড়াশোনা করেছেন এবং একই পাড়ায় বাস করেছেন— এমনকি তাদের মধ্যে নামগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। তারা অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল কিন্তু বৈবাহিক সূত্রে তাদের পৃথক হতে হয়। কুহেলী ধনীর স্ত্রী এবং সেহেলী নিম্নবিত্তের স্ত্রী। তাদের আবার দেখা হয় সাত বছর পর কুহেলীর বাড়িতে। তারা পরস্পরের কাছে মনের আবেগের বন্ধ দুয়ার খুলে দেন। সেহেলীর স্বামী কোর্টে প্রাকটিস করে সামান্য আয় করেন কিন্তু স্ত্রীকে প্রাণভরে ভালোবাসেন, অন্যদিকে ধনাঢ্য স্বামী ওবায়েদ সম্পর্কে কুহেলীও একই কথার প্রতিধ্বনি করেন। সেহেলী কিছুটা হলেও বুঝতে পারে 'কুহেলীর সব থাকার পরেও সে যেন কোথায় একটু অসুখী', কিন্তু কুহেলীর কথায় সেহেলী সে-জাতীয় কোনো কিছু অনুমান করতে পারেন না। কুহেলী বান্ধবীর হাতে হাত দিয়ে তার বুকের মাথা রেখে আবেগায়িত হয়ে পড়েন তবু স্বামী সম্পর্কে কিছু জানতে-বুঝতে দেন না। গল্পের ভাষায় :

> জানিস সেহেলী, বুকের পিয়াস চোখের পানিতে মেটে না। আর এক তৃষ্ণার্ত বুক এগিয়ে এলেই তা দূর হয়। তুই বুকের কাছে আয়। এর জন্যে আমি সারাজীবন লালায়িত থাকব...। (শওকত, ২০০৩ : ২৩৬)

কুহেলী যে দাম্পত্যজীবনে অসুখী উপরের বক্তব্যসূত্রে গল্পকার তার একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। পরে এর আরো প্রমাণ পাওয়া যায়। সেহেলী কুহেলীর স্বামীর অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলে কুহেলী জবাবে বলে তার স্বামী ব্যস্ত মানুষ, কোম্পানির কাজে ট্যুরে গেছেন। কিন্তু এর যে সত্যতা নেই তা বোঝা যায় সেহেলীর প্রস্থানের পরে, গল্পের সমাপ্তিতে। সেহেলীর স্বগতোক্তির মাধ্যমে পাঠক তার অন্তর্যন্ত্রণার প্রতিধ্বনি শুনতে পায়। যেমন :

> ট্যুর.. লুচ্চাটা মাগী নিয়ে ডাকবাংলোয় ফুর্তি করতে গেছে। এবার... লুকিয়ে দেখলাম সুটকেসে... সুটকেসে... সাহস কী...দুটো...শাড়ী পর্যন্ত ভরেছে দুখানা... নির্লজ্জ... বেহায়া... ট্যুর। (শওকত, ২০০৩ : ২৩৬)

একমাত্র ধনসম্পত্তিই যে দাম্পত্যজীবনে সুখ বয়ে আনতে পারে না, তা 'উভসঙ্গী' গল্পে সেহেলীর জীবনকাহিনিতে লেখক ব্যক্ত করেছেন। প্রাচুর্যের চেয়েও বিশ্বস্ততা যে বড় সম্পদ তা সর্বজনবিদিত। বিশ্বাসের কাঠামোটি যেখানে দুর্বল, ভালোবাসার বন্ধনটি সেখানে শিথিল। পারস্পরিক শ্রদ্ধাহীনতা এবং অবিশ্বাসের জায়গা থেকেও অনেকে হয়তো ভদ্রতার মুখোশ পরে দাম্পত্যজীবনে সুখে থাকার অভিনয় করেন কিন্তু হৃদয়গত দিক থেকে তারা ক্রমশ শূন্য হতে থাকেন, সেখানে দাম্পত্যসুখ সুদূরপরাহত।

'হেরফের' (Dcj ÿ¨) গল্পে দাম্পত্য জীবনের শৈথিল্য উপস্থাপিত। এছাড়া পুরুষের বহুগামিতা এবং নারীর স্বার্থসচেতনতা গল্পে প্রকাশিত। বর্ষীয়ান ভদ্র মহিলা মিসেস মজিদা চৌধুরী জমি বিক্রয়ের বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত জানাতে আয়কর অফিসে আসেন। তার স্বামী জীবিত থাকা সত্ত্বেও তিনি জমির কাগজপত্রে স্বামীর নামের স্থলে সর্বত্র বাবার নাম ব্যবহার করেন। আয়কর অফিসার এর কারণ জানতে চাইলে প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন :

> তুমি ছোকরা অফিসার। বয়স কম। কি বুঝবে ছাই। স্বামী এবেলা আছে, ওবেলা নাও থাকতে পারে। কিন্তু বাপ তো "Permanent" (শওকত, ১৯৬৫ : ৩২)

প্রকৃত অর্থে নারীপুরুষ পাশাপাশি থাকলেই যে তাদের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা কিন্তু নয়, বরং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং বিশ্বাসের অভাবে তাদের মধ্যে ক্রমশ দূরত্ব বেড়ে চলে যা 'হেরফের' গল্পের ছোট কলেবরে উপস্থিত।

'পত্নী-উপপত্নী' (Dcj ÿ¨) গল্পে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে অপসংস্কৃতির জোয়ারে ভেসে যাওয়া জীবনকে চিত্রিত করা হয়েছে। মানবমনে আসক্তির প্রেরণা কত তীব্র ও গভীর এবং আসক্তির স্পৃহাই যে আত্মক্ষয়ী জীবনবাসনার নামান্তর হয়ে ওঠে তা 'পত্নী-উপপত্নী' গল্পে উপস্থাপিত। জীবনভোগ ও জীবনক্ষয়ের বাসনারাশি মানবচিত্তে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে, এই বাস্তব সত্য আমরা মিঃ ওজায়ের এবং মিঃ তস্কীন চরিত্র বিশ্লেষণসূত্রে অনুধাবন করতে পারি। উল্লেখ্য,

"শওকত ওসমান শুধু দেশীয় চেতনার মধ্যে নিবদ্ধ থেকে তাঁর কথাসাহিত্যের পরিসরকে পুষ্পিত করেননি। আন্তর্জাতিক জীবনবীক্ষণ ও চরিত্র-রূপায়ণের মধ্য দিয়ে তিনি স্বদেশ সমকালকে বৈশ্বিক পরিসরে উপস্থাপন করেছেন।" (অনীক, ১৯৯৫ : ২৩৭)

মিঃ ওজায়ের এবং মিঃ তস্‌কীন মদ্যশালায় বাজি ধরেন কে বেশি মদ খেতে পারেন এবং খেয়ে একজনকে মরতে হবে। শুধু তাই নয় জীবিত থাকা ব্যক্তি বিয়ে করবেন মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে। বাজির নিয়মানুসারে মিঃ ওয়াজের অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন এবং মিঃ তস্‌কীন মিসেস ওজায়ের-এর দরজায় উপস্থিত হন। সব অবগত হয়ে মিসেস ওয়াজেরও আপত্তি করেন না, শুধু একটি প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশা করেন। গল্পকারের ভাষায় :

> —আমাকে বিয়ে করেই ওয়াজের বেঘোরে মারা গেল। এখন ভেবে দ্যাখো তুমি আমাকে বিয়ে করবে কি না?
> —নিশ্চয়ই করব। আমিও মরতে চাই। (শওকত, ১৯৬৫ : ৩৬)

মূলত 'পত্নী-উপপত্নী' গল্পে দাম্পত্যজীবনের শৈথিল্যের রূপটি চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিয়ে করলেই যে মানুষ সুখী হয় তা কিন্তু নয়, বরং দাম্পত্য কাঠামোর দুর্বলতার সুযোগে সংসারে নেমে আসে অশান্তির বিষবাষ্প এবং সেই বিষবাষ্প মানুষকে ধবংসের মুখোমুখি দাঁড় করায়, যা এ গল্পে মিঃ ওজায়ের এবং মিঃ তস্‌কীন এর জীবনসূত্রে প্রকাশিত।

'নেত্রপথ' (†bÎc_) গল্পে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ধর্মীয় সামাজিক সংস্কার নারীর স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহ, নারীমুক্তি এবং নারী স্বাধীনতাকে কীভাবে বিঘ্নিত করেছে তারই চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। ধর্মীয় চিন্তা, পর্দাপ্রথা এবং পশ্চাদ্‌পদ সামাজিক মূল্যবোধ নারীর স্বাভাবিক আবেগের পথেও প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলার ঐতিহ্যিক প্রাণ গরুর গাড়িতে সওয়ার হয়ে পিতৃবিয়োগের সংবাদে তিন সপ্তাহ পর পিতৃগৃহে আগত দুই বোনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ সামাজিক নিয়মের কারাগারে বন্দি। ধর্মীয় বিধিনিষেধ এবং পুরুষের বেঁধে দেওয়া রীতিনীতি রক্ষার্থে গরুর গাড়ির ছাউনিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে অনেকটা কবরের মতো আকার দেওয়া হয়েছে। রাস্তায় কাপড়ে আবৃত গাড়িতে তাদের কোনো ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যায় না, এমনকি চুড়ির আওয়াজও কানে আসে না। কিন্তু মহল্লায় পৌঁছা মাত্রই তাদের রুদ্ধ আবেগ শালীনতার বেষ্টনী না মেনেই প্রকাশ পায়। যে নারীরা এতক্ষণ গাড়ির মধ্যে ছিলেন জড় পদার্থের মতো, তারাই বাড়িতে পৌঁছে পর্দার রীতিনীতি রক্ষা না করে নারীদের সাথে কান্নার রব তোলেন। এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে কথক যে প্রশ্ন উত্থাপন করেন তা উল্লেখযোগ্য :

> আমাদের কণ্ঠ থেকে কান্না ছিনিয়ে তুলে নেওয়ার জন্যে কবে সড়কে সড়কে আত্মীয়রা অপেক্ষা করবে?
> আমরা কবে পথে কাঁদতে পারব?
> সেদিন কী আর কাঁদব?

না। (শওকত, ২০০৩ : ৩০৩)

গল্পকার পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বিধিনিষেধ ছিন্ন করে নারী মুক্তি এবং নারী স্বাধীনতার কথা অনেক গল্পেই বলেছেন। মূলত 'নেত্রপথ' গল্পটি তার ব্যতিক্রম নয়। তাই বলা যায়, আলোচ্য মন্তব্যের মধ্যে বন্দি নারীদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত হয়েছে, যা এ গল্পের উদ্দিষ্ট।

ইতিহাসের আলোকে রচিত 'আনারকলি' (†bÎc_) গল্পে একটি নারীর বেদনাবহ অবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে। "ইতিহাস খ্যাত সম্রাট আকবরের আমলের নর্তকী নাদিরা বেগমের খেতাব ছিল আনারকলি। কথিত আছে যে, যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে তার প্রণয়ের জন্য তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হয়।" (অনীক, ১৯৯৫ : ২২৭) পরবর্তীকালে সেই স্থানে সম্রাট জাহাঙ্গীর 'দেওয়ান-ই-আম' স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। গল্পকার স্বপ্নদৃশ্য এবং কল্পনার বাতাবরণে আনারকলির বর্তমান অবস্থার কথা জীবন্ত করে তুলেছেন বর্তমান সময়ের কোঠায় দাঁড়িয়ে।

পূর্ণযৌবনে জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে আনারকলি ভালোবাসে যুবরাজ সেলিমকে। তবে, তাকে ভালোবাসার মূল্য দিতে হয় ফেনায়িত রক্তের স্রোতে, কঠিন প্রস্তর খণ্ডের তলদেশে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে হয় তার শেষ ঠিকানা। এভাবেই একটি নারীর জীবনস্রোত-ভালোবাসার ঝরনাধারা সবার অগোচরেই চিরতরে নিস্তব্ধতায় হারিয়ে যায়। কিন্তু আজও আনারকলির ভালোবাসা সজীব, তাই অবরুদ্ধ জীবন থেকে আজও তিনি সূর্যের আলো, পাখির গান, শিশুর হাসি, মানুষের সান্নিধ্য পেতে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। তাই রূঢ়-কঠিন দেওয়ালের পাথরখণ্ডে অধরা আনারকলির অট্টহাস্য যেন সম্রাট আকবরের অন্যায় ও লাঞ্ছনাকে ধিক্কার জানান। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> মূর্খ আকবর ভেবেছিল, আমাকে দেওয়ালের বেষ্টনে টিপে-চিপে ধ্বংস করবে। কিন্তু আমি সৌন্দর্য...আমি রূপ...আমি প্রেম...আমাকে কে হত্যা করবে? আমি সেলিমের প্রিয়তমা... আমি কবি-শিল্পী প্রেমিকের আরাধনা, জীবনের তপস্যা...আমিও আজও চক্ আনারকলি। দোকানের সারি চক্ নই, চমক। আমি চমক আনারকলি। (শওকত, ২০০৩ : ৩১৬)

মূলত 'আনারকলি' গল্পে লেখক রোম্যান্টিক ভঙ্গিতে আনারকলির প্রেমের জয়গানসহ তার যন্ত্রণাদগ্ধ করুণ কাহিনি বর্ণনা করেছেন।

'ফ্লাশ' (Dfk½) গল্পটি 'পত্নী-উপপত্নী' (Dcjÿ¨) গল্পের অনুরূপ। 'ফ্লাশ' গল্পে জুয়ার আসর এবং তা থেকে দাম্পত্যজীবনের ভাঙনের সুরটি বেজে উঠেছে। এ-গল্পে পাঁচজন জুয়াড়ির সন্ধান পাওয়া যায়। গল্পের কথক, কন্ট্র্যাক্টর নাজিম, ইঞ্জিনিয়ার খাদেমালি, অধ্যাপক বাসেদ এবং ব্যবসায়ী কোবাদ। এ পঞ্চপাণ্ডব জুয়াড়ির মধ্যে হরিহরআত্মার সম্পর্ক বিরাজমান ছিল। জুয়ার আসরে পরিচয়

সূত্রে একজনের বাড়িতে অন্যজনের অবাধ বিচরণ ছিল। কিন্তু তাদের এই জুয়ার আসরের ভাঙন ত্বরান্বিত হয় একজনের স্ত্রী আরেকজনের সাথে পালিয়ে যাওয়ার ফলে। গল্পের ভাষায় :

> নাজিমের সঙ্গে সাজেদা বেগম এবং এবং কোবাদের সাথে হাফেজা বেগম ভেগে গিয়েছিল। রঙে রঙ মেশা, কালায় কালায়, ধলায় ধলায় : ফ্লাশ। (শওকত, ২০০৩ : ৪৩৬)

বিত্ত-বৈভবের দিক থেকে উচ্চবিত্তের মধ্যে জীবনভোগের বাসনা তীব্র থাকলেও তাদের দাম্পত্যজীবনের শৈথিল্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয় উল্লেখিত উক্তিতে। উচ্চবিত্ত নর-নারীর দাম্পত্যজীবনের এই ভাঙন তাদের অবক্ষয়ের চিত্রই প্রকাশ করে|

পাকিস্তান কালপর্বের গল্পে নর-নারীর দাম্পত্যজীবনের বিশ্বাসহীনতার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। বিশ্বাসহীনতা থেকে দাম্পত্যজীবনে শৈথিল্য এবং সেখান থেকে সাংসারিক ভাঙনের সুর চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে এ পর্বের গল্পে। যে গল্পে নর-নারীর সাংসারিক টানাপড়েন নেই, সেখানে আর্থিক সংকট তাদের দাম্পত্যজীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। তবে, এপর্বের গল্পে সামাজিক সংস্কার ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা নারীর স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহ, নারীমুক্তি এবং নারী স্বাধীনতাকে কীভাবে বিঘ্নিত করেছে তারই চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

Pvi : gb¯ÍËgjK ev gvbe cKwZgjK

শওকত ওসমানের কথাসাহিত্যে মানবমানবীর হৃদয়ের বিচিত্র ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। "মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলোর সদর্থক ও খারাপ প্রবৃত্তির নানা প্রসঙ্গের উপরে তিনি লিখেছেন অনেক গল্প।... সুকুমার বৃত্তিগুলোর মধ্যে প্রেম, স্বাজাত্যবোধ, দানশীলতা, আতিথেয়তা, মমত্ব, সহানুভূতি, কল্যাণবোধ" (অনীক, ১৯৯৫ : ২২৬) সমাজভাবনা, ব্যক্তিক চিন্তা প্রভৃতির সম্মিলন ঘটেছে।

'জনারণ্যে' (†bÎc_) গল্পে মধ্যবিত্তের শঠতা, ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা এবং পরিণতিতে মানুষের মানবিক চৈতন্যোদয়ের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। আপাত ভদ্রবেশের আড়ালে হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার যে মানসিকতা তা গল্পের ছদ্ম ও সরলাবরণে উপস্থাপিত। লুঙি-গেঞ্জি পরা সাধারণ মানুষের ময়লা-ছিন্নবস্ত্রের অন্তরালে সুন্দর ও পবিত্র মনটি লুকিয়ে থাকে, এর বিপরীতে দেখা যায় পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্ন আবরণের অন্তরালে কলুষিত আর স্বার্থতাড়িত মনটি প্রকট। নিম্নবিত্ত মানুষের সারল্য ও সৎজীবন-যাপন কখনও কখনও দুর্জ্ঞেয় ও স্বার্থমগ্ন উন্নাসিক মধ্যবিত্তকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সৎজীবন-যাপনে যে বাধ্য করে গল্পের ক্ষুদ্র কলেবরে সে দিকটিও স্পষ্ট।

এ গল্পে দেখা যায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণির কথক বিভিন্ন অজুহাতে বাসের ভাড়া কম দেওয়ার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি একটু উন্নাসিক স্বভাবের, পাশের আসনে কোন সাধারণ মানুষ বসলেও তিনি খুবই অস্বস্তিবোধ করেন। একদিন পাশের আসনে বসা এক গরিব লোককে বাসের যথাযথ ভাড়া দিতে দেখে তার চৈতন্যোদয় ঘটে এবং তিনিও যথাযথ ভাড়া প্রদানে মনস্থির করেন। গল্পের ভাষায় :

> আমার চোখ সহযাত্রীর দিকে। সে এক টাকা বের করে কন্ডাক্টরকে দিলে।
> –'কত রাখব?'
> –'চার আনা রাখেন।'
> –'কোথা থেকে আসছেন?'
> –'মালীবাগ থেকে।'
> কন্ডাক্টর তখন বললে, "আমি ভেবেছিলাম সেগুনবাগিচা কি আর কোথাও থেকে চড়েছেন।"
> 'না'। সহযাত্রী বারো আনা খুচরা পয়সা নিতে নিতে জবাব দিলে। এবার আমার পালা।
> আমি একটা সিকি কন্ডাক্টারের হাতে দিয়ে দিলাম। (শওকত, ২০০৩ : ২৯৬)

অবশ্য কথকের এ পরিবর্তন আকস্মিক কিছু নয়, কারণ মানুষের মন বিচিত্র এবং বিচিত্র পরিবেশে মানুষের সংবেদনশীল মন হয়ে ওঠে আরও সংবেদনশীল। আর এ কারণে কথকের ভাড়া দেওয়ার অভ্যাসটিরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আমরা জানি, মানুষের মনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় একটি সদর্থক ধারণা আর-একটাকে প্রভাবিত করে। তাই, পাশের আসনে বসা সহযাত্রীর নৈতিক আচরণ কথককে ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করেছে এবং কথকও তার চিরাচরিত পথ ছেড়ে যথাযথ ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে অধিকতর উন্নত মানবিক সত্তায় উপনীত হয়েছেন।

'বালকের মুখ' (†bÎc_) গল্পে অবিশ্বাস্য সরল ও সাদামাটা মানুষের কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। বালক মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচন করাই এ-গল্পের উদ্দিষ্ট। স্বার্থমগ্ন পৃথিবীর কিছু মানুষ সম্পূর্ণ স্বার্থমগ্নতার ঊর্ধ্বে থেকে সরল-স্বাভাবিক জীবন-যাপন করে আত্মতুষ্টি লাভ করেন; এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বালক করমালি তাদেরই প্রতিনিধি। আশা-সম্পদহীন এবং কোনোরূপ মৌলিক প্রয়োজন ব্যতিরেকে যে আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির পথের সন্ধান পাওয়া যায় বালক করমালি তারই জীবন্ত উদাহরণ। সৎ, সহযোগী, কর্মমুখী করমালি ছিন্নমূল জীবনেরই ভাসমান বুদ্বুদ। কৈশোরক অপরাধের স্পর্শের বাইরে করমালির অবস্থান।

দশ-বারো বছরের করমালি একটা মোটর কারখানায় ফাইফরমাস খাটে। সকাল-সন্ধ্যা পাড়ায় ঢুকলেই তার কণ্ঠ প্রত্যেককে অভিনন্দন জানায়। কোনোরূপ স্বার্থবুদ্ধি বা ন্যূনতম আশা তার চরিত্রকে কলুষিত করতে পারেনি। বরং তার স্বাভাবিক সারল্য আর বিশ্বাস সামাজিক মানুষের তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের মাধ্যমে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, ফলে সামাজিক জীবন থেকেই তিনি পলায়ন করেন অবজ্ঞা-অবহেলা এবং অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে। একদিন অন্য ভৃত্যরা তার সরলতার সুযোগে তরকারির হাঁড়িতে জল দিয়ে খাবার পরিবেশন করেন। সরল বিশ্বাসে করমালি

শুধু জলকেই তরকারি ভেবে খাবার খান। এ দৃশ্য দেখে অন্যরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তা পাড়ার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এর পরের দৃশ্য আরো মর্মান্তিক যা পাঠকচিত্তে আঘাত হানে। "সেদিনই তার প্রাত্যহিক জীবনের সুরে ছন্দে বাঁধা তারটি হঠাৎ নিষ্ঠুর আঘাতে ছিঁড়ে গেল।" (খালেদা, ১৯৯৭ : ৮৮) গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> আমার কানে পড়ল করমালির সমর্থন-পুষ্ট সরল কণ্ঠস্বর, "বাবুর্চি সাব, খালি লবণ একডু কম।"...
> পাড়ায় এ কাহিনি চালু হোয়ে গেল সারা বিকেলের মধ্যে।
> তারপর সন্ধ্যা থেকে কেউ করমালিকে এই পাড়ায় আর কোনদিন দেখে নি। (শওকত, ২০০৩ : ২৯৮)

'বালকের মুখ' গল্পে শিশু মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক বৈষম্যের রূপ ফুটে উঠেছে। ছিন্নমূল শিশুদের প্রতি আমরা দায়িত্বশীল তো নই-ই, বরং সামান্য সুযোগ পেলে তাদের স্বাভাবিক জীবন-যাপনে আমরা যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াই গল্পটি তারই সাক্ষ্য বহন করে। নাম-গোত্রহীন ছেলেটি কখনও কাউকে অসম্মানিত করেননি, এমনকি বিনা পারিশ্রমিকে সবাইকে উপকার করেছেন মনের আনন্দে। অথচ সমাজের মানুষের নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হয়ে সেই ছেলেটিকেই নিজের অন্তরের বেদনাকে সাথী করে, অবহেলা-অপমানের রক্তক্ষরণকে গোপন করে নিরুদ্দেশে যাত্রা করেন।
'জবর খাতির' (Dcjÿ¨) গল্পে মানুষের উন্মত্ততার লেলিহান শিখায় জীবন ঝলসিত। রক্ষাকর্তার জীবনের প্রতি সুবিচারের পরিবর্তে পরিণামে তার প্রতি অবিচার করা মনুষ্যত্বহীন মানুষের জন্য যেন এক স্বাভাবিক জীবনাচার। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে যেমন আছে ভালো দিক, তেমনি আছে অন্ধকারময় দিক। উপকারীর উপকার করার পরিবর্তে কখনো কখনো মানবমনে আদিম প্রবৃত্তি মাথা তুলে ধ্বংসাত্মক পথে চালিত করে। এগল্পে দেখা যায়, যে চালক অন্যের জীবনের ক্ষতি না করে উপকার করেছে, তাকেই শেষে আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়। গল্পের ভাষায়: "অতঃপর গাছের কাটা দুটো গুঁড়ির সাহায্যে গাড়ীর দরজা খোলার পথ বন্ধ করে আততায়ীয়া কেরোসিন যোগে মটরে আগুন লাগিয়ে দিল।" (শওকত, ১৯৬৫ : ১৩)

'আহার্য' (Dcjÿ¨) গল্পে মানবমনের খেয়ালিরূপের প্রকাশভঙ্গি লক্ষ করা যায়| জীবন ও জগতের প্রতি ব্যক্তির বিতৃষ্ণা ও নির্মোহ এ গল্পের মূল সুর। গল্পে সাহায্য নয় আহার্যকেই বড় করে দেখানো হয়েছে। তবে এ আহার্য আবার ভোগ্য নয়, উপভোগ্য। কোনো রকমে টিকে থাকা কিংবা অন্যের অনুগৃহীত হয়ে অস্তিত্বকে রক্ষা করাকে বড় জ্ঞান না করে সংগ্রামশীল জীবন-অভীপ্সায় আহার্যের ভূমিকাকে বড় করে তোলাই এর মূলকথা।

গল্প থেকে জানা যায়, গল্পকথকের কাছে এক ব্যক্তি সাহায্যের জন্য আসেন। জীবনের অর্থহীনতার যন্ত্রণায় তিনি প্রতিমুহূর্তে বিদ্ধ হন। আগত ব্যক্তিটি পোশাকে ভদ্রলোক কিন্তু হাবভাবে ভিক্ষুক। তিনি সাহায্য নয়; কথকের কাছে আহার্য চান। তবে এ আহার্য জুতাপেটা খাওয়া। আর এ বিচিত্র খেয়ালে গল্পকার আশ্চর্য হন, এর ব্যাখ্যা হিসেবে আহার্যপ্রার্থী ব্যক্তি জানান :

> আমি দেখলাম, যদি জুতা পেটা করা যায় তবে ভেতরে মারের চোটে কিছুটা সিদ্ধ হয় বৈকি। রক্ত গরম হয় যেহেতু। আমি তাই প্রতিদিন জুতা পেটা হই। আমি সিদ্ধ পুরুষ হতে চাই। (শওকত, ১৯৬৫ : ৪০)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতাংশ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আগত ব্যক্তি আত্মদ্বন্দ্বে পরাজিত চিত্তের জ্বালা প্রশমিত করতে নির্মম পরিহাসের পথ বেছে নিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বিচিত্র অনুভূতির সমাবেশ, বিতৃষ্ণা, জীবনের প্রতি নিরাসক্তভাব, মানসিক আঘাত মানুষের চরিত্রকে জটিল এবং রহস্যময় করে তোলে এবং তা পরবর্তীকালে বিভিন্ন উপসর্গের মাধ্যমে প্রকাশ পায় যা 'আহার্য' গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন।

'দেশ কাল পাত্র' (†bÎc_) গল্পে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষের চিন্তা এবং সাংস্কৃতিক অনুভূতির ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেশ কাল পাত্রভেদে মানুষের মনোজগতে সাংস্কৃতিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভিন্ন পরিবেশে-ভৌগোলিক ভিন্নতায় বেড়ে ওঠা মানুষের মানসজগতের ব্যবধানও ভিন্ন হয়। কথকের বন্ধু অডেনের কাছে বিদেশে যা স্বাভাবিক-তুচ্ছ বিষয়, এদেশে কথকের কাছে তা গুরুতর বিষয় হিসেবে বিবেচিত। সজ্জন অডেন নিজের স্বচ্ছ হৃদয় দিয়ে জগৎকে দেখেন। তাঁর মতে, দেশ-কাল সব ছাপিয়ে সব দেশেই মানুষ এক। কিন্তু গল্পকারের মতে, প্রত্যেক দেশের রীতিনীতি পৃথক, আচার ব্যবহার স্বতন্ত্র। সুতরাং মানুষের মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। বিদেশে শিক্ষকের সামনে সিগারেট খাওয়া, এক সাথে মদপান করা এবং ড্রাইভারের সাথে 'গার্ল ফ্রেন্ড' নিয়ে আলোচনা করা স্বাভাবিক বিষয় কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এগুলো অশোভন, সর্বসাধারণ এর সাথে পরিচিতও নয়। মূলত প্রত্যেক দেশের নিজস্ব রীতি, নিজস্ব মূল্যবোধ অনুযায়ী গড়ে ওঠে তাদের সংস্কৃতি এবং সেই সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে তাদের মানস জগতেও।

দুঃসময়ে বা প্রতিকূল পরিবেশে মানবমন যে প্রিয়জনের সান্নিধ্য কামনা করে তা 'একটি উপহার' (†bÎc_) গল্পে পরিস্ফুটিত। কথক পাকিস্তানের রোহরী স্টেশন থেকে করাচী আসার কোনো ভালো টিকিট সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন। তিনি বিজনেস প্রশাসক হিসেবে নিজের সুনাম-সুখ্যাতিকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ডেপুটি ট্রাফিক সুপারিনটেন্ডেন্টের সাহায্যে ট্রেনের পোস্টাল ভ্যানের মধ্যে সামান্য জায়গা পেতে সমর্থ হন। উল্লেখ্য, নিরাপত্তার জন্য পোস্টাল ভ্যানের অংশে আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা থাকে না। আলো-বাতাসের স্বল্পতার কারণে কিছু পথ অতিক্রম করার পর কথক প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টে ভোগেন। তার কাছে মনে হয় কে যেন তার গলা টিপে ধরেন এবং বুকের উপর পাথর চাপা দেন। এমন কঠিন সময়ে তিনি স্মরণ করেন পাঁচ বছর বয়সের ছোট কন্যা নন্দিনীর কথা, যে তাকে আসার সময় বলেন : "আব্বু, তোমার সুটকেসে একটা জিনিস দিলাম। খুলে দেখো।" দ্রুত সুটকেস খুলে কথক একটি কমলালেবু পায় এবং এরপর তার শরীর ও মনে প্রাণদায়ী যে অনুভূতির সঞ্চার হয় তা এখানে উল্লেখযোগ্য :

> আহ্, আহ! আমার সমস্ত নাসারন্ধ্রে তখন গন্ধের প্রবাহ নেই শুধু। বাতাস বইছে–বাতাস– যার জন্যে এতক্ষণ কাৎরাচ্ছিলাম। এই বাতাস বৈশাখের দাবদাহ– শেষে মেঘনার উচ্ছল সমীরণ, বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী ঝাউয়ের শন্‌শন্, যমুনার মৃদু তরঙ্গবর্তী কলহাস্য বিহরণ, বর্ষাসবুজ শরৎশ্যামল ক্ষেতে কিষাণী আঁচলের বীজন।...নির্জনতার দুঃসহনীয়তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে বসুন্ধরা আমার কাছে ছুটে আসছে– আহ্। (শওকত, ২০০৩ : ৩২৯-৩৩০)

রাঁতের আঁধারে ট্রেনের মধ্যে কথক যখন দুঃস্বপ্নের সাথে সংগ্রামরত, তখন কমলার মধ্যেই কথক খুঁজে পেয়েছেন প্রিয়জনের উপস্থিতি। মূলত দুঃসহ যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে দিয়েছে কন্যার দেওয়া কমলাটি, যা তার কাছে আশীর্বাদরূপে আবির্ভূত এবং এখানেই মানবমনের বিচিত্রতা।

'খরচ তেরিজ' (†bÎc_) গল্পে বিভিন্ন শ্রেণিগত অবস্থানের মানুষের লালসাবৃত্তিগত ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিগত স্থানে থেকেও সমপ্রবৃত্তিতাড়না তাদের যে একই জায়গায় নিয়ে আসে সে-সত্যই এ-গল্পে উঠে এসেছে। বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা কিংবা সামাজিক বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও বাহ্যাবরণের অন্তরালে দিনের আলোর বিপরীতে অন্ধকার জগতে অনেকের স্বরূপ একই রকম।

অফিস পিওন ইলামদ্দি তার বড় সাহেবের সাথে ঝুলাডাঙ্গা নামক স্থানে বেড়াতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি অনেক খুশি হন, কারণ সেখানে তার পূর্ব পরিচিত এক দেহপসারিনী বাস করেন। পিওনটি রাতের আঁধারে সেই রমণীর ঘরে গিয়ে স্বপ্নাহতের মতোই ফিরে আসেন, কারণ সে ঘরে তখন তার বড় সাহেব অবস্থান করেন। গল্পের ভাষায় :

> আচমকা আমার বুক ধড়কাতে লাইগল! দেহি, একডা ধলা ঠ্যাং!!! বেডী তো ভূত-কালা। হাদা ঠ্যাং কার? চোখ তাইড়া তাইড়া তাকাই।...বা'ইরে বা'ই, এ ঠ্যাং তো চেনা-চেনা লাগে। এই এক বছর কত মালিশ দিছি, কতবার দাবাইছি। এ তো আমার নয়া সাবের ঠ্যাং। (শওকত, ২০০৩ : ২৩৬)

গল্পকার 'খরচ তেরিজ' গল্পে পিওনের দৃষ্টিকোণ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের আরেকটি প্রবৃত্তিতাড়িত বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গল্পে মানব চরিত্রের একটি অন্ধকার দিক প্রত্যক্ষ করা যায়।

Ôগ্রেশামং শরণং' (†bÎc_) গল্পে নেশাগ্রস্ত মগ্নচৈতন্যে গল্পকার অর্থনীতির অধ্যাপক স্যার টমাস গ্রেশামের তত্ত্বটির যথার্থ মাহাত্ম্য খুঁজে পেয়েছেন। গ্রেশামের তত্ত্বটির মূল বক্তব্য ছিল : "Bad money drives away good money out of circulation" অর্থাৎ নকল মুদ্রা আসল মুদ্রাকে বাজার থেকে বের করে দেয়। লেখক বুঝেছিলেন গ্রেশামের তত্তটি শুধু বাজার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এমনকি মানব মনেও এর প্রভাব অত্যধিক। বিশেষ করে দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে এ তত্ত্বটি

বিশেষভাবে প্রযোজ্য। গল্পকার তাঁর মতের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন কয়েকটি উদাহরণ এবং ঘটনার মাধ্যমে। যেমন :

> বৃটিশ আমলে দ্যাখো। মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ প্রমুখ নেতাদের কোন খেতাব ছিল না। বাজারে এদের নাম ছিল অল্পই। নাম থাকত, খেতাব থাকত সব ইংরেজ ধামাধরাদের। বেচারা ভাল লোকেরা তো চাকুরী পর্যন্ত পেত না। ইংরেজদের চোখে তারা দাগী। সৎ লোকেরা দাগী এবং অসতেরা খেতাবী। (শওকত, ২০০৩ : ৩৩৯)

মিথ্যা-মেকির দাপটে সত্য আজ কোণঠাসা। চারদিকে অসৎ মানুষের জয়জয়কার, তাদের দাপটে সৎ মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তেমনি পর্নোগ্রাফির প্রভাবে বাজারে প্রকৃত সাহিত্যের স্থান হয় না। বিভিন্ন অপকৌশলে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে আজ সবাই ব্যস্ত । তাই, প্রকৃত মানুষের মূল্যায়ন না করে মূল্যহীন-তোষামোদি মানুষের দিকে স্বার্থপর মানুষের ঝোঁক বেশি। এটাই যেন মানব প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

যান্ত্রিকতা মানুষের আবেগকে কেড়ে নিয়েছে এবং সেখানে সঞ্চার করেছে বেগ। আর বেগের প্রভাবে মানুষ হারাতে বসেছে তার মনুষ্যত্ব। 'আদি অন্ত' (†bÎc_) গল্পে সমাজ বিবর্তনের ফলে মানবচরিত্রের রূপান্তর এবং নাগরিক জীবনের ছোঁয়ায় আত্মকেন্দ্রিকতা চরম শিখরে পৌঁছানোর একটি দিক উন্মোচিত। তবে, সমাজের এই মনুষ্যত্ববর্জিত রূপান্তরই শেষ কথা নয়, রূপান্তরিত মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষও যে যান্ত্রিক যুগে বিরল নয় তা গল্পের শিল্পভাষ্যে উঠে এসেছে। এ গল্পটি যেন ভালো-মন্দের যৌথতায় মানবপ্রকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমা স্পর্শ করেছে।

'আদি অন্ত' গল্পের প্লট থেকে জানা যায়, কথকের বন্ধু ইউসুফ মৃধা তার এক বড়লোক বাল্যবন্ধুর বাড়িতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা তিনি কথকের কাছে বর্ণনা করেন। ইউসুফ মৃধা কথককে 'সমাজতত্ত্ব' নামে সম্বোধন করেন এবং তিনি 'সমাজতত্ত্ব'কে জানাতে চান সমাজের মূল্যবোধ ও মানুষের মূল্যবোধ পরিবর্তন সংক্রান্ত ঘটনা। ইস্পাত কারখানা দেখার জন্য বাল্যবন্ধুর বাড়িতে আতিথেয়তা গ্রহণ করে তাকেই রাতের খাবার এবং সকালের নাস্তার টাকা পরিশোধ করতে হয়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে যাওয়ার রিকসা ভাড়া পর্যন্ত তাকেই দিতে হয়। তাছাড়া চলে আসার প্রাক্কালে তার বড়লোক বন্ধুর আদিখ্যেতা তার কাছে আরও বেশি পীড়াদায়ক ছিল : 'আহা, এক বেলার জন্যে এমন করে মানুষ আসে।' অন্যদিকে আরেক বন্ধু সাধারণ স্টেশন মাস্টারের বাড়িতে তিনদিনের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং আসার সময় স্টেশন মাস্টারের মা তাকে খাবার পর্যন্ত সাথে বেঁধে দেন, আর এখানেই মানুষে মানুষে প্রকৃতিগত পার্থক্য। মূলত 'আদি অন্ত' গল্পটিতে একদিকে মূল্যবোধবর্জিত এবং অন্যদিকে মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের প্রকৃতিকে পাশাপাশি উপস্থাপন করে মানুষেরই দ্বিবিধ রূপকে তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

‘গোরস্থানে’ (†bÎc_) গল্পে গল্পকথকের ভয়শূন্য হৃদয়ে কীভাবে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং সে অবস্থা থেকে তিনি কীভাবে মুক্ত হন সে-কথাই ব্যক্ত করেছেন। নির্জনতা এবং নিস্তব্ধতা কত ভয়াবহ হতে পারে তা গল্পকার সঙ্গীহীন অবস্থায় কবরস্থান অতিক্রম করারকালে উপলব্ধি করেন। শৈশবে ‘দুষ্টমি বন্ধ করা মায়ের বলা ভৌতিক কাহিনির ফিসফিসানি’ তিনি কল্পনার প্রেতায়িত পরিবেশে যেন শুনতে পান। কবরস্থানের স্তব্ধতার হিম-নিঃশ্বাস কথকের মনে ভীতি আর শূন্যতা ছড়িয়ে যে তাকে অন্য জগতে প্রবেশ করায় তা গল্পের ভাষ্য থেকে প্রমাণিত। যেমন :

> শিরদাঁড়া শির-শির করে। হয়তো এখনই মুখ থুবড়ে পড়ব। আর ভূত-প্রেত আমার ঘাড় ভেঙে দিয়ে যাবে, শুষে নেবে আমার রক্ত। অথবা, চেটে শূন্য করে ফেলবে! তারপর হয়তো ফেলে দিয়ে আসবে লোকালয়ে– যেন ভূতুড়ে পথে আর কেউ হাঁটার সাহস না পায়। (শওকত, ২০০৩ : ৩৫৭)

কবরস্থানের নির্জনতা কথকের মনে মৃত্যুর নির্জনতাকেই যেন স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তার মনে ভয়ের সঞ্চার ঘটায়। গল্পকার ‘গোরস্থানে’ গল্পে মৃত্যুর শীতলস্পর্শ থেকে বের হয়ে আসেন গোরস্থানে ঝিঁঝিঁ পোকার ঝাঁঝর বাজানো, পিঁপড়েদের সারিবদ্ধভাবে চলা, ডাহুক পাখির ডিমে তা দেওয়া দেখে। তিনি প্রত্যক্ষ করেন কবরস্থানও কর্মমুখর। কর্মময়তার চাকার নিচে পোকামাকড়দের ভয় গুঁড়ো হয়ে যায়। কেননা, কাজই ওদের ভীতির দুর্গ চুরমার করে দেয়। জীবের ভয়শূন্য উপস্থিতি কথককেও নির্ভীক হতে সাহায্য করে, এটাও মানব মনেরই আরেক প্রকৃতি।

‘পুরস্কার’ (†bÎc_) গল্পে লেখক মানুষের চৌর্য প্রবৃত্তিকে তুলে ধরেছেন। সুযোগসন্ধানী মানব সন্তানেরা মাঝে মাঝে অন্যের সংগ্রামকে পুঁজি করে নিজেদের বাহাদুরি প্রকাশ করেন, অবশ্য এর পেছনে আর্থিক বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট থাকে। কথক তাঁর তিন বন্ধুকে নিয়ে প্রকৃতি দর্শনে বনের মধ্যে প্রবেশ করেন। তাঁরা সেখানে একটি চিতা বাঘ দেখে আত্মরক্ষার জন্য গাছে চড়ে বসেন। সেখান থেকে তাঁরা চিতা কর্তৃক একটি মোষকে হত্যা করতে দেখেন। মোষের চিৎকারে অনেকগুলো মোষ এগিয়ে আসে এবং একটি বৃত্ত রচনা করে চিতাটাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বাঘটি নিহত হওয়ার পরে ধীরে ধীরে মোষগুলো ময়দান ত্যাগ করলে তিন বন্ধুসহ কথক গাছ থেকে নেমে আসেন এবং নতুন চিন্তায় তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> আমার এক সঙ্গী একটা সরু বাঁশ আর বুনো লতা কেটে নিয়ে এলো।
> জিজ্ঞেস করলাম, ‘কি হবে?”
> “কি হবে?” সঙ্গী হো-হো হাসল প্রথমে। তারপর জবাব দিলে, “এটা মহাকুমা হাকিমের কাছে নিয়ে যাব। বাঘ মারলাম, পুরস্কার নিতে হবে না? ভুলে গেছো বুঝি?” (শওকত, ২০০৩ : ৩৬৪)

এ উক্তির মধ্য দিয়ে কথক ও তার বন্ধুদের দুরভিসন্ধি প্রকাশিত। তারা কর্মভোগী না হলেও ফলভোগী এবং পুরস্কারপ্রত্যাশী। গল্পের একদিকে প্রকৃতির শান্ত সতেজতা, অন্যদিকে প্রকৃতির

সংগ্রাম উভয়ই যেন মানুষকে পুরস্কার যোগায়। প্রকৃতি তাদের পুরস্কার যুগিয়েছে অকৃপণ হাতে কিন্তু তাঁরা পুরস্কার প্রত্যাশী হয়ে উঠেছে চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে।

সংস্কারের অজুহাতে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার কাহিনি বিবৃত হয়েছে 'শকুনের চোখ' (Dfk½) গল্পে। জাগতিক লোভ মানুষকে মিথ্যা বলা এবং কপটতার আশ্রয় নিতে শেখায় যা 'শকুনের চোখ' গল্পের শিল্পভাষ্যে প্রতিভাসিত হয়েছে। গল্পের কথক এবং তার প্রতিবেশী মফস্বল শহরের একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন। কথকের সংসারে জ্বালানি সমস্যা তীব্র। কথকের স্ত্রী কথককে পরামর্শ দেন কোম্পানির বাগানের গাছ থেকে কিছু ডাল কেটে জ্বালানি সংকট দূরীকরণের জন্য। কিন্তু কথক প্রকৃতিপ্রেম এবং নৈতিকতার প্রশ্নে স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করেননি। তবে, কথকের প্রতিবেশীর জ্বালানি সংকট না থাকলেও তিনি সংস্কারের মিথ্যা অজুহাতে একটি প্রকাণ্ড শিমুল গাছ কাঠুরেদের সাহায্যে কর্তন করান। গল্পের ভাষায় :

> প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে বসলাম, "এমন সুন্দর বড় গাছটা কেটে ফেললে?"
> জবাব এলো, "হ্যাঁ ভাই, না কেটে উপায় ছিল না। দেখেছেন, এ গাছে কত শকুন বসে?"
> "তা-তো বসে দেখেছি।"
> তখন ভদ্রলোক বেশ জোরেশোরে বলতে লাগলেন, 'জানেন, শকুনের চেহারা বড় খারাপ। একদম কুযাত্রা। ফজরে উঠলেই শকুনের দুচোখ দেখতে হতো।' (শওকত, ২০০৩ : ৪৩৮)

মূলত 'শকুনের চোখ' শব্দদ্বয়কে গল্পকার প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করে মানব চরিত্রের আরেকটি অনুন্মোচিত প্রান্তকে আবিষ্কার করেছেন। গল্পকার 'শকুনের চোখ' গল্পে শকুনের চোখ বা দৃষ্টিসম্পন্ন সে সব মানুষের কথা বলেছেন যারা প্রকৃতিকে বিভিন্ন অজুহাতে ধ্বংস করার জন্য উন্মুখ। বিবেকবান মানুষ প্রকৃতির মধ্যে সবসময় সৌন্দর্যের সন্ধান করেন, অন্যদিকে বিবেকহীন মানুষ নিজস্বার্থে প্রকৃতির ক্ষতিসাধনসহ তাকে ভোগ্যসামগ্রীতে পরিণত করে।

লেখক মুখোশধারী সভ্য মানুষের অনেক দায়িত্ববোধহীন বিবেকবর্জিত আচরণ প্রত্যক্ষ করে তা সাহিত্যের উপকরণ হিসেবে ছোটগল্পে ব্যবহার করেছেন। 'জাতক কাহিনী' (Dfk½) গল্পে এমনি সভ্যনামধারী মানুষের অধঃগামী বিবেকের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ গল্পে কদর্যতা, বীভৎসতা, অমানবিকতা ও মনুষ্যত্বহীনতার উন্মোচনে গল্প হয়ে ওঠে বাস্তবোচিত।

গল্পের আখ্যান থেকে জানা যায়, অজ্ঞাত দুই নর-নারী তাদের ভোগ-বিলাসের ফসল জীবিত নবজাতককে লোকচক্ষুর অন্তরালে পার্কের পরিত্যক্ত স্থানে ফেলে যায়। নবজাতকটি 'পাপী-তাপী, নেককার, বদকার, বেকার, জীবিকাধারী, বাবুর্চী, মৌলানা, পাহারাওয়ালা, আদমি শরীফ' সবার দৃষ্টিগোচর হলেও চব্বিশ ঘণ্টা বয়সী সদ্যোজাত শিশুটিকে কেউ-ই পরম স্নেহে গ্রহণ করেন না, এমনকি শিশুটির ক্রন্দনেও কোনো দর্শনার্থীর অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে না। সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেলেও আর্তচিৎকাররত শিশুটিকে গ্রহণ করার মতো বিবেকসম্পন্ন কোনো মানুষর অস্তিত্ব খুঁজে

পাওয়া যায় না। শিশুটি 'অঘ্রাণের রোদ লাগতে সে হাই তুলে মোচড় মেরে পা-টা সটান করলে যেন সকলের মুখে লাথি মারবে।' প্রতীকী অর্থেই সদ্যোজাত শিশুটি এ সভ্য সমাজ এবং সভ্য সমাজের মানুষের মুখে পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে করুণ পরিণতি বরণ করেন। নবজাতকটি পৃথিবীর আলো দেখার পূর্বেই দেখেন পৃথিবীর মানুষের নির্মম নিষ্ঠুরতা এবং সেই নিষ্ঠুরতার পথ ধরেই শিশুটিকে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে হয়েছে। লেখক জানাচ্ছেন : "পার্কের ধারে আর পরিত্যক্ত গোটা শিশুটি ছিল না। পড়ে ছিল তার টুকরো ছেঁড়াখোঁড়া অংশ।" (শওকত, ২০০৩ : ৪৪০)

সুনীতি সভ্য সমাজের গোড়ার কথা হলেও কুনীতিই যেন কখনও কখনও প্রধান হয়ে ওঠে। সভ্যসমাজের মানুষের বিবেকহীনতার চরমতম প্রকাশ এ গল্পটি। পরিণামের কথা না-ভেবে দুটি মানুষের লালসা চরিতার্থ করার ফলে জন্ম-নেওয়া শিশুকে কীভাবে নিষ্ঠুর পরিণতি ভোগ করতে হয় তা 'জাতক কাহিনী' গল্পে স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে।

সঞ্চয়ের প্রবণতা মানুষের স্বভাবজাত। সঞ্চয়ের মাধ্যমে মানুষ ভবিষ্যতের নিরাপত্তা এবং ভালো থাকার পথকে কণ্টকহীন রাখতে চান। কিন্তু অতিরিক্ত সঞ্চয়ের ফলে মানুষ যে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিসর্জন দিয়ে ভিন্ন পথে চালিত হতে পারে তা 'জমা-খরচ' (Dfk½) গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে।

গল্পের কথক বিলাতি পাট কোম্পানির দালালরূপে স্টিমারের খবর জানতে সিরাজগঞ্জের জগন্নাথগঞ্জে আড়তদারের বাড়িতে গিয়ে উপনীত হন। আড়তদারের অনুপস্থিতিতে বাইরের ঘরে দুপুরে আড়তদারের বাবাকে এক পেয়ালা ডাল, চুনোমাছ চচ্চড়ি খেতে দেখে কথক আশাহত হন। অবশেষে কথকের খাবার ব্যবস্থা করা হয় অন্দরমহলে কিন্তু সেখানে একাধিক প্রকারের ব্যঞ্জনের পরিবেশনা গল্পকারকে কৌতূহলী করে তোলে। খেতে বসে "আতু-লিয়ো-আতু"– শব্দের অর্থ খুঁজে পান না, অবশ্য পরে জানতে পারেন বৃদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শিয়ালের মুরগী ধরার কৌশল তারা অবলম্বন করেন। কথক আরও বেশি কৌতূহলী হন এবং তা নিবৃত্ত করার জন্য রাতের বেলায় ঐ বাড়ির চাকররা তাকে বিস্তারিত অবগত করেন। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> –সাব, বুড়া এক লম্বর কিপ্টা। ট্যাহা পয়সা মুরগীর লাহান তা দিতে থাকে। পোলাদের খরচ দ্যাহার পারে না। আরো জানা গেল : বুড়া ভয়ানক বদমাস জোতদার। কোন প্রজাকে হাজার বিপদেও এক পয়সা রেয়াৎ দেয় না। ছেলেদের হাল-ফিল চাল-চলন সে পছন্দ করে না আদৌ। ছোট ছেলে বাপের সাথে ঝগড়া করে বিদেশে গেছে পড়তে, আর বাড়ী আসে না।...এখন বুড়ো বোঝে মেহমানরা ভাল খায়, কিন্তু তার সামনে কেউ ভালো কিছু খাক– তার বরদাস্ত করে না। (শওকত, ২০০৩ : ৪০৯)

এ উদ্ধৃতির মাধ্যমে গল্পকার আড়তদারের বৃদ্ধ বাবার কৃপণতা বা কঞ্জুসপনার দিকটি তুলে ধরেছেন যা মানব প্রকৃতিরই একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করেও দীনহীন জীবন-যাপন করা কিছু মানুষের স্বভাবগত তা লেখক 'জমা-খরচ' গল্পে আড়তদারের বাবার জীবনবর্ণনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

'নোট' (Dfk½) গল্পে শওকত ওসমান তির্যক ব্যঙ্গের মাধ্যমে মানব প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালের চিত্র তুলে ধরেছেন। ঘটনাচক্রে মিঃ আকবর খানকে একটি কুকুর আত্মহত্যার হাত থেকে রক্ষা করে। সেই থেকেই কুকুরটি খান সাহেবের জীবনের সাথে যুক্ত হয়ে যায় এবং তার ধ্যান-জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। কুকুরটিকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া হলেও সেটিকে সে কখনও ত্যাগ করে না। শ্যাম নামক এই কুকুরের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তার জীবনী লেখার জন্য লেখকরূপী কথককে তিনি নিয়োগ করেন। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> সত্যি নায়ক। আপনাকে অনেক data তথ্য দেব। ফটো দেব। আপনার লিখতে কোন কষ্ট হবে না। It might come out as a First class biography হয়ত প্রথম শ্রেণীর জীবন-চরিত হোয়ে যেতে পারে। (শওকত, ২০০৩ : ৪১১)

কুকুরটি সম্পর্কে কথক বিস্তারিত নোট গ্রহণ করেন। তবে জীবনী লেখার মাঝপথে আরেক দিন নোট নিতে গিয়ে কথককে জীবনী লেখা স্থগিত করতে হয়, কারণ আমাশয়ে কুকুরটি মারা যায়। কুকুরটির মৃত্যুর পরে খান সাহেব মনের দুঃখে সফরে বেরিয়ে পড়েন। অন্যদিকে লেখক তাঁর পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হন। কুকুরটির জন্য খান সাহেব অনেক অর্থ ব্যয় করলেও লেখকের ক্ষেত্রে তার কার্পণ্য লক্ষ করা যায়। কুকুরটির জন্য তার মায়া হলেও লেখকের প্রতি তার কোনো দরদ বা দায়িত্ববোধ বা বিবেকের দংশন প্রকাশ পায় না। মূলত, মানব চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্যকে গল্পকার 'নোট' গল্পে পশুপ্রবৃত্তির সাথে তুলনা করেছেন।

পাকিস্তান কালপর্বে রচিত গল্পে শওকত ওসমান মানব প্রকৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে বহুকৌণিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন। গল্পকার মানবমানবীর হৃদয়ের বিচিত্র ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াকে তুলে ধরতে কখনো অন্তর্বাস্তবতা আবার কখনো বহির্বাস্তবতার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

cvP : ag I agZš

"শওকত ওসমান পূর্ব বাংলার ছোটগল্পের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ধারাটির প্রতিনিধি। সুদীর্ঘ জীবনের প্রতিটি বাঁকে তিনি ক্রমাগত আরও উদার এবং আধুনিক হয়ে উঠেছেন, সেই সঙ্গে সৃষ্টিধারাও থেকেছে অবিরাম অব্যাহত।" (সানজিদা, ২০০২ : ১৭৬) গ্রামের ও পরবর্তীকালে কলকাতার মাদ্রাসা-ই-আলিয়ায় পড়াশোনার সূত্রে এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে লেখকের মধ্যে ইতিবাচক এবং নেতিবাচকতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এক ধরনের ধর্মীয় বোধ। বাংলা কথাসাহিত্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারের বিরোধিতায় শওকত ওসমান অনেকাংশে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমগোত্রীয়, তবে প্রকাশভঙ্গিতে তিনি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অপেক্ষা উচ্চকণ্ঠ। তাঁর ছোটগল্পে ধর্ম এবং ধর্মতন্ত্রের যে প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করা হলো।

‘পিতাপুত্র’ (c¯Íi djK) গল্পে বকধার্মিক সেজে ইহলোকে কীভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করা যায় তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। আমাদের সমাজে অনেক মানুষের মধ্যে দেখা যায় তাদের কাছে ধর্মচিন্তা থেকে কর্মচিন্তা অনেক বড়। ধর্মচিন্তা তাদের কাছে ব্যবসা বা সম্পত্তি রক্ষার হাতিয়ার মাত্র। এ গল্পে মূল বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে পিতাপুত্রের কাহিনিসূত্রে।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হাসিব সাহেব এবং তার দুই পুত্র, তারা সকলে নিজেদের বুদ্ধিমান এবং কৌশলী মনে করেন। হাসিব সাহেব প্রায়ই কথাসূত্রে ছেলেদের বলতেন ‘পুরাতন চাল ভাতে বাড়ে’ এবং তার সুযোগ্য ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করত ‘বেশী পুরাতন গন্ধ ছাড়ে।’ হাসিব সাহেব চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছেন কিন্তু স্বার্থচিন্তা থেকে অবসর গ্রহণ করেননি। সংসার তিনি ছেলেদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন সত্যি, কিন্তু চাবিকাঠি নিজের দখলেই রেখেছেন। সংসারে যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখন সেখানে তিনিই সর্বময়কর্তা। হাসিব সাহেবের কর্মচিন্তার আবরণে সবসময় ব্যবসায়িক স্বার্থবুদ্ধিই সজীব থাকে। হাসিব সাহেব লক্ষ করেন শহরে জমির দাম অবিরাম গতিতে বেড়েই চলেছে। এ সময় তিনি ছেলেদের অমতে পরিত্যক্ত সাত-আট বিঘা জমি ক্রয় করেন। কিছুদিন পরে তিনি সে জমিতে একটি মসজিদ এবং পুরাতন বাসিন্দাদের স্মরণ করে জমির চারধারে চারটি কবর বাঁধাতে চান। ছেলেরা এ অনাবশ্যক খরচে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং বাবার কাজে বাধা প্রদান করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ছেলেদের সাথে হাসিব পত্নীর যে কথোপকথন হয় তা এখানে উদ্ধারযোগ্য :

> হ্যাঁ মা। বাড়ীতে কেউ নামায পড়ে না, অথচ ভিটেয় মসজিদ? এমন কথা কখনও শুনেছেন?
> উনি বলছেন ত মসজিদ দেবেন।
> কিন্তু কেন?
> ওর যদি ধর্মে মতি হয়, তোরা বাধা দিস না।...
> কিন্তু আব্বা ত ভুলেও পশ্চিম দিকে আছাড় খান না। তখন কি করবেন? (শওকত, ২০০৩ : ২৬৩)

হাসিব চৌধুরী ছেলেদের বাধা সত্ত্বেও মসজিদ এবং চারটি পাকা কবর নির্মাণ করেন। ইতোমধ্যে সরকার রাস্তা তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণ করার ঘোষণা দেয়। এতে হাসিব চৌধুরীর ছেলেরা অস্থির হয়ে ওঠেন কিন্তু তিনি থাকেন নির্বিকার। পরিশেষে জানা গেল মসজিদ এবং কবর থাকার কারণে হাসিব চৌধুরীর জমি সরকার অধিগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিবর্তে রাস্তা একটু অন্য পাশ দিয়ে তৈরি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় হাসিব চৌধুরী ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে সম্পত্তি রক্ষার জন্য পূর্ব থেকে এ পরিকল্পনা করেন। প্রকৃতপক্ষে হাসিব সাহেবের এই চিন্তার মধ্যে তার ব্যবসায়িক বুদ্ধি যে স্পষ্ট তা বোঝা যায় গল্পের পরিসমাপ্তিতে। হাসিব চৌধুরীর ভাষায় : “শোন, কবর-টবর ও সব কিছু না। স্রেফ গুল-নাম্বার ওয়ান, কাউকে বলিসনে খবরদার।” (শওকত, ২০০৩ : ২৬৪) মূলত স্বার্থবুদ্ধি যে ধর্মীয়বোধ এবং মনুষ্যবিবেককে লুপ্ত করে দেয় তা হাসিব চৌধুরী এবং তার কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে লেখক ‘পিতাপুত্র’ গল্পে তুলে ধরেছেন।

'দুই মোনাজাত' (Dcjÿ¨) গল্পের একদিকে বর্বর পৈশাচিকতায় সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিলাষ এবং অন্যদিকে ধর্মীয় বাতাবরণে আত্মরক্ষার হীনচেষ্টা ফুটে উঠেছে। ঈশ্বরকে পাশে পাওয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা গল্পটিকে ভিন্নমাত্রায় উপনীত করেছে। ঈশ্বর যেন এ গল্পে অভিপ্রায় পূরণের হাতিয়ার। জাতি-গোষ্ঠীর স্বার্থ-সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ঈশ্বরকে ব্যবহার করা অধর্মেরই নামান্তর। তবে কি ঈশ্বর নির্বিকার থাকবেন? পোপ স্বয়ং এখানে সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক। প্রকৃতিকে স্বাভাবিক নিয়মে চলতে দিলে সাম্রাজ্যবাদের উন্মত্ততা দৃশ্যমান হওয়ার কথা নয়। এ গল্পে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের দ্বন্দ্ব সুস্পষ্টরূপে প্রতীকায়িত হয়েছে।

১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইটালি এবং আবিসিনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তখন ইটালির শাসক ছিলেন মুসোলিনী এবং আবিসিনিয়ার শাসক ছিলেন সম্রাট হাইলে সেলাসী। গীর্জায় মুসোলিনীর পক্ষে ধর্মযাজক পোপ এবং সম্রাট হাইলে সেলাসী নিজেদের পক্ষের জয় এবং অপরপক্ষের পরাজয় ত্বরান্বিত করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন অথচ উভয়েই খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত ও খ্রিষ্টান রাজ্যের অধিবাসী। গল্পের ভাষায় :

> পোপ। হে করুণাময় প্রভু ও লর্ড---তুমি সব ঋতুর মালিক। তুমি সকল শক্তির আধার। তুমি ইচ্ছা করলে কি না করতে পারো। তাই আমরা প্রার্থনা করছি, তোমার দরবারে সকল মিনতিসহ হে প্রভু--- এবার বর্ষা একটু দেরীতে, এই জোর পনর দিন, তার বেশি না, একটু দেরীতে নামাও। তাহলে দেখে নেব ওই কালা আদমিগুলো কত লড়ে? জানো তো প্রভু, বৃষ্টি নামলে আমাদের সাঁজোয়া গাড়িগুলো কাদায় আর হাঁটতে পারে না----। দয়া করো প্রভু---আমেন।
>
> সেলাসি। হে করুণাময় প্রভু ও লর্ড---তুমি সব ঋতুর মালিক---তুমি সকল শক্তির আধার। তুমি ইচ্ছা করলে কি না হয়। আমরা মিনতি জানাই তোমার দরবারে, ও লর্ড এবার বর্ষা একটু আগে নামিয়ে দাও---বেশি না পনের দিন আগে হে দয়াময়। তাহলে দেখে নেব ওই ধলা চামড়াওয়ালাগুলো কত লড়াই করে। তুমি তো সবই জানো প্রভু, বৃষ্টি না নামলে আমাদের সর্বনাশ। ওই শিক্ষিত সভ্য বর্বরগুলো তাদের মেশিন দিয়ে আমাদের শেষ করে ফেলবে---আমরা টিকতে পারব না---তুমি অসহায়ের বল---আমেন। (শওকত, ১৯৬৫ : ৬-৭)

এ গল্পে লেখক ধর্মধ্বজাবাহীদের ব্যঙ্গ করেছেন। তাদের ধর্মপালনের মধ্যেই নিহিত আছে ধর্মহীনতা, যা গল্পকার মাত্র দুটি সংলাপের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতীকায়িত করেছেন।

'কালের অপরাধ' (Dcjÿ¨) গল্পে "ধর্মের নামে অন্ধ আবেগের কথা এবং হঠকারী আচরণের চিত্র উদ্ভাসিত" (অনীক, ১৯৯৫ : ১৫২) এবং সাথে কালের চেহারাটিই প্রকটিত। খেলাফত আন্দোলনে ধর্মীয় চেতনা কালো চেহারা নিয়ে প্রকাশিত। এখানে তারুণ্যের জোয়ার ধর্মীয় সংস্কারে কারারুদ্ধ। গল্পকার ১৯২০ কিংবা ১৯২২ সালের ঘটনাকে গল্পের প্রেক্ষাপট হিসেবে তুলে ধরেছেন। এ সময় খেলাফত আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। খেলাফত আন্দোলনের কর্ণধারেরা সে সময় এক যুবককে মাথা নাড়া করে ও গলায় জুতার মালা পরিয়ে 'শরিয়ৎ-খেলাফ্কারির' (?) শাস্তি দেয়। শাস্তির কারণ

হিসেবে তারা ব্যাখ্যা দেয় : "গ্রামোফোন কি ছাই বলে– তাই কিনে এনে গান শুনিয়ে শুনিয়ে গাঁ নষ্ট করছিল। আজ ওটার দফারফা করেছি।" (শওকত, ১৯৬৫ : ১৪)

মূলত এ গল্পে খেলাফত আন্দোলনকারীরা ধর্মের বাতাবরণে রক্ষণশীল মনোভাব প্রদর্শন করেছে এবং কালের চাহিদাকে অস্বীকার করে 'কালের অপরাধ' হিসেবে বিবেচনা করেছে।

ধর্মীয় উন্মাদনা-উগ্রতা কীভাবে পাগলামিকে ছাড়িয়ে যায় তারই শিল্পভাষ্য 'যোগাযোগ' (Dcj ÿ¨) গল্পটিতে উপস্থাপিত হয়েছে। ধর্মীয় উন্মাতাল পরিস্থিতিতে ধর্ম রক্ষায় চেয়ে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা রক্ষার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। ধর্মীয় বিবেক এখানে পরাজিত, কেননা ধর্মীয় সংস্কার রক্ষাই তাদের বড় দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত।

গল্পের তাড়িখোর লোকটি মাতাল হলেও তার স্বার্থচিন্তা নেই, তবে অন্যের স্বার্থভাবনা আছে : "কারো ভাতের থালায় আমি পা দিতে পারব না বাবা।" (শওকত, ১৯৬৫ : ১৬) তাই যখন তিনি জানতে পারেন তার আজান দেওয়ার কারণে আরেকটি পরিবার পথে বসেছে, তখন কিনি নিজেকে আজান দেওয়া থেকে বিরত রাখেন এবং সাবেক ইমামকে নিজ পদে ফিরিয়ে আনেন। প্রকৃত অর্থে "ধর্মকে মুক্তবুদ্ধি ও স্বচ্ছ জীবনজিজ্ঞাসায় গ্রহণ না করে অন্ধ আবেগে যদি এর দিকে অনুরক্ত হওয়া যায়, তাহলে সেখান থেকে বড় কিছু প্রত্যাশা করা যায় না।" (অনীক, ১৯৯৫ : ১৫২)

'দুই ধার্মিক' (Dcj ÿ¨) গল্পে ধর্মীয় সংস্কার শক্তি প্রদর্শনে হাতিয়াররূপে প্রতিবিম্বিত। ঈশ্বরও যেন এ গল্পে নির্মমতার খেলনা হিসেবে আবির্ভূত। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই যে ধর্মের ঝাণ্ডা উড়িয়ে এক-অপরের প্রতি যুদ্ধংদেহী মনোভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারই শিল্পরূপ 'দুই ধার্মিক'। হিন্দু-মুসলমানের ধর্মানুভূতিকে কেন্দ্র করে দাঙ্গার প্রত্যক্ষ চিত্র গল্পে প্রতীকায়িত :

> প্রথম। (গলির এপার হইতে) হিন্দু কা মা কা, বহেনো কা.................আল্লাহো আকবর।
> দ্বিতীয়। (গলির ওপার হইতে) মুসলমান কা মা কা, বহেনো কা............বন্দেমাতরম। (শওকত, ১৯৬৫ : ৩০)

মাত্র দুটি সংলাপের বুননে গল্পকার হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার ভয়াবহতাকে শৈল্পিক মূল্যদান করেছেন। হিন্দু-মুসলমানের উগ্রবাদী সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা এবং রাজনীতিবিদদের নেতিবাচক স্বার্থচিন্তা সে সময়ের পরিবেশকে কীভাবে প্রকম্পিত করেছিল তা আলোচ্য গল্পে উপস্থাপিত।

'একটি বহস' (†bÎc_) গল্পে একটি অপ্রয়োজনীয় ধর্মীয় বিতর্ককে অবলম্বন করে গল্পকার শেষ পর্যন্ত ধর্মের ছদ্মাবরণে এর যে অন্তঃসারশূন্যতা ও আন্তরিকতাহীনতার উন্মোচন ঘটান, তা প্রশংসাযোগ্য। একই রাষ্ট্রে দুটি জাতির ধর্মীয় আবেগের বাড়াবাড়ি ধর্মীয় আবিলতামাত্র। ক্ষুধার্ত শিশুর ক্ষুধার উদারস্পৃহা সিয়ামের ধর্মকে অতিক্রম করে জৈবিক আকাঙ্ক্ষার জয়গান ঘোষণা করলে

Dhaka University Institutional Repository

তাকে শাস্তি পেতে হয় কিন্তু ধর্মের ধ্বজাবাহীরা একাজ করলে সমাজ-ধর্ম তাদের শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে বাহবা দেয়। মূলত এ গল্পে ধার্মিকদের ছদ্মাবরণের মুখোশকে উন্মোচন করতে লেখকের সযত্ন প্রয়াস সহজেই চোখে পড়ে।

'একটি বহস' গল্পে কাজের অবসরে চারবন্ধু ডাঃ আশরাফ ত্রিপুরা নিবাসী, জনাব বাহাদুর পাঠান, মালাকান্দ এলাকার বাসিন্দা সলিম মোমন্দ এবং গল্পের কথক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি মানুষের ধর্মভীরুতার বিষয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হন। তাঁরা হৃদয়ের দিক থেকে অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থান করলেও যুক্তির বিষয়ে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করেন। ডাঃ আশরাফ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ কিন্তু তিনি মনে করেন পূর্ব পাকিস্তানের থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ বেশি ধর্মভীরু। অন্যদিকে অঙ্কে এম.এস.সি করা পশ্চিম পাকিস্তানের সলিম মোমন্দ গাণিতিক যুক্তিতর্কে প্রমাণ করেন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বেশি ধর্মভীরু। উভয়ের মধ্যে যুক্তিতর্ক যখন সপ্তমে— সে সময় বিতর্কের মধ্যে এসে পড়েন তাদেরই বন্ধু গম্ভীর-উদার প্রাণ জান খাঁ। তিনি বিতর্কের ইতি টানতে এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের ধর্মভীরুতার পরিচয় দিতে গিয়ে একটি গল্পের অবতারণা করেন। তাঁর এক বন্ধু আমির খান হোস্টেল সুপার ছিলেন। রমজান মাসে বাচ্চু নামে এক ছাত্র হোস্টেলে দুপুরে মাংস রান্না করলে হোস্টেল সুপার তাকে হাতেনাতে ধরে প্রিন্সিপালের বিচারে কুড়ি টাকা জরিমানা করেন। কারণ 'রেশনকন্ট্রোলের যুগে ধর্মকর্মের উপরও কন্ট্রোল বসে।' কিন্তু ইত্যবসরে অন্যান্য ছাত্ররা তার রান্না করা মাংস খেয়ে নেন। ছাত্রটি প্রিন্সিপালকে জানায় : 'হুজুর আপলোগ হামারা তো বিশ রুপেয়া ফাইন কিয়া, উধার হামারা দোস্ত লোগ তো সব খা লেগা।' একথা শুনে প্রিন্সিপালের দয়া হয় এবং প্রিন্সিপাল ছাত্রটিকে তাঁর বাসায় খাবারের নিমন্ত্রণ জানান। গল্পের ভাষায় :

> "বাচ্চু–"।
> "হুজুর।"
> ওর কাঁধে সস্নেহে হাত রাখলেন পরে।
> রোদে পোড়া বেচারার কচি মুখ শুকিয়ে এতটুকু। দেখে সত্যি মায়া হয়।
> তাই বোধ হয় প্রিন্সিপাল বললেন, "বেটা, চলে আও, মেরা সাথ। দো-পহর কা খানা খা লো।" (শওকত, ১৯৬৫ : ৩০২)

এ থেকে প্রমাণিত হয় শুধু বাচ্চু নয়, ঐ মাদ্রাসার কোনো ছাত্র এমনকি প্রিন্সিপালও রোজা পালন করেন না। তবু রোজা না থাকার জন্য এবং দুপুরে রান্না করার জন্য জরিমানা দিতে হয় কোমলমতি ছাত্রদের। মূলত এ গল্পে ধর্মপালনের নামে ধর্মহীনতার যে প্রহসন আমাদের সমাজে প্রচলিত, গল্পকার সেদিকের প্রতিই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

'রাস্তার হদিস' (†bÎc_) গল্পে ধর্মকেন্দ্রিক ব্যবসায়ীদের চরিত্র উন্মোচিত। এ গল্পে একদিকে অসহায় মানুষেরা ধর্মকে পুঁজি করে দু-পয়সা আয়ের চেষ্টা করছে, অন্যদিকে ধর্মের ধারক-বাহকরূপী মোড়লদের মধ্যে ধর্মকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় অনৈক্য।

গল্প থেকে জানা যায়, ঈদ উপলক্ষে বাড়তি আয়ের জন্য বৃদ্ধ পঙ্গু খবির তার দুভাতিজা মনীর ও বশরের সাহায্যে শহরের পথে গমন করেন। তাদের আশা এ দিনে তারা পঞ্চাশ-ষাট টাকা আয় করবেন। কিন্তু কথকের কাছ থেকে তারা যখন জানতে পারেন আগামীকাল ঈদ হবে না, তখন তারা আশাহত হন। কিন্তু তারা তারপরও একটি নতুন আশায় ভর করে শহরের পথে যাত্রা করেন। তাদের ধারণা সন্ধ্যায় একদল মানুষ 'আগামীকাল ঈদ হবে' বলে জানিয়েছেন এবং রাত বারোটায় আরেকদল মানুষ 'আগামীকাল ঈদ হবে না' বলে জানাবেন। সম্বলহীন মানুষগুলোর ধারণা ঈদ দুদিনই হবে। কারণ এখানে চরমভাবে ধর্মীয় চিন্তার অনৈক্য বিরাজিত। গল্পের ভাষায় :

> ল্যাংড়া জন মারমুখো রবে বলে, এই হালারা কডা দল বানাইছে? এক হালারা কয় অইব, আর হালারা কয় অইব না।...
> বশর বললে, চাচা চলেন শহরৎ। ও হালা একদল কইছে অইত ন, আর এক দল কইছে অইব। দুই দিনই অইব। ডরান না। হে আমার জানা আছে। (শওকত, ২০০৩ : ৩৩৪)

সমাজে একদল মানুষ প্রতি বছর ঈদের চাঁদ দেখা নিয়ে ধর্মকেন্দ্রিক ধুম্রজাল সৃষ্টি করতে তৎপর থাকে। তবে এদের লক্ষ্য স্বার্থসিদ্ধি নয়, বরং ধর্মকেন্দ্রিক বিভিন্ন উপদল সৃষ্টি করা। এর ফলে সাধারণ এবং ধর্মপরায়ণ মানুষ ধর্মের ঠিক রাস্তা খুঁজে পেতে দিশাহারা হয়ে পড়েন।

ধর্মান্ধ সমাজের ধর্মান্ধ মানুষ ধর্মের আচার পালন করতে গিয়ে সব সময় মানবতাকে হত্যা করে চলেছেন। কিন্তু ধর্মের বলি হওয়া সাধারণ মানুষও একসময় ধর্মীয় আচার এবং মোল্লা-পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রকৃত ধর্মের পথ সন্ধান করেন। 'কিংবদন্তী' (Dfk½) গল্পে এমন-ই ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ লক্ষ করা যায়।

কিংবদন্তি থেকে জানা যায়, সীতাকুণ্ড পাহাড়ের চূড়ায় প্রতি অমাবস্যার রাতে কালীদেবীর উদ্দেশ্যে ডাকাত দল কর্তৃক নিরীহ গৃহস্থ ছেলে বা মেয়েকে ভুলিয়ে এনে বলি দেওয়ার প্রথা ছিল। একবার এক বালিকাকে দস্যুরা ধরে নিয়ে আসেন এবং তার তদারকিতে রাখা হয় পুরোহিতের ভৃত্য এক বাগদি পুরুষকে। বলিদান প্রথার অমানবিকতা বালিকার প্রতি ভৃত্যের মনে করুণার সঞ্চার করে এবং বালিকাকে বাঁচাতে উদ্বুদ্ধ করে। বলিদান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বালিকাটি ভৃত্যের পরামর্শ অনুসারে বোবার অভিনয় করে এবং সে যাত্রা রক্ষা পায়। পরবর্তী দিন আবারও ভৃত্যের পরামর্শানুসারে মন্দির থেকে মাটির প্রতিমাকে ফেলে দিয়ে সেখানে খড়ুগ হাতে বালিকাটি অপেক্ষা করে এবং সে রুদ্রমূর্তি দেখে পুরোহিতের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। লেখক জানাচ্ছেন :

হঠাৎ হকচকিয়ে পুরোহিত জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কে মা?"
"মূর্খ তুই আমাকে কি করে চিনবি! তুই পুরোহিত নস, তুই জল্লাদ। তোর হাতে কত মৃত্যু হয়েছে তার ঠিক আছে! তুই কি করে আমাকে চিনবি?"
"সে ত তোমার আদেশ, মা।"
"মূর্খ, মানুষ মেরে ধর্ম রক্ষা, আমার আদেশ?" খিলখিল হেসে উঠল বালিকা এবং বললে, "এমন শাস্ত্রে আগুন লাগিয়ে দিস্‌নি কেন?"...
বাগদী ভৃত্য তখন পাল্টা জবাব দেয়, "মৃত্যুর রাস্তা তৈরী করে তাকে তুই বলিস শাস্ত্র, ধর্ম? নরাধম। বহু দিনের ঝাল আজ ঝেড়ে নিই। দরিদ্রের কত সন্তান তুই বধ করেছিস। কিন্তু তোর সঙ্গে তর্ক বৃথা"— সে আর কথা বলে না। খড়ুগ চালায়। পুরোহিতের দ্বিখণ্ডিত দেহ লুটিয়ে পড়ল। (শওকত, ২০০৩ : ৪২৭-৪২৮)

শুদ্ধ ধর্মবোধ মানুষকে যেমন সৎপথের সন্ধান দেয়, তেমনি অসত্য ধর্মীয় আচার মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্বকে কেড়ে নেয়। আর তখনই দেবতার নামে মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ এবং ধর্মীয় আচার প্রকৃত ধর্মীয় বিচারের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সমাজকে পশ্চাৎপদ করতে বাধ্য করে। তবে, মানুষের মধ্যে আবার যখন শুদ্ধ ধর্মবোধের উদয় হয়, তখন অধর্ম পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয় যা পুরোহিতের হত্যার মধ্য দিয়ে 'কিংবদন্তী' গল্পের কলেবরে প্রকাশিত।

ধর্মের নামে কীভাবে মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ এবং অন্যের অনিষ্ট সাধন করে তারই শৈল্পিক রূপ প্রকাশিত হয়েছে 'ষাঁড়' (Dfk½) গল্পে। আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় মৃত ব্যক্তির নামে ধর্মের বাতাবরণে ষাঁড়কে বন্ধনমুক্ত করে দেওয়া একটি সাধারণ রেওয়াজ। কিন্তু এই ধর্মীয় লেবাসধারী মুক্ত-ষাঁড় অনেকের ক্ষতিসাধন করলেও ধর্মীয় আবেগে অথবা ষাঁড়ের মনিবের ভয়ে কেউ কোনো উচ্চবাক্য করে না। এ গল্পের প্রধান চরিত্র হরিপদ মজুমদারের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তার প্রিয় বিপণী বিতানে একাধিক সময়ে একাধিক ধর্মের ষাঁড় এসে চাল, ডাল, জামা-কাপড় পর্যন্তও গলাধঃকরণ করে। ত্যক্ত-বিরক্ত, অত্যাচারিত হরিপদ মজুমদার ষাঁড়কে শায়েস্তা করার জন্য পুরনো আমলের একটি গাদা বন্দুক নিয়ে তাড়া করে নিজেই ষাঁড়ের মনিবের চোখ রাঙানিতে পশ্চাৎগমন করেন। গল্পের ভাষায় :

ওরা ভেংচি না দিয়ে হেসে উঠল। তারপর জবাব দিলে, "কেন? কেন? তবে শুনে রাখুন। ষাঁড়টা আমার স্বর্গীয় বাবার নামে উৎসর্গ করা...একবার গুলী ছুঁড়ে দেখেন না...।"
উৎসর্গিত ষাঁড়ের দোহাই।
ধর্মের ষাঁড়। (শওকত, ২০০৩ : ৪৫২)

অবশেষে ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিক্ষুব্ধ হরিপদ মজুমদার সেই স্থান থেকে মুদি দোকানটি তুলে নিতে বাধ্য হন। মূলত, " 'ষাঁড়' গল্পটি বর্ণনাত্মক ও সাদামাটা হলেও শওকত ওসমান একটা জন্তুর ভেতর দিয়ে মানুষের ধর্মীয় আবেগের ভিন্নতর চেহারা দেখিয়েছেন।" (শোয়েব, ১৯৯১ : ৫৩)

ধর্মীয় রীতিনীতি পালন অপেক্ষা লৌকিক আচার মনুষ্যসমাজে কীভাবে বড় হয়ে ওঠে এবং সাধারণ মানুষের জীবনে ভয়াবহতা ডেকে আনে তা 'দানসত্র' (Dfk½) গল্পে বিবৃত হয়েছে। ধর্মের নামে দাতার হঠকারী সিদ্ধান্ত যে মনুষ্যজীবনে বিপর্যয় বয়ে আনতে পারে তার নির্মম শিল্পভাষ্য 'দানসত্র' গল্পটি।

কোটিপতি কালাম মজুমদার অভিনব প্রক্রিয়ায় দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ প্রক্রিয়ায় অনেক জীবনহানির সম্ভাবনা অনুমান করে অনেকে এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য অনুনয়-বিনয় ও উপদেশ প্রদান করলেও তিনি তার সিদ্ধান্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন। তিনি দান গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিছু নিয়মনীতি বেঁধে দেন। বিশাল প্রান্তরে শক্ত কাঠের বেড়া দিয়ে ছোট ছোট খোপ তৈরি করে প্রতি খোপে এক পয়সা থেকে আরম্ভ করে একশত টাকার নোট পর্যন্ত রাখা হয় এবং শেষ ফটক পার হয়ে এক হাজার টাকার নোট গ্রহণ করতে হবে কালাম মজুমদারের কাছ থেকে। দান গ্রহণ করার জন্য ভিখিরি থেকে আরম্ভ করে চোর, ডাকাত, বেকার যুবক, গুণ্ডা ও অনেক শরীফ লোক পর্যন্ত নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হয়। আসার পথে অনেক দানপ্রার্থী নৌকা ডুবি ও সড়ক দুর্ঘটনায় অকালে মারা পড়েন। অখ্যাত গৌড়গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে জনসমুদ্রের ঢেউ জাগে। দান গ্রহণ করতে গিয়ে হাজার হাজার মানুষ পদপিষ্ট হয়ে এবং কাঁটা তারের বেড়ার আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। দানগ্রহণস্থল রক্তের বন্যায় ভেসে যায় এবং ভুক্তভোগীদের চিৎকারে সেখানকার বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। দিনাজপুর থেকে আগত দানপ্রার্থী মায়মুনা বেগম নিজের বিধবা মেয়ের কিশোর ছেলেকে পদপিষ্ট এবং তার জোয়ান ছেলেকে কাঁটা তারের বেড়ায় ঝুলে মরতে দেখে উন্মাদ হয়ে পড়েন। কিন্তু মজুমদার তখনও নিরাবেগে পঞ্চাশ ফুট উচ্চতার একটি বেদী থেকে অগণিত মানুষের মৃত্যুযাত্রা পর্যবেক্ষণরত। গল্পের ভাষায় :

> মায়মুনা বিবি আর কাঁদেনি। লাশ দেখে শুধু হেসেছিল। কোলাহল একটু থিতিয়ে এলেই তার হাসি শোনা গেছে অনেক দূর থেকে। অনেকক্ষণ ধরে।
> এইভাবে সূর্য একসময় অস্ত গেল। দানও বন্ধ। একশো টাকার খোপে মাত্র কয়েকজন পৌঁছেছিল। সেখানে একখানা নোট গ্রহণ করার নিয়ম। তাই নিয়ে তারা চলে গেছে। ভিড়ে আইন ভাঙা যায়। এখানে তা সম্ভব ছিল না।
> মজুমদারের পনের আনা টাকাই বেঁচে গিয়েছিল। (শওকত, ২০০৩ : ৪৫৮)

কালাম মজুমদারের এ খামখেয়ালির জন্য অনেক প্রাণ অকালে ঝরে যায়। ধনী মানুষের দান করার এ বিলাসিতার কারণে আমাদের দেশে প্রতি বছরই এধরনের অসংখ্য প্রাণহাণি ঘটে। মূলত ধর্মীয় আচারকে কীভাবে লোক দেখানো লৌকিক আচারে পরিণত করা হয়েছে তা 'দানসত্র' গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

শওকত ওসমানের ব্রিটিশ কালপর্ব এবং পাকিস্তান কালপর্বে রচিত ধর্ম ও ধর্মতন্ত্র বিষয়ক গল্পগুলোর মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য চোখে পড়ে না। এ পর্বে রচিত গল্পেও ধর্মের নামে কীভাবে মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ এবং ধর্মীয় রীতিনীতি পালন অপেক্ষা লৌকিক আচার মনুষ্যসমাজে কীভাবে বড় হয়ে ওঠে তা গল্পকার নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে এপর্বে তুলে এনেছেন। তাছাড়া ধর্মীয় সংস্কার শক্তি প্রদর্শনে হাতিয়াররূপে কীভাবে ব্যবহৃত হয় এবং ধর্মপালনের নামে ধর্মহীনতার যে প্রহসন আমাদের সমাজে বিদ্যমান সে বিষয়ের উপরেও গল্পকার সমান গুরুত্বারোপ করেছেন। ধর্মের ছদ্মাবরণে মুখোশ খুলে তার অন্তঃসারশূন্যতা ও আন্তরিকতাহীনতাকে উন্মোচন করতে গল্পকারের প্রয়াস এপর্বে প্রশংসাযোগ্য। এছাড়াও ধর্মের ধারক-বাহকরূপী ধর্মব্যবসায়ীদের ধর্মকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনৈক্য পাকিস্তান কালপর্বে রচিত গল্পের শিল্পভাষ্যে উপস্থাপিত।

Qq : fvlv I wkÿvgjK

সমাজাভিজ্ঞ শওকত ওসমান বরাবর ভাষা এবং শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর এ সচেতনতাকে আরও বেশি ঋদ্ধ করেছিল শিক্ষকতা পেশা। তিনি বি.এ. পাস করার পর পেশাগত জীবনের প্রথমে তিনি অস্থায়ীভাবে কাজ করেন গ্রামের জুনিয়র মাদ্রাসার হেডমাস্টার পদে। এরপর তিনি ১৯৪২ সালে কলকাতার কমার্স কলেজে বাংলা বিভাগে প্রভাষকের পদ থেকে আরম্ভ করে সুদীর্ঘ তিরিশ বছর (১৯৪২-১৯৭২) শিক্ষকতা পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন। শিক্ষকরূপে শওকত ওসমান সর্বাংশে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। একজন শিক্ষকরূপে তাঁর সাফল্য ছিল চূড়াস্পর্শী। এই সুদীর্ঘ পেশাগত কারণে ভাষা এবং শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর একটি নিজস্ব মতামত গড়ে ওঠে। তাঁর এ ভাষা ও শিক্ষার বিভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সৃজিত কথাসাহিত্যে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৪১ সালে আল্লামা ইকবালের মৃত্যুদিবস উপলক্ষে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতির উর্দুতে বক্তৃতা দেওয়ার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং পরিণামে মুসলিম লীগের সদস্যদের হাতে প্রচণ্ডভাবে প্রহৃত হন। এটাই সম্ভবত মাতৃভাষাকেন্দ্রিক তাঁর প্রথম প্রতিবাদ। এছাড়া তিনি জীবনপ্রবাহে ভাষা ও শিক্ষা বিষয়ক একাধিক অনুষ্ঠানে প্রাণের তাগিদেই যোগদান করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, ভাষার প্রতি শওকত ওসমানের সুগভীর দরদ ছিল। ভাষা সম্পর্কে তিনি wbtm½ wbgvY (১৯৮৬) গ্রন্থে যে অভিমত ব্যক্ত করেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য :

> ভাষার সঙ্গে ভাতের প্রশ্ন জড়িত। আর ভাতের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মানুষের বহু সদ্‌গুণাবলী, যে বৈশিষ্ট্যে মানুষ হয় মানুষ— যার ফলে জন্তু থেকে সে আলাদা।... পাকিস্তানী শাসকরা ভাষার ওপর কোপ মারতে চেয়েছিল, আসলে সে কোপ কিন্তু ভাতের উপর। (শওকত, ১৯৮৬ : ৫২)

তিনি মাতৃভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যেমন আতঙ্কিত ছিলেন, আবার যত্রতত্র মাতৃভাষার যথেচ্ছা ব্যবহারেও আশাহত হন। তাই তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনাতে ভাষার বিবিধ ব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করার সাথে সাথে শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষকদের সম্পর্কেও মতামত প্রদান করেছেন। তাঁর যে সব গল্পে ভাষা এবং শিক্ষা পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম 'জিহ্বাহীন' (†bÎc_), 'কুকুরের ভাষা' (†bÎc_), 'গুরু শিষ্য' (Dcjÿ¨), 'কাব্যফল' (Dcjÿ¨), 'শৃগালস্য' (Dfk½), 'উভশৃঙ্গ' (Dfk½) প্রভৃতি।

ভাষা যে কোনো দেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি রক্ষার মূল হাতিয়ার, আর এ সত্যকে উপলব্ধি করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ১৯৪৭এর বাংলাভাগ পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার উপর প্রথম আঘাত হানেন পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত অগ্রগতিকে পিছিয়ে দিতে বা ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে। এদেশের সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিকেরাও সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন লেখনীর মাধ্যমে। 'জিহ্বাহীন' (†bÎc_) গল্পে সমাজসচেতন গল্পকার শওকত ওসমান রূপকের অন্তরালে ভাষার মহিমাকীর্তন করেছেন। এ গল্পের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বুলবন ওসমান উল্লেখ করেন : "রাষ্ট্রভাষা বাংলার বিরুদ্ধে যখন ষড়যন্ত্র চলছিল তার বিরুদ্ধেই এই কাহিনীর অবতারণা।" (বুলবন, ২০০৪ : ৬১)

'জিহ্বাহীন' গল্প থেকে জানা যায়, ভাষাহীন মানুষ যেন প্রাণহীন সত্তা। ব্যাধির কারণে বধির এবং বোবা মানুষটিই শুধু বুঝতে পারে ভাষাহীনের যন্ত্রণা। কয়েক বছরের কৈশোরের স্মৃতি তাকে খুব কষ্ট দেয়। ভাষার পরিবর্তে তার স্থান দখল করেছে সংকেত এবং অঙ্গভঙ্গি। কিন্তু ইশারা-সংকেত-অঙ্গভঙ্গির সাহায্যেও তিনি দৈনন্দিন সব কাজ করতে ব্যর্থ হন, পদে পদে তাকে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। ভাষাহীনতা তার চারপাশে দুরন্ত দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে আলো-বাতাসহীনতার মতোই জীবনের মহাসম্মিলন থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। তার অন্তর্ভেদী চিৎকার শোনা যায় আলোচ্য গল্পের শিল্পভাষ্যে। যেমন :

> ফিরিয়ে দাও আমার ভাষা। মহামানবের সাগর সঙ্গম-তীর্থের আমি পরিব্রাজক হোতে চাই। বিদ্যুতের মশাল সাহায্যে আমি চন্দ্রলোকের গিরি-গহব্বর জরিপ প্রয়াসী। আমার ভাষা ফিরিয়ে দাও। (শওকত, ২০০৩ : ৩৭১)

পাকিস্তানি শাসকচক্র বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক ষড়যন্ত্রের যে প্রাচীর তোলেন গল্পকার তার বিরুদ্ধেই 'জিহ্বাহীন' গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন করে, সে প্রাচীরকে ভাঙার আহবান জানিয়েছেন। গল্পে ভাষাপ্রেম ও ভাষার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত হয়েছে। ভাষা যে দেহের অন্যান্য অংশের মতো অপরিহার্য প্রয়োজনীয় সত্তা, তা ভাষাহীন মানুষের রুদ্ধকণ্ঠের মাধ্যমে উপস্থাপিত।

'কুকুরের ভাষা' (†bÎc_) গল্পে মাতৃভাষার প্রতি চরম অবজ্ঞা এবং অবহেলা প্রকাশিত। বিত্তবান সমাজের মানুষ যে ভাষার দিক থেকে বিত্তহীনতার পরিচয় দিয়েছেন তা এ গল্পের ভাষ্যে

উপস্থাপিত। বিলাত ফেরৎ মিসেস ফয়জনের বাসায় গিয়ে গল্পকার যে তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা এ গল্পে পাওয়া যায়।

গল্পের কথক একটি কলেজের বাংলার শিক্ষক, তাঁর সাথে বিশেষ পরিচয় ছিল বিলাত ফেরৎ মিসেস ফয়জনের। মিসেস ফয়জন যেমন বিদূষী, তেমনি আধুনিক সভ্যতার জন্য উচ্চাভিলাষী। তিনি বিদেশি সভ্যতার অনুকরণে মেম সাহেবদের মতো চুল কাটান, আর্মানিটোলার মাঠে গলফ খেলেন এবং বারে বসে বন্ধুদের সাথে হুইস্কি টানেন। পাড়ার মেয়েরা কথককে মিসেস ফয়জনের বাসায় নিয়ে যান 'বাংলা সাহিত্য-মজলিস'-এ সভার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তার অনুমতি আদায়ের জন্য। অগত্যা কথক মেয়েদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে না পেরে মিসেস ফয়জনের বাসায় উপস্থিত হন। কিন্তু সে বাসায় উপস্থিত হতেই এ্যাল্‌সেসিয়ান কুকুর কর্তৃক তারা আক্রান্ত হন। কথক 'থাক্,থাক্' করেও যখন কুকুরকে বশে আনতে ব্যর্থ হন, তখন কুকুরের মনিব ফয়জন 'টাইগার টাইগার, কাম হিয়ার।' এ ইংরেজি বাক্যের মাধ্যমে কুকুরকে থামিয়ে দেন। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> " You have commited a mistake —আপনি ভুল করেছেন।"
> —কি, বেগম সাহেবা?
> —আমার কুকুর বাংলা বোঝে না।
> —জ্বী?
> —আমার কুকুর বাংলা জানেও না।
> —আচ্ছা!!
> ওকে অর্ডার (হুকুম) ইংরেজীতে দিন, ও সব বুঝবে। আপনি—যে হঠাৎ বেকায়দায় পড়েছিলেন, সে ওই বাংলা বলার জন্যে। (শওকত, ২০০৩ : ৩৮০)

উন্নাসিক স্বভাবের মিসেস ফয়জন বিদেশি সভ্যতার কাছে যেমন নিজের দেশের সভ্যতাকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন, তেমনি মাতৃভাষাকেও বিসর্জন দিয়েছেন। যার বাড়ির কুকুরের ভাষা ইংরেজি হতে পারে, সে বাড়ির মনিবের মধ্যে যে বিন্দুমাত্র মাতৃভাষাপ্রেম আশা করা যায় না, তা উপরের উদ্ধৃতাংশের মধ্যে প্রকাশিত। মাতৃভাষা ভুলে অন্যের ভাষা চর্চা করাকে গল্পকার রূপকের মাধ্যমে মানবেতর প্রাণীর আচারের সাথে তুলনা করেছেন। আর মিসেস ফয়জনের কাছ থেকে সভাপতির দায়িত্ব পালনের অনুমতি শেষ পর্যন্ত মিলেছিল কি না, তা জানা যায় না, তবে তিনি যে 'মিসেস Poison' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন তা গল্প থেকে জানা যায়। আরো জানা যায় যে, মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞাকারীদের গল্পকার 'Poison' হিসেবেই দেখেছেন।

'গুরু শিষ্য' (Dcjÿ¨) গল্পে ভাগ্য বিড়ম্বিত সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত ভাগ্যাহত শিক্ষকদের প্রতি জনতার (শিষ্য) মনোভঙ্গি প্রকাশিত। শিক্ষাগুরুর দিনলিপি যেন কালো অন্ধকারের ফ্রেমে চিরকাল একই সুরে একই তালে বেজে চলেছে। খোর-তালের নতুন সুরের ব্যঞ্জনা বা জীবন

ব্যঞ্জনা বাজানোর মানসিকতা চিরকালই যেন অবাঞ্ছিত। এখানে বঞ্চনা যেন স্বাভাবিক এবং শাশ্বত। গল্পের ভাষায় :

> এদেশের শিক্ষকেরা যেন মই। তাদের সবাই মাড়িয়ে মগ্‌ডালে উঠে যায়। বেচারা মই কাদা-ধূলো মেখে যথাস্থানে পড়ে থাকে। তারপর রোদে শুকিয়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, ঘুণ ধরে, মচ্‌কায় এবং তারপর ভাঙে। তারপর মইয়ের কথা কেউ মনে করে না। (শওকত, ১৯৬৫ : ১৭)

শওকত ওসমান পেশাগতজীবনে নিজেও শিক্ষকতার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন বিধায় তিনি তাই খুব সহজেই ধরতে পেরেছেন শিক্ষকদের প্রকৃত দৈন্যের বিষয়টি। শিক্ষকেরা নিজের সবটুকু শ্রম এবং পিতৃস্নেহ দিয়ে অন্যকে উপরে ওঠার পথ দেখালেও তাঁদের আলোর পথ আটকে যায় জীবনের চোরাবালিতে। মূলত, ‘গুরু শিষ্য’ গল্পে অল্পকথায় শিক্ষকের প্রকৃত সমস্যাকে লেখক চিহ্নিত করেছেন।

‘গুরু শিষ্য’ গল্প থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী গল্প ‘কাব্যফল’ (Dcj ÿ¨)। গল্পে পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয়েছে বৈষয়িক বিষয়কে ঘিরে। তিনি জ্ঞানের ধারক নন, অর্থের ধারক। সারাজীবন তিনি অর্থের পিছনে কালাতিপাত করেছেন। কারণ ছোটবেলায় পঠিত কবিতার চরণ (বিন্দু বিন্দু জল/ গড়ে তোলে সমুদ্র অতল) তার বিশ্বাসের মর্মমূলে প্রোথিত। গ্রন্থ রচনা তাঁর কাছে আরাধ্য নয়, তাঁর আরাধ্য অর্থের আবাহন। পুস্তককে পণ্যে পরিণত করে উপরে ওঠার সিঁড়িটিকে তিনি মসৃণ করে তুলেছেন, যা মনুষ্যত্বহীনতারই নামান্তর। গল্পভাষ্য নিম্নরূপ :

> কয়েক লাখ টাকার মালিক কেন এই বুড়ো বয়সে, এই সামান্য দশ টাকার জন্যে এমন হন্যে?
> কারণ সামান্য।
> ছেলেবেলায় তিনি একটা কবিতা পড়েছিলেন। চব্বিশ ঘণ্টাই এই কবিতা গলার নীচ থেকে ঠেলা দিয়ে ওঠে :
> বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সমুদ্র অতল। (শওকত, ১৯৬৫ : ১৭)

আমাদের সমাজে বিবেকবান ত্যাগী শিক্ষকের পাশাপাশি বিবেকহীন আর্থিকভাবে লোভী শিক্ষকেরও যে অভাব নেই তা শওকত ওসমানের চোখেও ধরা পড়ে এবং এগুলোও তিনি সুনিপুণভাবে গল্পের অবয়বে প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

‘শৃগালস্য’ (Dfk½) গল্পে যুগপৎভাবে শিক্ষক সংকট এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির কথা চিত্রিত হয়েছে। স্বার্থবুদ্ধির মানুষ শিক্ষা ব্যবস্থাকে যে দিন দিন ব্যবসায়ে রূপান্তর করে তুলেছে তা গল্পের শিল্পভাষ্যে প্রতীকায়িত।

বি.এ পাস মনসুর আলি তার যোগ্যতা অনুসানে চাকরি না পাওয়াতে স্ত্রী-সন্তানসহ কষ্টে দিনাতিপাত করেন। পিতৃপ্রদত্ত সম্পত্তি ধ্বংস হওয়ার পরে তিনি বর্তমানে আত্মীয়-স্বজনের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে আছেন। দিনবদলের হাওয়ায় অনেক অকর্মণ্য ব্যক্তি সাফল্যের শিখরে পৌঁছলেও মনসুর আলি ভাগ্যের উপর নির্ভর করে একটি জায়গায়ই স্থির আছেন। তবে কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তার চাকরি না হলেও বিভিন্ন স্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষক হিসেবে তিন দিনের চাকরি তার ভাগ্যে জোটে এবং বিনিময়ে কিছু আর্থিক সাহায্য পান। এভাবে হাতীখোলা স্কুল থেকে নৌকার যাতায়াত ভাড়াসহ পঞ্চাশ টাকা, চন্দুপর স্কুল থেকে একশ টাকা, জয়পুর হাইস্কুল থেকে দুইশ টাকা মনসুর আলির প্রাপ্তিযোগ ঘটে। অবশ্য এর মধ্য দিয়ে মনুসর আলির বেকার জীবনে কিছুটা সচ্ছলতা এলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনিয়মের চিত্রটিও উদঘাটিত হয়েছে। "নিজস্ব উৎস ও সরকারি অনুদানের উপর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিকে থাকে বলে নানা সংকট ও দুর্নীতির আবর্তে এগুলো নিমজ্জিত।" (অনীক, ১৯৯৫ : ১২৩) তাই, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মনসুর আলির মতো যোগ্যরা অনেকে নিয়োগপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে কষ্টের জাঁতাকলে পিষ্ট হন। গল্পের ভাষায় :

> —আপনি তিন দিন থাকবেন। আপনাকে নৌকায় যাতায়াত খরচ আর পঞ্চাশ টাকা দেব।
> মনসুর আলি মনে মনে ভাবে, লোকটা বলে কী।
> কিন্তু সে ঈমানদার ব্যক্তি। নিজের দুর্বলতা-সচেতন। তাই বললে, "দেখেন তা না হয় হোলো। কিন্তু আমার কাপড়-চোপড় নেই।
> —সে বন্দোবস্ত আমরা করব।...হাইস্কুলে অন্তত তিনজন গ্র্যাজুয়েট দরকার। দু'জন আছে। আর একজন দেখাতে হয় নচেৎ 'এড' পাওয়া যায় না। পরশু ইনস্পেক্টর আসছেন। তাই এই তাগিদ। 'এডে'র হাজার টাকা না পেলে স্কুল শিকেয় উঠবে। (শওকত, ২০০৩ : ৪৪৪)

'শৃগালস্য' "গল্পের মধ্যে মনসুর আলির বেকার জীবনের দুঃখময়তা এবং শৃগালস্য পাঠশালার পণ্ডিতদের অনৈতিক জীবনের একটি উদ্ভাসন ঘটেছে" (অনীক, ১৯৯৫ : ১২৩)। তাছাড়া গল্পে শিক্ষার দুর্বৃত্তায়ন ও শিক্ষকের দৈন্যদশার কথাও চিত্রিত।

'উভশৃঙ্গ' (Dfk½) গল্পে প্রতীকী অর্থে শিক্ষক শওকত ওসমানের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এ গল্পে শিক্ষাগুরু তাঁর শিক্ষানবিশ নর্তকী বাসবত্তাকে কীভাবে সাধ্যাতীত বিষয়কে সাধ্যের মধ্যে আনতে হয় সে বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন। নৃত্য শেখার সাধনপ্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন মনঃসংযোগ এবং উপযুক্ত অনুশীলন এ বিষয়টি গুরু তাঁর শিক্ষানবিশকে শেখাতে সমর্থ হয়েছেন। গুরুর ভাষ্যানুসারে, আমরা দুই চোখকে দর্শনের কাজে ব্যবহার করলেও দুই চোখে দুই রকম অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। যখন 'এক চোখ হাসবে, তখন অন্য চোখ কাঁদবে'– এটাই নৃত্যানুশীলনের মূল মন্ত্র। গুরুর এ বেদমন্ত্রের কাছে শিক্ষানবিশ নর্তকীর এতদিনের শিক্ষাসাধনা নিমেষেই অতি তুচ্ছ মনে হয় এবং শিক্ষার্থী গুরুবাক্য শিরোধার্য করে নাচ শিখতে আরও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। গুরু তাকে নাচের সাধনপ্রণালি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত যে জ্ঞানদান করে তা এখানে প্রণিধানযোগ্য :

> বাইরে রাজরানীর মত থাকবি, কিন্তু ভেতরে সন্ন্যাসিনী। আর যখন বাইরে সন্ন্যাসীর মত থাকবি তখন তোর সাধনা হবে, রাজরাণীত্বের। একই কথা পুরুষের ক্ষেত্রে। বাইরে যখন রাজা, ভেতরে হবে সন্ন্যাসী। আর বাইরে যখন সন্ন্যাসী, ভেতরে সাধনা হবে রাজাত্বের। (শওকত, ২০০৩ : ৪৭৬)

মূলত, গুরুদেবের এই নিয়মপ্রণালি অনুসরণ করতে পারলে নৃত্যশিল্পীদের সাথে মঞ্চ কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। বাইরের জগৎ এবং ভেতরের জগৎ পৃথক হলেও, উভয় শৃঙ্গকে বা জগৎকে এক করে দেখতে পারাটাই জগৎসংসারের পরিপূর্ণতা। এই উভয় জগৎকে মিলনের সূত্রে বাঁধতে পারলেই সফলতার শিখরে আরোহণ করা সম্ভব, আর এটাই শিক্ষক শওকত ওসমানের 'উভশৃঙ্গ' গল্পের মূল সুর।

পাকিস্তান কালপর্বে রচিত ভাষা ও শিক্ষা বিষয়ক গল্পে শওকত ওসমান ভাষাপ্রেম ও ভাষার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তার কথা উপস্থাপন করেছেন। গল্পকার গল্পগুলোতে একদিকে যেমন মাতৃভাষার অপরিহার্যতার কথা ব্যক্ত করেছেন, তেমনি মাতৃভাষার প্রতি উচ্চবিত্ত মানুষের উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গিকেও সমানভাবে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও এপর্বে রচিত গল্পে শিক্ষার দুর্বৃত্তায়ন ও শিক্ষকদের আর্থিক দৈন্যদশার কথা যুগপৎভাবে উঠে এসেছে।

mvZ : †KŠZK, nvm¨imvZ¥K ev e¨½cavb

শওকত ওসমান তাঁর কথাসাহিত্যে জীবনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সমাজের অসঙ্গতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ অসঙ্গতি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কখনও বেছে নিয়েছেন ব্যঙ্গ আবার কখনও কৌতুকরস। লেখকের লেখনীতে কৌতুক ঝলসে ওঠে না, কিন্তু গোপন ইঙ্গিতময়তা ছলকে ওঠে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে। তাঁর এ কৌতুকরস বা ব্যঙ্গরস তাঁর রচনাতে কখনও নির্ভেজাল আনন্দদান করেছে আবার কখনও তা সমাজ বা ব্যক্তিশোধনার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কৌতুক রসাত্মক 'মৎস্য' (Dfk½) গল্পে মসিহ্ আলী আখন্দ এবং মসিহার প্রেমের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। মসিহ আলী আখন্দ এবং মসিহা একই কলোনীর দোতলা এবং তেতলায় বাস করেন। তিরিশ বছর বয়সী সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী নম্রপ্রকৃতির মসিহ্ আলীর দোতলার বারান্দায় তিনতলা থেকে শুকাতে দেওয়া একটি ঝুলন্ত শাড়ি এসে তার বুকে দোলা জাগায়। সময়ের পরিক্রমায় এই শাড়িটি উভয়ের ডাকঘর হিসেবে কাজ করে, কেননা এই শাড়িটিই তিনতলা থেকে চিঠি বহন করে দোতলায় এবং দোতলা থেকে চিঠি তিনতলায় পৌঁছানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে, অপরিচয়ের গণ্ডি এবং একে অপরকে দেখতে না পাওয়ার যন্ত্রণা প্রতিক্ষণ মসিহকে দগ্ধ করে। অবশেষে মসিহ অধৈর্য হয়ে শাড়িটিতে ফাঁস লাগিয়ে নিজেই ঝুলে পড়েন। গল্পের ভাষায় :

> তিনতলায় হৈ চৈ পড়ে যায়। নর-নারী কত কণ্ঠের যৌথ চেঁচামেচি : গলায় দড়ি দিয়েছে, না শাড়ী দিয়েছে? কার ছেলে? সেই ছোকরা অফিসার–ইত্যাদি।...

> দৌড়াদৌড়ি, ডাকাডাকি, গলা ফাটাফাটির তোড়ে এলাকা তোলপাড়।
> আশপাশের ফ্ল্যাটের লোকজন তখন আশপাশেই জড়ো হয়ে গেছে। ছিপেগাঁথা মাছের মত এক যুবককে উপরে টেনে তোলা হচ্ছে। (শওকত, ২০০৩ : ৩৯১)

মসিহ্ আলীর ঝুলন্ত শাড়িতে গলায় ফাঁস দেওয়া কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাটি কলোনির মানুষের হৃদয়ে আবেগের সঞ্চার করলেও তার চেয়ে বেশি কৌতুক রসের সৃষ্টি করে। অবশেষে শাড়ি কণ্ঠলগ্ন হয়েই মসিহ্ দেখা পায় তার আরাধ্য নারী মসিহাকে এবং তাদের প্রেমের সফল সমাপ্তি ঘটে।

গল্পকার শওকত ওসমান গভীর রসবোধ এবং অভিজ্ঞতাজাত উপলব্ধি থেকে 'লুভ' (Dfk½) গল্পে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। এ গল্পে হাস্যরস সৃষ্টির সাথে মিশে আছে বিদেশি জীবন যাপন, ইংরেজি শব্দের উচ্চারণভঙ্গি, ব্যবসা, বিপণি কেন্দ্রের প্রকৃতি, গল্পের ভাষা ব্যবহারের একটি অকৃত্রিম রেখাচিত্র।

ইংল্যান্ডের লীড্স শহরে ভ্রমণরত কথক সেদেশের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি এবং ধ্যান-ধারণাকে কিছুদিনের মধ্যেই আত্মস্থ করেন। তবে, প্রথম দিকে দোকানে কেনাকাটা করতে গিয়ে একপ্রকার বিপদেই পড়েন। সেখানকার রীতি অনুসারে বিক্রেতারা কোনো কিছু ক্রয়ের পর ক্রেতাকে 'থ্যাঙ্ক ইউ মাই লুভ' বলে সম্বোধন করেন এবং ক্রেতাগণও দোকানীকে একই সম্বোধন করেন। কিন্তু লেখক ভেবে বসেন সম্ভবত তিনি প্রেমের নগরে এসে পৌঁছেছেন এবং দোকানী সম্ভবত তাঁকে প্রেম নিবেদন করছেন। তবে, গল্পকার অনেক চেষ্টার পরে বুঝতে সমর্থ হন লীড্স শহরের রীতিই এমন এবং তারা 'Love' শব্দের উচ্চারণ করেন 'লুভ'। অবশ্য এরপর গল্পকার 'লুভ'— এর সাধারণ নিয়ম পালন করেই ভ্রমণ করেন। গল্পের ভাষায় :

> তিন সপ্তাহ ছিলাম লীড্স শহরে, লুভে আমি এতটুকু কার্পণ্য দেখাইনি। কতজনের লুভ মিলল, আর কতজনকে দিলাম— বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তরুণ-তরুণী— হরজাই মানবগোষ্ঠীর প্রতি— তার হিসেব দেওয়া মুস্কিল। (শওকত, ২০০৩ : ৪২৪)

তবে, এরপরও যে তিনি বিপদ থেকে পরিত্রাণ পান তা কিন্তু নয়— আরেকবার তিনি বেগম হাজরা খাতুন নামে এক ভারতীয় মহিলার দোকানে যান, যেখানে 'কালা মহিলাটি, ইংলণ্ড কালো করে দাঁড়িয়ে' ছিলেন। গল্পকার একজোড়া মোজা ক্রয়ের পর স্বাভাবিক রীতি অনুসারে 'থ্যাঙ্ক ইউ মাই লুভ' বলে সম্বোধন করলে মহিলাটি তাকে সাপে ব্যাঙ ধরার মতো 'What' বলে চিৎকার করে মারতে উদ্যোগী হন। কথক সেই স্থান থেকে অপদস্থ হয়ে লজ্জা এবং ভয়ে পালিয়ে আসেন।

গল্পকার 'লুভ' গল্পে হাস্যরসের সৃষ্টি করলেও দেখিয়েছেন, পাশ্চাত্যে বসবাস করেও ভারতীয়দের মধ্যে নিজ দেশীয় সংস্কৃতিচেতনা কীরূপ প্রবল। দোকানী মহিলাটি বিদেশিদের সাথে একই ধরনের

Dhaka University Institutional Repository

সৌজন্য দেখালেও নিজের অঞ্চলের মানুষের কাছ থেকে কখনো তা আশা করেননি। বরং তার মধ্যে দৈশিক চিন্তা প্রবলভাবে বিদ্যমান।

ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং বহুবিবাহ একজন মানুষকে কীভাবে পতনের দিকে ঠেলে দেয় তা 'ফৌৎ' (Dfk½) গল্পে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। ধর্মের ছদ্মাবরণেই হোক অথবা প্রতিপত্তির জোরেই হোক অনেকে বহুবিবাহের মাধ্যমে সুখের সন্ধান করলেও সুখ যে সুদূরের পাখিই হয়ে থাকে তা আলোচ্য গল্পপাঠে সহজই উপলব্ধি করা যায়।

জনৈক কামিল দরবেশ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মীর মোদাস্‌সির গোরখ্‌পুরী মক্কাগামী জাহাজ 'সফিনাতুল মালাক'— এ তিনজন স্ত্রীসহ হজ-যাত্রা করেন। উল্লেখ্য, জাহাজ কোম্পানি প্রতি বছর গোরখপুরীর জন্য দুটি কেবিন বরাদ্দ রাখেন তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থের জন্যে। গোরখ্‌পুরী তার তিন স্ত্রীকে হৃদয় সর্বস্ব (?) করে নাম দিয়েছেন 'জান', 'কলব' এবং 'রুহ্'। প্রতি রাতে গোরখ্‌পুরী কেবিন পরিবর্তন না করলেও স্ত্রীগণ নিয়ম করে তার সাথে রাত্রিযাপন করেন। কিন্তু এক রাতে সতীনদের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার জিদ এমন প্রবল হয়ে ওঠে যা তাকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দেয়। গোরখ্‌পুরী তার কনিষ্ঠা বেগম রুহর সাথে নিশিযাপন করতে মনস্থির করেন কিন্তু বড় স্ত্রী জান এবং মেজ স্ত্রী কলবও সে রাতে গোরখ্‌পুরীর সাথে থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিন সতীনের চিৎকারে ব্লাড প্রেসারের রোগী গোরখ্‌পুরীর প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থায় বউদের কাছে ওষুধ প্রার্থনা করেন। কিন্তু তারা ওষুধের শিশি নিয়ে টানাটানি করতে গিয়ে ফেলে দেয়, ততক্ষণে গোরখ্‌পুরী ধরাধাম থেকে ফৌৎ (অক্কা) প্রাপ্ত ঘটে। জাহাজের স্টুয়ার্ড ক্যাপ্টেনের কাছে গোরখ্‌পুরীর অক্কাপ্রাপ্তির সংবাদ যেভাবে পরিবেশন করেছেন তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে কৌতুকরসের মূল সুর। গল্প থেকে উদ্ধারযোগ্য :

> ক্যাপ্টেন এত রাত্রেও জাহাজের ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল। শশব্যস্ত, ঘটনা শুনেই সে আঁৎকে উঠল, "What? "
> -His heart failed, Sir.
> -What?
> -His heart failed, Sir.
> -But he had three hearts, which failed?
> -All of them, Sir? (শওকত, ২০০৩ : ৪৬৫)

এখানে গল্পকার 'three hearts' বলতে তিনজন স্ত্রীকে নির্দেশ করেছেন। বহুবিবাহ সংসারে শান্তির পরিবর্তে অশান্তির বিষবাষ্প ছড়িয়ে কীভাবে একজন পুরুষের জীবনাবসান ঘটায় তা গল্পকার নির্মম ব্যঙ্গের মাধ্যমে 'ফৌৎ' গল্পের স্বল্প অবয়বে উপস্থাপন করেছেন।

গল্পকার শওকত ওসমান গভীর রসবোধ এবং অভিজ্ঞতাজাত উপলব্ধি থেকে পাকিস্তান কালপর্বে রচিত গল্পে ব্যঙ্গ এবং হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। তবে, তাঁর গল্পে ব্যবহৃত ব্যঙ্গ কোনো ব্যক্তি

বা সমাজের পৃষ্ঠে সরাসরি আঘাত করে না, বরং পরোক্ষভাবে তা ব্যক্তি বা সমাজের অসঙ্গতিগুলোকে ধরিয়ে দেয়। এছাড়া হাস্যরসাত্মক গল্পগুলোতে গল্পকার সহজ-সরল ভঙ্গিতে নিম্ন মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা, চৌর্যবৃত্তি এবং বহুবিবাহকে কৌতুকের রঙে রাঙিয়েছেন। তবে, এখানে স্মর্তব্য যে, শওকত ওসমান ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে নির্মল হাস্যরসের সৃষ্টি করলেও তাঁর মধ্যে দেশীয় সংস্কৃতিবোধ স্পষ্ট ছিল।

AvU : †ckvRxex gvbl

শওকত ওসমান জীবন চলার পথে বিচিত্র ধরনের মানুষ এবং তাদের বিচিত্র রকমের পেশার সাথে পরিচিত হন। তাঁর পাকিস্তান কালপর্বে রচিত গল্পেও বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবী মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়।

'বর্ণামৃত' (c¯Íi djK) গল্পে দুজন চিত্রশিল্পী বেলায়েৎ এবং হাসিবের জীবনকাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। হাসিব ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টার এবং বেলায়েৎ ব্যবসায়িক চিত্রশিল্পী। চিত্রকর্মে হাসিব কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও বাজারে তাঁর চিত্রকর্ম বিক্রির দিক থেকে অনেক পিছিয়ে। প্রতিভার মূল্যায়ন না হওয়ায় হাসিব নিরুদ্দেশ হয়ে দূরবর্তী স্থানে গিয়ে কোনো কিছু না জেনেই শুধু শারীরিক অবয়বের কারণে মাজেন্দারান দেওবন্দী নাম ধারণ করে হেকিমি পেশা গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের সহজ পথ খুঁজে নেন। পাঁচ সাত বছর পর বেলায়েৎ এক মফস্বল শহরে গিয়ে হেকিমের আস্তানা থেকে আবিষ্কার করেন নতুন লেবাসধারী হাসিবকে। তারা দুজনে আবার শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু বেলায়েৎ একদিন লক্ষ করেন কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাসিব বিশেষ কোন কারণে মুখ ঢেকে রাখেন এবং ঐদিকে আর যেতে চান না। এখানে উল্লেখ্য যে, হাসিব ছদ্মবেশে হেকিমি পেশা গ্রহণ করলেও তার মধ্যে বিবেকবোধ তিরোহিত নয়। তাই তিনি আবার শুদ্ধতার পথ সন্ধান করেন এবং সুস্থজীবনে ফিরে আসার বাসনা ব্যক্ত করেন। হাসিব মুখ ঢাকার কারণ হিসেবে বেলায়েৎকে জানান :

> আমি হাকিমী শিখিনি, হাকিমীর কিছুই জানিনে। কবরস্থানে যারা শুয়ে আছেন, তাদের অনেকে আমার রোগী। তাড়াতাড়ি আগেই গেছে। অবিশ্যি আমাকে টাকা দিয়েছে সে জন্যে। আমার কি চক্ষু লজ্জা নেই। আমার মুখ ঢাকতে হয়...। (শওকত, ২০০৩ : ২৫২)

উপরিউক্ত উক্তির মধ্যে ব্যঙ্গ থাকলেও হাসিবের অন্তর্যন্ত্রণাই এখানে বিবেচ্য বিষয়। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা তার প্রতিভার ও পেশার মূল্যায়ন করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং তাকে আর্থিক নিরাপত্তা থেকেও দূরে ঠেলে দিয়েছে। তাই হাসিবও বাধ্য হয়েছেন ভণ্ডামির মাধ্যমে ভিন্ন পেশা গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক টানাপড়েন থেকে রক্ষা পেতে। অথচ 'শিল্পী হচ্ছে মানব চেতনার সিঁড়ি।' জাগ্রত বিবেকসম্পন্ন হাসিব আবার ফিরে আসেন তার পুরোনো চিত্রাঙ্কনের পেশায়।

'সেলুন' (c¯Íi djK) গল্পে নরসুন্দর গৌরহরি শীলের কর্মসূত্রে কালের প্রবহমাণ ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। শীল যেন কালের রাজসাক্ষী। তার সেলুনের সূচনাকাল থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেন কালের এবং কালের মানুষের ভাঙা-গড়ার ইতিহাস। এমনকি তার মধ্যে প্রতিবাদী সত্তার উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়।

পেশায় নরসুন্দর হওয়ায় শীলের দোকানে বিভিন্ন মানুষের আগমন ঘটে। তিনি রবীন্দ্রনাথী, জঙ্গী, মোল্লা-দরবেশ, পুরুত-বুরুত, কদমফুল, চৌধুরীর পুত, ড্যামসোয়াইন বিভিন্ন ঢঙে চুল কাটতে অভ্যস্ত। তার কাঁচির শব্দের তাল এবং মান বিচিত্র, কখনও ঢিলে তেতালা আবার কখনও দ্রুত লয়সম্পন্ন। কাঁচির শব্দে শীল মশায়ের কথার ওজন চলে। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন এবং নিগ্রোদের চুল কেটেছেন। সেই থেকে কমবেশি বিভিন্ন ধরনের ভাষা জানেন। হাতযশ থাকাতে ব্রিটিশ সাহেবদের বাংলোতে তার ডাক পড়ত। একবার তিনি স্টুয়ার্ট নামে এক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের গলা কেটে দিয়েছিলেন। অবশ্য এর পিছনে বহুদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ এবং অভিমান বিদ্যমান ছিল। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> শালা উঃ করে উঠল। ওই রকম গোঁফ চাঁচাতে, দাড়ি কামাতে দিলাম কয়েকটা খোঁচা। শালা কয়েকবার উহ-ইউ করে উঠল। (শওকত, ২০০৩ : ২৭৭)

ঔপনিবেশিক শাসনামলে একজন নরসুন্দরের ক্ষোভ প্রকাশের অভিনব কৌশলকে অবশ্য স্বদেশপ্রেম হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। তার দোকানে আগত সবাইকে তিনি ভদ্রলোক মনে করেন। বিশেষ করে সুলতান জামীর কথা তিনি শ্রদ্ধাভরে অন্যের কাছে বর্ণনা করেন। জামী সাহেব শীলকে চুল কাটতে দু-পয়সার জায়গায় পাঁচ টাকার কম দেন না। কিন্তু কথক আব্দুল খালেকের কাছে তার অতীত ইতিহাস জেনে আশ্চর্য হন। জামী সাহেব এক পণ্যাঙ্গনাকে বিয়ে করে অগাধ সম্পদের মালিক হন কিন্তু বিয়ের ছয়মাসের মাথায় তিনি তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য নির্যাতন করেন। মিসেস জামী শেষ পর্যন্ত অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন এবং জামী সাহেব আরেক নতুন স্ত্রীকে ঘরে তোলেন। শীল তখন বুঝতে পারেন তিনি শুধু ভদ্রলোকের চুলই কাটেন না— অনেক জন্তু-জানোয়ারেরও চুল কাটেন। তাই পরের দিন শীল তার দোকানের সাইনবোর্ডই পরিবর্তন করেন। প্রথমে তার দোকানের নাম ছিল :

মিনার্ভা সেলুন

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু মুসলমানের চুলাদি কর্তন করা হয়
প্রোঃ– গৌর হরি শীল

জামী সাহেবের ঘটনা অবগত হয়ে দ্বিতীয়বার দোকানের নামকরণ করা হয় :

মিনার্ভা সেলুন
হিন্দু মুসলমানের জীবজন্তুর চুলাদি কর্তন করা হয়
প্রোঃ– গৌর হরি শীল

শীলের মধ্যে বিবেকবোধ এবং রুচিবোধ অত্যন্ত প্রগাঢ়। তাই তার বিবেকের যন্ত্রণা তাকে দোকানের নাম পরিবর্তনে বাধ্য করেছে। শওকত ওসমান 'সেলুন' গল্পে পাঠককে এই তথ্য প্রদান করেন যে, সমাজে আমরা যাদের কাজ বা পেশাকে ছোট করে দেখি তাদের মধ্যে বিবেকবোধ, রুচিবোধ এবং স্বদেশপ্রেম প্রথাগত সভ্য সমাজের মানুষের থেকেও প্রগাঢ় হতে পারে। তাই কোন পেশা বা পেশার মানুষকে হীনদৃষ্টিতে দেখা অনুচিত।
'খলিফা' (Dcj ÿ¨) গল্পে দুই বিপরীতধর্মী পেশাকে মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে। গল্পে সময়ের পরিবর্তনে কৃষি সভ্যতা এবং নাগরিক সভ্যতার মধ্যে এক প্রকার দ্বন্দ্ব ও তাদের পারস্পরিক চাহিদার গুরুত্ব প্রকাশিত হয়েছে| কৃষি সভ্যতা থেকে নাগরিক সভ্যতার দিকে ধাবিত হওয়ার চিত্র গল্পের প্রারম্ভে প্রকাশিত। মাঝে আছে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির অন্তঃশারশূন্য বরকতি আকাঙ্ক্ষা। নতুন প্রজন্মের গতানুগতিক জীবন চর্চার পরিবর্তে নগর সভ্যতার নেতিবাচক জীবন চর্চার প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং সভ্যতার আলোকিত অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধকারের দিকে যাত্রা এ-গল্পে উপস্থাপিত।

'খলিফা' গল্পে কৃষিজীবী বাবা তার পুত্রকে বানাতে চেয়েছেন খলিফা বা দর্জি। কিন্তু পুত্রের সে পেশাটি পছন্দ না হওয়ায় বাবার ধমক খেয়ে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে পড়েন। তবে নিরুদ্দেশে থাকা পুত্রটি প্রতি মাসেই পিতাকে প্রচুর টাকা পাঠান। গল্পকার পুত্রের উপার্জনের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেন:

> নামের বরকত আছে বৈকি।
> ছেলে কাঁচি চালাতে শিখেছে।
> গঞ্জে বন্দরে জনতার ভিড়ে খলিফা এখন পকেট কাটে। (শওকত, ১৯৬৫ : ১)

লেখক এ-গল্পে 'খলিফা' শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে 'পকেটমার'কে বোঝালেও তাঁর উদ্দিষ্ট ছিল ভিন্ন। তিনি সময়ের প্রবহমাণতায় পেশা পরির্বতনের প্রতি মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা তা 'খলিফা' গল্পে তুলে ধরেছেন। চাষিপুত্র বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে কেমন করে 'খলিফা'তে রূপান্তরিত হয়, সেই প্রক্রিয়ার ভাঁজটি বক্ষ্যমাণ গল্পে লেখক খুলে খুলে দেখান।

$^{\prime}$আপনি ও তুই' (†bÎc_) গল্পে সড়ক ও জনপথ বিভাগের দুজন চাকুরীজীবী কর্মকর্তা এবং পিওনের কর্তব্যহীনতা ও তার ফলভোগ এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ ও স্বার্থবোধ প্রকাশিত। কর্মসূত্রে কর্মকর্তা এবং কর্মচারী একই অফিসে কাজ করেন কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শাখা হওয়ায় কেউ কাউকে চেনেন না। এখানে উল্লেখ্য যে, একই অফিসে কাজ করে পরস্পরকে না চেনার মধ্য দিয়ে তাদের চরম কর্তব্যহীনতার পরিচয় মেলে। যে কর্মের কর্তা বলে তারা নিয়োজিত, সেই কর্মের ব্যর্থতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে নিন্দার ঝড় তোলেন এবং সেই ঝড়ে নিজেরাই বিপর্যস্ত। অপরিচিত হওয়ায় যাত্রাপথে বাসের মধ্যে একজন আরেকজনকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করেন। কিন্তু অপরিচয়ের গণ্ডি ভেঙে পেশাগত পরিচয় পাওয়ায় কর্মকর্তা কর্মচারীকে 'তুই' বলে সম্বোধন করেন। এমনকি বাসের মধ্যে কর্মকর্তা তার অধীনস্থকে ব্যক্তিগত কাজ করাতেও দ্বিধা করেন না। গল্পের ভাষায় :

> আপনি। সাবাস। আমার বড় ঘুম ধরছে। এইজন্য এক কোণায় বসেছি। হেলান দিয়ে একটু খোঁয়ারী নিতে হবে।
> তুই। নিন্ না, স্যার।
> আপনি। বাসের ছাদে আমার দুটো বড় ট্রাঙ্ক আছে। প্যাসেঞ্জার যখন ওঠে নামে, খেয়াল রাখিস।
> তুই। তা রাখব স্যার, আপনি আরাম করুন। (শওকত, ২০০৩ : ৩২০)

দাপ্তরিক কাজে তারা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিলেও ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারে তারা একে অপরকে ব্যবহার করেন। কর্মকর্তা স্বার্থ উদ্ধারে পিওনকে 'আপনি' থেকে 'তুই' সম্বোধন এবং পরিশেষে তাকে কুলী হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের শ্রেণি-অবস্থানকে চিহ্নিত করেন। পিওনও কর্মকর্তার কাজ করে আত্মতুষ্টি লাভ করে আর এটাই আমাদের জাতীয় জীবনেরই একটি খণ্ড চিত্র, যা গল্পকার সুনিপুণভাবে $^{\prime}$আপনি ও তুই' গল্প-শরীরে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'সাবালক' (†bÎc_) গল্পে মানুষের স্বার্থবুদ্ধি অন্যকে ঠকানোর কুটকৌশল ও পরিণত মানুষ হয়ে ওঠার চেহারাটি পাওয়া যায়। এ গল্পে একই ব্যক্তির সাংবাদিক, ব্যাংক ম্যানেজার এবং কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পেশাগত পরিচয় বিধৃত হয়েছে। এককালের পত্রিকার সহ-সম্পাদক আর্থিক প্রতারণার মাধ্যমে পনের-ষোল বছরের বালক রজব আলি মোল্লার ছবি ছাপান দেড়শত টাকার বিনিময়ে। সেই সাংবাদিক পেশা পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানে ব্যাংক ম্যানেজার এবং সেই বালক আজকের কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত। ম্যানেজার তার এক সাংবাদিক বন্ধুকে ডাইরেক্টর সাহেবের কাছে উপস্থিত করে বিজ্ঞানের জন্য। সেই সময়ের সাংবাদিক রজব আলিকে ঠকালেও বর্তমানের ব্যাংক ম্যানেজার আজকের কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর রজব আলি মোল্লাকে ঠকাতে অপারগ। কেননা, রজব আলিও বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের মানুষের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন। গল্পের ভাষায় : "এই শহরে আমি একবার বড় ঠকেছিলাম। তবে তাতেই আমার হাতে খড়ি। বুঝেছিলাম না ঠকালে পয়সা পাওয়া যায় না।" (শওকত, ২০০৩ : ৩২৫) ম্যানেজার সাহেব মিলিয়ে দেখলেন এই রজব আলি আসলেই সেই রজব আলি। 'সাবালক' গল্পে বিভিন্ন পেশাজীবী

মানুষের স্বার্থ চরিতার্থ করার যে হীন মানসিকতা তা নাবালক সাবালক হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত।

Ôফলাফল' (†bÎc_) গল্পে একজন পেশাজীবী ড্রাইভারের চাকরি হারানোর ঘটনা চিত্রিত হয়েছে। আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন মানুষের সংঘাতসৃষ্ট পরিণতি অনিবার্যভাবে নিম্নবিত্ত মানুষের উপরে গিয়ে পড়ে এই নির্মম সত্য ড্রাইভারের জীবনে প্রতিফলিত। আত্মসম্মানবোধ রক্ষার্থে উচ্চবিত্ত শ্রেণিচরিত্রের মানুষ সর্বোচ্চ চ্যালেঞ্জরূপে নিলেও সমস্বার্থে আবার তারা একত্র হতে কোনো দ্বিধাবোধ করেননা, তবে এক্ষেত্রে তারা কোনো ভোগান্তিতে না পড়লেও নিম্নবিত্ত মানুষদের তার ফল ভোগ করতে হয়।

অবস্থাসম্পন্ন সেলিম খান এবং ইউনুস চৌধুরী একই পাড়ায় বাস করেন এবং উভয়ই গাড়ির মালিক। একদিন ঢাকা শহরে গাড়ি চালানোর সময় ইউনুস চৌধুরীর গাড়ির ড্রাইভার মহাম্মদ জান অপ্রশস্ত রাস্তার কারণে সেলিম খানকে সাইড দিতে বিলম্ব করেন। পরে সেলিম খান গাড়ি থেকে নেমে মহাম্মদ জানকে জনসম্মুখে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেন। মহাম্মদ জান বাড়িতে এসে ঘটনাটি তার মনিব ইউনুস চৌধুরীকে জানালে তিনিও অপমানিতবোধ করে সেলিম খানের বিরুদ্ধে মামলা করেন। কিন্তু কয়েক মাসে উভয় পক্ষের কয়েক হাজার টাকা খরচ হলে উভয় পক্ষের উকিলের মধ্যস্থতায় এক হোটেলে লাঞ্চ আয়োজনের মাধ্যমে মামলার নিষ্পত্তি করেন। এর তিন চার মাস পরে দশ মিনিট বিলম্বের কারণে মহাম্মদ জান-এর চাকরি চলে যায়। কিন্তু মহাম্মদ জান এই ভেবে আশ্চর্য হয়, তার মনিব তার জন্য মামলা-মোকদ্দমায় কত টাকা খরচ করেন, অথচ সামান্য দশ মিনিটের জন্য তার চাকরি যাবে। এর প্রত্যুত্তরে কথক জানিয়েছেন :

> "হ্যাঁ। তখন তোমার জন্য লড়েছিল, কারণ, তুমি তার ড্রাইভার। তার অন্যান্য সম্পত্তির উপর যেমন মায়া তোমার উপর তেমনি। সম্পত্তিই ইজ্জৎ। এখন তুমি গোলাম। কাজেই চাকরি গেছে। (শওকত, ২০০৩ : ৩৪৭)

নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন উচ্চবিত্তের খেয়ালি আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা 'ফলাফল' গল্পে ড্রাইভার মহাম্মদ জান এর জীবনে নির্মমভাবে নিরূপিত। চাকরি হারিয়ে নিম্নবিত্ত মানুষটি হয়ে পড়ে নিরুপায়। মূলত অনন্যোপায়ী মহাম্মদ জানরা যে সারাজীবন আনন্দময়ী ইউনুস চৌধুরীদের হাতের ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা 'ফলাফল' গল্পে উপস্থাপিত।

বিভিন্ন কালপর্বের ভাঙা-গড়ার ইতিহাসের সাক্ষী শওকত ওসমান পাকিস্তান কালপর্বে পেশাজীবী মানুষের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে নরসুন্দর, চিত্রকর, সরকারি চাকুরিজীবী, শ্রমজীবী, সাংবাদিক, বিচারক, ডাক্তার, ড্রাইভার, চোর, পকেটমার, পালিশ মিস্ত্রী, দর্জি, ব্যাংক ম্যানেজার, কালোবাজারি, পাখি বিক্রেতা প্রভৃতি শ্রেণি পেশার মানুষের চরিত্র অঙ্কন করেছেন। তবে, ব্রিটিশ কালপর্বে এবং

পাকিস্তান কালপর্বের রচিত পেশাজীবী শ্রেণি চরিত্রগুলোর মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। উভয় অংশেই পেশাজীবী চরিত্রগুলো সমমাত্রিকতায় এবং সমমূল্যে প্রতীকায়িত হয়েছে।

bq : i/cKagx Mí

রূপক (Allegory) সাহিত্যের একটি বিশেষ আঙ্গিক— যার মাধ্যমে চরিত্র, ঘটনা এবং পরিবেশ নিজেদের আপাত অর্থকে অতিক্রম করে, সমান্তরালভাবে, অন্য চরিত্র, ঘটনা এবং পরিবেশকে তুলে ধরে। রূপকধর্মী গল্পগুলো শওকত ওসমানের কথাসাহিত্যে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। তিনি এপর্বের গল্পে রূপকধর্মিতার ব্যবহার করেছেন মূলত বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং পরিবেশের অন্তঃসত্য আবিষ্কারার্থে।

'দুই মুসাফির' (c¯Íi djK) গল্পের কাহিনি বর্ণনায় mgvMg (১৯৬৮) উপন্যাসের একটি ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। mgvMg উপন্যাসে শওকত ওসমান আলাওল, চন্দ্রাবতী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হাজী মুহম্মদ মহসীন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লিও টলস্টয়, বার্নার্ড শ, রমা রলাঁ এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ-এর সমাগম ঘটিয়ে স্বৈরাচারকে নিন্দা করেছেন, তেমনি 'দুই মুসাফির' গল্পে লালন ফকির এবং জনৈক সোবহান জোয়ার্দার-এর আগমন ঘটিয়ে রূপকের আড়ালে পার্থিব ধন-সম্পদকে ধিক্কার জানিয়েছেন।

শওকত ওসমানের অনেক আলোচিত গল্পের মধ্যে 'দুই মুসাফির' গল্পটি অন্যতম। গল্পটিকে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ-গল্পটির বিষয়-বিশ্লেষণের পূর্বে সমালোচকগণের অভিমতগুলো উদ্ধারযোগ্য :

> আজহার ইসলাম: ধনদৌলত বিত্তসম্পত্তি মানুষকে অমরত্ব দিতে পারে না; কেননা তা অবিনশ্বর নয়। অন্যদিকে মহামানব তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনায় যখন জীবনের উৎকর্ষ সাধন করেন, তখন সে-জীবন অমরত্বের অধিকার অর্জন করে। লালন ফকির তাঁর গানের জগতে জীবনের সেই সাধনায় জয়ী হয়েছিলেন, ফলে মৃত্যুর পরেও তাঁর অমরত্ব অক্ষুণ্ন থাকে। (আজহার, ১৯৯৬ : ১১৩)

> অনীক মাহমুদ : 'দুই মুসাফির' গল্পটি তাঁর দার্শনিকতার ইঙ্গিত বহন করে। অর্থ ও কর্মের সাধনা এক নয়। এই তত্ত্বের উপর লিখিত হয়েছে 'দুই মুসাফির' গল্প। কল্পনা ও রূপকের মাধ্যমে শওকত ওসমান দুই মুসাফির গল্পে স্বর্গ-মর্ত্যের যোগাযোগ ঘটিয়েছেন। স্বর্গবাসীরা মর্ত্যে এসেছেন তাদের ইহলোক সন্দর্শনে। মৃত্যুর পর ইহলোকবাসী কিভাবে কাদের স্মরণ রাখে, অত্র গল্পে লেখক তা বিবৃত করেছেন।...আসলে বেঁচে থাকার সাধনাই শিল্পের সাধনা। যার ঠাঁই হয়ে যায় মানুষের মনে তার মৃত্যু হয় না। তার ইহলোকিকতার জন্য অঢেল ধন সম্পত্তির প্রয়োজন নেই। আর যাঁর অবস্থান অঢেল ধন সম্পত্তির মধ্যে, অথচ অমরত্বের সাধনা নেই-সেই মানুষ কীর্তিহীন। (অনীক, ১৯৯৫ : ২৪০-২৪১)

> মাহবুবুল আলম : 'দুই মুসাফির' একটি রূপকধর্মী গল্প। এ গল্পে দেখানো হয়েছে যে, ধনদৌলত মানুষকে অমরত্ব দিতে পারে না। অন্যদিকে মহামানব আধ্যাত্মিক সাধনায় সফলকাম হয়ে অমরত্বের মর্যাদা পায়। মূলত মহৎ কীর্তিগুলো মানুষকে অমরতা দান করে। (মাহবুবুল , ২০০৯ : ৪০৩)

'দুই মুসাফির' (প্রস্তর ফলক) গল্পপাঠে আমরা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারি যে, মানুষ বাঁচে তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে, ধনদৌলতের মধ্যে নয়। গল্পের শুরুতে গল্পকার নাটকীয় পরিচর্যার মাধ্যমে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে লালন ফকির এবং জনৈক সোবহান জোয়ার্দার-এর আগমন ঘটিয়েছেন।

মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে লালন ফকির এবং জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি সোবহান জোয়ার্দার ধরাধামে এসেছেন তাঁদের অতীতকর্ম সন্দর্শনে। লালন ফকিরকে সবাইকে চিনতে পেরে সবাই তাঁকে সমাদর করেন কিন্তু সোবহান জোয়ার্দারকে কেউ চিনতে পারেননি, বরং তার সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে নতুন মালিকের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হয়। জোয়ার্দার তার প্রচুর ধনসম্পত্তি পৃথিবীতে রেখে গেলেও তিনি হন পৃথিবীতে নিন্দিত এবং লালন ফকির শূন্য হাতে পৃথিবী থেকে চলে গেলেও পরবর্তীকালে তিনিই বিগত কর্মের জন্য হন নন্দিত। লালন ফকিরের আগমনে মানুষের মধ্যে এক নতুন প্রাণের সাড়া জাগে— বিভিন্ন গ্রাম থেকে দলে দলে জনতার সমাগম ঘটে তাঁকে দেখার এবং গান শোনার জন্য। জোয়ার্দার তাঁর সম্পত্তি নিয়ে গর্ব করলেও পৃথিবীতে পুনরায় এসে বুঝতে পারেন মানুষ তার সম্পত্তির মধ্যে নয়— তার কর্মের মধ্যেই স্মরণীয় হয়ে থাকে। তাই প্রথম মুসাফির লালন ফকির দ্বিতীয় মুসাফির সোবহান জোয়ার্দারকে বলেছেন : "একদিন তোমার কত কি, কত কে ছিল, আমার কিছুই ছিল না। আজ আমার সব আছে– অথচ তোমার কিছুই নেই।" (শওকত, ২০০৩ : ২৩০)

নশ্বর পৃথিবীতে একমাত্র মানুষের কর্মই অবিনশ্বর। এ-গল্পে লেখকের চরিত্রায়ণের কৌশলে চরিত্রগুলো তুলে ধরেছে বিমূর্ত ভাবধারা ও আদর্শ এবং কাহিনির মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে নীতি বা তত্ত্ব। প্রাচুর্য মানুষকে স্মরণীয়-বরণীয় করতে পারে না, যা 'দুই মুসাফির' গল্পের অন্তর্বুননে প্রকাশিত।

'গিরগিটি' (†bÎc_) গল্পে রূপক নামকরণের মধ্য দিয়ে মানুষের বহুমাত্রিক খোলস এবং রং-রূপ বদলের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। আপন স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা চালিত মানুষ আবুল কাশেম নিজের ফ্যাক্টরিতে আগুন দেন। এর পশ্চাতে কাজ করে আবুল কাশেমের অর্থলিপ্সা, প্রতারণার মাধ্যমে ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে অধিক পরিমাণে আর্থিক সুবিধা আদায় করা। কিন্তু নিজের দেওয়া আগুনে তিনি নিজেই দগ্ধ হন, ফলে তার দৈহিক বিকৃতি ঘটার সাথে সাথে চরিত্রও বিচিত্র বর্ণাবরণ ধারণ করে। প্রকৃতিতে গিরগিটি যেমন তার নিজের সুযোগ-সুবিধা মতো রং পরিবর্তন করে, তেমনি আবুল কাশেমও রং পরিবর্তনের মাধ্যমে সুবিধা আদায় করতে গিয়ে সারা শরীরে গিরগিটির রং ধারণ করে, যা গিরিগিটি এবং আবুল কাশেমকে একই সমান্তরালে দাঁড় করিয়েছে।

কথকের বন্ধু আজহার আবুল কাশেমের সাথে ফার্মে চাকুরি করার সূত্রে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং একারণে তিনি আবুল কাশেমকে 'গিরগিটি' বলে সম্বোধন করেন। গল্পের ভাষায় :

> লাভ আর লোভে দুই-ই উৎকট নেশা। এরা মুনাফা প্রফিট করে। সেবার আরো লোভে ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগিয়ে দিলে ইনসিওরেন্স কোম্পানির মাথায় হাত বুলোতে।...
> আগুন দেওয়ার পর ওর মনে পড়ে গেল, খাতা আয়রন সেফে রয়ে গেছে। সেফ তো আর পুড়বে না। তখন আবার ঢুকতে হোলো আগুনের মধ্যে। খাতা পুড়িয়ে দিলে ঠিক। কিন্তু নিজেও বেটা কাবাব হোয়ে যায়। (শওকত, ২০০৩ : ৩১০)

আবুল কাশেম মানুষের চোখে ধুলো দিলেও প্রকৃতির চোখে ধুলো দিতে ব্যর্থ হন। তাই প্রকৃতিও স্বাভাবিকভাবে তার সারা শরীরে রেখে গেছে গিরগিটির চিহ্ন এবং এর মধ্য দিয়ে উন্মোচন করেছেন প্রতারক আবুল কাশেমের প্রকৃত মুখোশ।

শওকত ওসমান পাকিস্তান কালপর্বে রচিত রূপকধর্মী গল্পে ব্যক্তি এবং বাস্তবের অন্তঃসত্য আবিষ্কারার্থে রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। রূপকধর্মিতা ব্যবহারের ফলে গল্পগুলোতে বাহ্যিক অর্থ অপেক্ষা অন্তঃসত্যই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।
শওকত ওসমানের পাকিস্তান কালপর্বের গল্পে বিষয়ের বিস্তৃতি ঘটেছে। বাংলাভাগোত্তরকাল থেকেই লেখকের জীবনদৃষ্টি সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্মচিন্তা, ব্যক্তিক সংকট এবং সমকালীন সংগ্রামের সমান্তরালে বিন্যস্ত হয়েছে ছোটগল্পে। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পের উপাদানের গ্রামজীবনমুখিতা এ পর্বে নাগরিক জীবনের স্বরূপ সন্ধানে বাঁক পরিবর্তন করেছে। এ-পর্বের গল্পে ১৯৪৭ সালের বাংলাভাগের প্রতিক্রিয়া, ভাষা আন্দোলন, সামরিক শাসনব্যবস্থা, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং মানবমনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চিত্র উন্মোচিত হয়েছে।

UxKv

1. kIKZ Imgvb : MímgM গ্রন্থে উল্লেখিত 'গৌরন্দ্রিা' গল্পটি সমকাল পত্রিকায় ৬বর্ষ : ১ম সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩৬৯) 'গোর-নিদ্রা' নামে প্রকাশিত হয়।

Mš' I ceÜcwÄ

অনীক মাহমুদ (১৯৯৫)। evsjv K_vmwn‡Z¨ kIKZ Imgvb, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী।
আজহার ইসলাম (১৯৯৬)। evsjv‡'‡ki †QvUMí : welq-fvebv ¯i/c I wkígj¨, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
চঞ্চল কুমার বোস (২০০৯)। evsjv‡'‡ki †QvUM‡íi wkíi/c, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
বুলবন ওসমান (২০০৪)। K_v-mwn‡Z¨ kIKZ Imgvb, সময় প্রকাশন, ঢাকা।
মাহবুবুল আলম (২০০৯। evsjv‡'‡ki mwnZ¨, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (২০০৮)। M½vFw× †_‡K evsjv‡'k, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ডি আর মোহন (১৯৯৯)। 'অমর্ত্য সেন : এ বাংলার ও বাংলার'; g‡Z¨i AgZ¨ †mb [সম্পা.মোহাম্মদ হান্নান], অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান (২০১৩)। 'নবমাত্রিক চেতনার উৎসমুখ'; †mv‡gb P‡›'i M í I M í cvV [সম্পা. আমিনুর রহমান সুলতান], ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

শওকত ওসমান (১৯৬৫)। Dcj ÿ¨, ওয়ার্সী বুক করপোরেশন, ঢাকা।

শওকত ওসমান (১৯৮৬)। wbtm½ wbgvY, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০০৩)। kIKZ Imgvb MímgM [সম্পা. বুলবন ওসমান], সময় প্রকাশন, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০০৭)। ivnbvgv 2 : Ab¨ iYcvš Íi I feb PZ‡i, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

শোয়েব শাহরিয়ার (১৯৯১)। 'শওকত ওসমানের গল্প : জীবনের আরেক নাম'; wbmM [সম্পা. সরকার আশরাফ], বগুড়া, ঢাকা।

সানজিদা আকতার (২০০২)। evsjv †QvUM‡í †'kwefvM, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (২০০৮)। 'শওকত ওসমান কথাসাহিত্যের পথিকৃৎ'; e¨w³ I mwnwZ¨K kIKZ Imgvb [সম্পা. বুলবন ওসমান], দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা।

ZZxq cwi‡"Q'
cwK¯Ívb Kvjc‡ei M‡íi wkíixwZ

বাংলাভাগ পরবর্তীকালে শওকত ওসমানের জীবনদৃষ্টি ও সাহিত্যসৃষ্টি রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজজীবনের নানামুখী সংকট-সংগ্রামের পথধরে এগিয়ে গেছে। কেননা "জীবনের অন্তহীন রূপ ও অবিরাম রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হয় একজন শিল্পীর সমগ্র চৈতন্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয় কালজ্ঞান, পরিবেশ-সচেতনতা, ইতিহাস-ঐতিহ্যবোধের পরাকাষ্ঠা এবং অর্জিত হয় সমাজ-প্রতিবেশ সৃষ্ট বিশ্বাস ও মূল্যবোধের গভীরতা। শিল্পীর ব্যক্তিচৈতন্য ও শিল্পিমানস প্রবহমাণ সময় ও দ্বন্দ্বমুখর সমাজের যোগফল।" (মিজানুর, ২০০৮ : ১) সুতরাং একজন শিল্পী তাঁর সময়-সমাজ-ঐতিহ্যবোধকে আত্মস্থ করে বিনির্মাণ করেন তাঁর শিল্পের জগৎ। পাকিস্তান কালপর্বে শওকত ওসমানের সাহিত্যবৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্ততায়, তির্যকভাষণে, ইঙ্গিতময়তায়, রূপক-প্রতীকে এবং গূঢ় বাক্যপ্রয়োগে প্রকাশিত। যে মননধর্ম নাগরিক শিল্প-রুচির প্রধান মানদণ্ড, শিল্পীজীবনের সূচনালগ্ন থেকেই তিনি তা অঙ্গীকার করেছেন ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। পঞ্চাশ-ষাটের দশকের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের আতঙ্ক-শিহরিত রূপ যে-কোনো সৎ শিল্পীর জন্যই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ হতে বাধ্য। ফলে, তাঁর গল্পসমূহ দ্বন্দ্বজটিল জীবনের নানামাত্রিক আয়োজনে যেমন ঋদ্ধ, তেমনি বিষয় বৈচিত্র্য এবং শিল্পকৌশলে বিবিধ প্রয়োগে সমৃদ্ধ।

GK

সংঘাতময় সময়-সমাজ-জীবনকে অনিবার্য রূপাঙ্গিকে প্রকাশ করা শিল্পীর স্বধর্ম। যুগচৈতন্যের অন্তর্দ্বন্দ্ব, রক্তক্ষরণ ও বেদনার ইতিহাসকে অনিবার্য শৈলীতে রূপদান করার দায়িত্ব শিল্পীর স্বকীয়। সেনাতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রের বিপজ্জনক সংমিশ্রণে পাকিস্তানি রাষ্ট্রাদর্শকে এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়— যার সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সমাজসত্তাকে মধ্যযুগীয় অন্ধকারের দিকে ধাবিত করে। শওকত ওসমানের এ-পর্যায়ের গল্প-উপন্যাস-নাটক সমকাল-উত্থিত তাঁরই স্রষ্টাচৈতন্যের ক্রমবিকাশের স্মারকচিহ্ন।

১৯৪৭ সালে 'দ্বি-জাতি' তত্ত্বের ভিত্তিতে "ভারতবিভাগের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলিম লেখকদের স্বতন্ত্র শিল্পচর্চার সুযোগ ঘটে। কেবল ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য নয়, শিল্পের ক্ষেত্রেও তাদের আত্ম-পরিচয় নির্মাণ এবং স্বাধীন সত্তা বিকশিত হবার সুযোগ তৈরি হয়।...শিল্পের যে কোন আদল বা রূপকল্প মুখ্যত গড়ে ওঠে সমকালীনতার ক্যানভাসে, তবে ঐতিহ্যের অঙ্গীকার এবং রূপান্তরের আন্তর গরজে শিল্পের অবয়ব ক্রমাগত বদলে যায়। বিষয়ের প্রয়োজনে আঙ্গিক ও প্রকরণে আসে পালাবদল।" (চঞ্চল, ২০১১ : ১০৬) তবে ব্রিটিশ কালপর্বের ভিক্টোরীয় প্রকরণরীতি, কাহিনি বিন্যাসও পাকিস্তান কালপর্বের কিছু সংখ্যক গল্পে স্বমহিমায় উপস্থাপিত। এ-পর্বেও তাঁর যে-সব গল্পে ভিক্টোরীয় শিল্প-কৌশলের প্রভাব পড়েছে তার মধ্যে 'দুই মুসাফির' (c¯Íi djK), 'উভসঙ্গী' (c¯Íi djK), 'পিতাপুত্র' (c¯Íi djK), 'চূর্ণলয়' (c¯Íi djK), 'আজব জীবিকা' (c¯Íi djK), 'বালকের মুখ' (†bÎc_), 'দেশ কাল পাত্র' (†bÎc_), 'শকুনের চোখ' (†bÎc_) গল্পের নাম উদ্ধারযোগ্য। এ-গল্পগুলোতে সময়ের এবং ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করে কাহিনি বিন্যস্ত। যেমন 'দুই মুসাফির' ভিক্টোরীয় প্রকরণরীতি অনুসারে গল্পের কাহিনি বিন্যাস ঘটেছে সময়ের নিখুঁত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। এ-গল্পে যেমন সময়ের সুস্পষ্ট ব্যবহার লক্ষ করা যায়, তেমনি অন্যদিকে কাহিনির ধারাবাহিকতাও লক্ষযোগ্য :

> তা ত থাকার যো নেই। আমি বলে এসেছি, ইহলোকে একদিন থাকব। আজ ভোরেই নিজের ঠিকানায় পৌঁছব। বাইরে আসার নাম করে চলে এলাম। ওই শুকতারা উঠেছে। চলো, বাতাসে মিলিয়ে যাই। (দুই মুসাফির ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৩০)

ব্রিটিশ কালপর্বের (ত্রিশ-চল্লিশ দশকের) গল্পের গ্রামজীবনমুখীতা পাকিস্তান কালপর্বের গল্পে নাগরিক জীবনের রূপ ও স্বরূপের সন্ধানে বাঁক পরিবর্তন করেছে। শওকত ওসমানের শিল্পিমানসের এ রূপান্তর সমকালীন জীবনপ্যাটার্নের সাথে অঙ্গাঙ্গিকভাবে সম্পৃক্ত তা বলাই বাহুল্য। "সমাজ-শর্তলগ্ন হয়েও একজন শিল্পী আন্তরজাগতিক অভিপ্রায় ও অভিজ্ঞানে, বোধ ও সংবেদনায়, আকাঙ্ক্ষায় ও মনস্তত্ত্বে, অস্তিত্বচেতনা ও জীবনদর্শনে অর্থাৎ নান্দনিক অনুভবে পৃথক।" (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭ : ৮৫) পাকিস্তান কালপর্বের গল্পের কাহিনি বিন্যাসে শওকত ওসমানের মননে সমকাল তাৎপর্যময় বিষয় হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল। এ সম্পর্কে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর মতামত উদ্ধারযোগ্য :

ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাতময় জীবন শওকত ওসমানকে দিয়েছিল এক চারিত্রিক দৃঢ়তা. যার প্রমাণ মেলে দেশের রাজনীতির বিরুদ্ধ পরিবেশে তাঁর সাহিত্যিক আচরণে। একাত্তরের পূর্বেকার স্বৈরশাসনের যুগ, আবার পঁচাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশে স্বৈরাশাসন ও অপশাসনের দুই দশক ছিল সাহিত্য ও শিল্পীকর্মীদের জন্য এক চরম পরীক্ষার ফল। এসময় অনেকে বিশ্বাসের শুদ্ধতা রক্ষা করতে পারেননি। অনেকেই নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্ষমতার নান্দীপাঠ করেছেন। অনেকেই রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছেন। প্রবল ব্যতিক্রম ছিলেন শওকত ওসমান। যিনি স্বৈরশাসনের প্রকৃত স্বরূপ দেখেছিলেন ও তাঁর সাহিত্য উপলব্ধির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। (জিল্লুর, ২০০৪ : ৪১)

মূলত সমকালীন রাজনৈতিক উত্তাল তরঙ্গ-স্রোতে শওকত ওসমানকে গল্পের কাহিনি বিন্যাসে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। পাকিস্তান কালের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ঘটনাপ্রবাহের অন্তর্বাস্তবতা এবং বহির্বাস্তবতার স্বরূপ নির্মাণে রূপক-প্রতীকের দিকে ঝুঁকে পড়েন। আর এভাবেই চিত্রকল্প ও প্রতীকের সহায়তার আপন ভাবনাকে অনায়াসে তিনি উপস্থাপন করেন গল্প-শরীরে। "শওকত ওসমানের প্রতীকাশ্রয়ী মানসচেতনার জন্ম স্বকাল-সংকট থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্যই। শওকত ওসমানের কৃতিত্ব তিনি তাঁর পলাতক চেতনাকে নিরীক্ষাধর্মী শিল্পরূপে উদ্ভাসিত করতে সমর্থ হয়েছেন।" (সৈয়দ ১৯৯৭ : ১০৬) ফলে, লেখকের এ-পর্বে গল্পের আঙ্গিক নির্মাণে অনিবার্যভাবেই রূপক-প্রতীকের বহুল ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বের সাথে রূপায়িত। যেমন, 'গোর-নিদ্রা' (c¯Íi djK) গল্পের বক্তব্য এই—পাকিস্তানি শাসক-শোষক-সামরিক জান্তারা এ-দেশের জনজীবনকে বিভিন্নভাবে বিষিয়ে তোলার স্বপ্নবিলাসে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এ-দেশের অত্যাচারিত জনগণ যে সঠিক সময়েই মুক্তি-সংগ্রামের অভিপ্রায়ে জেগে ওঠে তা লেখক নাটকীয় পরিচর্যার মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। লেখক জানাচ্ছেন :

সদ্য-জীবিত লাশ কিন্তু দ্রুত আমার করমর্দন করতে করতে বললে, "ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ভূত নই। ঘুমিয়ে ছিলাম মাত্র। আমি জ্যান্ত। আসলে ও-গুলো মড়া, দাও মত আমাকে বয়ে আনছিল। আসুন, দেখুন–।" (গোর-নিদ্রা ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৬৮)

রূপক-প্রতীকের বহুল ব্যবহার লেখকের ব্রিটিশ কালপর্বের যে-সব গল্পে প্রতিফলিত তার মধ্যে 'শিকারী' (c¯Íi djK), 'জিহ্বাহীন' (†bÎc_), 'চিড়িমার' (†bÎc_), 'শৃগালস্য' (Dfk½), 'উভশৃঙ্গ' (Dfk½) স্মরণযোগ্য। এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধারণকারী গল্পের বক্তব্য ইঙ্গিতধর্মী, ভাষা ব্যবহার প্রতীকধর্মী, প্লটের স্বাভাবিক গতিস্রোতের মধ্যে আকস্মিক নাটকীয় পরিচর্যা রূপক-প্রতীকধর্মিতাকে স্পষ্ট করে তোলে।

ছোটগল্প সাহিত্যের এমন একটি শাখা বা শিল্প মাধ্যম যেখানে জীবন ও সমাজের ছোট ছোট বোধ অনুভবের ছোঁয়া থাকে। ছোটগল্পের একমুখী দ্রুতগতি, ঘটনার নিপুণ নির্বাচন এবং ভাবগত ঐক্য ও ইঙ্গিতধর্মিতাই তার শিল্পরূপ, তার নিজস্ব সংহত উদ্দীপ্ত প্রাণশক্তি। এখানে উল্লেখ্যযোগ্য যে, "আধুনিক বিশ্বসাহিত্যে সংক্ষিপ্ততা ও ঘনীভবনের জন্য রুচিপ্রস্তুতি চলছে দীর্ঘকাল যাবৎ। লু সুন

(১৮৮১-১৯৩৬), কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪), ব্রেখট (১৮৯৮-১৯৫৬), কাওয়াবাতা (১৮৯৯-১৯৭২), বরহেস (১৮৯৯-১৯৮৬) এবং বেকেট (১৯০৬-১৯৮৯) এর বহু গল্প নাতিদীর্ঘ। বাংলা সাহিত্যে অণুগল্প জনপ্রিয় করেন বনফুল দুঃসাহসী একক প্রচেষ্টায়।... সংক্ষিপ্ত, আঁটোসাঁটো রচনার অনুরাগীরা সংখ্যায় বাড়ছেন দ্রুত। তাঁদের চোখে এমন রচনা শুধু উত্তমই নয়, শিল্পগুণেও শ্রেষ্ঠ।" (শান্তনু, ২০১২ : ৩১) ছোটগল্পের ছোট ছোট অনুভবের আবেদন পাঠকের হৃদয়ের অনেক গভীরে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোধ একসময় পাঠককে বড় বোধে উপনীত করে। এ-জাতীয় বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং সমকালীন বাস্তবতা অনুধাবন করে শওকত ওসমানও রচনা করেছেন Dcjÿ¨ (১৯৬৫) এবং †bÎc_ (১৯৬৮) গ্রন্থের গল্পশরীর। এ-দুটি গ্রন্থের গল্পগুলো অণু গল্প বা নকশা জাতীয় রচনা। লেখক পাকিস্তান কালপর্বে ব্রিটিশ কালপর্বে রচিত দীর্ঘ আয়তনযুক্ত গল্প-রচনা থেকে বের হয়ে আসেন এবং ধীরে ধীরে সংক্ষিপ্ত আয়তনযুক্ত গল্প-রচনায় মনোনিবেশ করেন। লেখক বাংলা কথাসাহিত্যে অধিকাংশ সময় নিরীক্ষাধর্মিতার পথে হেঁটেছেন এবং এ-জাতীয় গল্প-রচনা তার নিরীক্ষাধর্মিতারই অন্তর্গত। লেখকের ভাষ্যানুসারে : "বহুব্যস্ত পাঠকের ঈষৎ মনোরঞ্জনের আশায় এই লেখার সূত্রপাত।" (শওকত, ১৯৬৫ : ভূমিকাংশ) Dcjÿ¨ এবং †bÎc_ গল্পগ্রন্থের অধিকাংশ গল্প ছোটগল্পের সংযম ও শাসন মেনে মূলভাবকে ধারণ করে সংক্ষিপ্ত কলেবরে প্রকাশিত। তবে, গল্পের অবয়বগত সংক্ষিপ্ততা সম্পর্কে শওকত ওসমান 'স্বজন স্বজাতি' (i\/Rci¤§l) গল্পে যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন তা এখানে উদ্ধারযোগ্য : "গল্প ত স্বল্প চৌহদ্দির মধ্যে থাকা উচিত।...যদি পদে পদে শব্দের টীকা কাটতে বা ব্যাখ্যা দিতে হয়, তাহলে গল্প বেচারা মার খায়।" (শওকত, ২০০৩ : ৭২০-৭২১)

অবশ্য এ-জাতীয় গল্পলেখার উৎসাহদাতা হিসেবে তাঁর সামনে ছিলেন বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯)। বনফুল যেমন তাঁর গল্পের সংক্ষিপ্তকরণের মধ্যেও কাহিনি বিন্যাসগত প্রক্রিয়ায় কখনোই বাস্তব জীবন থেকে সরে যান নি, তেমনি শওকত ওসমানও তাঁর অণু গল্পের কাহিনি-বিন্যাসে বাস্তবভূমিকেই আধার হিসেবে গ্রহণ করেছেন। শওকত ওসমানও গল্পের ঘটনাবিন্যাস এবং জীবনচিত্রণে নিরাসক্ত মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু বনফুল তাঁর গল্পগুলোর কাহিনি বিন্যাসে যেখানে স্কেচধর্মিতার আশ্রয় নিয়েছেন, সেখানে শওকত ওসমান সরলরেখায় গল্পগুলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে, শওকত ওসমানের গল্পগুলো ঈষৎ মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এবং সরলরেখায় বর্ণিত হলেও লেখকের মননশীলতা, বক্তব্যের গভীরতায়, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশীলতায় এবং ভাষা ব্যবহারের দক্ষতায় প্রতিটি গল্প শিল্প-সার্থকতায় উত্তীর্ণ। উদাহরণ হিসেবে 'দুই ধার্মিক' (Dcjÿ¨) গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন :

> প্রথম। (গলির এপার হইতে) হিন্দু কা মা, বহেনো কা....আল্লাহো আকবর।
> দ্বিতীয়। (গলির ওপার হইতে) মুসলমান কা মা, বহেনো কা...বন্দেমাতরম। (শওকত, ১৯৬৫ : ১০)

গল্পটির আয়তন মাত্র দুটি বাক্য বা দুটি লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ অথচ কী বিশাল তার প্রকাশভঙ্গির ব্যঞ্জনা, দুটি বাক্যই যেমন ভারতবর্ষে সংঘটিত একাধিক দাঙ্গার চিত্র হিসেবে পাঠকের সম্মুখে প্রকাশমান। তবে ছোটগল্পের প্রবণতা অনুসারে এ গল্পগুলোকে ভাবপ্রধান গল্পের শ্রেণিভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যের আলোকে রচিত গল্পগুলোর মধ্যে 'উপলক্ষ্য' (Dcjÿ¨), 'দুই মোনাজাত' (Dcjÿ¨), 'গুরু-শিষ্য' (Dcjÿ¨), 'কাব্যফল' (Dcjÿ¨), 'ফারাক' (Dcjÿ¨), 'দম্পতি' (Dcjÿ¨), 'নেত্রপথ' (†bÎc_), 'গিরগিটি' (†bÎc_), 'সাবালক' (†bÎc_), 'উৎসর্গ' (†bÎc_), 'গ্রেশামং শরণং' (†bÎc_) উল্লেখযোগ্য।

শওকত ওসমানের পাকিস্তান কালপর্বের গল্পে কাহিনি বিন্যাসে ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতির প্রয়োগ ঘটেছে। তবে, যে-গল্পেই তিনি ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতির ব্যবহার করেছেন, সেখানেই এসেছে স্মৃতিময়তা। অর্থাৎ এ-পর্বের গল্পে ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতি এবং স্মৃতিময়তার যুগলবন্দি হিসেবে উপস্থাপিত। এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যের আলোকে রচিত গল্পের মধ্যে 'বর্ণামৃত' (c¯Íi djK), 'ভ্রূণাঙ্ক' (c¯Íi djK), 'সেলুন' (c¯Íi djK), 'একটি বহস' (†bÎc_), 'জন্তুগাথা' (†bÎc_), 'সৌদামিনী মালো' (Dfk½) উল্লেখযোগ্য। গল্প থেকে ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতি এবং স্মৃতিময়তার উদাহরণ উদ্ধৃত :

> আমার জনক-জননীরা পরস্পরকে ভালবেসে ছিল। হাজারি গলির সেই ছেলেটি, সেই মেয়েটি। বহুদিনের চেনাচেনি, জানাজানি তাদের। তার কতশত প্রমাণ আছে। এক সন্ধ্যার কথাই বলা যাক : মেয়েটি হাসতে লাগল। 'আহ, যেন ধুলোয় গড়িয়ে পড়ো না', সঙ্গী ছেলেটি খোঁচা দিয়ে বললে।
> -তোমার কথা মনে করে সত্যি হাসি পায়। (ভ্রূণাঙ্ক ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৫৩)

উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসর ছোটগল্পে থাকে না বলে তার গঠনশিল্পের সূক্ষ্মতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সংক্ষিপ্ত পরিসরে সমগ্র অবয়বের ঐক্যের প্রতীতি ছোটগল্পলেখকের মূল লক্ষ্য বলে কাহিনিবিভাগের বৃত্তগঠনে সেই প্রতীতি তার প্রধান অবলম্বন। তাই একেবারে শুরু থেকেই কোনো অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা না রেখে গল্পকারকে এগোতে হয় ঘটনাক্রমের পরিণতিবিন্দু এবং সেখান থেকে দ্রুত অবরোহনের মাধ্যমে গল্পের সমাপ্তির দিকে। শওকত ওসমানের এ-পর্বের কিছু গল্পের শুরু এবং সমাপ্তি অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং গল্পের আখ্যানভাগ নাটকীয়তায় ভরপুর। নাটকের প্লট গঠনে অ্যারিস্টটল যে আদি-মধ্য-অন্ত সংবলিত বিন্যাসের কথা বলেছিলেন, শওকত ওসমানের এ পর্বের গল্পের সংক্ষিপ্ত অবয়বেও তা লক্ষণীয়। ফলে নাটকীয় বিন্যাসরীতিতে ঘটনা-কালের পরম্পরায় গল্পগুলো ব্যঞ্জনাময়রূপ লাভ করেছে। এ–ধরনের গল্পের মধ্যে 'দুই মুসাফির' (c¯Íi djK), 'শিকারী' (c¯Íi djK), 'ভ্রূণাঙ্ক' (c¯Íi djK), 'উপলক্ষ্য' (Dcjÿ¨), 'একটি বহস' (†bÎc_), 'নেত্রপথ' (†bÎc_), 'হিংসাধার' (†bÎc_), 'গিরগিটি' (†bÎc_), 'দ্রব্যগুণ' (†bÎc_), 'ব্ল্যাকমার্কেট' (†bÎc_), 'শরিকান' (†bÎc_), 'জিহ্বাহীন' (†bÎc_), 'জাতক কাহিনী' (Dfk½) অন্যতম। প্রতিটি গল্পের মধ্যে সময়ের নিখুঁত বিন্যাস এ-জাতীয় গল্পের শিল্পসার্থকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত। যেমন, 'দুই মুসাফির' গল্পে সময়ের বিন্যাস দুপুর থেকে ভোর রাত পর্যন্ত,

'শিকারী' গল্পের পর্বকাল 'একবেলা', 'ভ্রূণাঙ্ক' গল্পে সময়ের ব্যাপ্তি 'অপরারেশন টেবিলের অবস্থানকাল', 'উপলক্ষ্য' গল্পের সময়পরিসর দুই মিনিট, 'একটি বহস' গল্পের সীমাকাল 'সন্ধ্যা থেকে রাত', 'নেত্রপথ' গল্পের সময়ের ব্যপ্তি 'দুপুর থেকে বিকেল', 'গিরগিটি' গল্পের 'একটি রাত' 'দ্রব্যগুণ' গল্পের পর্বকাল 'দেড় ঘণ্টার', 'জাতক কাহিনী' গল্পের সময়সীমা 'চব্বিশ ঘণ্টা'। এভাবে সময়ের নিখুঁত অনুভবময়তার চূড়ান্ত বিস্তার লাভ করেছে এ-পর্বের গল্পে। 'জাতক কাহিনী' গল্প থেকে একটি উদাহরণ উদ্ধারযোগ্য :

> সেদিন সূর্য অস্ত গিয়েছিল। কারণ, পরদিন আবার সকাল হোলো, তেমনই অঘ্রাণের সকাল। পার্কের ধারে আর পরিত্যক্ত গোটা শিশুটা ছিল না। পড়ে ছিল তার টুকরো ছেঁড়াখোঁড়া অংশ। (জাতক কাহিনী ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৪০)

এ-পর্বে কিছু গল্পের বিন্যাসরীতিতে চরিত্রের দৃষ্টিকোণকে উপজীব্য করে শওকত ওসমান গল্পরচনায় অগ্রসর হয়েছেন, এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গল্পের মধ্যে 'দীক্ষায়ণ' (c¯Íi djK), 'গোর-নিদ্রা' (c¯Íi djK), 'জনারণ্যে' (†bÎc_), 'ব্ল্যাকমার্কেট' (†bÎc_), 'মন্ত্রগুণ' (†bÎc_) অন্যতম। এ-জাতীয় বিন্যাসরীতি ব্যবহারের কারণে চরিত্রের ভিতর-বাহির যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি চরিত্রের প্রত্যক্ষ-দর্শনের ফলে গল্পের পরিবেশ আরও জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। যেমন :

> সমাজ-শকটে আমার জায়গা ইন্টার ক্লাসে। একদম বাথরুমের কাছাকাছি। অর্থাৎ আমি নিচ-মধ্যবিত্ত। অবিশ্যি ভদ্রলোক। আমার অফিসের মেজ-সেজো বড় সাহেবেরা কী মনে করেন জানি না। কিন্তু পিয়ন-সম্প্রদায় এবং আমার গ্রামের চাষিবাসি, মাঝিমাল্লা সকলে আমাকে মিয়া-সাহেব বলেই সম্বোধন করে। (জনারণ্যে ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৯৫)

গল্পের অনুচ্ছেদ বিন্যাস পাকিস্তান কালপর্বের গল্পেরও একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে, এ-ধরনের বৈশিষ্ট্য ধারণকৃত গল্পের মধ্যে গল্পকার স্থান-ঘটনা-সময়ের সঠিক বিন্যাসে যথেষ্ট সচেতনতার ছাপ রেখেছেন। এ-ধরনের গল্পের মধ্যে 'দুই মুসাফির' (c¯Íi djK) ২টি, 'বর্ণামৃত' (c¯Íi djK) ২টি, 'সেলুন' (c¯Íi djK) ২টি, 'প্রস্তর ফলক : একটি রাগিনী' (c¯Íi djK) ৩টি, 'জন্তুগাথা' (†bÎc_) ২টি, 'চোর ও সাধু' (†bÎc_) ২টি, 'সৌদামিনী মালো' (Dfk½) ২টি, 'দানসত্র' (Dfk½) ৬টি এবং 'গরু চোরের কাহিনি' (Dfk½) ২টি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত। এ পর্বে লেখক স্বল্প সংখ্যক অনুচ্ছেদেই গল্প-কাহিনি বিন্যস্ত করেছেন।

গল্পের নামকরণ সাহিত্যের মানদণ্ডে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গল্পনামের প্রাথমিক পরিচয়েই পাঠক গল্পের বিষয়-বক্তব্যের মর্মমূলে প্রবেশ করেন। পাকিস্তান কালপর্বের গল্পের নামকরণে শওকত ওসমানের সচেতনতার পরিচয় সুস্পষ্ট। এ-পর্বে গল্পকার নামকরণ-বিচারে রূপক-প্রতীকাশ্রয়ী। এ-পর্বের গল্পে তিনি যেমন রূপক-প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন, তেমনি নামকরণ প্রক্রিয়ায়ও এর বহুল ব্যবহার

দৃষ্টিগোচর হয়। এ-জাতীয় নামকরণে গল্প যেমন ভিন্ন তাৎপর্যে উপনীত হয়, তেমনি লেখকের কাঙ্ক্ষিত-লক্ষ্যের সার্থক রূপায়ণও ঘটে। রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে এ-পর্বে যে-সব গল্পের নামকরণ করা হয়েছে তার মধ্যে 'শিকারী' (c¯Íi djK), 'বর্ণামৃত' (c¯Íi djK), 'ভ্রূণাঙ্ক' (c¯Íi djK), 'দীক্ষায়ণ' (c¯Íi djK), 'চূর্ণলয়' (c¯Íi djK), 'হিংসাধার' (†bÎc_), 'গিরিগিট' (†bÎc_), 'জিহ্বাহীন' (c¯Íi djK) উল্লেখযোগ্য।

যেসব গল্পের নামকরণে বক্তব্যধর্মিতা মুখ্য হয়ে উঠেছে, সে সব গল্পের মধ্যে 'দুই মুসাফির' (c¯Íi djK), 'উভসঙ্গী' (c¯Íi djK), 'উপলক্ষ্য' (Dcjÿ¨), 'দুই ধার্মিক' (Dcjÿ¨), 'নেত্রপথ' (†bÎc_), 'দেশ কাল পাত্র' (†bÎc_), 'দ্রব্যগুণ' (†bÎc_), 'সাবালক' (†bÎc_), 'অকাল-পক্ক' (†bÎc_), 'ফলাফল' (†bÎc_), 'শরিকান' (†bÎc_), 'ফৌৎ' (Dfk½), 'জাতক কাহিনী' (Dfk½) অন্যতম। এ-জাতীয় নামকরণের মধ্যেই গল্পের মূল-বিষয় অভিব্যঞ্জিত।

'B

শওকত ওসমান পাকিস্তান কালপর্বের গল্পে চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রেও এনেছেন পরিবর্তনের ছোঁয়া। ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পে চরিত্রায়ণে যে ভিক্টোরিয়ান আদর্শবাদ, আবেগীয় মূল্যবোধ, চরিত্রের বাহ্যাবরণকে ফুটিয়ে তোলার কৌশলকে আশ্রয় করেছিলেন, সচেতনভাবেই এ-পর্বে তা বর্জন করেন। এ-পর্বে চরিত্রের বাহ্যজটিলতা অপেক্ষা স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা-অন্তর্জটিলতার চিত্রই এ-পর্বে নানামাত্রিক আয়োজনে উপস্থাপিত। তাছাড়া বহির্বাস্তবতার সাথে অন্তর্বাস্তবতার রসায়ন এ-পর্বের চরিত্রগুলোকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

এ কালপর্বে রচিত শওকত ওসমানের গল্পের চরিত্রায়ণ রূপক-প্রতীকাশ্রয়ী। এ-পর্বের চরিত্রসমূহ জীবনযন্ত্রণার জতুগৃহে বেড়ে উঠেছে। প্রথাগত সমাজশক্তির বিরুদ্ধে এ-পর্বের চরিত্রসমূহ অস্তিত্বের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। কুসংস্কার ও ধর্মব্যবসার পুরুষানুক্রমিক শোষণে শওকত ওসমানের এ-পর্বের গল্পের চরিত্র আলোড়িত। এ-পর্বের চরিত্রসমূহ পাকিস্তানি শোষকের নিষ্পেষণে পদদলিত কিন্তু দেশমাতৃকার স্বাধীনতা-চিন্তায় আন্দোলিত এবং স্বদেশভাবনায় অতন্দ্র প্রহরী। লেখকের এ-কালপর্বের "চরিত্রায়ণরীতি সর্বতোভাবে প্রথাগত নয়। রূপকধর্মী চরিত্রের মাধ্যমে লেখক জীবনের গভীর দার্শনিক উপলব্ধিকে ব্যক্ত করেছেন, তেমনি সমাজের স্থবিরতা ও পচনশীলতাকে তীব্র শ্লেষবিদ্ধ করেছেন কোনো কোনো গল্পে।" (চঞ্চল, ২০১১ : ৮২) এ-জাতীয় গল্পের মধ্যে 'দুই মুসাফির' (c¯Íi djK), 'শিকারী' (c¯Íi djK), 'ভ্রূণাঙ্ক' (c¯Íi djK), 'চিড়িমার' (†bÎc_), জিহ্বাহীন (†bÎc_) উদ্ধারযোগ্য।

'দুই মুসাফির' গল্পের বাউল সাধক লালন ফকির এবং সোবহান জোয়ার্দার চরিত্র-চিত্রণে শওকত ওসমান রূপকধর্মিতার আশ্রয় নিয়েছেন। জীবনের দার্শনিক মূল্যচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে, ঘটনার টানাপড়েনে উপর্যুক্ত চরিত্রদ্বয়ের পরিকল্পনা অভিনব এবং বৈচিত্র্যমণ্ডিত। এক্ষেত্রে লালন ফকির চরিত্র অর্জন করেছে রাউন্ড চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং সোবহান জোয়ার্দার ধারণ করেছে ফ্লাটধর্মী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। লালন ফকিরের অর্জন পৃথিবীতে অবস্তুগত এবং সোবহান জোয়ার্দারের অর্জন বস্তুগত। লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের সাথে চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দুর ব্যবহার চরিত্র দুটিকে যেমন তাৎপর্যমণ্ডিত করে, তেমনি গল্পের বিষয়কেও স্পষ্টভাবে প্রতীকায়িত করে— যা লালন ফকিরের উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত :

> একদিন তোমার কত কি, কত কে ছিল, আমার কিছুই ছিল না। আজ আমার সব আছে– অথচ তোমার কিছুই নেই। (দুই মুসাফির ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৩০)

'শিকারী' গল্পে তাজু খান চরিত্র নির্মাণে গল্পকার বিশেষ কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক ও অবচেতনাগত নিগূঢ় সংকটের উন্মোচন ঘটলেও চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু স্বগতকথনের ভঙ্গিতে বিমিশ্র হয়েছে লেখকের সর্বজ্ঞার সাথে। গল্পে তাকে পাখি শিকারী-প্রকৃতির সৌন্দর্য হরণকারী রূপে চিহ্নিত করলেও লেখকের চরিত্রসৃষ্টির গোপন অভিপ্রায় আলোচ্য চরিত্রের মুখ থেকেই নিঃসৃত হয় : "The murderer is murdered thus- খুনীরা এইভাবে খুন হয়।" (শিকারী ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৪২) বক্ষ্যমাণ গল্পে নিজের গুলিতে তাজু খানের মৃত্যুকে দেখানো হয়েছে প্রতীকী অর্থে এবং পরিণামে চরিত্রটিও হয়ে উঠেছে প্রতীকধর্মী।

'ভ্রূণাঙ্ক' গল্পের চরিত্র-নির্মাণ অভিনব। "মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হয় নি, এমন এক সুপ্ত মানবভ্রূণ গল্পকারের অনিন্দ্য শিল্পকল্পনায় চরিত্রকল্প হয়ে উঠেছে। সমাজ-অস্বীকৃত এক অবৈধ সন্তানের তীব্র সামাজিক ও মানবিক অসহায়ত্ব উন্মোচনের মৌল অভীপ্সা থেকেই লেখক উত্তম পুরুষে কাহিনি বর্ণনা করেছেন।" (চঞ্চল, ২০১১ : ১৩২) মানবগর্ভস্থ মানবভ্রূণটির চরিত্র অঙ্কনের পিছনে আছে আধুনিক সংকটদীর্ণ মানুষের জটিল মনোভুবন। এই দুর্জ্ঞেয় মনোজগতের রূপায়ণে লেখকের সর্বজ্ঞতার সঙ্গে চরিত্রের স্বগতকথন বা মনোলগ একীভূত হয়ে যে স্বতন্ত্র প্রাজ্ঞময় চরিত্র-সৃষ্টি হয় তা এখানে উদ্ধারযোগ্য :

> তোমার সার্জনকে বলো, তার সাড়াশিটা আরো জোরে বসিয়ে দিক আমার ব্রক্ষ্মতালু ছিনভিন্ন করে দিতে, মস্তিষ্কের সব-কোষ লণ্ডভণ্ড উপড়ে ফেলতে। আমার কোন দুঃখ থাকবে না। তোমার মতো আমারও অসংখ্য সান্ত্বনা তারই মধ্যে নিহিত। (ভ্রূণাঙ্ক ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৫৭)

গল্পের শিল্পভাষ্যে ভূমিষ্ঠ না হওয়া এক মানব শিশুই চরিত্র-হিসেবে উঠে এসেছে— যা খুবই অর্থবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। রূপকধর্মী এ-শিশু বা মানবভ্রূণাঙ্ক চরিত্রটি মূলত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিরূপকে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন।

'চিড়িমার' গল্পের চরিত্রায়ণ কৌশল 'শিকারী' গল্পের অনুরূপ। সামরিক অক্টোপাশে বন্দি মানুষের অবরুদ্ধ চিত্রকে গল্পকার প্রতীক-আঙ্গিকে বিন্যাস করেছেন। লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে স্বৈরশাসনের শৃঙ্খলে বন্দি মানুষের যন্ত্রণার রূপকধর্মী চরিত্র হিসেবে 'গানের পাখি' (ডাহুক, ঘুঘু, শ্যামা, টিয়া, মণিয়া, কোকিল, দোয়েল) এবং শাসকশ্রেণির প্রতিনিধিত্বশীল হিসেবে চরিত্র হিসেবে 'চিড়িমার' (শিকারী) আত্মপ্রকাশ করেছে। অভিনব এ-দুই শ্রেণির প্রতীকী চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে গল্পকার যথাক্রমে দেশপ্রেমিক মানুষ এবং নির্যাতনকারী শাসকশ্রেণির প্রতিনিধিত্বশীলতাকে রূপ দিয়েছেন। চিড়িমারের জবানিতে প্রকাশ পেয়েছে অবরুদ্ধ বাঙালি এবং বাংলাদেশের গতি-প্রকৃতি :

> -এরা গান গাইলে, গান শুনে শুনে জঙ্গলের সমস্ত পাখি নড়েচড়ে, লাফালাফি করে। আমাদের তো ব্যবসা মাটি। তখন পাখি ধরব কি করে? তাই আগে এগুলো ধরলাম। (চিড়িমার ॥ শওকত, ২০০৩ : ৩৭৪)

শওকত ওসমান আত্মকথনরীতিতে জিহ্বাহীনের বা ভাষাহীনের মুখে ভাষা দিয়ে চরিত্র-সৃজনে বিশেষ অনুভবময়তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন 'জিহ্বাহীন' গল্পে। জিহ্বাহীন চরিত্রের মানসগঠনে লেখক জটিল ক্রিয়াকলাপের আশ্রয় নিয়েছেন। গল্পকার এ-জাতীয় জটিল চরিত্র নির্মাণের পশ্চাতে তাঁর গূঢ় উদ্দেশ্য গোপন রেখে রূপকধর্মিতার মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন। এ-ধরনের চরিত্রসৃষ্টিতেও গল্পকার রূপকধর্মিতাকে উপজীব্য করে ভাষার মহিমা-কীর্তন করেছেন। লেখকের চরিত্রসৃষ্টির উদ্দেশ্যপূরণে, চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় মনোজগতের রূপায়ণে লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের সাথে চরিত্রের স্বগতকথন একীভূত হয়ে স্বতন্ত্র পরিচর্যারীতি লাভ করেছে। যেমন :

> আমি অশেষ। কিন্তু আমি অনিত্য। তাই আমি অনন্তের হাতে রাখী বন্ধনের দুঃসাহসী অভিযাত্রী। শুধু আমার ভাষা ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও...। (জিহ্বাহীন ॥ শওকত, ২০০৩ : ৩৭১)

মানবচরিত্রবীক্ষণে শওকত ওসমান বহুদর্শী। "রক্তমাংসে নির্মিত অস্তিত্বশীল মানুষ তাঁর গল্পে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। বিষয়-বৈচিত্র্য শওকত ওসমানের গল্পে বিভিন্ন মাত্রার চরিত্রসৃজনে সহায়ক হয়েছে। লোভে, ভোগে, ঈর্ষায় ও প্রতারণায় আলোড়িত যে মানুষ, বস্তুগত প্রাপ্তিতে যারা উন্মুখ– সেই বাসনা-প্রণোদিত মানুষ তাঁর গল্পে বিভিন্ন বর্ণে ও রেখায় চিত্রিত।" (চঞ্চল, ২০১১ : ৮৫) পাকিস্তান কালপর্বে রচিত শওকত ওসমানের গল্পে নিম্নবিত্ত বা প্রান্তিক মানুষের স্রোত উজ্জ্বলরেখায় উপস্থিত। কেরানি, নরসুন্দর, চোর, ডাকাত, সাধু, ড্রাইভার, বারবনিতা, জেলে, মাঝি, মন্বন্তরপীড়িত বুভুক্ষুজন, পাহারাদার, পাখি বিক্রেতা, চা-বিক্রেতা, পালিশ মিস্ত্রির কল্লোল ধ্বনি দূরাগত রাখালী বাঁশির মতো পাঠকের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। তবে, এ-জাতীয় চরিত্র নির্মাণে গল্পকার আবার সেই ভিক্টোরীয় শিল্পাদর্শকে (চরিত্রকে সহানুভূতির আলোকে উপস্থাপন করা) আশ্রয় করেছেন।

‘সেলুন’ (c¯Íi djK) গল্পে শওকত ওসমান কখনও কথকের দৃষ্টিকোণ আবার কখনও নরসুন্দর গৌর হরি শীল-এর দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে সমাজের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানরত মানুষের অবস্থানকে তুলে ধরেছেন। গৌর হরি শীল চরিত্রটি অনেকটা টাইপ চরিত্র বা একরৈখিক চরিত্র বলা যায়। চরিত্রটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মোটামুটি স্থিতিশীল এবং অপরিবর্তিত। তবে গৌর হরি শীলের মধ্যে বিদ্যমান দৈশিক ভাবনা তার চরিত্রের একটি উজ্জ্বলপ্রান্ত।

‘হিংসাধার’ (†bÎc_) গল্পে পালিশ মিস্ত্রীর বিপর্যস্ত জীবনের কথা চিত্রিত হয়েছে উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণে। পালিশ মিস্ত্রী চরিত্রটিকে অনেকটা টাইপ চরিত্র বা একরৈখিক চরিত্র বলা যায়। চরিত্রটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মোটামুটি মীমাংসিত এবং অপরিবর্তিত। তবে, গল্পের পরিণতিতে চরিত্রটি দ্বিমাত্রিক চরিত্রে রূপ লাভ করেছে। যেমন :

> চেয়ারের উপর একটা বড়বড় লোম কুকুর শুয়ে বাইরের দিকে তাকাচ্ছে। দুই থাবার মধ্যে ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করে আছে প্রাণীটি। আমি সেই দিকে চেয়ে রইলাম। এই ঠাণ্ডায় শুকনা জায়গার মূল্য কত, আমি জানি। কুকুর বৃষ্টি দেখছে। আহ্, কত আরামে, কত নিশ্চিন্তে। তখন আমার মনে হোলো, ওইখানে পৌঁছতে পারতাম! (হিংসাধার ॥ শওকত, ২০০৩ : ৩০৫)

পাকিস্তান কালপর্বে প্রান্তিক-চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে গল্পকার সমাজের নানা অসঙ্গতি, নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনচিত্র, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মানদণ্ডে তাদের অবস্থান প্রতীকায়িত করেছেন। এ-পর্বের প্রান্তিক চরিত্রসৃষ্টিতে শওকত ওসমান প্রধানত কথক চরিত্র এবং প্রান্তিক চরিত্রের দৃষ্টিকোণকে ব্যবহার করেছন। তাছাড়া প্রতিটি চরিত্র সৃষ্টিতে গল্পকার নাটকীয় পরিচর্যার সাহায্যে নিম্নবর্গের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের শ্রেণি-অবস্থানকে চিহ্নিত করেছেন। এ-পর্বের চরিত্র-নির্মাণ প্রসঙ্গে চঞ্চল কুমার বোস যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে উদ্ধারযোগ্য :

> শওকত ওসমানের গল্পে সমাজের আলোকিত স্তর থেকেই কেবল চরিত্রগুলো আসেনি, সমাজের অন্তর্গত অন্ধকার থেকেও নানা চরিত্রের মানুষের ভিড় করেছে তাঁর গল্পে। জীবনের কঙ্করময় কঠিন মৃত্তিকা ভেঙে তারা দুঃখ-প্রহত জীবনের সঙ্গীত শোনায়, অভাবে-সংকটে তারা জীবনের ও অস্তিত্বের নিরাপত্তা খোঁজে। (চঞ্চল, ২০১১ : ৮৬)

পাকিস্তান কালপর্বে নিম্নবিত্ত শ্রেণিচরিত্র থেকে মধ্যবিত্ত জীবনের দিকে ক্রমশ শওকত ওসমানের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে। মধ্যবিত্তের সঙ্কটদীর্ণ স্বরূপ উন্মোচনে গল্পকার গ্রহণ করেছেন বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যারীতি। ফলে, চরিত্রায়ণরীতিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে ব্যক্তি তথা চরিত্রের দৃষ্টিকোণ, অন্তর্ভাবনা ও মনোবিশ্লেষণ। অন্যদিকে প্রান্তিক চরিত্রসৃষ্টিতে গল্পকার যেখানে ছিলেন গ্রামীণজীবনাশ্রয়ী, সেখানে মধ্যবিত্ত চরিত্রসৃজনে তিনি শহরমুখী হয়েছেন। এ-জাতীয় চরিত্রায়ণে গল্পকার উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণাশ্রয়ী। তাঁর যে-সব গল্পে মধ্যবিত্ত শ্রেণি-চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে ‘বর্ণামৃত’ (c¯Íi djK), ‘গন্তব্য’ (c¯Íi djK), ‘পিতা পুত্র’ (c¯Íi djK), ‘প্রতিবেশী’ (c¯Íi

djK), 'গিরগিটি' (†bÎc_), 'সাবালক' (†bÎc_), 'পুরস্কার' (†bÎc_), 'বোন বিবির কেচ্ছা' (Dfk½), 'শকুনের চোখ' (Dfk½), 'শৃগালস্য' (†bÎc_) অন্যতম। শওকত ওসমান এ-পর্বে অঙ্কিত মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের রঙে আলোকিত করেছেন।

'পিতাপুত্র' (c¯Íi djK) গল্পে লেখক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে সুযোগসন্ধানী মধ্যবিত্ত হিসেবে হাসিব সাহেব এবং তার পুত্রের চরিত্র নির্মাণ করেছেন। আমাদের সমাজে অনেক মানুষের মধ্যে দেখা যায় তাদের কাছে ধর্মচিন্তা থেকে কর্মচিন্তা অনেক বড়, এ-ধরনের চরিত্র হিসেবে হাসিব সাহেবের আত্মপ্রকাশ। হাসিব সাহেব চরিত্রটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মীমাংসিত এবং অপরিবর্তিত, কিন্তু পুত্র চরিত্রটি ঘটনার এবং মানসিক জটিলতার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করেছে। গল্পে ঘটনার টানাপড়েনে পিতা ও পুত্রের চরিত্রের বিকাশ সাধিত হয়েছে, তারপরেও এ-চরিত্র দুটিকে রাউন্ড চরিত্র বলা যায় না, কেননা তাদের চরিত্রে যে জটিলতা দেখা যায়, তা বাহ্যিকভাবে আরোপিত–অন্তর্গত দ্বন্দ্ব-সংকটজাত নয়।

'শৃগালস্য' (Dfk½) গল্পের "মধ্যে মনসুর আলির বেকার জীবনের দুঃখময়তা এবং শৃগালস্য পাঠশালার পণ্ডিতদের অনৈতিক জীবনের একটি উদ্ভাসন ঘটেছে।" (অনীক, ১৯৯৫ : ১২৩) মধ্যবিত্ত শ্রেণিচরিত্রের প্রতিনিধি বি.এ পাস মনসুর আলির শৃগালস্য বৈশিষ্ট্যের কথা উপস্থাপিত হয়েছে তার চরিত্র বিশ্লেষণসূত্রে। 'শৃগালস্য' গল্পে শিক্ষার দুর্বৃত্তায়ন ও শিক্ষকের দৈন্যদশার কথা মনসুর আলির দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত। এ-চরিত্রটির স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে লেখক কখনও সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ, কখনও চরিত্রের আবার কখনও মনসুর আলির স্ত্রীর দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন। মূলত মনসুর-এর স্ত্রীর উক্তিতে মনসুর চরিত্রের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। যেমন :

> এই জমানায় কত অযোগ্য, অক্ষম, চোর বদমাস কত কী হোয়ে গেল এই সময় তোমার কিছু না হোলে আর ইহজন্মে কোন আশা নেই। (শৃগালস্য ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৪৪)

পাকিস্তান কালপর্বের গল্পে শওকত ওসমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ নয়, বরং মানুষ হিসেবে তাদের বিচিত্র মনোভঙ্গি তুলে ধরেছেন। এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে লেখক একই সাথে মধ্যবিত্ত চরিত্রের বাহ্যিক দ্বন্দ্ব সংঘাত ও অন্তর্যন্ত্রণা ফুটিয়ে তোলার সাথে সাথে তাদের চরিত্রের ভণ্ডামি-ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, স্বার্থচিন্তা, সাংসারিক টানাপড়েনকে চিত্রিত করেছেন।

পাকিস্তান কালপর্বের কিছু গল্পে উচ্চবিত্ত শ্রেণি-চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, এ-জাতীয় চরিত্রের মধ্যে 'আপনি ও তুই' (†bÎc_) গল্পের অফিসার, 'খরচ তেরিজ' (†bÎc_) গল্পের সাহেব, 'গ্রেশামং শরণং' (†bÎc_) গল্পের সেক্রেটারি সাহেব, 'সাহেবালি সাহেব' (Dfk½) গল্পের সাহেবালি খান, 'দানসত্র' (Dfk½) গল্পের কালাম মজুমদার উল্লেখযোগ্য।

'সাহেবালি সাহেব' (Dfk½) গল্পে সাহেবালি খান 'রায় বাহাদুর' খেতাব লাভের জন্যে নিজেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়েছেন। লেখক সাহেবালি সাহেব-চরিত্রের অভ্যন্তর বৃত্তে আলো ফেলে কুৎসিত সত্যকে আবিষ্কার করেন। তার জীবন-প্যাটার্ন উন্মোচনে লেখক বর্ণনার সঙ্গে যোগ করেছেন নাটকীয়তা। লেখক সাহেবালি চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে এক ঐতিহাসিক সময়ের মানসিকতাকেই দ্যোতিত করেন। সাহেবালি খানের স্বার্থউদ্ধারের সাথে নৈতিক অধঃপতনের চিত্র তার চরিত্রকে কলুষিত করার মধ্যে একটি ঐতিহাসিক যুগ-যন্ত্রণারই পচনশীলতাকে ফুটিয়ে তুলেছে।

পাকিস্তান কালপর্বের গল্পে নারী-চরিত্রের বহুমাত্রিকরূপ অঙ্কিত হয়েছে, এ-ধরনের গল্পের মধ্যে 'উভশঙ্গী' (c¯Íi djK), 'উদ্‌বৃত্ত' (c¯Íi djK), 'নেত্রপথ' (†bÎc_), 'ব্ল্যাকআউট' (†bÎc_), 'সৌদামিনী মালো' (Dfk½), 'রাতা০ (Dfk½) উল্লেখযোগ্য ।

ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ্য, বিষাদ, তার দ্বন্দ্ব ও অন্তর্বিরোধ শওকত ওসমানের গল্পে যে মনোময় জগত তৈরি করে তার প্রয়োজনেই তিনি সন্ধান করেছেন স্বতন্ত্র শৈলীর । 'উভসঙ্গী' (c¯Íi djK) গল্পে কুহেলী ও সেহেলী দুই বান্ধবী চরিত্র-চিত্রিত হয়েছে কখনও চরিত্রের দৃষ্টিকোণে আবার কখনও সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের সাহায্যে। এ গল্পে সেহেলী ফ্লাট চরিত্র এবং কুহেলী জটিল চরিত্র। উল্লেখ্য, এ গল্পের চরিত্রসৃষ্টি 'জিহ্বাহীন' গল্প-চরিত্রের অনুরূপ। কুহেলী চরিত্রে লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক ও অবচেতনাগত নিগূঢ় সংকটের উন্মোচন ঘটলেও চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু স্বগতকথনের ভঙ্গিতে বিমিশ্র হয়েছে লেখকের সর্বজ্ঞতার সঙ্গে। কুহেলীর স্বগতোক্তির মাধ্যমে পাঠক তার চরিত্রের অন্তর্যন্ত্রণার হাহাকার উপলব্ধি করেন। যেমন :

> তারপর ডুকরানি থামিয়ে অর্ধ-চিৎকার, –"সেহেলি -সব মিথ্যে- সব ঝুট-ট্যুর–।" আয়নার দিকে সটান দৃষ্টি। তখন ক্রুর হাসি হেসে উঠেছিল কুহেলী দাঁতে দাঁত চেপে-ট্যুর–। তোকে মিথ্যে বলেছি, সেহেলি। (উভসঙ্গী ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৩৬)

সময় ও সমাজ-বিধৃত নরনারীর দুর্মর অস্তিত্ব এবং তার প্রাণ প্রতিষ্ঠায় লেখক অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের আশ্রয় নিয়েছেন। 'উদবৃত্ত' গল্পে আমিরণ চরিত্রটিকে লেখক কখনও সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে, আবার কখনও স্বগতোক্তির মাধ্যমে এ-চরিত্রের মনোজাগতিক- জটিলতা পাঠক সম্মুখে তুলে ধরেছেন। বাবা-মায়ের 'যেহানেই থাহিস, আল্লা যেন তরে দ্যাহে।' এ-আশীর্বাদ যেন আমিরণের জীবনে বিপরীত ফল বয়ে নিয়ে আসে, এখানেই আমিরণ চরিত্রটির ট্র্যাজেডি। গল্পের ভাষায় :

> আছে বাদামতলীর রাজা পাটোয়ারী-শরীফার চোখ–ধরা সোন্দর শাড়ীটা যে কিনে দিয়েছিল। যে দেয়. নেওয়ার অধিকার তারই থাকে। সে ত বস্ত্র কেড়ে নিয়ে আমাকে রোজই দেখে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা...। (উদবৃত্ত ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৪৬)

'সৌদামিনী মালো' (উভশৃঙ্গ) গল্পের সৌদামিনী চরিত্র সৃষ্টিতে গল্পকার কথকের দৃষ্টিকোণের পাশাপাশি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ এবং নাটকীয় উপাদানের আশ্রয় নিয়েছেন। মানবতার কিংবা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিরূপ হিসেবে সৌদামিনী মালো চরিত্রটি তাৎপর্যপূর্ণ। মূলত সম্পত্তি নয়, সৌদামিনীর প্রবল মাতৃস্নেহ তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গল্পের ভাষায় :

> সৌদামিনী প্রায় কাঁদত আর চীৎকার দিত : আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল–। হে যিশু, ও হরি, হে আল্লা, আমার হরিদাসকে ফিরিয়ে দে– ফিরিয়ে দে। (সৌদামিনী মালো ॥ শওকত, ২০০৩ : ৩৯৮)

'রাতা' (Dfk½) গল্পে গল্পকার ভিক্টোরীয় আদর্শবাদকে গ্রহণ করে বাস্তববোধ এবং মানবতাবোধের সমন্বয়ে করিমা বিবি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। "অভাব ও মাতৃত্বের বিপ্রতীপ টানাপড়েন অঙ্কিত এ চরিত্রটি লেখকের চরিত্রসৃজনে সামর্থের শিল্পসাক্ষ্য।" (চঞ্চল, ২০১১ : ৮৭) লেখক নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকে যেমন দেখেছেন বাস্তবতার নিক্তিকে, তেমনি চরিত্রাঙ্কনেও এনেছেন বাস্তবতার ছোঁয়া। গল্পের ভাষায় :

> নেশাগ্রস্ত জনের মত করিমা বিবি হঠাৎ বলে ফেলে : আজ আর বাত পাইবি না ফুফুর ঘরৎ। এত দেরী অইয়ে।
> -ক্যান?
> -হেরার ত দিন চলে না। দশ বারো জন খাওয়াইয়া। খাওনের আগে গেলে কিছু থাইকত। (রাতা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৫০)

শওকত ওসমান পাকিস্তান কালপর্বের কিছু গল্পে কিশোর চরিত্র অঙ্কন করেছেন। এ-জাতীয় গল্পের মধ্যে 'বালকের মুখ' (†bÎc_), 'অকাল-পক্ব' (†bÎc_) উল্লেখযোগ্য। "কিশোর চরিত্র উপস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে রয়েছে গল্পকারের বিশেষ সামাজিক দৃষ্টিকোণ। এ-চরিত্রগুলো প্রায়শ হয়ে উঠেছে সামাজিক অসঙ্গতিজাত অসহায়ত্বের দ্যোতক। অস্তিত্ব রক্ষায় তারা সংগ্রামশীল, বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে তারা সংকুচিত, শেকড়হীন।" (চঞ্চল, ২০১১ : ৮৪) মূলত বহুমাত্রিক চরিত্রের মধ্যে কিশোর-চরিত্র নির্মাণও শওকত ওসমানের শিল্পদৃষ্টির পরিচায়ক।

শওকত ওসমানের গল্পসমূহ সমকালশাসিত হওয়ার কারণে পাকিস্তান কালপর্বের গল্পের চরিত্রসমূহ প্রাত্যহিক জীবনের চিরচেনা ভুবন থেকেই উঠে এসেছে। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশায় সম্পৃক্ত, লোভ-রিরংসা-প্রতারণা, এমনকি ডাকাতি-চৌর্যবৃত্তি-পতিতাবৃত্তি-ধর্মজীবী-নৌকাজীবী-পালিশ মিস্ত্রী পাকিস্তান কালপর্বের চরিত্রপুঞ্জকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় আলোকিত করেছে।

॥Zb

শওকত ওসমানের ব্রিটিশ কালপর্বের ত্রিশ-চল্লিশ দশকের দৃষ্টিভঙ্গি পাকিস্তান কালপর্বে বা পঞ্চাশ-ষাটের দশকে এসে ক্রমবিবর্তন লাভ করেছে। এ-পর্বের গল্প বর্ণনার ক্ষেত্রে শওকত ওসমান

আত্মজৈবনিক, উত্তম পুরুষের এবং কিছু গল্পে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহার করেছেন। এ-পর্বে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি শানিত এবং তীক্ষ্ণ। তাছাড়া গল্পকার সচেষ্ট ছিলেন বহির্বাস্তবতা অপেক্ষা মনোবাস্তবতার প্রতিচ্ছবি নির্মাণে। ঘটনা অপেক্ষা ঘটনার পূর্ব এবং পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার প্রতি গল্পকারের অভিনিবেশ ঐকান্তিক। মনোবাস্তবতার ক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণের বহুকৌণিক ব্যবহার নতুন মাত্রা লাভ করেছে— যা লেখকের স্বতন্ত্রতার পরিচয়বাহী।

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় ষাট-সত্তর “দশকের গল্পকারেরা সময়ের বাস্তবতায় নিরীক্ষার আড়ালে প্রতিবাস্তবতাকে নির্মাণ করেছেন তাদের গল্পের পরোক্ষ পদ্ধতিতে। পূর্ববর্তী দশকের গল্পকারদের নিরূপিত সীমানা প্রাচীর ডিঙিয়ে এ-দশকের গল্পকাররা পরিবর্তমান সমাজপ্রেক্ষিতের, রাজনৈতিক বাস্তবতার বিপ্রতীপে নির্মাণ করতে চাইলেন অনন্য গল্পভাষা।...সমকালীন অবরুদ্ধ পরিস্থিতি গল্পকারদের নতুন আঙ্গিক নিরীক্ষায় যেমন উদ্বুদ্ধ করে তেমনি বিশ্বসাহিত্যের নানামুখী প্রভাব ও প্রণোদনা এই সময়ের গল্পকারদের শিল্প-অন্বেষাকে আন্তর্জাতিকতায় উন্নীত করে।” (চঞ্চল, ২০১১ : ১১৯) ফলে শওকত ওসমানের পাকিস্তান কালপর্বের গল্পের দৃষ্টিভঙ্গিতে যুক্ত হলো নতুন দৃষ্টিকোণ বা প্রেক্ষণবিন্দু রূপকধর্মিতা। এ-ধরনের বৈশিষ্ট্যের আলোকে যে-সব গল্প রচিত তার মধ্যে ‘শিকারী’ (c¯Íi djK), ‘ভ্রূণাঙ্ক’ (c¯Íi djK), ‘দীক্ষায়ণ’ (c¯Íi djK), ‘গোর-নিদ্রা’ (c¯Íi djK), ‘চিড়িমার’ (†bÎc_) অন্যতম।

ব্যক্তি ও সমাজচৈতন্যের প্রতীকায়ন বাংলাভাগোত্তর কিংবা নব্য পাকিস্তান রাষ্ট্রে সাহিত্যের পরিসীমাকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। পরাধীনতা ও পরবশ্যতা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় একজন শিল্পী অব্যর্থ আড়াল খুঁজে নেয়। শওকত ওসমান বাংলাদেশের সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির সচেতন দ্রষ্টা। এ-পর্বে গল্পকার সরল বর্ণনার আড়ালে রূপক-প্রতীকধর্মিতার আবরণে তাঁর কাঙ্ক্ষিত বিষয়কে অভিব্যঞ্জিত করেছেন। নিপীড়ক-শাসকের বিরুদ্ধে মানবমুখী লেখক প্রতীককে ব্যবহার করেন জোরালোভাবে। শুধু প্রতীকের গদ্যময় ব্যবহার নয়, সূক্ষ্ম মননের পরিশীলনের শওকত ওসমানের প্রতীক উনীশ শতকীয় গল্পের সারল্য থেকে দূরবর্তী। ভাষার মোচড়ে গহীন প্রতীকতায় শওকত ওসমানের গল্পভাষা স্বতন্ত্র। এ-কারণেই গল্পকারের উদ্দিষ্টকে অনুধাবন করতে পাঠককে অপেক্ষা করতে হয় গল্পের শেষ পর্যন্ত। এর ফলে গল্পের অন্তর্গত চরিত্রসমূহ তীব্র সংবেদনা নিয়ে উপস্থিত হয় এবং কায়া ও ছায়ার দ্বৈত অস্তিত্বে চরিত্রগুলো রূপবান হয়ে ওঠে। যেমন, ‘শিকারী’ গল্পে তাজু খানের নিজের গুলিতে নিজের মৃত্যুবরণ পাকিস্তানি সরকারের আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের পরিণতির ইঙ্গিত বহন করে। ‘ভ্রূণাঙ্ক’ গল্পে অপারেশন টেবিলে ভূমিষ্ঠ হয় নি– এমন এক মানব ভ্রূণের আর্তচিৎকারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কে ব্যঞ্জিত করেছে। ‘দীক্ষায়ণ’ গল্পে রাতের আধারে বলপূর্বক ‘ছাগল-ভেড়াকে’ মদ খাওয়ানোর মধ্যে পাকিস্তানি রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুনকে পদদলিত করার চিত্র প্রকাশিত। ‘গোর-নিদ্রা’ গল্পে ‘মৃত লাশ’ এর

জেগে ওঠার মধ্য দিয়ে বাঙালি শোষক-শ্রেণির বিরুদ্ধে জেগে ওঠার প্রত্যয় উপস্থাপিত। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখলাম, চাদর ঢাকা শব খাটের উপর বসল না শুধু, এক কিনারা ধরে লাফ মেরে নীচে নেমে আমার দিকে এগোতে এগোতে হেঁকে উঠল, "স্লামালেকুম! স্লামালেকুম।" (গোর-নিদ্রা ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৬৮)

কাহিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে এ-কালপর্বের অধিকাংশ গল্পে শওকত ওসমান উত্তম পুরুষের বা কথক চরিত্রের আশ্রয় নিয়েছেন। c¯Íi djK গ্রন্থের নয়টি, Dcj ÿ¨ গ্রন্থের চারটি, †bÎc_ গ্রন্থের তেত্রিশটি এবং Dfk½ গ্রন্থের এগারোটি গল্পের বর্ণনভঙ্গিতে গল্পকার উত্তম পুরুষের ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ পাকিস্তান কালপর্বে রচিত সাতানব্বইটি গল্পের সাতান্নটি গল্প উত্তম পুরুষে বর্ণিত। উত্তম পুরুষের ব্যবহারের মাধ্যমে লেখক প্রায়ই নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন। ফলে, ব্যক্তি-সমাজ-সময়-প্রবহমাণ ঘটনার জটিল রূপ এ-পর্বের গল্পের শিল্পভাষ্যে উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত। এ-পর্বের কয়েকটি গল্প থেকে উত্তম পুরুষের ব্যবহার উদ্ধৃত হল :

> (ক) আমরা পাঁচজন জুটেছিলাম। জন দুই ঠিক গোত্রের নয়। তবু তারা ছিল, যেমন তেলের সংগে জল। কিন্তু নেশার অথৈ সমুদ্রে কখন আমরা একাকার হোয়ে গেছি, তার খেয়াল ছিল না। (দীক্ষায়ণ ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৫৭)
>
> (খ) মনের গুমোটে হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। একই চৌহদ্দির মধ্যে হপ্তার পর হপ্তা কাটানো আমার পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য। কিন্তু নাচারের কাছে আর কোন প্রশ্ন তুলবে? নিজের পাড়ায় কয়েক মাস যেন কয়েদীর জীবন-যাপন। জীবিকার জন্যে যতটুকু পাড়া ছাড়া দরকার তার বেশি আর পা বাড়াতে পারি নি। (মন্ত্রগুণ ॥ শওকত, ২০০৩ : ৩৬৬)

এ-পর্বে শওকত ওসমান উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দুর সমন্বয়ে কিছু গল্প সৃজন করেছেন। এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধারণকারী গল্পের মধ্যে 'বর্ণামৃত' (c¯Íi djK), 'দীক্ষায়ণ' (c¯Íi djK), 'সেলুন' (c¯Íi djK), 'আজব কাহিনী' (c¯Íi djK), 'সৌদামিনী মালো' (Dfk½), 'চিড়িয়া' (Dfk½), 'নোট' (Dfk½), 'আখেরী সংক্রান্ত' (Dfk½) অন্যতম । উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণের সাথে চরিত্রের দৃষ্টিকোণের যোগফল ঘটায় গল্পে চরম নাটকীয়-চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়। যেমন :

> (ক) আমি তখন মাছি, মাকড়সার জালে পড়েছি– ঠায়ে পোঁতা। আমার পায়ের তলায় শিকড় নেমেছে হাজারে হাজারে। হঠাৎ অনুভব করলাম, হাকিম সাহেব আমাকে বুকে জড়িয়ে উচ্চারণ করছেন অতি সংক্ষিপ্ত ভাবস্ফীত গলায়, "বেলায়েৎ। বেলায়েৎ।"...শুরু হোলো কথা।...
>
> এদেশে বিদেশী কিছু ছাপ না থাকলে, আর কল্কে মেলে না। অক্সফোর্ড কেমব্রিজ থেকে হয়ত একটি আস্ত গর্দ্দভ বনে এসেছে। কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে সেই গর্দ্দভের দাম বেশি। আর দেশে হাজার লেখাপড়া

> জানলেও দাম নেই। আমি তাই শুধু মাজেন্দারান দেওবন্দী লাগালাম না– নিজেকেও বদলে ফেললাম। (বর্ণামৃত ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৫০)
>
> (খ) কিন্তু সৌদামিনী মালো বাপের বেটী, বাঘের দুধ খেয়েই বোধ হয় মানুষ– বেরিয়ে এল একদম নিরস্ত্র, যদিও বাড়িতে বন্দুক আছে। ক্ষিপ্ত জনতার সামনে সে এবার বোমা ফাটালে। বোমাও বোধ হয় এত শব্দ তুলতে পারত না। সৌদামিনীর চোখ থেকে শিবের মত আগুন ছড়িয়ে বললে...কি বললে শোন। তার কথাটা মুখ জবানি পেশ করতে হয়। সৌদামিনীর উপর তখন যেন কিছু ভর করেছিল।
>
> "... শোন্ অভাগীর ব্যাটারা, ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের দল...আমার হরিদাস শুদ্রও নয়, ব্রাহ্মণও নয়। শোন্, কী।...ওর আসল বাবা লুঙ্গিপরা দাড়িওয়ালা চাষী...আমার হরিদাস মুসলমান...।" (সৌদামিনী মালো ॥ শওকত, ২০০৩ : ৩৯৭-৩৯৮)

কাহিনি বিন্যাসে আবেগীয় নাটকীয়তা ও ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহার চল্লিশ দশকের গল্পের মৌল বৈশিষ্ট্য হলেও পঞ্চাশ-ষাটের দশকে তা একেবারেই তিরোহিত নয়। c¯Íi djK গ্রন্থের সাতটি, Dcjÿ¨ গ্রন্থের একুশটি এবং Dfk½ গ্রন্থের বারোটি গল্পের বর্ণনভঙ্গিতে গল্পকার সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ পাকিস্তান কালপর্বে রচিত সাতানব্বইটি গল্পের চল্লিশটি গল্প সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে রচিত। শওকত ওসমানের এ-পর্বের গল্পে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহার করেছেন ভিক্টোরীয় রীতি আদর্শ মেনে। লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ফলে গল্পে স্বাভাবিক গতি রক্ষিত হয় এবং মাঝে মাঝে চিত্রধর্মিতার ঝলকে গল্প হয়ে ওঠে রঙিন। তাছাড়া সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের সঙ্গে চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দুর সমন্বয়ে তৈরি গল্পের আখ্যানভাগ হয়ে ওঠে নাটকীয়। যেমন :

> একাকীত্বের রেখায় হাওর, পাখি, নানা নিনাদের নিদালী সংগীত কাতার বাঁধে। বুঁদ অনেক সময় গুমেরই নামান্তর। আয়াজ দৃষ্টি ভাসিয়ে বসে থাকল। তীর থেকে এক-দেড় ক্রোশ দূরে তারা চলে এসেছে। শীতের সূর্য কারো গায়ে লাগে না। পান-ফলের পাতায় সবুজ মোজেইক করা পানি ফাঁকে ফাঁকে ঝিকিমিকি নৃত্য-মত্ত। (শিকারী ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৪০)

ব্রিটিশ কালপর্বের কিছু সংখ্যক গল্পে নিজের মতো করে গল্পের জাল বিস্তার করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই গল্পকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে উঠে এসেছে তাঁর দুর্বলতা-বিশ্বাস-যুক্তি। যে-গল্পগুলোতে লেখকের সরাসরি প্রভাব পড়েছে তার মধ্যে 'প্রস্তর ফলক : একটি রাগিনী' (c¯Íi djK), 'মৎস্য' (Dfk½) অন্যতম। নিরীক্ষাধর্মী 'প্রস্তর ফলক : একটি রাগিনী' গল্পটির তিনটি অনুচ্ছেদে আত্মকথনরীতিতে বর্ণিত গল্পকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় স্পষ্ট। আবার 'মৎস্য' গল্পটিকে শওকত ওসমান 'কবিতাধর্মী ছোটগল্প'-এ রূপ দিতে ঊনিশটি কবিতাংশ ব্যবহার করেছেন।

শওকত ওসমানের পাকিস্তান কালপর্বে রচিত গল্পে শিল্পদৃষ্টির বাঁক-পরিবর্তন একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ-পর্বে তিনি ছোটগল্পের পরিচর্যারীতিতে রূপক-প্রতীকধর্মী, ঘটনাধর্মী, নাটিক্য পরিচর্যা, কাব্যিক পরিচর্যা, আত্মধর্মিতা, ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতির রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। এ-পর্বের গল্পগুলোতে

শওকত ওসমান সাংকেতিকতা নির্মাণে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। অবশ্য এর পেছনে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ-সময়ের প্রভাব স্পষ্ট।

গল্পকার ঘটনাবিন্যাস, প্লট নির্মাণ, চরিত্রায়ণ কৌশল, দৃষ্টিকোণ ব্যবহারে, গল্পের পরিণাম নির্দেশে পাকিস্তান কালপর্বের পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত প্রায়ই ভিক্টোরীয়রীতির ব্যবহার করেছেন। তাই এ-পর্বে রচিত সব গ্রন্থের কিছু গল্পেই বর্ণনধর্মিতার ব্যবহারে গল্প-ভাষা রচিত হয়েছে। তাঁর যে-সকল গল্পে বর্ণনধর্মিতার পরিচয় সুস্পষ্ট তার মধ্যে 'উভসঙ্গী' (c¯Íi djK), 'শিকারী' (c¯Íi djK), 'উদ্‌বৃত্ত' (c¯Íi djK), 'বর্ণামৃত' (c¯Íi djK), 'প্রতিবেশী' (c¯Íi djK), 'জনারণ্যে' (†bÎc_), 'বালকের মুখ' (†bÎc_), 'দেশ কাল পাত্র' (†bÎc_), 'গোরস্থানে' (†bÎc_), 'সাহেবালি সাহেব' (Dfk½), 'রাতা' (Dfk½) অন্যতম। এ-বিবরণধর্মী গল্পগুলো আয়তনগত দিক বিবেচনায় দীর্ঘ। এ-পর্বে রচিত গল্পের বর্ণনাধর্মিতার উদাহরণ :

> (ক) যীশুখ্রীষ্ট প্রতিবেশীদের ভালবাসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর বাণী যেখানে সবচেয়ে বেশি শিকড় গেড়েছে, সেই ইউরোপে আজ কেউ প্রতিবেশীর চেনে না। পরিচয় করিয়ে না দিলে বাক্যলাপ পর্যন্ত অভদ্রতা। এই নিয়ে তো এক গল্পই চালু আছে গোটা লন্ডন-প্যারিস-রোম জুড়ে। (প্রতিবেশী ॥ শওকত , ২০০৩ : ২৬৮)
>
> (খ) চৌদ্দগ্রাম ছাড়িয়ে জেলা-বোর্ডের দক্ষিণমুখী সড়ক আবার পূর্বদিকে বাঁক নিয়েছে। এইখানে আমাদের কাহিনি শুরু করা যাক। চারিদিকে তাকালে কোন জমকালো জনপদ তোমার চোখে পড়বে না। আচোট রুক্ষ জমির সমতলে ডট-চিহ্নের মত কৃষকের ইতঃক্ষিপ্ত কুটির, উঠান আর দু-একটা গাছপালা শুধু ছড়ানো। চতুর্দিকে প্রকৃতির হৃদয়হীনতার মধ্যে ঐটুকু শ্যামল-মমতা। পূর্ব আকাশের গা-ঘেঁষা পার্বত্য ত্রিপুরার পাহাড় আধ ক্রোশটাক দূরে। (রাতা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৪৪)

তবে, "ব্যক্তি ও সমাজচৈতন্যের প্রতীকায়ন ষাটের দশকের গল্পে স্বতন্ত্র শিল্পজিজ্ঞাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিরূপ সময়, সমাজ ও জীবনের অবরুদ্ধ বাস্তবতার চিত্রণে ষাটের দশকের লেখকেরা সচেতন শিল্প-অভিপ্রায় থেকে প্রতীকতার সন্ধান করেছেন।" (চঞ্চল, ২০১১ : ১২৪-১২৫) এ-সময়ের গল্পগুলো বিবরণধর্মিতা থেকে ইঙ্গিতধর্মিতা বা প্রতীকধর্মিতায় বাঁক নিয়েছে। এ-পর্বে রূপক-প্রতীক-ইঙ্গিত এর অন্তরালে গল্পকারের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যকে ফুটিয়ে তোলার সযত্ন প্রয়াস লক্ষণীয়। এ-জাতীয় গল্পের মধ্যে 'গোর-নিদ্রা' (c¯Íi djK), 'দুই মোনাজাত' (Dcjÿ¨), 'দুই ধার্মিক' (Dcjÿ¨), 'গিরগিটি' (†bÎc_), 'থেরী-সন' (†bÎc_), 'জিহ্বাহীন' (†bÎc_), 'চিড়িমার' (c¯Íi djK), 'কুকুরের ভাষা' (†bÎc_), 'ষাঁড়' (†bÎc_) উল্লেখযোগ্য। যেমন লেখক মানুষের মধ্যকার অবরুদ্ধ পশুশক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন 'ষাঁড়' গল্পের প্রতীকে।

পাকিস্তান কালপর্বের গল্পে শওকত ওসমান রূপক-প্রতীকের অন্তরালে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যকে ফুটিয়ে তুলতে নাটকীয় পরিচর্যার আশ্রয় নিয়েছেন। তাছাড়া সমাজ ব্যবস্থার সাংঘর্ষিক রূপ, মানব-মানবীর বাহ্যিক ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, কাহিনির প্রবহমাণতা সৃষ্টিতে নাটকীয় পরিচর্যার বিন্যাস ঘটেছে। তবে,

অধিকাংশ গল্পে নাটকীয় বিন্যাসরীতিতে নাটকীয় সংলাপ-এর ব্যবহার অনিবার্যভাবেই উঠে এসেছে। এ-ধরনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গল্পের মধ্যে 'দুই মুসাফির' (c¯Íi djK), 'শিকারী' (c¯Íi djK), 'ভ্রূণাঙ্ক' (c¯Íi djK), 'আনারকলি' (†bÎc_), 'আপনি ও তুই' (†bÎc_), 'তস্কর সঙ্গীত' (†bÎc_), 'মৎস্য' (Dfk½), 'বোন বিবির কেচ্ছা' (Dfk½), 'জাতক কাহিনী' (Dfk½) অন্যতম। গল্প থেকে এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ :

> অনেক লোক জমেছে ইত্যবসরে। সুরের ইন্দ্রজালে ফেলে এসেছে কতজন। ছোটখাট জমায়েত পাড়ের উপর। স্তম্ভিত শ্রোতাদল।
> সোলেমান মল্লিক গান থামার পর জিজ্ঞাসা করে, জনাব, আপনার— বেয়াদবী মাফ করবেন— আপনার নাম?
> —আমার নাম লালন ফকির।
> —কুষ্টিয়ার লালন ফকির?
> —হ্যা, ভাই।
> গ্রামের জমায়েৎ লোকদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। একজন চিৎকার দিয়ে গ্রামের দিকে ছুটতে লাগল, ওরে কে কোথা আছিস। লালন ফকির ফিরে এসেছেন, ওরে আয়। গান শুনবি। আয় চোখ সার্থক করবি–আয়–আয়....। (দুই মুসাফির ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৩০)

শওকত ওসমান তাঁর এ-পর্বের গল্পের পরিচর্যা হিসেবে ঘটনাধর্মিতাকেও আশ্রয় করেছেন। তাঁর গল্পের ঘটনাধর্মিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য; গল্পে একাধিক ঘটনা থাকলেও বিভিন্ন তথ্যের সংযোগে গল্পের মূল সড়ক ধরে পরিণতির দিকে ধাবমান। এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গল্পের মধ্যে 'পিতাপুত্র' (c¯Íi djK), 'আজব জীবিকা' (c¯Íi djK), 'দ্রব্যগুণ' (†bÎc_), 'সাবালক' (†bÎc_) 'রাস্তার হদিস' (†bÎc_), 'গ্রেশামং শরণং' (†bÎc_), 'সৌদামিনী মালো' (Dfk½) উল্লেখযোগ্য।
শওকত ওসমান এ-পর্বের গল্পের পরিচর্যাতে চিত্রাত্মক পরিচর্যারীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। মাঝে মাঝে এই চিত্রাত্মক পরিচর্যারীতি কাব্যধর্মিতাকেও অতিক্রম করেছে। যেমন:

> (ক) চাঁদের আলোয় জড়াজড়ি-সৌন্দর্যে কয়েকটা খেজুর গাছ সত্যি কাছে টেনে নিতে পারে। (দীক্ষায়ণ ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৫৮)
> (খ) মেঘের জনতা কি বিচিত্র পৃথিবী না গড়ে রেখেছে। হাল্কা হাওয়ায় গড়ে তুলছে অজস্র খেলনা সম্ভার। (গন্তব্য ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৬২)
> (গ) পেশোয়ার য়ুনিভার্সিটি মার্চের নৈশ জোছনায় হাবুডুব খায়। নিকটে তারতারা পাহাড় শুভ্র মৌনে নিঃঝুম। আর বহু দূরে কাবুলের কোলে সোফেদ কোহ্ অনন্ত তুষার-রাজ্যে শয়ান স্বপ্ন কন্যা। (একটি বহস ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৯৮)

শওকত ওসমানের ব্রিটিশ কালপর্বের অধিকাংশ গল্পের পরিচর্যারীতি বিবরণধর্মী হলেও পাকিস্তান কালপর্বের পরিচর্যারীত ঘটনাধর্মী এবং ক্ষেত্রবিশেষ তথ্যধর্মী। এ পর্বের অবরুদ্ধ সময়-সমাজ এবং ব্যক্তিক জটিলতা উন্মোচনে ঘটনাধর্মী পরিচর্যারীতিই গল্পে অনিবার্যভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। কাহিনি

বিন্যাসে, ঘটনা-চরিত্র এবং পরিবেশের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পরিচয় প্রতিপাদনে ঘটনা ও তথ্যের ব্যবহার-বৈশিষ্ট্যের সরলীকরণ এ-পর্বের গল্পে বিশেষভাবে প্রতীকায়িত। তাছাড়া গল্পের সংক্ষিপ্ত অবয়ব, সংক্ষিপ্ত বাক্য এবং চলিত গদ্যের ব্যবহার ঘটনাধর্মী এবং তথ্যধর্মী পরিচর্যারীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে উপস্থাপিত। যেমন :

> —স্যার, সেই বিটিশ আমলে গলা কাটলে কী আজ এখানে থাকতাম? শোনেন তবে– ১৯৩২/৩৩ সনের কথা। সারা শহর তোলপাড়। আজ সাঁঝ-আইন, কাল বাড়ী-ঘেরাও, পরশু ফাঁসি এই সব চলছে। তখন আমার দোকান খুব ছোট ছিল।...হগ ফক্স-টক্স কিছু হবে...শালা তখন ম্যাজিস্ট্রেট– ডাকলে চুল কাটতে। গেলাম বাংলোয়। মেজাজ ভাল নেই, তা ত বুঝতেই পারছেন। ক্ষুর চালাতে গিয়ে দিলাম দু-জায়গায় ঘচ ও-you- ইউ। (সেলুন ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৭৭)

তবে, এ পর্বের কিছু গল্পে গ্রামীণ জীবনপ্রবাহ, নিম্নবিত্ত-প্রান্তিক মানুষের জীবনকাহিনি উপস্থাপনে লেখক ব্রিটিশ কালপর্বে ব্যবহৃত বিবরণধর্মিতাকে পরিচর্যায় বেছে নিয়েছেন।

Pv i

সৃজনী গদ্যের ভাষারীতিতে সাধারণত তিনটি বিভাগ দেখা যায়— বর্ণনামূলক, নাটকীয় ও কাব্যিক। ছোটগল্পেও এই রীতিবিভাগ প্রযোজ্য। তবে প্রতিটি রীতিতেই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে পারে; একাধিক রীতির মিশ্রণও হতে পারে। আবার সুনির্দিষ্ট রীতির শর্তগুলিকে ভেঙেচুরে ফেলার প্রবণতাও অলক্ষ্য নয়। বিষয় ও প্রতীতি অনুযায়ী গল্পকার তাঁর ভাষারীতির সন্ধান করেন। তাঁর নিজস্ব মেজাজ-মর্জিও এ বিষয়ে তাঁকে পরিচালিত করতে পারে। গল্পকার হিসেবে শওকত ওসমানও তাঁর গল্পের ভাষা-ব্যবহার সম্পর্কে ছিলেন সচেতন এবং পরীক্ষা-প্রবণ। তিনি এ-পর্বে ভাষার যে বিভিন্নমুখী-রূপাঙ্গিক ব্যবহার করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। গল্পকার পাকিস্তান কালপর্বের সাতানব্বইটি গল্পের সবগুলোতেই কাহিনি বর্ণনায় চলিত ভাষা রীতি ব্যবহার করেছেন। সমকালীন অন্য লেখকদের মতো শওকত ওসমানেরও স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল চলিত ভাষারীতির দিকে এবং চলিতরীতিতেই তিনি ছিলেন স্বচ্ছন্দবিহারী।

শওকত ওসমানের এ পর্বের গল্পের ভাষা ইঙ্গিতধর্মী এবং চেতনাপ্রবাহী। তাঁর "কথাসাহিত্যের ভাষা একাধারে বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ও অলঙ্কারবহুল। তাঁর বাক্য কখন সরল, কখনবা জটিল ও চাতুর্যপূর্ণ। বিষয় ও বর্ণনার প্রয়োজনে শব্দ নিয়ে তিনি ইচ্ছে মত খেলতে পারেন। শব্দধানুকী কবিত্বপূর্ণ মনোযোগ থাকায় তাঁর বাককুশলতা" (অনীক, ১৯৯৫ : ২৫৫) গল্প-শরীরে প্রকাশমান। তবে, এ-ধরনের বৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত ভাষা ব্যবহারকে সাধারণত এপিগ্রামধর্মী ভাষার বা রচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এপিগ্রাম (Epigram) ভাষায় বাক্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, ব্যঙ্গাত্মক, প্রশংসাসূচক অথবা জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে। শওকত ওসমানের এ-কালপর্বের রচনাতে এ-জাতীয় এপিগ্রাম রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যেমন :

(ক) "সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় তখন বিদ্রোহ করে, ধমক মানে না। চোখ বুজলেও, বোঝা যায়, চোখ দেখছে। মন চেতনার গিঁঠে এমন জড়িয়েছে যে, টেনে সরানো যায় না। (মন্ত্রগুণ ॥ শওকত, ২০০৩ : ৩৬৬)
(খ) আমি শব্দ চাই, সুরেলা শব্দ চাই। আমি আওয়াজ-পিয়াসী, আমি শব্দ পান করব। (চিড়িমার ॥ শওকত, ২০০৩ : ৩৭৩)
(গ) তোমার সঙ্গে কথা-শিকার চলে, পাখি শিকার হয় না। (শিকারী ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৩৮)
(ঘ) কুয়াসা স্বরূপ চত্বর আমার চেতনার এই প্রত্যুষ-বেলা ঝাপসা রেখায় কল্পনার মতো চঞ্চল। (ভ্রূণাঙ্ক ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৫৩)
(ঙ) বাঁচার ভেতর দিয়েই মানুষ জীবনের যন্ত্রণা-কে অস্বীকার করতে চেয়েছে। সেই ত তার সংস্কৃতি। বাঁচবে, তবু বাঁচাকে অস্বীকার করবে। কি বিরাট মহৎ পণ! (গন্তব্য ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৬২)
(চ) জনাব, শুধু বুক ঠুকে কথা বলবেন না। একটু মাথা ঠুকে বাতচিৎ করুন। (একটি বহস ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৯৯)
(ছ) তার দৃষ্টি-বল্লমে আমার সমস্ত শরীর নিঃসাড় গাঁথা। আমার দুই চোখ শুধু সজীব, তাই মুক্তি প্রার্থনা-রত। (আনারকলি ॥ শওকত, ২০০৩ : ৩১৩)
(জ) নীচে এই যুগের তিনজন হোসেন যেন কারবালার প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পানি চায় শুধু। (নেমক হালাল ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৬৮)

লেখকের এ-পর্বের বিভিন্ন গল্পে আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি-ইংরেজি শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মূলত, গল্পের পরিবেশ এবং চরিত্রের বাস্তবানুগ রূপ দিতে গিয়ে গল্পকার এ-জাতীয় শব্দ ব্যবহারের কৌশল গ্রহণ করেছেন। এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গল্পের মধ্যে 'একটি বহস' (†bÎc_), 'আনারকলি' (†bÎc_), 'চিড়িয়া' (Dfk½), 'সাহেবালি সাহেব' (Dfk½) অন্যতম। এ-ধরনের ভাষার উদাহরণ :

(ক) 'হুজুর আপলোগ হামারা তো বিশ রুপেয়া ফাইন কিয়া, উধার হামারা দোস্ত লোগ তো সব খা লেগা।' (একটি বহস ॥ শওকত, ২০০৩ : ৩০২)
(খ) "কিয়া সোঁচ্‌তে হেঁ?"
"খোয়াব মে থে, বেরাদর!"(আনারকলি ॥ শওকত, ২০০৩ : ৩১৬)
(গ) ওই কামরা কা খিড়কী কা পাশ যা-কর চেল্লাও, চিড়িয়া চাই, চিড়িয়া চাই।...আওর চেল্লানে কা জায়গা নেহি মিলা, শুয়ার কা বাচ্চা। (চিড়িয়া ॥ শওকত, ২০০৩ : ৩৯৯-৪০০)
(ঘ) I promise, you would be the only Khan Bahadur in the district this year. (সাহেবালি সাহেব ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪০৫)

শওকত ওসমান ব্রিটিশ কালপর্বে দীর্ঘ আয়তনের যেমন গল্প রচনা করেন, তেমনি গল্পে দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করেন। কিন্তু পাকিস্তান কালপর্বে গল্প-কাহিনির সংক্ষেপায়ণের সাথে সাথে তাঁর বাক্যও সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে । যেমন :

(ক) মাঝখানে গানের আসর। গেরুয়া বসন কবির কণ্ঠ ও একতারা নিনাদিত। অভিনয় সহকারে বাউল ফকির মেতে উঠেছেন। স্তব্ধ জনতা। নির্বাক পৃথিবী। সুর আর সুরার পার্থক্য কতটুকু। (দুই মুসাফির ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৩০)

(খ) তুই একটু চুপ কর, সেহেলি। একটু খাট্‌তে দে। বসে বসে ত পাছায় উইপোকা ধরে গেছে। তুই এলি আমি যে কী খুশী হই। কুহেলী পাল্টা জবাব দিল। (উভসঙ্গী ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৩১)

শওকত ওসমান এ-কালপর্বের গল্পে চলিতরীতির ভাষা ব্যবহার করলেও গল্পের প্রয়োজনানুসারে উপভাষার ব্যবহার করেছেন। যেমন :

(ক) এই জারগুয়া ফ্যুৎ...ইডা খ্রিস্টানর মুল্লুক নঅ...বেশরা-বেহারা কাম ইন্দি চইলব ন। (চূর্ণলয় ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৭৫)

(খ) নদীর ফানিতে ব্যুৎ ঠাণ্ডা লাইগ্‌গে, সাব একডা বিড়ি দিতে ফারেন নি। (আজব জীবিকা ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৮৪)

(গ) হেদিনও চাচারে এই তক্তার উপর শোয়াইয়া গেলাম হালা শহরৎ। ডাক্তার কইল, সীট নাই। সব ঠিক আছেগ্যা, কিছু অইত না। (রাস্তার হদিস ॥ শওকত, ২০০৩ : ৩৩২)

(ঘ) আর গেলেও উলড্যা দিকে। উলড্যা দিক সোজা দিগ– তুমি হব বুইঝবা, হুন না ছাই, এক বছর মনডা পুড়তাছে। (খরচ তেরিজ ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৩৬)

(ঙ) -না; বা-জান। সইন্ধ্যায় প্যাডে লাগছিল, হেল্লাই তো বাৎ খাই নাই। অহন খামু। (তস্তর সঙ্গীত ॥ শওকত, ২০০৩ : ৩৬৫)

(চ)-রাতা কন্‌ডে লইবা, দাদী?
-তর ফুফুর ঘরৎ লইয়া যামু।
-ন,লইতা দিতাম নঅ। আঁর রাতা এ্যাডে লইবা ক্যান? (রাতা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৪৫)

পাকিস্তান কালপর্বের গল্পে শওকত ওসমান কবিতার ন্যায় উপমা, চিত্রকল্প, সমাসোক্তি এবং উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের ব্যবহার করেছেন। এ-আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহার তাঁর পাকিস্তান কালপর্বের গল্পের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত। তবে, এসব গল্পের অপরিহার্য অংশ হিসেবেই ফুটে উঠেছে। যেমন :

Dcgv

(ক) রুক্ষতার সৌন্দর্য বৈরাগীর মনের রঙের মতো। (দুই মুসাফির ॥ শওকত, ২০০৩ : ২২৭)

(খ) সে ত বুকের রক্ত ঢাকার জন্যে মেহেদী পাতার মত উপরে সবুজ ছোপ। (শিকারী ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৫০)

(গ) পাতাল-বন্দী হীরক-খণ্ডের মত আমি আমার নিজস্ব দ্যুতি-পানে অভ্যস্ত। (ভ্রূণাঙ্ক ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৫৪)

(ঘ) মানুষের গন্ধ-পাওয়া রাক্ষসের মত আমার দুই চরণ তখন দ্রুততার প্রতীক। (গোর-নিদ্রা ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৬৭)

(ঙ) ঘুরে ঘুরে সেই বাপের কথাই এসে ঘাই মারে, বাঁধা পুকুরে পোষা ঘেটো রুই মাছের মতো। (উৎসর্গ ॥ শওকত, ২০০৩ : ৩৩৭)

Dr‡cÿv
(ক) সুরের মোড়কে পৃথিবী যেন শরণার্থী। (দুই মুসাফির ॥ শওকত, ২০০৩ : ২২৮)
(খ) দেহ থেকে সে যেন সাত-সাত বছর এখনি ঝেড়ে ফেলবে, উপরের পলিমাটি সরিয়ে খুঁজে বের বের করবে প্রাক্তন জমিন! (উভসঙ্গী ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৩১)
(গ) সত্যি সবুজ-নীলে হরিতে সমস্ত এলাকা যেন হাবুডুব খাচ্ছে। (ফলাফল ॥ শওকত, ২০০৩ : ৩৪৮)
(ঘ) শাড়ী বারান্দায় যেন চিঠির মেল গাড়ী। (মৎস্য ॥ শওকত, ২০০৩ : ৩৮৬)

mgv‡mwi³
(ক) নীল পানির রাজত্ব- যেখানে আকাশ সাঁতার কাটার লোভে হাঁটুজলেও উপুড়। (শিকারী ॥ শওকত, ২০০৩ : ২৩১)
(খ) কয়েকটা জামগাছ বিস্তার মেলে শুধু সকালের আলো পান করছে। (রাস্তার হদিস ॥ শওকত, ২০০৩ : ৩৩৩)
(গ) বিছানায় এলায়িত দেহ সর্ব্বাধিক সংখ্যক স্বপ্ন খুঁড়ে বের করতে পারে। (মৎস্য ॥ শওকত, ২০০৩ : ৩৮৮)
(ঘ) দূর দূর লোকালয় ক্রমশ অন্ধকারের নিভৃতে আত্মগোপন করছে। (কিংবদন্তী ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪২৬)

শওকত ওসমান ছোটগল্পের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ধারার প্রতিনিধি। সুদীর্ঘ জীবনের প্রতিটি বাঁকে তিনি ক্রমাগত আরও উদার, সাহসী এবং আধুনিক হয়ে উঠেছেন, সেই সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিধারাও থেকেছে অবিরাম অব্যাহত। তিনি ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পের বিষয়-বীক্ষণ থেকে পাকিস্তান কালপর্বের গল্পের বিষয়ে যেমন নতুনত্বের সঞ্চার করেছিলেন– তেমনি তাঁর গল্পের শিল্পাঙ্গিকেও এসেছিল নতুনত্ব। "সমাজবিকাশ-প্রক্রিয়ার বহুভুজ জটিলতা শিল্পীর আত্মপ্রকাশকেও করেছে তার অনুগামী। ব্যক্তি ও অস্তিত্বের বহুমুখী সংকটে বাংলাদেশের শিল্পচিত্ত হয়ে উঠেছে উদ্বেগাকুল, জাতিসত্তার প্রশ্নে সতর্ক সন্ধানী এবং অভীপ্সার বিচিত্র রূপকল্প সৃজনে ঐকান্তিক। সমাজজীবনের অন্তর-বাহিরের বৈপরীত্যময় সত্যের সমগ্রতা সন্ধানের মধ্যে নিহিত রয়েছে এ-পর্যায়ে রচিত" (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭ : ১১৫) ছোটগল্পের বিষয় ও শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য।

MŠ I ceÜcwÄ

অনীক মাহমুদ (১৯৯৫)। evsjv K_vmvwn‡Z¨ kIKZ Imgvb, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী।
চঞ্চল কুমার বোস (২০১১)। evsjv‡`‡ki K_vmvwnZ¨ Ges Ab¨vb¨, শব্দকোষ প্রকাশনী, ঢাকা।
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (২০০৪)। 'শ্রদ্ধাঞ্জলি'; kIKZ Imgvb ¯§viKMš [সেলিনা বাহার জামান], বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

মিজানুর রহমান খান (২০০৮)। ebd‡ji †QvUMí : Rxeb‘wó I wkíixwZ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৭)। evsjv‡‘‡ki Dcb¨v‡mi welq I wkíi¦c, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
(২০০৭)। gvB‡Kj iex›‘bv_ I Ab¨vb¨, সাহিত্য বিলাস ঢাকা।
শওকত ওসমান (১৯৬৫)। Dcj ÿ¨, ওয়ার্সী বুক করপোরেশন, ঢাকা।
শওকত ওসমান (২০০৩)। kIKZ Imgvb MímgM [সম্পা. বুলবন ওসমান], সময় প্রকাশন, ঢাকা।
সানজিদা আকতার (২০০২)। evsjv †QvUM‡í †‘kwefvM, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৯৭)। cm½ : evsjv K_vmwnZ¨, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

ZZxq Aa¨vq

evsjv‡‘k Kvjce

c_g cwi‡”Q`

evsjv‡`k Kvjce : mËi, Awk I beŸB‡qi `kK

mgKvjxb cwi‡cwÿZ

ivR‰bwZK cwigÐj

১৯৭০ সালের নির্বাচনোত্তর পূর্ব বাংলার পরিবেশ আরও বেশি উত্তাল হয়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার বিশাল গণরায়কে উপেক্ষা করে সামরিক স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের মাধ্যমে রাজনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ শীর্ষক এক ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে দেশবাসীকে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানান। এরপর ২৫ মার্চ রাতে বর্বর পাকসেনারা অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ‘অপারেশন সার্চ লাইট’-এর নামে নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা অগ্নিসংযোগ, হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন, লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্বাস্তুতে পরিণত করে নারকীয় বিভীষিকা সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের জনজীবনকে তছনছ করে দেয়। অবশেষে আরম্ভ হয় হাজার বছরের বাঙালি জীবনের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।

প্রতিবাদী বাঙালিও তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা, যা এদেশের হাজার বছরের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ অর্জনগুলোর মধ্যে অন্যতম।

বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জীবনে ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রাম একটি স্মরণীয় অধ্যায় এবং রাজনৈতিক তাৎপর্যময় ঘটনা। এ স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। প্রকৃত অর্থে "একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘকালের আত্মানুসন্ধান, দীর্ঘকালের আন্দোলন এবং ইতিহাসের অমোঘ প্রক্রিয়ার পরিণতি।" (সালাউদ্দীন, ১৯৯৬ : ১৫) অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। এটি ছিল বাঙালির বীরত্বগাথা, আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্ত শপথ, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসার উপাখ্যান, জাতির মুক্তির ইতিহাসের উজ্জ্বল বাঁক চিহ্নের সূচক এবং হর্ষ-বিষাদের এক মহাকাব্য। মুক্তির জন্য মানুষের প্রাণের আবেগ যখন দুর্দমনীয় মূর্তি ধারণ করে, তখন পৃথিবীর যত ভয়ংকর বা প্রচণ্ড যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করা হোক না কেন, তা প্রাণের আবেগের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তার প্রমাণ বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে ভিয়েতনাম-আমেরিকার যুদ্ধে এবং সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে। একাত্তর সালের ১৬ ডিসেম্বর অনেক রক্তের পথ পেরিয়ে উঠল বাংলাদেশের স্বাধীনতার সোনালি সূর্য।

১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা লাভ করলেও পরবর্তীকালের তার পথচলা খুব বেশি মসৃণ নয়। ১৯৭১ এর নয় মাসে পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনী দমন-পীড়ন-লুণ্ঠন-গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগসহ এ দেশে যে 'পোড়ামাটির নীতি' অনুসরণ করে তাতে সদ্য স্বাধীন দেশটির নবতর যাত্রা হয়ে উঠেছিল দুরূহ। দেশ স্বাধীন হলেও তার ক্রমবিবর্তন সাধিত হয়েছে বিচিত্র পথ ধরে। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে ১৯৭২-২০০০ একটি গুরুত্বপূর্ণ কালপর্ব। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ এ সময় এক তীব্র অস্থিরতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। এ কালপর্বকে আবার তিনটি অংশে ভাগ করা যায় : ১৯৭২-৭৫, ১৯৭৫-৯০ ও ১৯৯০-২০০০। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তীকালে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রথম সরকার গঠন করে। সদ্য ভূমিষ্ঠ-যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের দুঃসময়ে আওয়ামী লীগ জাতিকে একটি গ্রহণযোগ্য সরকার এবং জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আলোকে প্রণীত একটি প্রত্যাশিত সংবিধান উপহার দিতে সমর্থ হয়েছিল। তখন দেশের সর্বত্র এক প্রকার অস্থিরতা বিরাজ করছিল। এ পরিস্থিতিতে দেশের সর্বসাধারণ নব-উদ্যমে দেশের পুনর্গঠনে সক্রিয়ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৭২ সালে প্রণীত নতুন সংবিধানের আলোকে ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নতুন সরকার গঠন করে। ইতোমধ্যে সরকারের অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়। নতুন রাষ্ট্রের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরূপতা, খাদ্য সাহায্য পাঠাতে বিলম্ব, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দেশ পরিচালনায় অদক্ষতার কারণে ১৯৭৪ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ধীরে ধীরে দেশ নতুন সংকটের দিকে

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রসর হয়। আবার এরই মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত দেশি-বিদেশি শক্তির ষড়যন্ত্রও থেমে ছিল না। দেশ পুনর্গঠনের এই কঠিন যাত্রাপথে শাসকদল আওয়ামী লীগের দেশ শাসনে অনভিজ্ঞতা, নানাবিধ ভুল ও ভোগবাদী মানসিকতা দেশবাসীর বিভিন্ন অংশকে একই সঙ্গে বিরূপ, বিক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী করে তুলেছিল।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিকাশের পথে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়। এদিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিপদগামী একদল সৈন্যের হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। এরপর থেকেই আরম্ভ হয় সামরিক শাসনে রাষ্ট্রের পথচলা। ১৯৭৫-এর মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞের ঘটনার পরবর্তী ১৫ বছরের অধিককাল সামরিক, আধা-সামরিক বা ছদ্ম সামরিক শাসনে দেশ পরিচালিত হয়েছে। আদর্শগত দিক থেকে শাসকশক্তি সুচতুরভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনীতির অঙ্গীভূত করা হয়েছে। অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করা হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিকাশ তার স্বাভাবিক গতিপথ হারায়। এ সম্পর্কে সৈয়দ আবুল মকসুদ-এর ভাষ্য :

> তারপর এলো সরাসরি সামরিক শাসন। জাতির জীবন থেকে হারিয়ে গেল ভাষা আন্দোলনের চেতনা, ৫৪-র ২১দফার চেতনা, ৬২-র শিক্ষা আন্দোলনের মর্মবাণী, ৬৬-র ছয় দফার চেতনা, ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের সময় ছাত্রদের ১১ দফার অঙ্গীকার এবং সবচেয়ে যা বেদনাদায়ক তা হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করতে করতে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, সেই গণতন্ত্রই দেশ থেকে নির্বাসিত হলো। (মকসুদ, ২০১১ : ১২)

বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার অল্পকাল পরেই ৩ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, কামরুজ্জামান, মনসুর আলীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাযজ্ঞ, বর্বর জেল হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে নানারূপ কলঙ্কের ছাপ রেখে গেছে। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার অভুত্থানে খালেদ মোশাররফ নিহত হলে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন এবং সামরিক বিধিবলে দেশ শাসন করেন। ১৯৮১ সালের ৩১ মে আরেকটি সামরিক অভুত্থানে জিয়াউর রহমান নিহত হন এবং ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ আবার সামরিক শাসনের নামে রাষ্ট্র পরিচালনায় আবির্ভূত হন জেনারেল এরশাদ।

১৯৭৫-১৯৯০ পর্যন্ত সামরিক হত্যাযজ্ঞ, সামরিক অভ্যুত্থান, পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান, গণতন্ত্রের লেবাসে সামরিক শাসন, এ ছিল এ সময়ের রাজনৈতিক বিবর্তন। ১৯৮৮ সালের নির্বাচনের পর এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। এ সময় বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ এরশাদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন এবং জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৮৯ সালের ১০ অক্টোবর ছাত্ররা সচিবালয় ঘেরাও করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে 'সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য' গঠন করে। ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বর বিরোধী দলগুলো এরশাদ সরকারের শাসনক্ষমতার অবসান ঘটাতে যৌথ আন্দোলনের

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। অবশেষে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর রাজনৈতিক দল ও ছাত্রসমাজের তীব্র আন্দোলনের মুখে এরশাদ সরকার পদত্যাগ করে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সামরিক শাসনের অবসান এবং গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটে। এ সম্পর্কে হারুন-অর-রশিদ মন্তব্য করেন :

> জেনারেল এরশাদের দীর্ঘ স্বৈরশাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামের শেষের দিকে ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বর আন্দোলনরত তিন রাজনৈতিক জোটের পক্ষ থেকে সংবিধানের আওতায় এরশাদ ও সরকারের পদত্যাগ, নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ঘোষণা (যা 'তিন জোটের রূপরেখা' নামে খ্যাত) আমাদের শাসনতান্ত্রিক রাজনীতির ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। রূপরেখা ঘোষণার স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এরশাদ-বিরোধী ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। (হারুন, ২০০১ : ২৬)

নব্বইয়ের দশকের প্রারম্ভে সামরিক শাসকের পতনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের বিকাশের পথ সুগম হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারার সুস্থ বিকাশে ১৯৯০-২০০০ সাল পর্যন্ত কালপর্বটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘ সেনাশাসনের অবসানের পরে বাংলাদেশ নিয়মতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি নিরপেক্ষ-নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত। এ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। নির্বাচিত সরকার গঠনের মাধ্যমে এদেশের রাজনীতিতে যে সুস্থ ধারা বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা অল্পদিনের মধ্যে বিনষ্ট হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস-মতানৈক্য-অসহিষ্ণুতা-ক্ষমতার লড়াই, বৈদেশিক দাতা-সংস্থা-ব্যক্তির কর্তৃত্ব, জনগণের অসচেতনতা এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা রাজনৈতিক বিকাশকে ব্যাহত করেছে।

১৯৯৪ সালের মার্চ মাস থেকে বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সংসদ বর্জন করেন এবং ডিসেম্বর মাসে একযোগে আওয়ামী লীগের সাংসদগণ সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্ট ভেঙে দেন এবং ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ভোটারবিহীন এক নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি আবার সরকার গঠন করে; কিন্তু ৩০ মার্চ এ সরকার বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৯০-পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাজনীতিতে জোটবদ্ধ নির্বাচন-সংস্কৃতির সম্প্রসারণ ঘটেছে। তবে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী সরকারের পতন হলেও রাজনৈতিক দলগুলোর স্বৈরাচারী মনোভাবের পতন ঘটেনি, যার ফলে গণতন্ত্রও সুনির্দিষ্ট ভিত্তিভূমি খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া সমস্ত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু জাতীয় সংসদও প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হয়নি। এক্ষেত্রে প্রধানত রাজনৈতিক দলগুলোর যথাযথ ভূমিকা এবং জনগণের সচেতনতার অভাবকেই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তার কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে

না পারার ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা যায়। মূলত স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অসম সমাজবিকাশের সাথে সাথে রাজনৈতিক অনুশীলনও হয়ে ওঠে শাহরিক ও জনবিচ্ছিন্ন। রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি এবং আদর্শহীনতা স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনীতির ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন সাধনে ব্যর্থ হয়।

A_‰bwZK Ae¯'v

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশও স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হয় নি। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রের কাছে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রত্যাশা যতটুকু ছিল, তা প্রাপ্তির সাথে বিস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীনতার পর এদেশীয় সমাজব্যবস্থায় উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অবনতি এবং বেসরকারি খাতের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার পথ ধরেই ১৯৭৪ সালে স্বাধীনতার স্বল্পসময়ের ব্যবধানে এদেশে আবার দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা নেমে আসে। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং শোষণ-ক্ষুধামুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের হাতের নাগালে পৌঁছেছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ-রাস্তাঘাটের অবকাঠামোগত উন্নতি সাধিত হলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তি আসে নি। তাছাড়া বৈদেশিক অর্থনৈতিক দাতা-গোষ্ঠী-সংস্থা, জনসংখ্যার আধিক্য, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, কৃষিজমির উপর শিল্প কল-কারখানার থাবা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে বিপন্ন করেছে।

বাংলাদেশ কালপর্বে অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ মূল্যস্ফীতি, জ্বালানি তেলের ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্বগতি, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনার কারণে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষমাত্রা অর্জিত না হওয়া, বিভিন্ন শর্তে বৈদেশিক দাতা-সংস্থার ঋণ গ্রহণ ও বিনিয়োগ এবং অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে সমন্বয়হীনতা প্রভৃতি। তাছাড়া গঠনমূলক ও দূরদর্শী নেতৃত্ব, সামাজিক শৃঙ্খলা ও সুদূরপ্রসারী উদ্ভাবনমূলক পরিকল্পনার অভাব, টেকসই উন্নয়নের অনগ্রগতি, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ এবং স্বাধীনতার পরে কৃষির উৎপাদন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেলেও কৃষি উপকরণের ঊর্ধ্বগতি এবং উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের নিম্নগতি চাষিসমাজকে অনেকক্ষেত্রেই হতাশার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। এ কথা স্বীকার্য যে, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্নমুখী কারণে কৃষকদের জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে এবং অনেকে প্রান্তিক কৃষক থেকে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়েছে। এ সম্পর্কে আহমদ ছফার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

> বাংলাদেশে ভূমিহীনের সংখ্যা ষাট শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে অথবা যাওয়ার পথে। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে এই যে বিপুল জনসংখ্যা ক্রমশ ক্রমবর্ধমান হারে খারিজ হয়ে পড়েছে. তাঁদেরকে শৈল্পিক উৎপাদন

> পদ্ধতির অঙ্গীভূত করার কোনো ব্যবস্থা বর্তমান বাংলাদেশের নেই। কেননা বাংলাদেশের যন্ত্রশিল্পের বিকাশ হয়েছে খুবই অল্প। এই ভূমিহীন জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান স্ফীতি সংশ্লিষ্ট সকলকে শঙ্কিত এবং আতঙ্কিত করে তুলেছে। যাঁরা পুঁজিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাঁরাও আতঙ্কিত। (ছফা, ২০১১ : ১৩৬)

অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও শিল্প-কারখানায় উৎপাদন, রপ্তানি, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং বিদেশি রেমিটেন্স বৃদ্ধি পেয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। টেলিফোন, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ সম্প্রসারিত হয়েছে। চাষাবাদ ও সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা হয়েছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি, বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ বৃদ্ধি, বিভিন্নমুখী কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্য সেবার প্রসার ঘটেছে। তবে সত্তর থেকে নব্বয়ের দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দুটি প্রধান ধারা সহজেই চোখে পড়ে— ১. গ্রামীণ অর্থনীতি এবং ২. শহুরে অর্থনীতি। গ্রামীণ অর্থনীতির মূলভিত্তি কৃষি। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিবর্তন ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলোও (NGO) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অন্যদিকে শহুরে অর্থনীতির ক্ষেত্রে শিল্প-কারখানা, ব্যাংক-বীমা, বৈদেশিক বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

বিশ্বায়নের মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে দেশীয় পুরাতন কল-কারখানা (বিশেষ করে পাটকল) ক্রমাবনতির দিকে ধাবিত হলেও চামড়াজাত দ্রব্য, ঔষধ, মৎস্য ও বস্ত্রশিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। অন্যদিকে বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, গণমাধ্যম এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে গ্রামাঞ্চলেও আধুনিকতার অনেক ছোঁয়া লেগেছে, যা অর্থনৈতিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ। যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে গ্রাম এবং শহরের অর্থনীতির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এক সমীক্ষায় দেখা যায়— "১৯৭৩ সালে যখন দারিদ্র্যের প্রথম জরিপ করা হয় তখন দেশের শতকরা ৭০ জন মানুষকে দু'বেলা পেটপুরে খেতে উদয়স্ত প্রাণান্ত চেষ্টা করতে হতো। ১৯৯১-৯২ সালে এমন দুস্থ মানুষের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে শতকরা ৫৮ দশমিক আট এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে আরও হ্রাস পেয়ে শতকরা ৪৯ দশমিক আটে এসে দাঁড়ায়।" (হাবিবুর, ২০১১ : ২১) এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এদেশে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে— অন্যদিকে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলেও উচ্চবিত্ত মানুষের সাথে সাধারণ জনগণের অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে খুবই দ্রুত। আরেক সমীক্ষায় দেখা যায়— "দেশের ওপরের দিকের মাত্র পাঁচ শতাংশ ধনী জাতীয় আয়ের ৩০ শতাংশ ভোগ করে। সবচেয়ে গরিব পাঁচ শতাংশ মানুষ জাতীয় আয়ের মাত্র ০.৬৭ শতাংশ ভোগ করে। দৈনিক দুই ডলার আয় করা মানুষের সংখ্যা জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশ। আর দৈনিক এক ডলারের নিচে আয় করে অর্ধেক জনসমষ্টি।" (হাবিবুর, ২০১১ : ৪৭) পরিণতিতে আশি-নব্বইয়ের দশকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ধনী-দরিদ্রের অর্থনৈতিক বৈষম্যও আরো বেড়েছে। জাতীয় বাজেটে ব্যক্তি মালিকানাকে অগ্রাধিকার দান করা, পুঁজির সামাজিকীকরণ না করা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি,

পুঁজিপতিদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার্থে বিভিন্নমুখী নিয়ম-নীতি প্রচলনের কারণে, দেশ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন কখনও সম্ভব হয় নি।

অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য স্থলপথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেলেও নৌপথের উন্নয়নে জন্য কোনো সরকারই তেমন আশাব্যঞ্জক উৎসাহ দেখান নি। ফলে স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটলেও নৌপথে তা সংকুচিত হয়েছে। এক সময়ের 'মাছে ভাতে বাঙালি'র জীবিকার উৎস ২৩০টি নদীর মধ্যে ১৯০টি নদীর অবস্থা মুমূর্ষুপ্রায়। তাছাড়া রেলপথে পণ্য পরিবহন খরচ কম হলেও তার সম্প্রসারণ বা তাকে লাভজনক খাতে রূপান্তরের জন্য সত্তর-আশি-নব্বইয়ের দশকে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। ফলে এদেশে উৎপাদিত পণ্যের পরিবহণ খরচ মাত্রাতিরিক্ত হারে বেড়েই চলে, যার বিরূপ প্রভাব পড়ে অর্থনীতির উপর।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে শিল্পায়ন দ্রুতমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও বিকাশ ঘটেছে। তবে আর্থসামাজিক উন্নয়নকে বার বার বাধাগ্রস্ত করেছে সংঘাতময় রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, স্বৈরশাসন, কর্মমুখী শিক্ষার স্বল্পহার ও কর্মভিত্তিক আধুনিক শিক্ষার অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, উদীয়মান সুযোগ-সম্ভাবনার যথোপযুক্ত ব্যবহার না করা, প্রশিক্ষণের অভাব। বিশ্বায়নের যুগে অর্থনীতিতে সময়োপযোগী মৌলিক নীতি গ্রহণ না করায় এ দেশের অর্থনীতি অন্যান্য দেশের তুলনায় দ্রুত পিছিয়ে পড়ে। তাছাড়া কৃষি উপকরণ বিশেষ করে সার, বীজ, কীটনাশক ও সেচ ব্যবস্থা কৃষকের কাছে সহজলভ্য না হওয়াতে অথনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া শিল্পক্ষেত্রেও উদ্যোক্তা ও মূলধনের অভাবে কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসেনি। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি না পাওয়ায় জাতি গঠনে ইচ্ছুক এবং উৎপাদনমুখী কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহী লক্ষ লক্ষ মানুষ এখনও বেকারত্বের অভিশাপ বহন করে চলেছে। তাই এখানে উল্লেখ করা যায়, দেশ স্বাধীন হলেও স্বাধীন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এখনও অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদ থেকে বহুদূরে।

mgvR-ms¯‹…wZ

মানুষের জীবনাচরণের সাথে অঙ্গীভূত সকল কিছুই সংস্কৃতির উপাদান। বাঙালি এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতি হাজারো ভাঙা-গড়ার ইতিহাস এবং জীবনাচরণের সাথে সম্পৃক্ত। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বিবর্তিত হতে হতে বাংলাদেশের সংস্কৃতি আজকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। বাঙালি বা বাংলাদেশি "সংস্কৃতি কোনো অখণ্ড অথবা অভিন্ন সংস্কৃতি নয়। এ সমাজ যেমন বহু ভাগে বিভক্ত, এ সংস্কৃতিও তেমনি বহু রঙে রাঙানো।" (মুরশিদ, ২০০৮ : ১৪) রাজনৈতিক, ধর্মীয়, বিত্ত-বৈভব, রীতি-নীতি, গ্রাম-শহর, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, শ্রেণি অবস্থান প্রভৃতির দিক থেকে বাঙালি সংস্কৃতিকে পৃথক করা গেলেও এগুলোর মিথস্ক্রিয়ায়-ই সৃষ্টি হয়েছে এদেশের সংস্কৃতি। এখানে

স্মর্তব্য যে, বাঙালি সংস্কৃতিতে যে সব অভিন্ন উপাদান আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষার জন্মকাল থেকেই বাঙালি সংস্কৃতির পথ চলা আরম্ভ হয়। তবে বাংলা ভাষা সৃষ্টির পূর্বে এ অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ছিল, স্বীকার করতে হবে তার উপর ভিত্তি করেই বাঙালি সংস্কৃতির মূল বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে।

স্বাধীনতা-উত্তর ১৯৭২ সালের সংবিধানের মধ্যে বাঙালি খুঁজে পায় আপন সংস্কৃতি বিকাশের স্বাভাবিক পথ। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের রীতি-নীতি, সাহিত্য-সাধনা, নাটক, চলচ্চিত্র, নৃত্যকলা, সংগীত, আবৃত্তিচর্চার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। ধীরে ধীরে এদেশে লালন গীতি, হাসন রাজার গান, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, জারি-সারি, কীর্তন, আঞ্চলিক গীতিকাগুলো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এদেশের মানুষ তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যেই সন্ধান করে তাঁদের অস্তিত্বের শেকড়। ফলে, ধীরে ধীরে বাঙালির মেধা-মনন চর্চার মধ্য দিয়ে দেশীয় সংস্কৃতি ক্রমবিকাশের পথে যাত্রা করে। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য, স্বাধীনতা-পূর্বকালে এদেশের মানুষ দল-মত, জাতি-ধর্ম, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে জনগণকে একই সূত্রে বেঁধে একটি সমৃদ্ধ জাতি এবং সব ধর্মের ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তা সর্বাংশে বাস্তবে প্রতিফলিত হয় নি।

স্বাধীনতার পর সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশে 'বাংলাদেশে লেখক শিবির' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লেখক শিবিরের লেখকগণ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও সমাজের প্রতি শিল্পীর অঙ্গীকারের দিকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। ১৯৭২ সালে বাংলা একাডেমী থেকে এ শিবিরের উদ্যোগে 'হে স্বদেশ' শিরোনামে গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশিত হয়। এছাড়াও ১৯৭৩ সালে এ শিবিরের লেখকবৃন্দ সপ্তাহ জুড়ে 'বাংলাদেশ : সংকট ও সম্ভাবনা' নামে সেমিনারের আয়োজন করে। পরবর্তীকালে এ লেখক শিবির 'একুশে উদযাপন জাতীয় কমিটি' গঠনের মাধ্যমে ১৯৭৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'প্রতিরোধ ও আবিষ্কারের একুশ' হিসেবে ঘোষণা করে একুশ উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমী এপার বাংলা-ওপার বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিয়ে 'সাহিত্য সম্মেলন'-এর আয়োজন করে। এ সম্মেলনে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পরে এদেশের সংস্কৃতিতে ধর্মীয় চেতনা ও সাম্প্রদায়িকতা মাথা তুলে দাঁড়ায়। প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ১৯৭৬ সালে ২১টি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমবায়ে গঠিত হয় 'সংযুক্ত একুশে উদযাপন সাংস্কৃতিক কমিটি।'

স্বাধীনতা-উত্তর সামরিক শাসনামলে সীমিত পরিসরে যে কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সংস্কৃতিচর্চার পটভূমি তৈরি করেছিল তার মধ্যে 'ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠী' (১৯৭৬),

'বাংলাদেশ যন্ত্রশিল্পী সংস্থা' (১৯৭৬), 'উন্মেষ সাহিত্য সংসদ' (১৯৭৭), 'সংকেত' (১৯৭৭), 'গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ফ্রন্ট' (১৯৭৮), 'বিশ্বসাহিত্যকেন্দ্র' (১৯৭৮), 'গীতিকবি সংসদ' (১৯৭৮), 'পদাবলী' (১৯৮০), 'একাডেমী অব ক্লাসিক্যাল মিউজিক' (১৯৮০), 'কানাইলাল শিল্পীগোষ্ঠী' (১৯৮১), 'রংধনু ললিতকলা একাডেমী' (১৯৮২), 'কবিকণ্ঠ' (১৯৮২) উল্লেখযোগ্য। এসব সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিল্পের সাধনা ও বিকাশ, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের কল্যাণ সাধন, আলোকিত মানুষ গড়ার প্রত্যয়, অপসংস্কৃতি রোধ, শুদ্ধ সংগীত প্রচার ও প্রসার, গণতান্ত্রিক জাতীয় সংস্কৃতি সৃষ্টি, সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি বিস্তারে প্রতিরোধ, দেশীয় সাংস্কৃতিক চেতনাকে সমুন্নত রাখা এবং সর্বোপরি দেশে সুস্থ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ধারা গড়ে তোলা।

আশি ও নব্বইয়ের দশকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক অবক্ষয়, সাংস্কৃতিক দেউলিয়াপনা প্রতিনিয়ত এদেশের মানুষকে নানা প্রকারের বিড়ম্বনার সম্মুখীন করেছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আহার-বাসস্থান-চিকিৎসা-বাসস্থানের মতো মৌলিক অধিকার সবার জন্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নি। প্রতিনিয়ত ভূমিহীনদের সংখ্যা, শহুরে বস্তি, বেকারত্ব, সহিংসতা, চাঁদাবাজি, হত্যা, অ্যাসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, বে-আইনি আটকাদেশ, মানবাধিকার লঙ্ঘন, রাজনৈতিক নির্যাতন লাগামহীনভাবে বেড়েই চলেছে। অর্থবল ও পেশীশক্তি মানবিক মূল্যবোধকে পরাজিত করে সমাজের নৈতিক শক্তিকে খর্ব করে চলেছে। দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত হচ্ছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর সবাই স্বপ্ন দেখেছিল জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হবে, কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানেই এদেশের মানুষের স্বপ্নভঙ্গ হয়। সময় যতই গড়িয়েছে সত্তর-আশি-নব্বইয়ের দশক পেরিয়ে বাংলাদেশ চরম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে।

তবে আশি ও নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৯৯০ সালে শিশুদের স্কুলে উপস্থিতির শতকরা হার ছিল ৬১। কিন্তু, সেখানে পরের বছরেই বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষানীতির কারণে শিশুদের স্কুলে যাওয়ার হার ৯২ ভাগে উন্নীত হয়। অবৈতনিক এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষানীতির কারণে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধিত হয়। এছাড়া স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে সরকার বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় বিভিন্ন জেলায় নিরক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণেহ্রাস পায়।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার ফসল। "বাঙালি সংস্কৃতি থেকে প্রাণরস আহরণ করে জাতীয়তার বোধটি পুষ্ট এবং বিকশিত হয়েছে। তথাপি বাংলাদেশের সংস্কৃতির আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়নি। কতিপয় জটিল সংকট সংস্কৃতি চর্চার পথটিকে কন্টকাকীর্ণ করে রেখেছে। বাংলাদেশের সংখ্যাধিক জনগণের মানস-সংকটের প্রতিফলন ঘটেছে সংস্কৃতিতে।" (ছফা, ২০১১ : ৩০৩) অনার্যযুগ থেকে প্রবাহিত যে সংস্কৃতি ধারা তা বিদেশি-বিভাষী-বিজাতি বৌদ্ধ, সেন, মোঘল, পাঠান, ওলন্দাজ, ঔপনিবেশিক, পাকিস্তান শাসন-শোষণের মধ্যেও একটি স্বতন্ত্র অবয়ব ধারণ করে

আছে। বহুমানুষের-বহুদিনের প্রচেষ্টা, চিন্তাধারা, কর্ম এবং আন্দোলন-সংগ্রামের সমবায়ে সৃষ্টি হয়েছে এদেশের সংস্কৃতি। জাতি-গোষ্ঠী-ব্যক্তির ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভাষা ও সাহিত্য-সাধনা, সংগীত, যাত্রা, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা, স্থাপত্যকলা, কারুশিল্প, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, নারী-পুরুষ ও আন্তঃশ্রেণি সম্পর্ক, সমিতি-সংগঠন, প্রথা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সমবায়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতি স্ব-মহিমায় ভাস্বর।

e¨³-cwi‡ek

শওকত ওসমানের তীক্ষ্ণ রসবোধ এবং সমাজ সচেতনতার সাথে রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে অঙ্গীভূত করে দেখার দৃষ্টি, বিষয় নির্বাচন ও নির্ভীক উচ্চারণ তাঁকে বাংলা সাহিত্যে একটি পৃথক আসন দান করেছে। স্বাধীনতা-উত্তর বা বাংলাদেশ কালপর্বেও তিনি মৌলবাদ, অপসংস্কৃতি, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সাথে কখনও লেখনীর মাধ্যমে, আবার কখনও রাজপথে নেমে উচ্চ কণ্ঠে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তিজীবনাচরণের অনুরূপ তিনি সাহিত্যসাধনাতেও ছিলেন সমান আন্তরিক, ন্যায়নিষ্ঠ, স্পষ্টভাষী, প্রতিবাদী ও কর্তব্যসচেতন। এক কথায় ব্যক্তি শওকত ওসমান ও সাহিত্যিক শওকত ওসমান ছিলেন পরস্পর সমান্তরাল। তাঁর জীবনাচরণ ও সাহিত্য একই সুতায় গাথা। তিনি তাঁর মনের কথা মুখে এনে লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। "দেশ কালের পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে শওকত ওসমান নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুধাবন করেছেন। নিজের দর্শন ও বিশ্বাসবোধের দীপ্তিতে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি এমন কি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে নিরন্তর স্থাপন করে আপন শিল্পলোকের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি সাধন করেছেন।" (অনীক, ১৯৯৫ : ৬২)

বাঙালি বা বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা-সংগ্রাম একটি স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ মুক্তিযুদ্ধ শওকত ওসমানের মনন ও সাহিত্যকর্মে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তাঁর সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন শাখায় এ ধ্রুপদী ঘটনা নানা রঙে-নানা বর্ণে-নানা অনুষঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। "আসলে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ঐতিহাসিক দাবিকে শওকত ওসমান মনে প্রাণে সমর্থন করেছিলেন বলেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এতটা গভীরভাবে তাঁর সৃষ্টিকর্মে আমূলিত হয়েছে।" (অনীক, ১৯৯৫ : ৬০) তিনি শুধু লেখার মাধ্যমে নয়, সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছিল ২৭ মার্চ সকাল দশটার মধ্যে সকল সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিকে অফিসে উপস্থিত থাকার জন্য। কিন্তু শওকত ওসমান অফিসে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার জন্য গোপনে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। তিনি কলকাতায় অবস্থানকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত কথিকা পাঠ এবং বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে জনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

বাঙালি জাতির চূড়ান্ত বিজয়ের পরে শওকত ওসমান পুনরায় দেশে ফিরে আসেন এবং ১৯৭২ সালের ১ এপ্রিল সাহিত্য সাধনাতে পুরো সময় দেয়ার জন্য স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সাহিত্য সাধনার সাথে সাথে তিনি বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মের সাথেও জড়িয়ে পড়েন। এ সময় তিনি রচনা করেন ‘B ^mwbK (১৯৭৩), †bK‡o AiY¨ (১৯৭৩), RjvsMx (১৯৭৪) উপন্যাস, mg‘ b‘x mgwcZ (১৯৭৩), fve-fvlv-fvebv (১৯৭৪) প্রবন্ধগ্রন্থ এবং Rb¥ hw‘ Ze e‡½ (১৯৭৫) গল্পগ্রন্থ সমূহ। এ রচনাগুলোতে মূলত বাংলা ভাষা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনিই বেশি স্থান পেয়েছে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে কিছু সময়ের জন্য হলেও তাঁর লেখার গতি হ্রাস পায়। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু পরবর্তীকালে ২২ আগস্ট তিনি স্বেচ্ছায় দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শওকত ওসমান ১৯৮১ সালে স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে দেশে ফিরে এসে সার্বক্ষণিক লেখালেখিতে সময় ব্যয় করেন। এসময় তিনি নিরীক্ষাধর্মী রচনার দিকে আরো বেশি মনোনিবেশ করেন। এ সময় তিনি রচনা করেন ivRmvÿx (১৯৮৩), cZ½ wcÄi (১৯৮৩), AvZbv‘ (১৯৮৫), wcZciæ‡li cvc (১৯৮৬) উপন্যাস, wZb wgRv (১৯৮৬), gwbe I Zvnvi KKi (১৯৮৬), civZb LÄi (১৯৮৭), Ck‡ii cwZØ›Øx (১৯৯০), ivRciæl (১৯৯২) গল্পগ্রন্থ, bóZvb Aófvb (১৯৮৬) নাটক, wbR¯ msevv‘‘vZv †cwiZ (১৯৮২), †k‡Li m¤iv 1g I 2q LÐ (১৯৯২) কাব্যগ্রন্থ, BwZnv‡m we¯ÍwiZ (১৯৮৫), ms¯‹wZi PovB DrivB (১৯৮৬), gmjgvb gvb‡mi i¡cvšÍi (১৯৮৬), cY ¯vaxbZv PY ¯vaxbZv (১৯৯০) Dc‡‘k-Kc‡‘k (১৯৯১) প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ। তবে তিনি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন আত্মজীবনীমূলক রচনার দিকে। ¯Rb ¯Mvg (১৯৮৬), Kvjiwî LÐwPÎ (১৯৮৬), ¯§wZLÐ gwRebMi (১৯৯২), DËice gwRebMi (১৯৯৩), ivnbvgv 1 †Q‡j‡ejv I ˆK‡kvi †Kvjvnj (২০০৭) এবং ivnbvgv 2 Ab¨ iYcvšÍi I feb PZ‡i (২০০৭) তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা।

স্বাধীনতা-উত্তর বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাস্রোত তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তাই তিনি শিল্পের প্রতি এবং শিল্পীর দায়িত্ববোধ থেকেই সৃজনশীল সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হন। এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, এ-কালপর্বে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংবর্ত এবং বৈচিত্র্যময় জীবনের অভিঘাত গল্পকার শিল্পীর তুলিতে অঙ্কন করেন। গল্পকারের স্বাধীনতা-উত্তর বা বাংলাদেশ কালপর্বে রচিত সাহিত্যকর্মে স্থান পেয়েছে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিসংগ্রামের চিত্র, সদ্যজাত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের বহুবিধ অস্থিরতা, রাজনৈতিক সংকট, সমাজের নৈতিক অবক্ষয়, মূল্যবোধহীন ছাত্রদের অরাজকতা, শাসকশ্রেণির দুর্বলতা, ১৯৭৫ পরবর্তীকালে সামরিক ও আধা-সামরিক বা ছদ্ম সামরিক শাসনে দেশ পরিচালনা, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, পেশাজীবী মানুষ, নরনারীর সম্পর্ক এবং ধর্মীয় চালচিত্র প্রভৃতি।

Mš I ceÜcwÄ

অনীক মাহমুদ (১৯৯৫)। evsjv K_vmvwn‡Z¨ kIKZ Imgvb, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী।

আহমদ ছফা (২০১১)। wbewPZ ivR‰bwZK ceÜ, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢকা।

এ.এফ সালাউদ্দীন এবং অন্যান্য (১৯৯৬)। evsjv‡`‡ki gw³hy× bvbv cm½, মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা।

গোলাম মুরশিদ (২০০৮)। nvRvi eQ‡ii evOwj ms¯‹wZ, অবসর প্রকাশনি, ঢাকা।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (২০১১)। hv †P‡qwQ hv †c‡qwQ, নিমফিয়া পাবলিকেশন, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০০৯)। DËice gwRebMi, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় (২০১২)। †Qv‡UvMí ZËmÜvb I mgv‡jvPbwPšÍv, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

সৈয়দ আবুল মকসুদ (২০১১)। ‘সহজিয়া কড়চা : সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষ ও বিপক্ষ’; ‘দৈনিক প্রথম আলো’, ২৭ ডিসেম্বর ২০১১, ঢাকা।

হারুন-অর-রশিদ (২০০১)। evsjv‡`k ivRbxwZ miKvi I kvmbZvwšK Dbqb 1757-2000, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq cwi‡"Q'

evsjv‡'k Kvjc‡ei M‡íi Rxeb‰ewPÎ¨

প্রবহমাণ সময়ের হাত ধরে শওকত ওসমানের কথাসাহিত্যে বিচিত্র-বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে ইতিহাসের ঘটনাস্রোত এবং বিষয়ের সাথে সাথে তাঁর প্রতিক্রিয়াও দিন দিন তীব্রতর হয়েছে। বাংলাদেশ কালপর্বে গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের নানা চিত্র, যুদ্ধোত্তর দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বাস্তবতার প্রকৃত স্বরূপটিকে তুলে ধরলেন তাঁর গল্পে। বাংলার এবং বাঙালির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অর্জন মহান মুক্তিযুদ্ধ এদেশের সমাজ এবং জাতীয় জীবনে যে পরিবর্তনের সূচনা করে, মুক্তিসংগ্রামের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সমাজসচেতন শিল্পী সাহিত্যিকেরা আর্থ-সামাজিক কাঠামো এবং চেতনার পৌনঃপুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার প্রতিফলন ঘটিয়ে চলেছেন তাঁদের সাহিত্যকর্মে। এ সূত্র ধরেই শওকত ওসমানের স্বাধীনতা-উত্তর কালপর্বে রচিত গল্পগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়— সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিসংগ্রামের চিত্র, নবজাত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের বহুবিধ অস্থিরতা, রাজনৈতিক সংকট, সমাজের নৈতিক অবক্ষয়, মূল্যবোধহীন ছাত্রদের অরাজকতা, শাসকশ্রেণির দুর্বলতা, ১৯৭৫-পরবর্তীকালে সামরিক ও আধা-সামরিক বা ছদ্ম সামরিক শাসনে দেশ পরিচালনা এবং স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের চিত্র গল্পকার অসাধারণ নৈপুণ্যে অঙ্কন করেছেন। আমরা এ পর্বে শওকত ওসমানের ছোটগল্পে সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ তাঁর জীবনপ্রবাহ ও শিল্পিসত্তার ওপর কীরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে সে বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস পাব। বিষয়বৈচিত্র্য অনুযায়ী এ-কালপরিসরের গল্পকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা যায় :

এক : গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ-অবলম্বী।
দুই : ইতিহাস-আশ্রয়ী।

Dhaka University Institutional Repository

তিন : সমাজ-সমস্যামূলক।
চার : নর-নারীর সম্পর্ক-বিষয়ক।
পাঁচ : মনস্তত্ত্বমূলক বা মানব প্রকৃতি-বিষয়ক।
ছয় : ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।
সাত : পেশাজীবী জীবন-আশ্রয়ী।
আট : স্বদেশ-ভাবনামূলক।

GK : †MŠiegq gyw³hy×-Aejw¤^Mí

সভ্য সমাজের প্রথম কথা : "তুমি বেঁচে থাকো, আমাকেও বাঁচতে দাও।"— এর ব্যতিক্রম হলেই সমাজ-রাষ্ট্রে অশান্তির বিষবাষ্প প্রজ্বলিত হয়। এটা ধ্রুব সত্য যে, মানবজাতি পরিবর্তনশীল বিশ্বে সবসময় সুসভ্য আচরণ করেনি বা ভবিষ্যতেও করবে না। এমনকি অন্যের অধিকারের প্রতি নত শিরে সম্মান জ্ঞাপন করতেও শেখেনি। আর সুসভ্য আচরণ বা অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান জানানোর অভাববোধ থেকেই পৃথিবীতে নেমে আসে যুদ্ধবিগ্রহ এবং পরিণামে ধ্বংসযজ্ঞ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পিছনেও আছে বঞ্চনা, অধিকারসচেতনতা ও অধিকার আদায়ের ইতিহাস। পাকিস্তানি শাসকচক্র যখন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সব দিক থেকে ধীরে ধীরে বাংলার মানুষকে অধিকার-বঞ্চিত করেন এবং তাদের শোষণের বিষয়টি সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করে, তখন এদেশের মানুষও তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে ঝাঁপিয়ে পড়েন অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অর্থাৎ মহান মুক্তিযুদ্ধে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মানুষ লাভ করে তাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয়। এদেশের হাজার বছরের ইতিহাসের প্রবহমাণ ধারায় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। "জাতিগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ প্রক্রিয়ার সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালি জাতি সারা বিশ্বের কাছ একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" (সালাহ্উদ্দীন, ১৯৯৯ : ১৭)

"রোমাঁ রোলাঁর (১৮৬৬-১৯৪৪) বিখ্যাত বই 'আই উইল নট রেস্ট' (*I Will Not Rest*)-এর মূল বক্তব্য ছিল সভ্যতার সঙ্কটকালে লেখক ও শিল্পী নির্লিপ্ত থাকতে পারেন না।" (মতিন, ১৯৯৬ : ১৫৬) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে কিংবা স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশি-বিদেশি শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীগণও এই গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধে আন্দোলিত হয়েছেন এবং এ দেশের মুক্তিসংগ্রামে তাঁরাও বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন। আমাদের শিল্পী সাহিত্যিকগণও ছিলেন এই অবিরাম সংগ্রামের সহযাত্রী— ১৯৫২-এ তাঁরা প্রতিবাদী, ১৯৬৯-এ দ্রোহী, ১৯৭১-এ মুক্তিযোদ্ধা। এ-সময় কেউ কলমকে বন্দুকের সমকক্ষ করে তোলেন, আবার কেউ কেউ বন্দুককে ভেবেছেন অভিনব কলম। মহাসামুদ্রিক গভীরতাতুল্য, সহস্রাব্দকালের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বেদনা মহিমার এই

বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা পাশ কাটিয়ে নতুন সাহিত্য রচনা সম্ভব ছিল না। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ তাই এক অপরিহার্য উপাদান এবং দীর্ঘ সময় ধরে তা সমাদৃত।

জাতীয় জীবনের কিংবা সমাজজীবনের চালচিত্র হলো শিল্প-সাহিত্যের উপাদান। তাই সমাজের চালচিত্রকে কোনো লেখক-শিল্পী উপেক্ষা করতে পারেন না। তাই ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যে রক্তক্ষরণ ঘটেছে, স্বভাবত শিল্প সাহিত্যে তার প্রভাব পড়বে। ফলে, শিল্পী সাহিত্যিকদের রচনায় মুক্তিযুদ্ধের চিত্রের সমাবেশ ঘটেছে নানামাত্রিক আয়োজনে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্যরচনা সম্পর্কে রফিকুল ইসলামের মন্তব্য এখানে স্মরণযোগ্য :

> বাংলা ভাষায় আধুনিক যুদ্ধ ইতিহাস বা যুদ্ধ সাহিত্য গড়ে ওঠেনি, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বাংলা সাহিত্যের সে অভাব পূরণ করেছে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাংলা ভাষায় যেসব যুদ্ধ ইতিহাস, প্রেক্ষিত ইতিহাস, রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতা, যুদ্ধকালীন স্মৃতিকথা এবং সৃজনশীল সাহিত্য গড়ে উঠেছে তা বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। (রফিকুল, ১৯৯৮ : ১১৭)

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে সুব্রত বড়ুয়ার মন্তব্য এখানে উদ্ধারযোগ্য :

> স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের ব্যক্তিক ও জাতীয় জীবনে তেমনই এক উজ্জ্বল সঞ্চয়, যে সঞ্চয় অসংখ্য মানুষের রক্তে রঞ্জিত, যে সঞ্চয় অজস্র প্রাণের নীরব অসম্ভব আত্মদানে উজ্জ্বল-উজ্জ্বলতর। ইতিহাস যেমন ঘটনা ও কার্যকারণের দ্বন্দ্বমূলক ক্রম পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক মাধ্যম ধরে এগিয়ে যায় তেমনই ইতিহাসাশ্রয়ী যে কোনো পরিবর্তনই তার সুদূরপ্রসারী বিরাট ছায়া ফেলে সব সৃষ্টিশীল কর্মে তথা জনজীবনের ব্যাপক পরিসরে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধ ও তাই আমাদের শিল্পী সাহিত্যিকদের সৃজন প্রয়াসে বারবার ফিরে এসেছে বিষয় ও বিষয়ের অধিগত অন্তর্মুখী চেতনার মতো। (সুব্রত , ১৯৯৫ :২২৫-২২৬)

বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সব জায়গাতেই মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এ সম্পর্কে আরেকজন সমালোচকের মূল্যায়ন উল্লেখযোগ্য :

> কোনো পরাধীন জাতির মুক্তিসংগ্রামের দীর্ঘ সাধনা যখন সফল হয়, তখন তা জাতীয় চেতনার মর্মমূলে থাকে নিরন্তর প্রবহমাণ; বিরাজ করে অনাগত কাল ধরে অনির্বাণ প্রেরণার উৎস হয়ে। অসীম সমুদ্রে ভাসমান দূরগামী জাহাজের নাবিকের কাছে বাতিঘরের আলোকস্তম্ভের মতো, মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রামী জাতিসত্তাকে নতুন আশা আর আকাঙ্ক্ষার বাণী শোনায় প্রতিনিয়ত। মুক্তিযুদ্ধের বৃহত্তম প্রেক্ষাপট নির্মাণে একটি দেশের জাতীয় সংস্কৃতি পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি যেমন একটি দেশের মুক্তিসংগ্রামকে ত্বরান্বিত করতে পারে, তেমনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় স্নাত হয়ে সে-দেশের শিল্প-সাহিত্যও যুগান্তকারী নতুন সৃষ্টিতে হয় ঋদ্ধ। (বিশ্বজিৎ, ২০০৯ : ১১)

গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত ইতিহাস বিভিন্ন রূপাঙ্গিকে ধরা পড়েছে শওকত ওসমানের গল্পে। তাঁর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গল্প সম্পর্কে সালাহউদ্দীন আইয়ুব জানাচ্ছেন :

> ১৯৫২ সালে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনে ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবোধের যে অভ্যুদয় ঘটেছিলো, তারই সার্থক পরিণতি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও আমাদের স্বাধীনতা। এভাবে রূপান্তরিত ও পুনর্জাত হয় বাঙালীর জাতিসত্তা, আর এই মুক্তিসংগ্রাম অফুরন্ত অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে আমাদের সাহিত্যে। শওকত ওসমান বরাবরই ছিলেন দেশাকাললগ্ন সমাজঘনিষ্ঠ কথাশিল্পী; স্বাভাবিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ তাঁর কথা-সাহিত্যে একটি অনিবার্য বিষয়। (সালাউদ্দীন আইয়ুব, ২০০৮ : ২৪)

জাতির এ গৌরবময় এবং গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে শওকত ওসমান সাহিত্যের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। তাঁর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গল্পগুলোকে স্পষ্ট দুটি রেখায় বিভক্ত করা যায় : (ক) মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত গল্প। (খ) মুক্তিযুদ্ধোত্তর পটভূমিতে রচিত গল্প।

(K) gw³h‡×i cUfwg‡Z iwPZ Mí

মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা সময়-পরিসরের 'আলোক অন্বেষা' (Rb¨ hw' Ze e‡½) গল্পের স্বল্প অবয়বে শওকত ওসমান গল্পের প্রধান চরিত্র সালামৎ আলির মগ্ন চেতনার সাথে বাস্তব পরিবেশের যোগসূত্র স্থাপন করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দোসর মুসলিম লীগের কর্মকাণ্ড এবং হানাদার বাহিনীর নির্মম-পাশবিক-অত্যাচারের চিত্র উপস্থাপন করেছেন।

'ঘাগী মুসলিম লীগারের' ষড়যন্ত্রে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দি হয়ে তাদের তৈরি নির্যাতন কক্ষে দুই হাতে হাতকড়া ও দুই চোখে ফেটি-বাঁধা অবস্থায় অভুক্ত সালামৎ আলি বাইরের জগতের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। শরীরে চাবুকের আঘাতে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে বর্বর পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ-বিদ্বেষ-ঘৃণা আরও পুঞ্জীভূত হয়। ফেটি বাঁধা অবস্থায় তিনি পৃথিবীর 'আলো : এতটুকু আলো' প্রত্যাশা করেন, তবে তা বর্বর পাঞ্জাবি সেনাদের কাছে অনুরোধ বা তাদের অনুকম্পায় নয়। এ আলো তার জীবনে যেমন মুক্তির বার্তা বহন করবে, তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তির আলোকিত বন্দরেরও দিকচিহ্ন ঘোষণা করবে বলে তিনি নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যেও শান্তির সন্ধানে স্বপ্নাতুর হয়ে ওঠেন। সালামৎ আলি মৃত্যুকে ভয় করেন না, কিন্তু ভাবেন 'জন্মভূমি বাংলাদেশকে শেষবার না দেখলে মৃত্যু অর্থহীন থেকে যাবে'। তাই, বন্দিদশায় থেকেও সালামৎ আলির প্রতিশোধপরায়ণ মগজে শত্রুবিনাশী রেখা জেগে ওঠে এবং যন্ত্রণা-ঘৃণা-ক্ষোভের সমবায়ে নৃশংস পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে তার অন্তর্যন্ত্রণার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> কুকুরের মধ্যেও মানবিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়। আর তার সঙ্গী দশজন পাঞ্জাবী সিপাই, এগুলো মুসলমান...মুসলমান...কুকুরের কাছাকাছি কোন কালেও যেতে পারবে না। এই কুকুরদের মনিব বসে আছে ইসলামাবাদ শহরে— সেগুলোই আসল জন্তু। (শওকত, ২০০৩ : ৪৮১)

নির্যাতনে ওষ্ঠাগত-প্রাণ সালামৎ আলির মৃত্যুর পূর্বে জন্মভূমিকে দেখার প্রার্থনা সেনা অফিসার মঞ্জুর করেন। কিন্তু নির্যাতন কক্ষের সে আলো তার চোখে জ্বলন্ত তীরের মতোই বিদ্ধ হওয়ায় সালামৎ মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন, কারণ তার মাথার উপর নির্যাতন কক্ষের পাঁচশ পাওয়ারের বাল্ব প্রজ্বলিত। মৃত্যুপথযাত্রী সালামতের মনোবীণায় নরপশুদের ধ্বংস করার যে দৃঢ়প্রত্যয়ী রূপ ফুটে ওঠে তা এখানে উদ্ধারযোগ্য : "দুশমনের কাছ থেকে করুণা ভিক্ষা করো না? হয় ধ্বংস করো অথবা ধ্বংস হও।" (শওকত, ২০০৩ : ৪৮৩)

লেখক 'আলোক-অন্বেষা' গল্পে নির্যাতন কক্ষে নৃশংস অত্যাচারে অবধারিত মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষারত সালামৎ আলির আত্মগত চিন্তাপ্রবাহে মুক্তিযুদ্ধের পরিবেশকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। গল্পের মূল বিষয়কে লেখক আলোকিত করেছেন সালামৎ আলির নির্ভীক চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে। এ গল্পে যেমন একদিকে ফুটে উঠেছে একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধার গৌরবান্বিত জীবনদানের কাহিনি, তেমনি অন্যদিকে প্রকাশ পেয়েছে বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের নারকীয় অত্যাচারের প্রতিচ্ছবি। তবে, সবকিছুর ঊর্ধ্বে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আলোকের ঝরনাধারার আকাঙ্ক্ষাই গল্পের মূল সুরে ব্যঞ্জিত।

'আলোক-অন্বেষা' গল্পের সাথে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-৯৭) R¨j¯c I ¯‡ci R¨j (১৯৯৭) গল্পগ্রন্থের 'রেইনকোট' গল্পের সাযুজ্য লক্ষণীয়। উভয় গল্পের কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে ঢাকা শহরের কোনো অজ্ঞাত স্থানের নির্যাতন কক্ষে। বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের অমানবিক অত্যাচারে মুখে 'আলোক-অন্বেষা' গল্পের সালামৎ আলি যেমন নির্ভীক চিত্তের পরিচয় দিয়ে জন্মভূমিকেই বড় করে তুলেছেন, তেমনি সাহসিকতার এবং দেশপ্রেমের পরিচয় 'রেইনকোট' গল্পের প্রধান চরিত্র নুরুল হুদার ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। 'রেইনকোট' গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> বৃষ্টির মতো চাবুকের বাড়ি পড়ে তার রেইনকোটের মতো চামড়ায় আর সে অবিরাম বলেই চলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তার জানা আছে। শুধু তার শালার নয়, তার ঠিকানা জানার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নাই, সে ছদ্মবেশী কুলিদের আস্তানাও চেনে। তারাও তাকে চেনে এবং তার ওপর আস্থাও কম নয়। (রেইনকোট ॥ আখতারুজ্জামান ২০০৩ : ৪০৪)

'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া' (Rb¨ hª' Ze e‡½) গল্পে মুক্তিযুদ্ধের নিখুঁত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে পাকবাহিনীর নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ, প্রাণভয়ে পলায়নরত মানুষের ঢল, নারীদের সম্ভ্রমহানির বেদনাত্মক বাস্তবতা, মুক্তিকামী মানুষদের সশস্ত্র সংগ্রাম, গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের কৌশলী যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা এ গল্পে উঠে এসেছে।

বর্বর পাকিস্তানি সেনারা হত্যাযজ্ঞের সাথে সাথে এদেশে হাটে-বন্দরে, বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, ব্রিজ-কালভার্ট ধ্বংস করে আবহমান বাংলার শান্ত সংহত জীবনকে বিষিয়ে তোলেন। লেখক আলোচ্য গল্পের প্রধান চরিত্র পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন বশীরের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধের

পরিবেশকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। যুদ্ধকালীন পরিবেশে বশীরের জওয়ানেরা সন্দেহবশত ষোল-সতের বছরের এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্রকে ক্যাপ্টেনের কাছে ধরে নিয়ে আসেন। কিন্তু ছাত্রটি নির্ভীক চিত্তে ক্যাপ্টেনের সব কথার উত্তর দেন, এটাকে অনেক জওয়ান বেয়াদবি মনে করে রাতের আঁধারে ছাত্রটিকে হত্যা করেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন ছেলেটির 'দীপ্ত রহস্যময়' চোখের কথা ভুলতে পারেন না। তারপরেও ক্যাপ্টেন 'বাংলাদেশ জন্ম মানে পাকিস্তান বরবাদ।...বাঙালির উপর কট্টর শাসন ছাড়া সব অচল হয়ে যাবে...ইত্যাদি ইত্যাদি' অজুহাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে নারকীয় ধ্বংসলীলা অব্যাহত রাখেন। গল্পের ভাষায় :

> একদিন আগে এই পথে মুক্তিবাহিনী একটা ব্রীজ উড়িয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা জীপ। যার ভেতরে ছিল অফিসারসহ আরো চার জওয়ান। সকলেই ফৌত হয়। তারই বদলা। ভোর হওয়ার আগেই তারা গোটা গ্রাম ঘিরে ফেলেছিল। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন। নির্বিচার হত্যা, অগ্নিদাহ, লুট। রমণীর চিৎকার, আর্তনাদ, আগুনের লেলিহান শিখা, প্রাণভীত মানব-মানবীর দৌড়, বেয়নটে গাঁথা শিশু, মেশিনগানের খটখট রব— নারকীয় তাণ্ডবের নানা অধ্যায়।... এক হিসেবী সিপায়ের হিসাব অনুযায়ী শিশু-নারী-পুরুষ মিলে পাঁচ শো মৃত, দু'হাজার অন্তত জখম। (শওকত, ২০০৩ : ৪৮৫-৪৮৬)

গল্পের বর্ণনার সাথে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত evsjv‡`‡ki ¯vaxbZv h× `wjjcÎ-এর অষ্টম খণ্ডের বর্ণনার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন :

> রাস্তায় দেখলাম ঘরে ফেরার মানুষগুলোর সে কি উর্ধ্বশ্বাস চলা। কারো দিকে কারো তাকাবার সময়টা পর্যন্ত নেই। সবাই ছুটছে কোন মতে নিজের জানটুকু নিয়ে যে যেভাবে পারছে পালাচ্ছে। (হাসান হাফিজুর, ১৯৮৪ : ৪০৪)

এ গল্পে লেখক গেরিলাবাহিনীর দলনেতা রণেশ-দা কর্তৃক 'সুদেহী যুবতী সখিনা এবং তহমিনা'কে বাঁচানোর মাধ্যমে মানবিকতার চিত্র নির্মাণ করেছেন। রণেশ-দা উঠানে খাটের উপর সাদা কাপড়ে আবৃত মৃত মানুষের ন্যায় পড়ে থাকেন এবং তার চারপাশে লোবান কাঠি জ্বালিয়ে মৃত্যুর পরিবেশ সৃষ্টি করে সখিনা এবং তহমিনা কাঁদেন এবং কেউ কোরান শরীফ আবার কেউ দরুদ শরীফ পাঠ করেন। এমন পরিবেশ পর্যবেক্ষণে 'বশীরের শরীরে জিঘাংসার জায়গায় বৈরাগ্যের উদয়' হয় এবং তারা সে-স্থান ত্যাগ করেন। রণেশ-দার উপস্থিত বুদ্ধির কারণেই সে-যাত্রায় তিনটি প্রাণ রক্ষা পায়।

রণেশ-দার প্রাণ রক্ষার ঘটনার বাস্তবতা যেন উজ্জ্বল দীপ্তিতে ইতিহাসের অভ্যন্তর থেকে কালের সাক্ষী হিসেবে বেরিয়ে আসে এ-গল্পে। মূলত এ গল্পটি মুক্তিযুদ্ধকালে পাকসেনাদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনি, মানুষের দিগ্বিদিক পলায়ন, নারী নির্যাতন, লুট, অগ্নিসংযোগ, হত্যাযজ্ঞ, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নানামুখী কর্মতৎপরতা এবং অসাম্প্রদায়িকতার চিত্র ধারণ করে আছে।

'সারেঙ সুখানী' (Rb¥ hy' Ze e‡½) গল্পের মূল বিষয়কে শওকত ওসমান চিত্রিত করেছেন গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সোলেমান সারেঙের দৃষ্টিকোণ থেকে। গল্প বর্ণনার মাঝে মাঝে গল্পকার যুদ্ধের খণ্ড খণ্ড চিত্র অঙ্কন করে গল্পের মূল স্রোতধারার সাথে প্রবাহিত করেছেন। এরই সূত্র ধরে এ গল্পে উঠে এসেছে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ, মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধের চিত্র, পাকিস্তানি সেনাদের নারকীয় তাণ্ডব-অগ্নিসংযোগ-হত্যাযজ্ঞ-লুণ্ঠন এবং যুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণের প্রতিচ্ছবি।

সোলেমান সারেঙ 'কাওন ধানের ছাওয়াল শেখ মুজিবের দ্যাশের মানুষ।' কর্মসূত্রে তাকে সাউদাম্পটন, লিভারপুল, বিন্দিসি, এথেন্স বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। দূর-দেশের কোনো ঝলমলে পরিবেশ তাকে মুগ্ধ করতে পারে না। কারণ, তার মন পড়ে থাকে মা-মাটির জন্মভূমি বাংলাদেশে। যুদ্ধের মধ্যে তিনি কয়েক দিনের ছুটিতে দেশে আসেন এবং ঢাকা শহরে প্রত্যক্ষ করেন শেখ মুজিবের ৭মার্চের জনসভার লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল। তার বুকে স্বাধীনতার স্বপ্ন নতুন করে বাসা বাঁধে। ইতোমধ্যে দেশে যুদ্ধ আরম্ভ হলে যুদ্ধের বিভীষিকাময় পরিবেশ তাকে ব্যথাতুর এবং প্রতিশোধপরায়ণ করে তোলে। সোলেমান সারেঙ জানতে পারেন : "তালেব বেঁচে নেই।...গণেশ মালোরা আর শীতলপুর গাঁয়ে আসবে না। বংশ ধ্বংস। আল্লার ইনসাফ আছে? তরীক মসিয়র, গফুর, বামা মাইতি, ইনাম মৃধার ভাই রাশেদ, অমিত, অমিয়, গোলাম কাসেম, বশীর শীতলপুর আর তালশহর দুই ইউনিয়নের আড়াই শ' মানুষ মারা গেছে মাত্র পাঁচ দিনে।" (শওকত, ২০০৩ : ৪৮৮) ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এ-সময়ে কুলিয়ার চর থেকে বৈদ্যেরবাজার পর্যন্ত স্টিমার চালানোর জন্য মুসলিম লীগের দালালরা প্রবীণ সারেঙকে বন্দুকের মুখে পাকসেনাদের হাতে ধরিয়ে দেন। সোলেমান অন্যান্য সহযোগী সারেঙের সাহায্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মেঘনার বুকে তিন-চার প্লাটুন পাকসৈন্যকে ডুবিয়ে মারার দুঃসাহসিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। গল্পকারের ভাষায় :

> ঝাঁপিয়ে পড়ার পর বাংলার নদী কিছুক্ষণ আলিঙ্গনে আলিঙ্গনে সারেঙকে নিয়ে লোফালোফি করেছিল, যখন লাল হয়ে উঠেছিল পানির সমতল প্রৌঢ় মানুষের রক্তে। ... সুটবুট ধারী, এমনিতে ভারী প্রায় দেড়শ' বিদেশী শত্রু মেঘনার থাবার মুখে কুকুরের মত চিৎকার দিয়ে উঠবে অপমৃত্যুর অপচ্ছায়া দেখে। নীলজল, স্বচ্ছ মেঘনা! খাকী রঙে বেঢপ করতে দেবে না তার বুকের বর্ণ সমতল। আর থোড়া অক্ত! আর কিছু সময়ের অপেক্ষা। (শওকত, ২০০৩ : ৪৯০)

সোলেমান সারেঙের শত্রুনিধনের এ অভিনব আত্মঘাতী পরিকল্পনাটি দেশপ্রেমস্নাত এবং একই সাথে মর্মস্পর্শী। পাকসেনাদের ধ্বংস করতে গিয়ে তিনি নিজেও মেঘনার বুকে সলিল সমাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু তার বুকে-মুখে তখন বিজয়ের হাসি এবং পাকসেনাদের অপমৃত্যু তার মৃত্যুকে গৌরবান্বিত করে।

'সারেঙ সুখানী' গল্পের পরিণতি বিচারে আবু জাফর শামসুদ্দীনের (১৯০৯-১৯৮৮) 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পটির সাদৃশ্য লক্ষণীয় পাওয়া যায়। 'সারেঙ সুখানী' গল্পে যেমন সোলেমান সারেঙ

পাকসৈন্যদের মেঘনা নদীতে ডুবিয়ে মারেন, তেমনি 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে কলিমদ্দি দফাদার খালের জলে ফেলে পাকসেনা হত্যায় মুক্তিসেনাদের সহযোগিতা করেন। 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> কলিমদ্দি একপা দু'পা করে অতি সাবধানে এগিয়ে যায় এবং পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, আইয়েন হুজুর। কলিমদ্দি দফাদার যত এগিয়ে যায়, তার পদযুগল নিপুণ অভিনেতার পদযুগলের মতো ঠকঠক কাঁপে, পুল কাঁপে দ্বিগুণ তালে।...কলিমদ্দি দফাদার কি ভেবে নিচের দিকে এক নজর তাকায়– খালের তীব্র স্রোত ছাড়া আর কোনো ঝামেলা নেই সেখানে। পরমুহূর্তে আর্তনাদের মতো কণ্ঠস্বরে 'মুক্তি মুক্তি' বলতে বলতে পচা তক্তাসমেত নিচে পড়ে যায়। খালের জলে একটা ঝুপ শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে গুলি বর্ষণ শুরু হয়। পজিশন নিয়ে পাল্টা গুলিবর্ষণের আগেই ধরাশায়ী হয় দু'তিনজন পাকসেনা। (আবু জাফর, ১৯৭৪ : ১৬)

শওকত ওসমানের 'বার্তাবহ' (Rb¨ h¨' Ze e‡½) গল্পটি বিষয়বস্তুর স্বরূপ নির্মাণে নয়, বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় তাৎপর্যমণ্ডিত। এ-গল্পে ইঙ্গিতধর্মিতার মাধ্যমে লেখক বাংলাদেশের আসন্ন স্বাধীনতার যেমন ইঙ্গিত করেছেন, তেমনি পাকবাহিনীর বর্বরতার চরমতম সীমাকেও তুলে ধরেছেন।

পাকবাহিনী মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের নিরীহ জনগণের উপর বিভিন্নমুখী অমানবিক নির্যাতন করেন। তারা জীবিত অবস্থায় অনেক মানুষকে হাত-পা বেঁধে আগুনে এবং পানিতে নিক্ষেপ করেন। এ-ধরনের এক কাহিনি ধারণ করে আছে 'বার্তাবহ' গল্পটি। নদীতে ভাসমান একটি লাশ এবং লাশের পাশে পাশে নদীর তীর ধরে জনতার ঢল নামে। তারা মুক্তিযোদ্ধার এরূপ করুণ পরিণতির জন্য পাকিস্তানি দোসর মুসলিম লীগ এবং পাকসেনাদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, এই ভাসমান লাশটিই তাদের জন্যে স্বাধীনতার বার্তা বহন করে এনেছেন। তাই, পাকসেনাদের নির্যাতনে নিহত এক দেশপ্রেমিক বীর মুক্তিযোদ্ধার আত্মত্যাগের বীজমন্ত্র ধাবিত হয় সহস্র প্রাণে। আত্মপ্রত্যয়ী জনগণের ভাসমান লাশকে অনুসরণ করে পাশে পাশে ধাবিত হওয়ার চিত্র দেখে মনে হয় তারা যেন সম্মিলিতভাবে তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে চলেছেন। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> ঘাট থেকে মাঠ থেকে যে-যেখানে থেকে পারে ছুটে আসছে। আব্রুভীতু গৃহবধূ এগিয়ে আসছে ঘোমটা টেনে গাছ-গাছালীর আড়াল সম্বল করে। নচেৎ যে-ব্যক্তি বাংলাদেশের সংবাদ বয়ে এনেছে, তার জানাযায় শরীক না হলে যে সারা জীবন আফসোস থেকে যাবে। (শওকত, ২০০৩ : ৪৯২)

উপরের উদ্ধৃতি থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তি চেতনার দেশপ্রেম একজন মুক্তিযোদ্ধার ভাসমান লাশকে কেন্দ্র করে তা সমষ্টি মনে অনুরণন তোলে এবং এ-থেকে তারাও বাংলাদেশের

স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। উল্লেখ্য যে, ব্যক্তিচেতনা থেকে সমষ্টিচেতনায় উত্তরণের কার্যকারণ 'বার্তাবহ' গল্পকে গৌরবান্বিত করেছে।

'জন্ম যদি তব বঙ্গে' (Rb¥ h`' Ze e‡½) গল্পটি কলকাতাস্থ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১-এ প্রচারিত হয়। বক্ষ্যমাণ গল্পটি লেখক মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) সমাধি ফলকে খোদিত 'দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব/ বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে'— চরণগুচ্ছের আলোকে একজন বাঙালি স্বদেশপ্রেমিকের প্রতিবাদী চরিত্র অঙ্কন করেছেন। গল্পে গ্রাম্য বৃদ্ধের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের বিভীষিকাময় পরিবেশ, পাকসেনাদের লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞের চিত্র।

গল্পের প্রারম্ভেই পাকসেনাদের অত্যাচারে নিহত গ্রাম্যবৃদ্ধের আহবানের মধ্য দিয়ে লেখক চমৎকারিত্ব আনয়ন করেছেন। বৃদ্ধের কাছে আগত ব্যক্তির মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে ধরা পড়েছে পাক বাহিনীর বর্বরোচিত পৈশাচিক চেহারা। ২৫ মার্চ কাল্‌রাতে "মিলিটারি শকুনেরা ঢাকা শহর ভাগাড় মনে করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এক রাত্রে হাজার হাজার লোককে হত্যা করেছে, আগুন লাগিয়েছে শত শত ঘরে।" (শওকত, ২০০৩ : ৪৯৪) অবশ্য গল্পকার যে নারকীয় ঘটনার ইঙ্গিত করেন তা জাহানারা ইমামের (১৯২৯-১৯৯৪) GK\Ë‡i i `'b¸`j গ্রন্থের পাতায় অনুপুঙ্খ বর্ণনায় উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন :

> সবাই ছুটলাম ছাদে। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে মাঠ পেরিয়ে ইকবাল হল, মোহসীন হল, আরো কয়েকটা হল, ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার্সের কয়েকটা বিল্ডিং। বেশির ভাগ আওয়াজ সেইদিক থেকে আসছে, সেই সঙ্গে বহু কণ্ঠের আর্তনাদ-চিৎকার।...বিভিন্ন দিক থেকে গোলাগুলি, মেশিনগানের শব্দ আসছে, ট্রেসার হাউই আকাশে রংবাজি করে চলেছে— দূর থেকে চিৎকার ভেসে আসছে। উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে সবদিকেই দূরে আগুনের স্তম্ভ ক্রমেই স্পষ্ট ও আকাশচুম্বী হয়ে উঠছে। (জাহানারা, ২০১২ : ৩৮-৩৯)

ধর্মকে অবলম্বন করে মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম করার পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বক্তব্য বা প্রয়াস যে অন্তঃসারশূন্য একটি রাজনৈতিক চালমাত্র তা পাকসেনাদের কর্মকাণ্ডে প্রকাশিত। বৃদ্ধকে পাকসেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের এবং তাদের বাড়ি চিনিয়ে দিতে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেন। কিন্তু স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত নির্ভীক চিত্তের বৃদ্ধ তা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে তারা বৃদ্ধকে নির্মমভাবে প্রহার করেন এবং 'গোসল-জানাজা-দাফন ছাড়াই' অর্ধমৃত অবস্থায় মাটি চাপা দেন। কিন্তু মৃত বৃদ্ধজন জীবিত বৃদ্ধ অপেক্ষা যেন আরও বেশি প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। গল্পের ভাষায় :

> একটু দাঁড়াও পথিক। দেখছ মাটির ভেতর থেকে আমার মুঠি বাঁধা হাত উঁচিয়ে আছে। মাত্র কব্জি পর্যন্ত। মাংস ত নেই। কাকের ঠোকরে শেষ। সাদা হাড়, মাটির রঙের সঙ্গে মিলে গেছে, কারো চোখে পড়বে না

> সহজে। তুমি শুধু দেখে যাও। নেকড়ের পালে পড়ে আমি আমার শেষ প্রতিবাদ রেখে গেছি বাইরের জগতে। আমার মুঠি হাত, দ্যাখো, দ্যাখো।
> তুমিও দুশমনকে আঘাত দিতে হাত মুঠিবন্ধ করো। একটু দাঁড়াও।
> দেখে যাও, জন্ম যদি তব বঙ্গে। (শওকত, ২০০৩ : ৪৯৫)

মূলত 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' গল্পে শওকত ওসমানের জীবনবোধ ভিন্ন মাত্রায় উপনীত। তিনি এ গল্পে মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তির মাধ্যমে পাকসেনাদেরকে পরাস্ত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুফল এনে দেওয়ার স্বপ্নে বিভোর। আর এ কারণেই তিনি ধর্মীয় পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে হিন্দু-মুসলিম বিভিন্ন জাতির সমবায়িত মুষ্টিবদ্ধ শক্তির প্রত্যাশা করেছেন।

মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কোন ধরনের ক্রিয়াশীল ছিল এবং তাঁদের আত্মত্যাগ বাংলার স্বাধীনতার সোনালি সূর্য আনয়নের প্রক্রিয়াকে কীভাবে ত্বরান্বিত করে তার একটি নিখুঁত বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে 'রক্তচিহ্ন' (Rb¨ hy' Ze e½) গল্পে।

নাজেম মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে পাঞ্জাবি সৈন্যের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। 'হয় মারো, নয় মরো' এই বীজমন্ত্রে দীক্ষিত নাজেম আটজন সহযোদ্ধার সাথে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে 'অ্যাম্বুশ' করতে যান। কিন্তু 'অ্যাম্বুশ' করতে যাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে রাজাকারদের ষড়যন্ত্রে অন্ধকারে শত্রুপক্ষের গুলিতে নাজেমের হাত-পা দুই-ই জখম হয় এবং ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তের বান ছোটে। কিন্তু জন্মগতভাবে 'ধকল সওয়া' নাজেমের মধ্যে তখন মৃত্যু চিন্তা নয়, সহযোদ্ধাদের রক্ষা এবং দেশমাতৃকার স্বাধীনতার চিন্তা তীব্রতর হয়ে ওঠে। 'মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি নিজে বেঁচে থাকার জন্য নয়, দেশের আর দেশের মানুষকে বাঁচাতে।' তাই, নাজেম সহযোদ্ধাদের নিরাপদ স্থানে ঠেলে দিয়ে নিজে ভিন্ন পথে ক্রল করে অগ্রসর হন, যাতে রক্তের চিহ্ন ধরে পাকসেনারা তার দিকেই ধাবিত হন। অবধারিত মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়েও নাজেমের মনোবীণায় দেশের যে কল্যাণচিন্তা জাগ্রত থাকে তা এখানে উদ্ধারযোগ্য :

> ডালকুত্তারা তার হদিসে এগিয়ে আসবে না— তা হয় না। কুকুরের চেয়ে হিংস্র এবং আক্কেল ঢের বেশি। তাই আরো ভয়। রক্তের দাগ ধরে ধরে কোন গ্রামে পৌঁছলে ওই পাঞ্জাবী জানোয়ারেরা সব পুড়িয়ে ছাই করে দেবে, আরো কত মানুষ...অসহায় নারী...প্রাণভয়ে আর্তনাদ করছে, দৌড়াচ্ছে, দাউ দাউ জ্বলছে গ্রাম। আমার মৃত্যু আরো শত শত মৃত্যুর কারণ হোক...না...না। (শওকত, ২০০৩ : ৪৯৮)

নাজেমের পরিকল্পনা এবং অনুমান চরম সত্যের মুখোমুখি হয়। বর্বর পাঞ্জাবি সৈন্যরা রক্তচিহ্ন দেখে অগ্রসর হয়ে তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে অতি যত্নে এবং গোপনে লুকিয়ে রাখা গ্রেনেডের সাহায্যে তিনি কিছু সংখ্যক পাকসেনাকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিতে সক্ষম হন। মূলত, একজন মানুষের মধ্যে দেশমাতৃকার ও জনগণের মুক্তির বাসনা কতটুকু তীব্র এবং আন্তরিক

হলে শত্রুসেনাদের সাথে সম্মুখ-সমরে নিজের জীবনকে নির্ভীকচিত্তে বিসর্জন দিতে পারে তারই বাস্তব দলিল হয়ে উঠেছে ‘রক্তচিহ্ন’ গল্প।

‘দুই ব্রিগেডিয়ার’ (Rb¥ hw‘ Ze e‡½) গল্পে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকবাহিনী ঢাকা শহরে ‘অপারেশন সার্চ লাইট’ নামে যে বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ এবং ধ্বংসযজ্ঞ ঘটান তারই একটি হৃদয় বিদারক বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। ফায়ার ব্রিগেডের অফিসার ময়ীদুর রহমান ভূঁইয়ার পেশাগতজীবন বর্ণনার সাথে চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ব্যবহারের মাধ্যমে শওকত ওসমান ২৫ মার্চ রাতের ঘটনাবলিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন এ-গল্পে।

দেশপ্রেমস্নাত এবং কর্মচিন্তায় উজ্জীবিত ময়ীদুর রহমান ভূঁইয়া অনেকবার প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে প্রাণহানি এবং সম্পদহানি থেকে অনেককে রক্ষা করেন। ফায়ার ব্রিগেডের ‘লোক-বন্ধুরা’ তাকে ‘মিস্টার ব্রিগেডিয়ার’ নামে সম্বোধন করেন। পেশা এবং নেশাগত কারণে চেতনার পলিমাটিতে গড়া ময়ীদুর রহমান ভূঁইয়া আগুন আর বিপদের সম্মুখে এক মূর্তিতে রূপান্তরিত হন। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ শেল-মর্টার-ব্রাশ ফায়ার নামক মারণাস্ত্রে প্রকম্পিত এবং প্রজ্বলিত হয় ঢাকা শহর। শহরের প্রলয় সংগীতের প্রচণ্ডতায় ভূঁইয়া রাত্রি পৌনে বারোটার দিকে ঘুম থেকে জেগে শহরের দক্ষিণ প্রান্তে আগুনের লেলিহান শিখা এবং ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখতে পান। অভ্যাস মতো দায়িত্ববান-কর্তব্যনিষ্ঠ অফিসার ভূঁইয়া তার ফায়ারম্যানদের সাথে নিয়ে আগুনের শিখা লক্ষ্য করে সেদিকে দ্রুত ধাবিত হন। কিন্তু পলাশী ব্যারাকের কাছে আসতেই কিছু বোঝার পূর্বেই দমকলের বিরাট গাড়িটি সাঁজায়ো গাড়ির শেল এবং ব্রাশ ফায়ারে ছিটকে পড়ে। ফায়ারম্যান সবাই মৃত্যুর মুখে পতিত এবং ময়ীদ ভূঁইয়া জীপের মধ্যে রাইফেলের গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হন। মিলিটারি বোঝাই দুটি জীপ আহত ভূঁইয়ার পাশে থামলে তিনি ব্রিগেডিয়ার আসলামের কাছে জখমী কণ্ঠে জানতে চান : “ভাইলোগ আপলোগ মেরা সব ফায়ারম্যান কো কিঁউ মারা...হাম লোগ সব ডিউটি মে নিকলা...শহর মে আগ (আগুন) লাগা...হাম লোগ সব ফ্রায়ার ব্রিগেড কা আদমী।” (পৃ. ৫০১) কিন্ত ময়ীদ ভূঁইয়াকে ব্রিগেডিয়ার আসলাম যে প্রত্যুত্তর করে তাতে ভূঁইয়ার সারাজীবনের শিক্ষা তার সামনে এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো খাড়া হয়ে পড়ে :

> শোনো বাঙলীকা বাচ্চা, হাম ভী ডিউটী মে নিকলা। মেরা আব ডিউটী হ্যায় আগ (আগুন) লাগানা, জায়সা তোমরা হ্যায় বুজানা (নেভানো)..সমঝা...? (শওকত, ২০০৩ : ৫০২)

মূলত, ‘দুই ব্রিগেডিয়ার’ গল্পে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে ঢাকা শহরে ঘুমন্ত মানুষের উপর বর্বরোচিত যে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে তাতে কেউ হন ঘরছাড়া আবার কেউবা পৃথিবী ছাড়া এবং এর মাধ্যমে পাকসেনাদের পাশবিকতার এবং নির্মমতার মুখোশটিই উন্মোচিত হয়।

‘ক্ষমাবতী’ (Rb¥ hw‘ Ze e‡½) গল্পে গণতন্ত্র ও মানবতার বিরুদ্ধে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে পাকসেনা কর্তৃক নারীর চূড়ান্ত সম্ভ্রমহানি, গ্রামের মানুষের উপর পাশবিক নিপীড়ন, এদেশের মানুষকে ছিন্নমূল করে সীমান্তের বাইরে ঠেলে দেওয়া, আবহমান বাংলার শান্ত-সংহত পরিবেশ তছনছ করা এবং প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথায় মানুষ কীভাবে উন্মাদগ্রস্ত হন তার অনুপুঙ্খ ভাষাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বৃদ্ধ তমিজ মিয়ার পঞ্চদশী কন্যা তহমিনা পাঁচজন পাকসেনার দ্বারা ধর্ষিত হন। ‘আজন্ম মেহনতের সঙ্গে পরিচয় বলেই হয়ত প্রচুর রক্তপাতের পরও তিনি জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলেন।’ বর্বর পাকসেনাদের বলাৎকারের শিকার মেয়েটিকে কাঁধে করে বৃদ্ধ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে জনস্রোতের সাথে বেরিয়ে পড়েন। অবশ্য এদেশের মানুষদেরকে নির্বিচারে হত্যা এবং ভীতসন্ত্রস্ত করে ভারতে ঠেলা দেওয়ার পিছনে পাকসেনাদের একটি সুপরিকল্পনা ক্রিয়াশীল ছিল, তারা চেয়েছিল বেলুচিস্তানের কসাই টিক্কা খানের “হাম জমিন দেখনে মাংতা আদমী নেহি।” (শওকত, ২০০৭ : ১৫৬) আদেশ বাস্তবায়ন করতে। “আশ্রয় নিতে দিগ্বিদিক হন্যে, যেন জন্তু- গ্রামের ঝোপঝাপ, পানা-বন, পাটক্ষেত গাঁয়ের কত পরিবার। অনেকে খেয়াল করতে পারেনি, কে কোন দিকে যাচ্ছে।” (পৃ. ৫০৩) এখানে স্মর্তব্য, এ গল্পের কাহিনি বর্ণনার সাথে বেগম মুশতারী শফী রচিত ¯vaxbZv Avgvi i³ Sivw‘b গ্রন্থের পাতায় বর্ণিত ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষের পলায়নের দৃশ্যের যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় তা এখানে উদ্ধারযোগ্য। যেমন :

> হাজার হাজার মানুষ নারী, পুরুষ, শিশু, পোটলা, পুটলী, বোঁচকা, বুঁচকী মাথায় নিয়ে চলেছে হেঁটে। কোথা থেকে আসছে আর কোথায় বা যাচ্ছে বোঝা যায় না। (মুশতারী, ১৯৯৬ : ১৮৭)

তমিজ মিয়া তার দুহিতাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বমুখী চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। তহমিনা তার অশুচি শরীর নিয়ে আর বাঁচতে চাননি, তাই তিনি সম্ভ্রমহানির দশ-বারো দিনান্তে সবার অগোচরে গোমতী নদীতে আত্মবিসর্জন দেন। পরিণতিতে দুহিতাশোকে উন্মাদগ্রস্ত তমিজ মিয়ার গগনবিদারী চিৎকারের মাধ্যমে সারা দেশেরই ভয়াবহ দুর্যোগময় পরিস্থিতি অনুধাবন করা যায় :

> চুলে জট, নিরেট পাগল, সদা চুপচাপ, কাঁধে কাঁথাজাতীয় বুচকী এবং বিড়বিড় আন্দোলিত ঠোঁটসহ হঠাৎ হাঁটু জলে সে নেমে যাবে, তারপর বজ্রনাদী চিৎকার দেবে, “মাফ কইরা দে, মা— মা— মা—।” (শওকত, ২০০৩ : ৫০৬)

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি শাসকচক্র ও পাঞ্জাবি সৈন্যদের নিষ্ঠুরতা শান্তিপ্রিয় বাংলার শান্ত পরিবেশকে যে কতটুকু বিষিয়ে তুলেছিল তা শওকত ওসমানের ‘ক্ষমাবতী’ গল্পে তহমিনার আত্মবিসর্জন, নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে রাতের আঁধারে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ছুটে চলা এবং স্বজন হারানো তমিজ মিয়ার চিৎকারের মাধ্যমে প্রকাশিত।

১৯৭১ সালের প্রলয়ংকারী মুক্তিযুদ্ধে নরপিশাচ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্মমতা এবং পাশবিকতা কীভাবে মানব সভ্যতার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে তারই ভাষাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে ‘জননী : জন্মভূমি’ (Rb¨ hÿ‘ Ze e‡½) গল্পে। বর্বর পাকবাহিনীর নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ এবং পশুশক্তির অবরোধ বেষ্টনী ঘেরা বাংলাদেশের একটি খণ্ড চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে এ-গল্পে।

‘ক্ষমাবতী’ (Rb¨ hÿ‘ Ze e‡½) গল্পের প্লটের ন্যায় ‘জননী : জন্মভূমি’ গল্পেও নারীর সম্ভ্রমহানির বিষয় উঠে এসেছে। পাক হানাদার বাহিনী এবং রাজাকারদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে বাঁচতে গ্রাম জনশূন্য; গ্রামে শুধু অবস্থান করেন সত্তর বছর বয়সের কাছাকাছি কসিমন বিবি, অলিমন বিবি ও খাতু বিবি। বার্ধক্যজনিত কারণে তারা সম্ভ্রমহানি এবং একই সাথে পাকসেনাদের ভয়ে ভীত হন নি। তাছাড়া নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটির মতো শারীরিক শক্তিও তাদের ছিল না। তাদের আবাসস্থল পাশাপাশি তিনটি ভিটাতে হলেও ‘কথাবার্তায় পারস্পরিক সান্নিধ্যে দুঃখ-ভয় অনিশ্চয়তার বোঝা হাল্কা করার’ জন্য তারা একই ভিটায় অবস্থান করেন। কিন্তু এ-গ্রাম থেকে দুমাইল দূরে মুক্তিযোদ্ধাদের মাইন বিস্ফোরণে একটি জীপ উল্টে দুজন অফিসারসহ আট-দশ জন খান সেনা নিহত হলে বৃদ্ধাদের জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য পাকসেনারা তাদের অনুচর রাজাকারদের সাথে করে জনশূন্য-পরিত্যক্ত গ্রামেও তল্লাশি করেন। জনশূন্য গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় পাকসেনা ও রাজাকাররা তল্লাশির শেষে উপস্থিত হন কসিমন বিবির উঠানে। বৃদ্ধারা ‘ভীত নয়, তবে কিছুটা আতঙ্কিত।’ কিন্তু এই বয়সেও ছেলের সমান বয়সী পাকসেনাদের নির্মম পাশবিকতা ও লালসা থেকে কসিমন বিবিরা নিজেদের সম্ভ্রমহানি থেকে রক্ষা পাননি। গল্পকার জানাচ্ছেন :

> ঘরের ভেতরে আর্তনাদ উঠেছিল বৈকি। অসহায়ের এই আর্তনাদ নতুন নয় পৃথিবীতে। ক্যাপ্টেন পনর বিশ মিনিট পরে পাৎলুনের বোতাম লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে এসেই বাঙালি সহকর্মীর দিকে তাকিয়ে বললে, “আরে তোম খাড়া হ্যায়? আরে তোম ভী থোড়া মজা কার লো Any port in the storm– এনি পোর্ট ইন দি স্টর্ম।”
> বাঙালি সৈন্য কাচু-মাচু জবাব দেয়, “নেহি, মজাক ছোড়িয়ে।”
> “মজাক নেহী। যাও, আন্দর যাও, হাম গার্ড রহেগা।”
> “নেহি ক্যাপ্টেন সাহাব।”
> তাজ খাঁর জিদ চড়ে গেল। আবার সে বললে, ‘জলদি কারো–।’
> বাঙালি সৈন্য শেষ মোক্ষম অস্ত্র ভেবে মুখ থেকে নিক্ষেপ করলে “ও মা-কার উমর (মার বয়সী) হ্যায়।”
> “আরে ছোড়ো বাৎ। দেশ কো ভী তোমলোগ মা বোলতা (অর্থাৎ দেশকেও ত তোমরা মা বলো) ওসব বাৎ-কা-বাৎ।” (শওকত, ২০০৩ : ৫১৪)

উপরের উদ্ধৃতাংশে পশুপ্রবৃত্তির পাকসেনাদের লোলুপতার বীভৎস চেহারা ফুটে উঠেছে। গল্পকার ‘জননী : জন্মভূমি’ গল্পে যে চিত্র নির্মাণ করেছেন তা স্বাধীনতাযুদ্ধকালের সারাদেশেরই একটি

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ চিত্র এবং এ-জাতীয় অনেক দুঃসহ-বেদনাবহ ঘটনার মধ্য দিয়েই আমাদের দেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীনতার বিজয় পতাকা লাভ করেছে।

গ্রাম-গঞ্জে পাকবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ, নারীর সম্ভ্রমহানির বেদনাত্মক বাস্তবতা, পাকিস্তানপন্থি মানুষের ক্রিয়াকর্ম, স্বাধীনতার ডাকে তরুণদের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া, যুদ্ধোত্তর দেশগড়ার প্রত্যয় এবং যুদ্ধকালীন আদর্শিক কারণে একই পরিবারের মানুষের মধ্যে যে মতভিন্নতাসহ বিবাদ দেখা দেয় তা উপস্থাপিত হয়েছে 'কেন মৌন' (Ck‡i i c‖Z∅›∅¦) গল্পে ।

এ-গল্পে মোবেদ মজুমদারের চরিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে গল্পকার পাকিস্তানপন্থি মানুষের চারিত্রিক মুখোশ উন্মোচন করেছেন। ব্যবসায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন মজুমদার মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাসহ পার্টির নামে চাঁদা প্রদান করে পাকিস্তানপ্রীতির পরিচয় দেন। কিন্তু মজুমদারের স্ত্রী-সন্তানরা আদর্শিক কারণে মজুমদার থেকে ভিন্নমেরুতে অবস্থান করেন। সারাদেশের ধ্বংসযজ্ঞের তথ্যে মিসেস মজুমদার এবং তাদের কনিষ্ঠপুত্র তৃতীয় বর্ষে অনার্স পড়ুয়া জহির উদ্দীনকে চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যথাতুর করে তোলে। এমতাবস্থায় বাড়ির ভৃত্যদের কাছ থেকে তারা ধ্বংসযজ্ঞের আরও সংবাদ পায় : "দু-বার মিলিটারী আইছিল। পেরথম বার বাড়ী ঘরদোর জ্বালাইছে, তিনটা মাইয়ার ইজ্জৎ খাইছে।" (পৃ. ৬৮০) এ-সংবাদে 'সদা প্রাণবন্ত জহির দঙ্গল পিয়াসী এখন জঙ্গল পিয়াসী।' তিনি সবার অজান্তে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে দেশ-মাতৃকার মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। গল্পের ভাষায় :

> মা তুমি আমার জননী। আমার আরো এক জননী আছে। তার ডাকেই আমি বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছি। আমার জন্যে চিন্তা করো না। সময় হলে ফিরে আসব। (শওকত, ২০০৩ : ৬৮১)

জহিরের এ-আকস্মিক অন্তর্ধান এবং যুদ্ধে যোগদানকে মজুমদার কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারেন না। তাই তিনি মিসেস মজুমদারকে 'তোমার ছেলেমেয়েরা সবাই ভল্ক্যানো (অগ্নিগিরি), হঠাৎ চুপ থেকে ফেটে পড়ে।'— এ-বাক্যবাণে তিরস্কার করেন। কিন্তু সমাজসচেতন, দেশপ্রেমিক এবং সন্তানবৎসল মিসেস মজুমদারও এর প্রত্যুত্তর করেন ঝাঝালো ভাষায় : "ঘৃণা, ক্ষোভ চিরকাল চেপে রাখা অসম্ভব। অনেক মূর্খই তা জানে না।" তাদের কথোপকথনে মুক্তযুদ্ধকেন্দ্রিক আদর্শিক দ্বন্দ্বটি স্পষ্ট। তারা আবার একত্র হন জহিরের সংবাদ বহনকারী রণক্ষেত্র থেকে আগত এক যুবককে কেন্দ্র করে। যুবকটিকে মজুমদার দম্পতি পুত্রবৎস্নেহে গ্রহণপূর্বক যুদ্ধের জন্যে তার হাতে নগদ তিন হাজার টাকা এবং দু'গাছা বালা তুলে দেন। কিন্তু আগত যুবকটি এ সব নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে যে তথ্য পরিবেশন করেন তার মাধ্যমে যেমন পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র ফুটে ওঠে, তেমনি দেশগড়ার প্রত্যয়ও প্রকাশিত হয়। যেমন :

> না, মা, এসব রেখে দেন দেশ-গড়ার কাজে লাগবে। জানোয়ারেরা কী রকম সব তছনছ করেছে ঘর, বাড়ী, ব্রিজ, রেলওয়ে লাইন, চাল রাখা গুদাম ঘর ইত্যাদি তা আপনি ঘরে বসে কল্পনা করতে পারবেন না। (শওকত, ২০০৩ : ৬৮২)

'কেন মৌন' গল্পে শওকত ওসমান যুদ্ধকালীন গ্রাম-গঞ্জ-শহরের খণ্ড খণ্ড চিত্র উপস্থাপন করেছেন। এবং এরই সূত্র ধরে উঠে এসেছে পাকবাহিনীর গণহত্যা, নারী নির্যাতন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, তরুণদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং পাকিস্তানি দোসরদের দেশবিরোধী কাজের প্রতিচ্ছবি।

অতি সূক্ষ্ম রেখায় বর্ণিত রূপক-সাংকেতিক গল্পের মধ্যে ঘটনাপ্রধান 'নিজের লাশ লইয়া' (ciÑZb LÄi) গল্পটি সাফল্যের পরিচয়বাহী। এ-গল্পের পটভূমি ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বিস্তৃত। গল্পকার ফ্লাশ ব্যাক রীতিতে ১৯৪৭ সালকে টেনে আনলেও গল্পটির সমাপ্তি টেনেছেন ১৯৭১ সালে মৃত্যুঞ্জয়ী মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা পাক নরপশু হননের বিজয় গাথার চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে।

পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রযন্ত্র এদেশের মানুষ ও তাদের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষাকে লাশে পরিণত করে। অথচ এদেশের মানুষ ও তার স্বপ্নভঙ্গের লাশ বহন করতে হয় এদেশেরই নিরীহ জনগণকে। উত্তম পুরুষে বর্ণিত এ-গল্পে বলা হয়েছে : "কবে আমার মৃত্যু হয়েছিল। হয়ত তেইশ, চব্বিশ, পঁচিশ বছর পূর্বে।" গল্পকার সময়কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও ১৯৭১ থেকে 'তেইশ, চব্বিশ, পঁচিশ বছর পূর্বে' উল্লেখ করার মাধ্যমে ১৯৪৭ সালকেই নির্দেশ করেছেন। তাছাড়া শববাহক নিজের লাশের "হৃৎপিণ্ডে দুটো কালো দাগ" দেখতে পাওয়ার মাধ্যমে ১৯৪৭ সালের বাংলাভাগের 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের' কলঙ্ককেই স্মরণ করিয়ে দেন।

পাকিস্তানি শাসকচক্র বিভিন্নমুখী প্রাণসংহারী নির্যাতনের মাধ্যমে এদেশের মানুষকে লাশে পরিণত করতে তৎপর ছিলেন। কথক ১৯৭১ সালে 'বুলেটে নিহত কোন আততায়ীর শিকার' নিজের লাশ বহন করে এমন এক স্থানে উপস্থিত হন, যেখানে অগণিত লাশ ও কংকালের স্তূপ পড়ে আছে এবং আরও অনেকে তার মতো করে নিজের লাশ বহন করে চলেছেন। হঠাৎ তিনি তার পরিচিত রাজ্যে এসে পড়ায় বাস্তবের ভীতি অনুভব করেন এবং লক্ষ করেন একদল দানব-নরপশু নরমাংস ভক্ষণ করছেন। এসময় হঠাৎ তার কানে একটি রমণী কণ্ঠের আর্তনাদ এসে ধাক্কা খায় : "পুত্র, আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও।" (পৃ. ৫৯৩) এক রমণী-এক মা-এক দেশের আহবানে উত্তম পুরুষ কংকালের অস্ত্র নিয়ে দানবের পিছনে ধাওয়া করেন এবং দানবটিও প্রাণভয়ে দৌড়ায়। "লোকটি তার পিছু ছাড়ে না এবং চিনতে পারে— এটা যে পাকিস্তানী সৈনিক সেটা না বলা হলেও বোঝা যায়— আর উপলব্ধি করে পশু মাত্রই ভীরু। সে আরো অনুভব করে জননী-ধর্ষক পশুটাকে শিক্ষা দিতেই হবে।" (বুলবন, ২০০৪ : ১৮৭) এদেশের বীর সন্তানেরা দানব পশুদের যে শিক্ষা দিয়েছেন তার প্রমাণ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। তাই গল্পের পরিণতিতেও গল্পকার সে-সব বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়-কীর্তন করেছেন : "আমি রক্ত বীজ। আমি মৃত্যুহীন।" (শওকত, ২০০৩ : ৫৯৪)

'নিজের লাশ লইয়া' গল্পটিতে শওকত ওসমান একদিকে যেমন পাকিস্তানি নরপশুদের ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র তুলে ধরেছেন, তেমনি অন্যদিকে ১৯৭১ সালের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মত্যাগ, সাহসিকতা এবং বিজয় গাথাও বর্ণনা করেছেন।

(L) gw³h‡×vËi cUfwg‡Z iwPZ Mí

শওকত ওসমান যুদ্ধপরবর্তী গল্পসমূহে নতুন পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক কাঠামো এবং চেতনার বিবর্তনের পটভূমিতে নবতর সমস্যা এবং সম্ভবনার চিত্র তুলে ধরেছেন। সমগ্র বাঙালির জাতিসত্তার প্রাণস্পন্দন মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী প্রতিক্রিয়াকে গল্পকার গভীর জীবনাসক্তি এবং নিরাসক্ত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে তার অন্তঃসত্যেরই রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তাঁর গল্পে। এ-জাতীয় গল্পে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কোনো চিত্র নেই, তবে আছে যুদ্ধ-পরবর্তী মানুষের জীবনসংগ্রাম, নানামাত্রিক সংকট ও সমস্যা, দেশ গড়ার এবং নতুন পরিবেশে নতুন সমাজ কাঠামোর জন্য নবতর যুদ্ধের চিত্র।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যাকে উপজীব্য করে শওকত ওসমান রচনা করেছেন 'ওয়াগান ব্রেকার' (Rb¨ hw' Ze e‡½) গল্পটি। গল্পে যুদ্ধ-পরবর্তী রাজনৈতিক সংকট, অর্থনৈতিক মন্দা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, লুণ্ঠন, ছিনতাই, ডাকাতি, সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের বিভিন্ন চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় ইতি টানা লুৎফর ওরফে লাতু দেশমাতৃকার মুক্তির ডাকে ঘর ছেড়ে আগরতলায় মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ শেষে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মালগাড়ির ওয়াগান ব্রেকারের পরিচয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার প্রাক্কালে তাকে নিয়ে অনেক কথার ডালপালা প্রসারিত হয় কিন্তু তিনি তার সমস্ত বদনামের অসারতা নিজের যোগ্যতা বলে প্রমাণ করেন। দেশ স্বাধীন হলে বীরমুক্তিযোদ্ধার গর্ব নিয়ে তিনি গ্রামে প্রবেশ করে সবার কাছেই উষ্ণভাবে সংবর্ধিত হন। গ্রামে ফেরার সাত দিনের মধ্যে লাতু আবার কাজের সন্ধানে শহরে গমন করেন। সেখানে তিনি তার যোগ্যতানুসারে কাজ না পেয়ে নিস্তরঙ্গ বেকার জীবনে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রত্যাশায় 'লুটপাট-রাহাজানি-গাড়ি হাইজ্যাক' করার মতো সমাজবিরোধী কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। একদিন দিনে-দুপুরে মিলের বেতন আনার গাড়ি হাইজ্যাক করতে গিয়ে তিনি পুলিশের গুলিতে নিহত হন। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার এরূপ মৃত্যু আমাদের সামনে একটি জিজ্ঞাসা চিহ্ন রেখে যায়; স্বাধীনতা তাহলে আমাদের জন্য কি সুফল বয়ে এনেছিল? লাতুর বাবা বৃদ্ধ জাবেদ আলী মিয়া এবং লাতুর সহযোদ্ধা গিয়াসের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার বিস্বাদের সুরটিই যেন ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> -"কেন এমন হলো, বাবা? বৃদ্ধ প্রায় ডুকরে ওঠেন।"

-"চাচা, বেওয়ারিশ লাশের কবর এখানে। আপনি আর কাঁদবেন না। যুদ্ধের কাজ ত ফুরিয়ে গেছে। তাই এখন আমরা বেওয়ারিশ।" (শওকত, ২০০৩ : ৫১৮)

"মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ মূল্যায়ন ও তাদের দানের স্বীকৃতি না দেয়ার কারণেই লাতুর এহেন পরিণতি নেমে এসেছে। এর দায়ভার যেমন তৎকালীন শাসকের, তেমনই জনগণেরও বটে।" (অনীক, ১৯৯৫ : ১৮৯) মূলত, ‍ওয়াগান ব্রেকার' গল্পে লেখক সামাজিক দায়বদ্ধতাকেই অনিবার্য করে তুলেছেন। তাছাড়া, কালের পরম্পরায় কাহিনি বিন্যাস করার ফলে যুদ্ধ-পরবর্তী একটি দেশের সার্বিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এ-গল্পে।

'দ্বিতীয় অভিসার' (Ges ïZb ïgRÑ) গল্পে শওকত ওসমান যুগপৎভাবে নারীর চূড়ান্ত সম্ভ্রমহানি এবং পাকসেনাদের প্রতি এদেশবাসীর ঘৃণার চরম নিদর্শনের চিত্র এঁকেছেন। ১৯৭১ সালের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে মাজু তার জ্ঞাতি ভাই ফরিদ রাজাকারের ষড়যন্ত্রের কারণে মিলিটারি ক্যাম্পে পাকসেনা কর্তৃক ধর্ষিত হয়ে যুদ্ধ-পরবর্তীকালে একটি সন্তান প্রসব করেন। কিন্তু মাতৃত্বের আনন্দের পরিবর্তে 'বেজন্মা মিলিটারীর ছাওয়াল' জন্মদানের তিক্ততায় মাজুর মন বিষিয়ে ওঠে। বিষিয়ে ওঠা তিক্ততাকে জলাঞ্জলি দেওয়ার তীব্র নির্দয়-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে মাজু তার বোন মরিয়মের পরামর্শে নবজাতক সন্তানকে ধলেশ্বরী নদীতে বিসর্জন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। "যারা মাতৃত্বের অবমাননা করে মাজুর কপালে কলঙ্ক তিলক পরিয়েছিল, তাদের বীজজাত সন্তান আপন উদরে ধারণ করেও মাজু নিজের অপমানকে ভুলতে পারেনি। তাই প্রতিশোধের শেষ বহ্নিজ্বালা মেটানোর জন্য সে ধলেশ্বরীর তীরে গিয়েছিল দ্বিতীয় বারের মত রাতের অভিসারিকা হয়ে।" (অনীক, ১৯৯৫ : ১৮৪) 'দ্বিতীয় অভিসার' গল্পের পরিণাম অবাস্তব বলে মনে হলেও, মাজুর পক্ষে এ সন্তান পালন করা সম্ভব ছিল না। মাজুর কাছে মনে হয়েছে পাক হানাদার বাহিনীর কুকীর্তির ফল যে সন্তান, তার বাঁচার অধিকার নেই। তাই তিনি হানাদার বাহিনীর প্রতি তীব্র ঘৃণা থেকেই নিজ সন্তানকে নদীর জলে নিক্ষেপ করেন। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

মরিয়ম বাধা দিতে হাত বাড়ালে এবং বললে, 'আর মায়া বাড়াস নে। একডু বায়ে সরে যা। তারপর ফেইলা দে। বেজন্মা মিলিটারীর ছাওয়ালের লগে আবার মুহব্বত!'...
জল এত এগিয়ে এসেছে নিকটে যে নামার প্রয়োজন নেই।...
শব্দ হয়ত একটা উঠছিল।
ধলেশ্বরীর গর্জনে সব ঢাকা পড়ে গেল। (শওকত, ২০০৩ : ৫৫৪)

উপরের উদ্ধৃতির মাধ্যমে বোঝা যায় পাকসেনাদের প্রতি ঘৃণার কাছে মাতৃত্বেরও পরাজয় ঘটেছে। "এই গল্পে শওকত ওসমান একদিকে বাঙালি নারীত্বের মধ্যে যেমন প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তির সঞ্চার করেছেন, তেমনই কলঙ্কমুক্ত মাতৃত্বের বিজয় ঘোষণা করেছেন।" (অনীক, ১৯৯৫ : ১৮৪)

'দস্যু-দারোগা সংবাদ' (ciѴZb LÄi) গল্পে একজন মুক্তিযোদ্ধার বিপথগামী হওয়ার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে সঠিক পুনর্বাসনের অভাবে, শাসকশ্রেণির অদূরদর্শিতা, ভঙ্গুর অর্থনীতি এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কারণে দেশের বীর সন্তানেরা যে আদর্শচ্যুত হয়ে নীতিহীন কাজের সাথে জড়িয়ে পড়েন তা এ গল্পের স্বল্প অবয়বে লেখক উপস্থাপন করেছেন। সাবুদ আলী মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশমাতৃকার মুক্তির জন্যে প্রাণপণে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দীর্ঘ নয় মাস 'দেশকে মায়ের প্রতিরূপে দেখে-ভেবে' রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্যে অপেক্ষায় থেকেছেন। গল্পের ভাষায় :

> হঠাৎ স্বাধীনতার বান ডাকল। পাঞ্জাবী জানোয়ারদের জুলুমে আমার চোখ খুলে গেল।... সব লুট করা সম্পদ দেশের ছেলে যারা লড়ছিল– তাদের কাজে নিঃশেষ করে ছাড়লাম। আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, দারোগা সাহেব, আবার নিঃস্ব। ইতিমধ্যে বউ মরে গেছে।...আট-ন মাস কী নেশার মধ্যে না কাজ করেছি। আমি নিজেকে চিনতে পারতাম না।...পাঞ্জাবী মেরেছি, দালাল মেরেছি, রাজাকার মেরেছি।...এককালের শিক্ষা বেশ কাজ দিলে। দেশ সকলের মা। আমার মরা মেয়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটেছিল কি না বলতে পারব না— আমি মাঝে মাঝে মেয়েটাকে স্বপ্নে দেখতাম, আর ডাক দিতাম মা, মা। (শওকত, ২০০৩ : ৬৩০)

কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে সমাজবাস্তবতার নির্মমতা তার স্বাধীনতার স্বাদকে তিক্ত করে তোলে। মুক্তিযোদ্ধা সাবুদ আর্থিক টানাপড়েনে বাধ্য হয়ে ডাকাত দলে নাম লেখান। যদিও তার জীবিকা অর্জনের পথটি সামাজিক এবং বিচারিক মানদণ্ডে অবৈধ এবং নীতিবিগর্হিত, তবুও এ-ছাড়া আর তার সামনে কোনো পথ খোলা ছিল না। 'বর্তমানে সে অত্র জনপদের ত্রাস; দুর্ধর্ষ ডাকাত সাবুদ।' তার ভয়ে দু-দশ গাঁয়ের মানুষ আতঙ্কিত অবস্থায় দিনযাপন করেন। সুবাদ ডাকাতের অতীতচারিতা এবং বর্তমানের করুণ পরিণতি দারোগা আলি সাহেবের কাছে ধৃত সুবাদ ডাকাতের জবানবন্দি থেকে পাঠক অবগত হয় ফ্লাশ ব্যাক রীতিতে। অবশ্য 'সুবাদ ডাকাত' সারা দেশেরই প্রতিনিধিত্বশীল একটি চরিত্র মাত্র। শওকত ওসমান 'দস্যু-দারোগা সংবাদ' গল্পে ডাকাত সুবাদ-এর চরিত্র নির্মাণ করলেও তাঁর লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের বিশৃঙ্খল পরিবেশ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অবমাননাকর দিকটি উদ্ভাসিত করা।

হাজার বছরের বাঙালি জীবনের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত নব্য স্বাধীন দেশের এবং এ নবোত্থিত জাতিসত্তার সকল প্রতিচ্ছবি ছোটগল্পের ছোট ক্যানভাসে ধারণ করা সম্ভব নয়। তবুও বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালের গল্পকারগণের মধ্যে শওকত ওসমানের গল্পসমূহ স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। তাঁর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গল্পে পাক হানাদারদের বর্বর গণহত্যা, নারী-নিপীড়ন, পাশবিক সব কার্যকলাপের ভাষা চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গণতন্ত্র ও মানবতার বিরুদ্ধে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে ফাটল ধরিয়ে, মানুষের আজন্ম সম্পর্কে প্রভেদ সৃষ্টি করে গায়ের জোরে দখলদারিত্ব বজায় রাখার অপচেষ্টার চিত্র স্পষ্ট রেখায় পরিস্ফুটিত হয়েছে এ-সব গল্পের পটে। এ জনপদকে মেধাশূন্য করা ও পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করার

প্রয়াসও সমভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ২৫-২৬ মার্চের (১৯৭১) কালো রাতে আধুনিক ভয়ংকর মারণাস্ত্র হিংস্রভাবে প্রয়োগ করে ঘুমন্ত ঢাকাবাসীর উপর পাক দখলদারদের হামলে পড়া, মারাত্মক মানবিক বিপর্যয়ের গ্রাসে পতিত শহরবাসী মানুষের, বিশেষভাবে ঢাকার মানুষের দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে গ্রামের দিকে পালানোর জ্বলজ্যান্ত চিত্র সবচেয়ে বেশি চিত্তাকর্ষক। গ্রাম-গঞ্জের দারিদ্র্যপীড়িত সাধারণ মানুষের আর্থিক দেউলিয়াত্বের ছবি, পাক বাহিনীর দোসর আলবদর, রাজাকার, আল শামস, শান্তি কমিটির সদস্যদের ঘৃণ্য পৈশাচিকতা, কৃষক-মাঝি-শ্রমিক-নিম্নবিত্তদের বুক চিতিয়ে দাঁড়ানোর চিত্র, গ্রামের মানুষের উপর পাশবিক নিপীড়নের কাহিনি, নিবিড় পল্লির মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থার বাস্তব চিত্র শতভাগ গল্পে ধরা না পড়লেও গল্পগুলো থেকে গ্রাম্য সমাজে যুদ্ধের ভয়াবহতা সহজেই অনুমেয়। তাঁর গল্পে যুদ্ধবিধ্বস্ত, সামগ্রিক অর্থেই বিপর্যস্ত, নবজাত দেশটির গঠনপ্রাপ্তির প্রাথমিক চিত্রটি উপস্থাপিত হয়েছে, এর সাথে লুণ্ঠিত, মৃত্যু কবলিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের নানা শ্রেণির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রাথমিক ঘটনাবহুল দিনগুলোর ছবি বিশ্বস্তভাবে ধারণ করে আছে। শওকত ওসমানের এ-পর্বের গল্পে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে সুযোগসন্ধানী মানুষের উপরে উঠতে চাওয়ার মরিয়া প্রচেষ্টা, বিপথগামী যুবক-ছাত্রদের গণবিরোধী অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ, দেশের বিভিন্ন স্থানে ছিনতাই, দখল, দলবাজি-টেন্ডারবাজির মাধ্যমে যুদ্ধোত্তর পরিবেশকে আরও অস্থিতিশীল করে তোলার চিত্র উঠে এসেছে। তাছাড়া স্বাধীনদেশে সংখ্যালঘু পরিবারের উপর বিভিন্ন প্রকার অন্যায়-অত্যাচার, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের অবমূল্যায়ন প্রভৃতি গল্পগুলোতে উপস্থাপিত হয়েছে।

‘B : BwZnvm-Avkqx

সমাজসচেতন ইতিহাস-ঐতিহ্যমনস্ক কথাসাহিত্যিক হিসেবে শওকত ওসমানের পরিচয় সর্বজনবিদিত। দীর্ঘদিনের সাহিত্যসাধনার বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুতে যেমন বৈচিত্র্য এসেছে, তেমনি গল্পকারের তীক্ষ্ণ রসবোধ, সমাজভাবনা এবং রাজনৈতিক ও সমকালীন ঘটনাস্রোতের সাথে ইতিহাসকে অঙ্গীভূত করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি গল্পগুলোকে ভিন্নমাত্রায় পৌঁছে দিয়ে তাঁর শিল্পিসত্তাকে শানিত ও পরিপুষ্টি দানে সাহায্য করেছে। এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গল্পে তিনি ইতিহাসকে আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। এ-কালপর্বে রচিত ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক গল্পগুলো বিশ্লেষণ করলে সহজেই লেখকের ইতিহাস-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

‘এবং তিন মির্জা’ (Ges wZb wgR©v) গল্পে ইতিহাসের পটভূমিকায় মির্জা বংশের তিন দেশপ্রেমিক বীরপুরুষের দেশ, জাতি ও স্বাধীনতার জন্য আত্মদানের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ব্রিটিশ কালপর্বের সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) থেকে আরম্ভ করে স্বদেশী আন্দোলন অতিক্রম করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে (১৯৭১) মির্জা বংশধরদের যে অবদান তা ইতিহাসের পরম্পরায় এ-গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মির্জা আব্সারের বংশধর আলী হায়দার ত্রিপুরা এলাকার অভিজাত পরিবারের বাসিন্দা। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা মোগল আমলে বিভিন্ন সেরেস্তায় নিয়োজিত ছিলেন। বিপুল লাখেরাজ সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার সূত্রে তাঁরা মির্জা পরিবার। যৌবনের উষালগ্নে যাযাবর প্রকৃতির আলী হায়দার দেওবন্দ, জোনপুরসহ বিখ্যাত শিক্ষাপীঠগুলো পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে হৃদ্যতার বাধনে বাঁধা পড়েন। দেশ-মাটি এবং মানুষের সাথে নিবিড় সম্পর্কের কারণে বিদেশি, বিজাতি কোম্পানির শাসন মির্জা হায়দারের পক্ষে মেনে নেওয়া দুঃসাধ্য ছিল। তাঁর সকল অস্থিরতার উৎস সেইখানে। তাই, বিজাতীয় রাজত্বের অবসান এবং দেশমাতৃকার সেবার উদ্দেশ্যে স্ত্রী-সন্তানকে রেখে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ঝান্ডা উড়িয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গ করেন। কিংবদন্তির উৎস হয়ে দাঁড়ায় মির্জা আলী হায়দারের অন্তর্ধান। লেখক জানাচ্ছেন :

> অনেকের ধারণা, ঢাকার বিদ্রোহী সেনাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। নিজেই সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বিদ্রোহ অসফল হওয়ার পরে তিনি নিজ গ্রামে ফেরেন স্ত্রী-পুত্রকে একটি বার দেখার জন্যে। পরে কোম্পানির সিপাইদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় তিনি প্রাণত্যাগ করেন। (শওকত, ২০০৩ : ৫২৩)

সিপাহী বিদ্রোহের চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পর বিশ শতকের গোড়ার দিকে মির্জা পরিবারের আরেক বংশধর মির্জা আলী আনোয়ার নিজ শিক্ষাগুণে ব্রিটিশ সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োজিত হন। চাকুরিপ্রাপ্তির অব্যবহিত কাল পরেই মির্জা আনোয়ার রাজপুরুষগণের মধ্যে কিংবদন্তির নায়কে পরিণত হন। ক্লাবে, শরাব পানের প্রতিযোগিতায়, বিলিয়ার্ড টেবিলে 'নাম্বার ওয়ান'। এমনকি এই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে 'রমণী-মোহন, রমণী ভোজন এবং গণিকালয়ে'ও দেখা যেত। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের দাবানলে যখন এ-উপমহাদেশে ব্রিটিশ মসনদ কেঁপে উঠেছিল, সে-সময় (১৯২৭/২৮) এক তরুণী তাঁর কাছে আসেন তার রাজবন্দি ভাইয়ের মুক্তির বিষয়ে সুপারিশের জন্য, কিন্তু মির্জা রূঢ় স্বরে তা করতে অস্বীকৃতি জানান। তরুণীটিও তাকে চড়া কণ্ঠে জানিয়েছিলেন, "আপনি কি এদেশে জন্মাননি? দেশের সামান্য সেবা দিয়ে কী সারাজীবনের পাপ স্খালন করার চেষ্টা এতটুকু দেখাতে পারেন না?" এর অল্প দিনের ব্যবধানে তরুণীর ভাই আত্মহত্যা করলে মির্জা আনোয়ারের বোধোদয় ঘটে এবং শরীরে প্রবাহিত পূর্বপুরুষদের রক্ত তার দেশভাবনায় জেগে ওঠে। এ-সময় থেকেই স্বদেশভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে মির্জা আনোয়ার গোপনে রাজবন্দিদের সাহায্য করেন। লেখক জানাচ্ছেন :

> রাজবন্দির সঙ্গে তিনি দেখা করতে যেতেন।...এক-দু ঘণ্টা কেটে যেত রাজবন্দিদের সঙ্গে জেলের ভিতর।...ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাজবন্দিদের সঙ্গে যেন কতকালের আলাপ মির্জা সাহেবের।...বাড়ী ফিরে গিয়ে যখন কয়েদী জানতে পারেন যে তাদের পরিবারের কোন আর্থিক বিপর্যয় দেখা দেয় নি। কারণ, মাস-মাস অথবা ঈষৎ সময় ব্যবধানে তাদের আয়ের যোগান যথা-মজুদ ছিল এবং এই টাকা নাকি তার এক অচেনা হিতাকাঙ্ক্ষী পাঠিয়ে দিত অন্য একজন মারফৎ।...রাজবন্দির সন্দেহ গিয়েছিল মির্জা আনোয়ারের উপর। (শওকত, ২০০৩ : ৫২৫)

সিপাহী বিদ্রোহের প্রায় একশ বারো বছর পর বাংলাদেশের রণাঙ্গনে মির্জা বংশের চতুর্থ বা পঞ্চম পুরুষ একুশ বছরের সূর্যসন্তান মির্জা আলী আশ্রার-এর উপস্থিতি যোদ্ধাদের মনোবলকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে। পাকসেনাদের অত্যাচারে নিহত বাবা-মায়ের মৃত্যু সংবাদও তাকে রণাঙ্গন থেকে টলাতে পারেনি। অকুতোভয়ে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে তিনি যেমন সহযোদ্ধাদের বাঁচিয়েছেন, তেমনি বাঁচিয়ে গেছেন বাংলাদেশকে। যেমন :

> শেষে একদম লীডারের মতই তিনি আদেশ দিলেন, "তোমরা চলে যাও।"...আমি ওদের উল্টো পথে নিয়ে যাব, যেন তোমরা সহজে দুশমনের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারো।...
> বন্ধুগণ, তোমরা কেউ কেউ ভাবতে পারো, শত্রুর হাতে আমার লাশ পড়বে। ত পড়ুক। পরে পুঁতে দেবে মাটিতে। জননী বাঙলাদেশের মাটির বুকে ঘুমাবো...তার চেয়ে প্রশান্তিময় আর কী আছে দুনিয়ায়। (শওকত, ২০০৩ : ৫২৮)

'এবং তিন মির্জা' গল্পে মির্জা বংশের তিন প্রবাদ পুরুষের দেশপ্রেমের নিদর্শন লেখক সরলরেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। দেশমাতৃকার প্রতি গভীর মমতা থেকে মির্জা পরিবারের তিন বংশধর মির্জা আলী হায়দার, মির্জা আলী আনোয়ার, মির্জা আলী আশ্রার-এর আত্মত্যাগ জাতির দুর্দিনে, জাতির মুক্তির পথকে অনেকটা কণ্টকমুক্ত করে।

'পুরাতন খঞ্জর' (ciÖZb LÄi) গল্পের প্রেক্ষাপটে শওকত ওসমান ১৯৪৭ সালের ঐতিহাসিক বাংলাভাগের বেদনাবহ কাহিনিকে উপজীব্য করেছেন। বাংলাভাগের ফলে সৃষ্ট সমস্যা বাংলার উভয় অঞ্চলের সমাজ এবং জনজীবনে কী প্রভাব সৃষ্টি করে তা লেখক দুটি পরিবারের সমস্যাজর্জর কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে প্রতীকায়িত করেছেন।

গল্পের প্রেক্ষাপট থেকে জানা যায়, পশ্চিম বাংলা থেকে আগত পাঁচজন সদস্যের একটি রিফিউজি পরিবারের সাথে বাংলাদেশের চার সদস্যের এক পরিবারের হৃদ্দিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারা একে অপরকে 'মোকামী ভাই' ও 'রিফিউজী ভাই' সম্বোধন করেন। এদেশের পরিবারটি জীবন এবং জীবিকার প্রয়োজনে গ্রাম ছেড়ে শহরের বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তাদের অবস্থা কোনোভাবেই রিফিউজি পরিবারের থেকে উন্নত নয়। বাংলাভাগ উভয় অঞ্চলের মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা ছাড়া যে আর কিছু দিতে ব্যর্থ হয়েছে তা দুদেশের দুটি পরিবারের মানুষের জীবন বর্ণনার মাধ্যমে গল্পকার প্রতীকায়িত করেছেন। পৃথক পৃথক অঞ্চল থেকে আগত দুটি পরিবার ছিন্নমূল বৃক্ষের মতোই অমানবিক জীবনযাপন করেন। গল্পের ভাষায় :

> মোকামী জন ত প্রায় তিক্ত গলায় বলত, "আমার নাকি দেশ আছে? দেশ আছে ত আমার কী? আমি ত মানুষের মত দিন গুজরান করি না। দেশ–ভেশ ওসব কথার কথা। ভোটারের তালিকায় তোমার নাম নেই, আমারও নেই। হালা–"। তারপর খিস্তি জুড়ে দিত সে। রিফিউজী তার তিক্ততা হাড়ে হাড়ে বোঝে। এবং সেই জন্যে মৃদু স্বরে সায় দিত, "আমিও তা-ই ভাবি।" (শওকত, ২০০৩ : ৬০৪)

শওকত ওসমান বাংলাভাগের অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরতে অতি কৌশলে এ গল্পে রূপকের ব্যবহার করেছেন মোকামি ব্যক্তির জবানিতে 'সোহরাব-রুস্তমের' পুথি ব্যবহারের মাধ্যমে। আলোচ্য পুথি থেকে জানা যায়, মহাবীর রুস্তম ভুল করে ন্যায়বর্জিত বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে খঞ্জর দিয়ে তার নিজ সন্তান তরুণ বীরযোদ্ধা সোহরাবকে হত্যা করেন। এ-হত্যাযজ্ঞ যে ১৯৪৭ সালের বাংলাভাগের ক্ষেত্রে ঘটেছে তা মোকামি জনের উদ্ধৃতিতে তার পিতার মৃত্যুর সংবাদ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত :

> মোকামী জন উঠে দাঁড়াল। তখন সহজ গলায় রিফিউজী উচ্চারণ করল, "বাপ আমাদের মেরেছেন। এবার খোদ নিজেই মরেছেন। (শওকত, ২০০৩ : ৬০৪)

"রুস্তম যেমন নিজ সন্তানকে খুন করেন, আমাদের রাজনৈতিক পিতারাও তেমনি দেশকে খণ্ডিত করে নিজ সন্তানকে খুন করেছেন।" (বুলবন, ২০০৪ : ৯৯) বহু যুগের সেই পুরাতন খঞ্জর আবার নতুন করে এদেশের মানুষের এবং মানবসভ্যতার উপর প্রয়োগ করা হয় ১৯৪৭ সালের বাংলাভাগের মাধ্যমে।

স্বদেশীদের আত্মত্যাগের গৌরবময় কাহিনি এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। 'জনপদে' (Ck‡ii c‖ZØ›Øx) গল্পে শওকত ওসমান ব্রিটিশ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবন দান করেছেন। সে-সময় স্বাধীনতা আন্দোলনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ ছিল প্রশংসাযোগ্য। তাছাড়া মুক্তিকামী মানুষের প্রতি বিশেষ করে স্বদেশীদের প্রতি কুলি-মজুর-শ্রমিক-চাষি-মাঝি-কামার-কুমারসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের শ্রদ্ধাবনত সহমর্মিতা-সহযোগিতা এবং সমর্থন ছিল উল্লেখযোগ্য। এ-গল্পপাঠে দৃশ্যমান হয় স্বদেশী জগদীশ পাকড়াশীকে ধরতে ইংরেজ গোয়েন্দা এবং পুলিশ বাহিনী যখন প্রবল অভিযানে তৎপর, তখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সুবল মাঝি তাকে নদী পার করতে ব্যস্ত। "দেশপ্রেম এক অনির্বচনীয় মর্যাদায় অন্তরাত্মায় স্থান পেয়েছে বলেই সুবলের মত একজন নিরক্ষর মাঝি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝুঁকিপূর্ণ পথে পা বাড়িয়েছিল" (শোয়েব, ১৯৯১ : ৫৬) স্বদেশী জগদীশ পাকড়াশীর জীবন বাঁচাতে। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> আমি এখন আর ওপারে যাবো না। ডাক দিলে যাবো। তার আগে নৌকা পানি বোঝাই করে রাখব। বলব, ফাটো হয়ে গেছে। জল ছেঁচা শেষ হলে যাবো। ফলে, দেরী হবে। আপনি খুব দ্রুত পার হয়ে যাবেন। (শওকত, ২০০৩ : ৬৬৫)

সুবল মাঝির বুদ্ধিমত্তার জন্যেই সেদিন জগদীশ প্রাণে রক্ষা পায়। পরবর্তীকালে এ-কাহিনি ওই জনপদে লোকশ্রুত গল্পের মতো পরিচিতি লাভ করে। "তেমনি জগদীশ তার এলাকার মানুষের মনে-চেতনায়-উপলব্ধিতে অবিনশ্বর পবিত্রতায় এক মন্ময় সত্তায় লীন হয়ে গেছেন।" (শোয়েব,

১৯৯১ : ৫৬) তাই, ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে আগস্ট আন্দোলনে মৃত্যুবরণ করেও অপ্রত্যাশিতভাবে সুবলের পুত্র সুধীরের সাথে জগদীশের আবার সাক্ষাৎ ঘটে। মূলত, স্বাধীনতাকামীরা কখনও মরে না, তারা বিভিন্নরূপে বিভিন্ন সময়ে ফিরে ফিরে আসেন। জগদীশ পাকড়াশীর ভাষায় : "যাঁরা কাহিনি হয়ে যায়, তাদের মরার ভয় থাকে না।" (পৃ. ৬৬৯) 'জনপদে' গল্পে স্বদেশী আন্দোলনের চিত্র অঙ্কনের সাথে সাথে স্বদেশীদের অমরত্ব বিষয়টি গল্পকারের শৈল্পিক লাভের নৈপুণ্যে উপস্থাপিত হয়েছে।

শওকত ওসমানের 'হন্তারক' (nš ÍviK) গল্পটি বৃহৎ ক্যানভাসে রচিত ঐতিহাসিক ছোটগল্প। তবে গল্পের মধ্যে ভৌতিক আবহও দুর্লক্ষ্য নয়। গল্পের একদিকে ফুটে উঠেছে মোঘল আমলের রাজপ্রসাদের অন্তঃপুরের বিচিত্র কাহিনি এবং অন্যদিকে রূপকের অন্তরালে প্রকাশ পেয়েছে এদেশ বা জাতিকে বন্ধ্যা বা অনুৎপাদনশীল করে রাখার প্রচেষ্টা। কোনো কারণে দেশমাতৃকার প্রতি মানুষের প্রাণের আবেগ দুর্দমনীয় হয়ে উঠলে মানুষ সহজেই যে প্রতিবাদী-বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে তারও অনবদ্য রূপায়ণ ঘটেছে এ গল্পে। বিভিন্ন কারণে 'হন্তারক' গল্পটি বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে।

প্রথমত, একটি মাত্র গল্প নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভবত এটিই বাংলা সাহিত্যে প্রথম।

দ্বিতীয়ত, "ইতিহাস, কাল এবং অস্তিত্বের সমস্যার ঘোঁট পাকানো গল্পটি চরিত্রে স্বতন্ত্র।" (শওকত, ১৯৯১ : ৬) গল্পটি পাঠ করে রফিকুন নবী উক্ত মন্তব্য করেছিলেন। তবে গল্পকারও তাঁর সাথে একমত প্রকাশ করেন।

তৃতীয়ত, গল্পটি লেখক এক গল্পের আসরে মৌখিকভাবে বলেন এবং পরবর্তীকালে লিখিতরূপ দেন।[১]

চতর্থত, গল্পটির মধ্যে গল্পের বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা উপন্যাসের গুণাবলিই বেশি।

পঞ্চমত, প্রবাদ-প্রবচন, কাব্যিক ভাষার বহুবিধ ব্যবহার ঘটেছে এ গল্পে।

গল্পটির দৃশ্যপটে উন্মোচিত হয় সতের শতকের শেষ পর্যায়ের আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল। ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে কাজীদের বিচারে ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে শিরশ্ছেদ ঘটানো শাহজাদা দারাশিকো (দারাশুকো) এবং ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত আওরঙ্গজেব প্রেতপুরিতে অপেক্ষমান শেষ বিচারের প্রত্যাশায়। প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব ব্যাখ্যা আছে, কাহিনি আছে। তবে পাপ-পুণ্যের কথা প্রায় সকল ধর্মেই এক। মহাকালের অসমতল গর্ভে মানুষের আত্মা জাগ্রত থাকে প্রলয়ের শেষ দিন পর্যন্ত এবং অতীত কৃতকর্মের জন্য প্রত্যেকের আত্মা অস্থির থাকে প্রতিক্ষণ। মানুষের কিছু কিছু কীর্তি অবশিষ্ট থাকে অখণ্ডতার আরেক রূপে। আর এ জাতীয় শিল্পচিত্র অঙ্কনের নেপথ্যে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় মহাকাল।

‘হন্তারক’ গল্পটি ঐতিহাসিক। লেখক উত্তমরূপে ইতিহাসকে অধ্যয়ন করে গল্প লেখায় ব্রতী গ্রহণ করেন। গল্পকার বিশাল মোগল রাজপ্রাসাদ-হারেমের দুই খোজা (নপুংসক) প্রহরীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অন্তঃপুরের দৃশ্যপট উন্মোচন করেছেন। তাদের কথোপকথনে সম্রাটের হারেমে লুকিয়ে শাহজাদাদের প্রবেশের তথ্য যেমন আছে, তেমনি অবৈধ সন্তান জন্মদানের কাহিনিও আছে। এছাড়া পূর্ববঙ্গের (সিলেট অঞ্চলের) ছোটনদী ইলিশবিল থেকে শিশু বয়সে হরণ করে কীভাবে তাদের নপুংসক করে বিশাল হারেমের সেবাদাসে পরিণত করা হতো তার চিত্রও এ অংশে উপস্থাপিত হয়েছে হিজুর স্মৃতিচারণ থেকে : “আমাকে কেল্লার ভেতর দুজনে হাজামের কাছে ধরে রেখেছিল। তখন আমি খুব কাঁদছিলুম।” (পৃ. ১৩)

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আমাদের এ দেশ ও দেশের মানুষ বিভিন্ন সময় বিদেশি-বিভাষী-বিজাতি দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয়েছে। কিন্তু শত যন্ত্রণার মধ্যেও মানুষের মনোবীণায় বারবার ভেসে ওঠে এদেশের সুখময় স্মৃতি। হিজু-গেজুর স্বপ্ন-সাধ নপুংসকে পরিণত হওয়ার মধ্য দিয়ে নিঃশেষিত হলেও তাদের হৃদয় থেকে মুছে যায়নি দেশের সুখ-স্বপ্নবিজড়িত স্মৃতি। তাই শ্রাবণ আকাশের মেঘের ন্যায় তাদের হৃদয় আকাশেও উঁকি দিয়েছে সুখময় স্মৃতি এবং তাদের অন্তর্জগৎ ভরে ওঠে স্ব-গ্রামাঞ্চলের প্রতিবেশ কল্পনায় : “আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি একটি নদীর নাম। নদীর নামটা মনে আছে। ইলিশবিল।” (পৃ. ১৪)

এখানে স্মর্তব্য যে, ‘হন্তারক’ গল্পের সাথে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-১৯৭১) ‘নয়নচারা’ গল্পের একটি দিকের সাযুজ্য বিদ্যমান। এ গল্পে নয়নচারা গ্রামের আমু, ভুতো, ভুতনি দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে দুমুঠো খাদ্যের অন্বেষণে ছুটে আসেন শহরে। কিন্তু শহরে আগত বুভুক্ষুর দল প্রত্যক্ষ করেন শহরজীবনের দয়া-মায়াহীন, হিংসা-বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা, অসহ্য বৈরিতা ও নির্মম পাশবিকতাপূর্ণ পরিবেশ। লঙ্গরখানায় কোনো দিন তারা দুটি খেতে পেলেও তা জীবনধারণ বা বেঁচে থাকার জন্য অপ্রতুল। ফলে দুর্ভিক্ষ-কবলিত মানুষগুলো দারুণভাবে জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে অন্নহীন অবস্থায় খড়কুটোর মতো রাজপথে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু জীবন-সংহারকারী ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও তাদের মনোবীণায় বেজে ওঠে গ্রামের সুখময় স্মৃতি। তাই শহরের ফুটপাতে তারা খড়কুটোর মতো পড়ে থাকলেও ঘনায়মান কালো রাতে “জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটাকে তাদের গ্রামের ময়ূরাক্ষী নদী” (ওয়ালীউল্লাহ, ২০০৫ : ৩) হিসেবে কল্পনা করতে ভালো লাগে, এমনকি কেউ তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলে তাদেরকেও তারা নয়নচারা গ্রামের মানুষ হিসেবে কল্পনা করেন : “নয়নচারা গাঁয়ে কি মায়ের বাড়ি?” (ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০০৫ : ৩) ‘হন্তারক’ গল্পেও হিজু, গেজুর মনোবীণায় বেজে ওঠে তাদের পরিচিত একটি নদীর দৃশ্য– “আমার শুধু শব্দ হিসেবে সেই নাম মনে আছে, সেই নদীর নাম।...আমার কানে বাজে সেই নদীর নাম : ইলিশবিল...ইলিশবিল।” (শওকত, ১৯৯১ : ৪৭) তবে ‘নয়নচারা’ গল্প থেকে ‘হন্তারক’ গল্পের বিশিষ্টতা এখানেই যে ‘নয়নচারা’ গল্পে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষগুলোর মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উত্তরণের কোনো পথ নেই বা

লেখক উত্তরণের কোনো পথের সন্ধান দেখাননি। অন্যদিকে 'হন্তারক' গল্পে হিজু, গেজু, হেবু, গেবু বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হলেও তাদের স্বপ্ন-সাধ, উৎপাদনশীলতা যারা হত্যা করেছে তারা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। গেজুর ভাষায় : "আমি দাদ নেব, প্রতিশোধ নেব।" (শওকত, ১৯৯১ : ১২)

'হন্তারক' গল্পে লেখক মোগল রাজপ্রাসাদের অলিন্দে নৈশকালীন দুই খোজা প্রহরীর সংলাপের মাধ্যমে ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতির সাহায্যে পাঠককে পৌঁছে দিয়েছেন মোগল সাম্রাজ্যের অন্তঃপুরে। আওরঙ্গজেব ও দারাশিকো যে সময়ে প্রেতপুরিতে প্রথম সাক্ষাতে মিলিত হন, সেটি সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) পরবর্তী ইংরেজ শাসনামল। লেখকের বর্ণনা কৌশলে মোগল রাজপ্রসাদ, প্রেতপুরী ও ইংরেজ শাসনামলের চিত্র মিলে-মিশে একাকার। গল্পারম্ভে হারেম প্রহরী হিজু-গেজুর দৃশ্যে আওরঙ্গজেব ও দারাশিকোর জীবনকালের খণ্ডচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এ-থেকে জানা যায়, দারাশিকো ছিলেন শিক্ষিত, সঙ্গীতপ্রিয়, অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী, বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি আস্থাশীল, পক্ষান্তরে আওরঙ্গজেব ছিলেন ধর্মীয় গোঁড়ামির পৃষ্ঠপোষক, উচ্চাভিলাষী, কূটকৌশলী, রণবিদ্যায় দক্ষ। দারাশিকো চরিত্রে দার্শনিকতা, ভাবুকতা, স্বর্গীয় প্রেম-চেতনা ও কাব্যানুরাগের চমৎকার সমাবেশ ঘটেছে। দারাশিকো ত্রিকালজ্ঞ, তিনি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের গণ্ডি অতিক্রম করে জীবন ও জগৎকে দেখতে পান। অন্যদিকে আওরঙ্গজেব স্বার্থান্ধ ও ক্ষমতালোভী; তিনি শুধু বর্তমানকেই দেখতে পান। আওরঙ্গজেবের প্রতি দারার খেদোক্তি প্রকাশের মধ্য দিয়ে লেখক তার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন তা এখানে উদ্ধারযোগ্য :

> তুমি যদি কাজীদের সামান্য ইশারা দিতে আমাকে বাঁচিয়ে রাখার দরকার, তাহলে কি আমার গায়ের কোন লোম খসত?...তুমি মুরাদকে বন্দী করার মতলবে কুজো কুজো শরাব আর টাকা পয়সার ঘুষ সরবরাহ করোনি? তোমার শরীয়ৎ পালনের রকমসকম আমার জানা আছে। তোমার শরীয়ত মানে ষড়যন্ত্র। (শওকত, ১৯৯১ : ১৮)

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ক্ষমতালোভী আওরঙ্গজেব রাজ্যলোভে বিভিন্ন ধরনের নীতি-বহির্ভূত কর্মের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। লেখক দারাশিকোর প্রেতাত্মার সহায়তায় আওরঙ্গজেবের প্রেতাত্মাকে একবার দিল্লিতে তাদের প্রপিতামহ বাদশাহ আকবরের পিতা হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধ দেখিয়ে দুই সহোদরকে ভবিষ্যতের পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে আওরঙ্গজেব শাসনামলের বিভিন্ন ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করান। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ ও শাহাজাদাগণের করুণ কাহিনিও বিধৃত হয়েছে গল্পে। লেখক জানাচ্ছেন :

> দিল্লির লাল কেল্লার দিকে এগিয়ে চলেছে ইংরেজ সৈন্য পরিবেষ্টিত বাহাদুর শা'র শিবিকা। তারা দুই সহোদর দারা আওরঙ্গজেব আড়াল কোন জায়গা থেকে অবলোকন করছিল সেই দৃশ্য। (শওকত, ১৯৯১ : ২৪)

মানুষের আত্মা পরিব্রাজক। বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করে দারা আওরঙ্গজেবকে বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়েছেন। আওরঙ্গজেবের নানা অত্যাচারের চিত্র আভাসিত হয়েছে, এসব দৃশ্যের ব্যক্ত-অব্যক্ত ঘটনায়। প্রেতাত্মাগণের বিলাপ, নানা বয়সের অত্যাচারিত নগ্ন আত্মীয় নারী-পুরুষের কাফেলা, নৃশংসভাবে নিহতদের আত্মীয়-স্বজনের আর্তনাদ, মেকি-ধার্মিক ছদ্মাবরণে মানুষের কবরের উপর মসজিদ তৈরি এবং ভ্রষ্টাচারের নির্লজ্জরূপ গল্পকার নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন। তবে নেপথ্যে উচ্চারিত কথামালাই আওরঙ্গজেবের হন্তারক-ব্যভিচারী চরিত্রটিকে সর্বাধিক বিচলিত করেছে। আওরঙ্গজেবকে তীব্রভাবে অসহিষ্ণু, অস্থির করে তুলেছে তার চরিত্র উদ্ঘাটক গায়েবি আওয়াজ : "আমি জননী-ভগিনী ধর্ষক, নারীঘাতী, নরঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী তাই আমি জারজ বেজন্মা অজাচারী জঘন্য...ঘৃণ্য, ঘৃণ্য।" (শওকত, ১৯৯১ : ৪৫) গল্পের সমাপ্তিতে পুনরায় হিজু-গেজুর প্রেতাত্মার সংলাপে মোগল রাজপ্রাসাদের চিত্র ব্যক্ত হয়েছে। খোজাদের কথার মধ্য দিয়ে সম্রাট ও শাহজাদাগণের চারিত্রিক ব্যভিচার, শাহজাদাদের আত্মকলহ, সিংহাসন দখলের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ ফুটে ওঠার পাশাপাশি রাজপুরিতে বন্দি মানুষের প্রকৃত চিত্রও এখানে ধরা পড়েছে। গেজুর ভাষ্যে : "ঠোকাঠুকি লাগলে তোরই বা কি, আমারই বা কি? মনিব বদল হবে। তার বেশি ত কিছু না। চাষী গরুকে বললে, তোকে বেচে দেব। গরু বললে এখানে ঘাস-পানি সেখানেও ঘাস পানি। আমাদেরও সেই দশা।" (শওকত, ১৯৯১ : ৪৬) সংক্ষেপে বলা যায়, গল্পকার 'হন্তারক' গল্পে একই সঙ্গে ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্মীয় ও অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস এবং সাহিত্যের অমৃতরস পরিবেশনে সফল হয়েছেন।

আদিকাল থেকেই বাঙালি জাতি 'বিজাতি এবং বিভাষী' দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয়েছে। এ শাসন-শোষণ, নিপীড়ন-নির্যাতন বাঙালির জীবনে বয়ে এনেছে বহুমাত্রিক দুর্ভোগ এবং বাঙালি জাতি নিপতিত হয়েছে চরম দুরবস্থার মধ্যে। এর ফলে বাঙালি জাতি হারিয়েছে তার মৌলিকতা-উৎপাদনশীলতা-শাসনক্ষমতা এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। বারবার হন্তারকরূপে আবির্ভূত হয়েছে বিজাতি-বিভাষীরা এবং এ সবের মিথস্ক্রিয়ার শৈল্পিক রূপ লাভ করেছে ঐতিহাসিক 'হন্তারক' গল্পটি।

শওকত ওসমানের সঞ্চরণশীল লেখকসত্তায় সবসময় ইতিহাসচেতনা সক্রিয় ছিল। তিনি ইতিহাসকে উত্তমরূপে অধ্যয়ন করে গল্প-রচনা করেছেন। ফলে তাঁর গল্পে মোগল-ব্রিটিশ-পাকিস্তান আমল, স্বদেশী আন্দোলন, স্বদেশীদের আত্মত্যাগের গৌরবময় কাহিনি সরলরেখায় ফুটে উঠেছে। তবে, তাঁর গল্পে ইতিহাস নিছকই ইতিহাস নয়, তাঁর গল্পে ইতিহাস এবং দেশপ্রেম যেন হাতধরাধরি করে আছে। শওকত ওসমানের স্বচ্ছ ইতিহাসজ্ঞানও প্রাগ্রসর শিল্পচেতনার নির্ভুল স্বাক্ষরবাহী।

wZb : mgvR-mgm¨vgjK

মানুষ সামাজিক জীব, তাই সমাজের অঙ্গীভুত হয়েই প্রত্যেককে বাস করতে হয়। মানুষের প্রবহমাণ জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকে সুবিধা-অসুবিধা, ভালো লাগা-মন্দ লাগা, হাসি-কান্নার উপাখ্যান। জীবন-চলার পথে নিত্যনতুন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে অগ্রসর হতে হয় মানুষকে। এই সমস্যার উৎসমূলে কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামী, অশিক্ষা, অপসংস্কৃতি, ব্যক্তির নীতিহীন কর্মকাণ্ড, অর্থ লোলুপতা, প্রভাবশালীদের কূটকৌশল, ধনী কর্তৃক দরিদ্রের শোষণ ও অত্যাচার, শাসকের জনবিরোধী নীতি প্রভৃতি বিরাজমান। সমাজমনস্ক শওকত ওসমান উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে আরম্ভ করে সমাজের নিম্নবিত্ত এবং প্রান্তিক সমাজেও এসব বিষয়কে নিকট থেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সে-সমাজাভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে তাঁর ছোটগল্পে।

'ফয়সালা' (Ges ‖Zb ‖gR¨) গল্পে শওকত ওসমান সমাজ-সমস্যার বিভিন্ন দিককে চিহ্নিত করেছেন এক বিধবা নারীর জীবন-কাহিনি বর্ণনাসূত্রে। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিধবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মলিহা বেগম অমানবিক সমাজপতিদের ঈর্ষাপরায়ণতা এবং কূটকৌশলের কারণে কীভাবে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হয়ে বিবাহযোগ্য কন্যা আলেফাকে নিয়ে নিরাশ্রয় এবং নিঃসহায়তার মধ্যে পতিত হন তারই ভাষাচিত্র এ গল্প।

স্বামী আশেক আলীর মৃত্যু-পরবর্তীকালে মফস্বল শহরের নানারকম বিড়ম্বনা সহ্য করেও মাথা উঁচু করে বাঁচতে চেয়েছেন মলিহা বেগম। কিন্তু সমাজের মাথারূপে চিহ্নিত ব্যক্তিবর্গ তাকে সুযোগ দেয়ার পরিবর্তে তার জীবনটাকেই বিষিয়ে তোলেন। মলিহা বেগম স্বামীর মৃত্যুর পর যেদিন মহল্লার ধনী ব্যবসাদার আলি মিয়ার নিকার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন, সেদিন থেকে তার পরিবারের বিরুদ্ধাচরণ এবং পদে পদে দোষ সন্ধান করা আরম্ভ হয়। ফলস্বরূপ, মলিহা বেগমের কন্যা আলেফাকে অষ্টম শ্রেণির সেরা ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও পথে-ঘাটে বখাটেদের উৎপাতে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হতে হয়। আলেফা সাত বছর বয়সে বাপের মৃত্যুর পরই জীবনের অলিগলি, চড়াই-উৎরাই চিনতে শুরু করে। তাই 'সে যমের দুয়ারে যেতে রাজী আছে, কিন্তু স্কুলে নয়।' মলিহা বেগমের অস্তিত্ব সংগ্রামের দুর্দিনে একমাত্র নিঃস্বার্থ শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে দেখা দেয় আলেফার পিতার বন্ধু কলিম সাহেব। কলিম সাহেবের সাথে জড়িয়ে মলিহা বেগমের নামে অপবাদ রটাতেও মহল্লার মাতব্বররা পিছপা হন না। মলিহা বেগমের চূড়ান্ত সর্বনাশ করেন সমাজপতিরা আলেফার বিয়ের দিন। কলিম সাহেব সওদাগর অফিসের অফিসার আড়াইশ টাকা মাসিক উপার্জনকারী পঁচিশ–ছাব্বিশ বছরের সুদর্শন পুরুষ বিহারী আকিল কাজেমীর সাথে আলেফার বিয়ে ঠিক করেন। বিয়ের চূড়ান্ত লগ্নে আলী মিয়া, জহুর মৃধা, রব্বানী শেখ উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিয়ের শাড়ি, দেনমোহর এবং মসজিদ, প্রাইমারি স্কুল ও গোরস্থানের নামে টাকা আদায় করা নিয়ে উদ্দেশ্যমূলক বিবাদ সৃষ্টি করে বরপক্ষকে বিয়ে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে বাধ্য করেন :

> রব্বানী শেখ বহু পুরাতন মুসলিম লীগপন্থি। তিনি মনে করেন, দুনিয়ার সব মুসলমান এক জাতি। আজ চিৎকার করে উঠলেন, "হটাও ইয়ে বিহারী জানোয়ার লোগ কো। শাদী করেন আয়া বাঙলা মুলুক মে। হটাও শালে লোগ কো। (শওকত, ২০০৩ : ৫৩৫)

বিয়ে ভাঙার সাথে সাথে মা এবং মেয়ের কপালও ভেঙে যায়। আলেফা স্তব্ধ হয়ে যান এবং মলিহা বেগম মূর্ছিত অবস্থায় ঘরের মধ্যে পড়ে থাকেন। সুতরাং বলা যায়, শক্তিহীন মানুষের প্রতি শক্তিমান ধনিক শ্রেণির নীতিহীনতার চরমতম প্রকাশ ঘটেছে 'ফয়সালা' গল্পে। অন্যায় এবং অনৈতিক পথ ধরে মনুষ্যত্বহীন সমাজপতিরা মানবীয় মূল্যবোধকে পদদলিত করে নতুন সমস্যা সৃষ্টির মাধ্যমে কীভাবে একজন বিধবা নারীর বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে তা এ গল্পের কলেবরে উপস্থাপিত হয়েছে।

ঘুষ এবং দুর্নীতি আমাদের সমাজে কীভাবে ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে তা শওকত ওসমান 'শেষ আগে শুরু হয়' (Ges ШZb ШgRV) গল্পের স্বল্প অবয়বে তুলে ধরেছেন। এ-গল্পের একদিকে আছে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ঘুষ বা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা এবং অন্যদিকে আছে অনৈতিক অবমাননাকর পথও যে মানুষের শেষ রক্ষা করতে পারে না তারই চিত্র।

সাংসারিক দায়বদ্ধতা, পিতার আর্থিক টানাপড়েন এবং বেকার জীবনের অভিশাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আসাদ মাসিক দেড়শ টাকা বেতনে ইঞ্জিনিয়ার মিনহাজ সাহেবের গাড়ি চালক হিসেবে কর্মজীবন আরম্ভ করে। তবে, আসাদ কোনো পরীক্ষা বা স্বচ্ছ পথে ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ করেননি, বরং তার অদক্ষতাকে তিনি ঘুষের মাধ্যমে দক্ষ হওয়ার সনদ সংগ্রহ করেন। কিন্তু গাড়ি চালানোর বাস্তব পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য হয়ে নিজের এবং গাড়ির মালিকের মৃত্যু নিশ্চিত করেন। শুধু তাই নয়, তার এ মৃত্যু যে একটি পরিবারকেও মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত করে তা মৃত্যু-পরবর্তী আসাদের বাবার হাহাকারের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত :

> পোলা কইল, ড্রাইভারের কাম শিখছি। আমি কইলাম, ভালামত শিখছস? কইল, 'চইলা যাইব যা শিখছি। অহন সাড়ে তিনশ' ট্যাহা উপরি দেওয়া লাইগব!' তাই জমিন বন্দক দিলাম পোলার 'লাইসেনের' লাইগ্যা। ও মাবুদ...আমার জমিন গেল, আমার পোলারেও তুমি লইলা... ও আল্লা রে। (শওকত, ২০০৩ : ৫৩৫)

ঘুষ এবং দুর্নীতি যে জীবনসংহারী হয়ে উঠতে পারে তা আসাদের করুণ পরিণতির মাধ্যমে প্রতীকায়িত। ঘুষ বা দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত তাদের সবার পরিণতি যে এমন হতে পারে তা গল্পকার 'শেষ আগে শুরু হয়' গল্পের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন।

'গ্রহচ্যুত' (gШbe I ZvnVi KKi) গল্পে শওকত ওসমান সমাজে বিদ্যমান কয়েকটি সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন। এক : গ্রামের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, দুই : বিত্ত-বৈভবের প্রাচুর্যের কারণে গ্রাম ও

গ্রামের মানুষদের ভুলে যাওয়া, তিন : মাত্রাতিরিক্ত সম্পদশালী হওয়ার ফলে অবক্ষয়ের পথে ধাবিত হওয়া প্রভৃতি।

গল্পের শুরুতেই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মিরাজ সরকারের পরিচয় লেখক এভাবে তুলে ধরেন : "মিরাজ সরকার সেইসব প্রাবাদিক ভাগ্যবানদের মধ্যে পড়েন, যারা মাটি হাতে নিলে সোনা হয়ে যায়।" (শওকত, ২০০৩ : ৫৫৭) তিনি চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই বিশাল সফলতার মাধ্যমে অঢেল বিত্ত-বৈভবের মালিক হন। প্রায় ত্রিশ বছর পরে তিনি ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জনের এবং এক ঘেয়েমি-জাত ক্লান্তি দূর করার অভিপ্রায়ে পাঁচদিনের জন্য জন্মভূমি সাগরপুরে বেড়াতে আসেন। মিরাজ সাহেবের 'জন্মভূমি-বাল্যভূমি-কৈশোরভূমি'তে তাকে দেখতে স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের 'সাক্ষাৎপ্রার্থী ও দর্শনপ্রার্থী' মানুষের সমাগম ঘটে। দারিদ্র্যজর্জরিত জনপদের অনেকে তাদের সুখ-দুঃখের কথা সাজিয়ে মিরাজ সরকারের কাছে বর্ণনা করেন এবং এমনকি তাকে নিয়ে গর্ব করাও বাদ পড়ে না : "মিরাজ, তুমি আমাদের অহঙ্কার। তোমার মত গাঁয়ের সোনার পিদিম যদি এদিকে জ্বলত, তা হলে কী এত দুর্দশা হয় আমাদের।" (পৃ. ৫৫৮) আগত মানুষদের মধ্যে দুদিনের মাথায় হাজির হয় মিরাজের চাচাত বোন হেলেনা, যে স্বামী এবং সন্তানের মৃত্যুর পর শরিকদের চক্রান্তে নিজস্ব বিষয়-সম্পদ হারিয়ে উন্মাদিনী অবস্থায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। কৈশোরে এই হেলেনাকে কল্পনা করে মিরাজ সাহেব অনেকদিন নিজের মধ্যে 'ধ্যান এবং স্বপ্ন' রচনা করেন। কিন্তু বাস্তবের সরেজমিনে তিনি এখন যে দৃশ্য দেখলেন তাতে শুধু কষ্টই পেলেন না, বিস্মিতও হলেন বটে। হেলেনা তাকে আর চিনতে পারেন না, অবাক তাকিয়ে তিনি সবার সম্মুখে একটি অদ্ভুত আচরণ করেন যা তিনি কোনদিন করেন নি : "হঠাৎ পাগলি হেলেনা নাচের ঘোরে তার কাপড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিবস্ত্র দাঁড়িয়ে গেল সকলের সামনে।" (পৃ. ৫৬০) মূলত এ-গল্পে 'পাথরের মতো' স্তব্ধ থাকার মাধ্যমে লেখক সুকৌশলে শান্ত গ্রাম-বাংলার স্থবিরতাকে প্রতীকায়িত করেছেন। অন্যদিকে হেলেনা পাগলির 'বিবস্ত্র নাচ'-এর মাধ্যমে উচ্চবিত্ত মানুষদের যেন বিবস্ত্র করে নাচিয়েছেন, যারা আর্থিক সঙ্গতি অর্জনের পরে গ্রামকে ভুলে গিয়ে নাগরিক পরিবেশে আরাম-আয়েশে জীবন অতিবাহিত করেন।

কিন্তু দুদিনের ব্যবধানে নাগরিক পরিবেশে অভ্যস্ত মিরাজ সরকারের স্ত্রী হাজেরা বেগম, মেয়ে নাজনী, রাজনী এবং ছেলে রমিজ অনভ্যস্ততার কারণে সুজলা-শ্যামলা গ্রাম-বাংলার পরিবেশে হাঁপিয়ে উঠলে শহরের বাড়িতে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। 'ওরা শহরের মানুষ, গাঁ পছন্দ করবে কেন?' এভাবেই এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম গ্রাম ছেড়ে শাহরিক হয়ে উঠে গ্রামের প্রতি উন্নাসিক ভাবের প্রকাশ ঘটায়। তাদের এ গ্রামাচ্যুত হওয়াকেই লেখক 'গ্রহচ্যুত' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ-গল্পে রমিজের আচরণে যেমন সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র প্রতিফলিত তেমনি তার বক্তব্যে গ্রাম-সমাজকে উপেক্ষা-অবহেলা করার চিত্রও উপস্থাপিত। যেমন :

> মুরুব্বি ব্যবসা আর সামাজিক মর্যাদা নিয়ে মাথা ঘামান। পুত্রের সময় খামখা যায় না। তার ক্লাব আছে, বন্ধু বান্ধব আছে। পিতা ব্যবসার খাতিরে পার্টি দেন কখনও হোটেলে, কখনও বাড়ির লনে। সেখানে শরাব সরবরাহ করা হয়। পুত্র প্রথমে চোখে স্বাদ গ্রহণ করত। এখন তা জিহ্বায়। সুতরাং সময় বেকার যায় না। (শওকত, ২০০৩ : ৫৫৭)

গ্রাম থেকে ফিরে রমিজ যথারীতি তার বন্ধুদের সাথে ক্লাবে যোগদান করেন এবং বন্ধুদের জানতে চাওয়া "কি রকম দেখলে তোমার আব্বাজানের জন্মভূমি?" (পৃ. ৫৬১)— প্রশ্নের উত্তরে হুইস্কির ঝাঁঝ মিশ্রিত কণ্ঠে উত্তর করেন : "জন্মভূমি ত নয়, দেখে এলাম কর্মভূমি... ।" (পৃ. ৫৬১) আসলে প্রায় প্রতিটি মানুষের শিকড় গ্রামে থাকলেও শহরে এসে অনেকে ভুলে যান তার আসল ঠিকানা বা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করেন। আর এ সাথে ভুলে যায় গ্রাম এবং গ্রামের মানুষের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা।

'গ্রহচ্যুত' গল্পের 'সাগরপুর' গ্রামের সাথে লেখকের নিজ গ্রাম 'সবলসিংহপুর' গ্রামের সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। গল্পকারের গ্রামের পরিবেশ, মানুষের জীবনযাত্রার সাথে এ গল্পের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। গল্পকার শওকত ওসমানের মনোবীণায় গ্রামের চিত্র ধরা দিয়েছে বার বার কিন্তু পেশাগত কারণে বা যান্ত্রিকজীবনের ব্যস্ততার জন্য কিংবা পরবর্তীকালে ভিন্ন দেশের নাগরিক হওয়ার কারণে তাঁর পক্ষেও গ্রামের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। তারপরেও তিনি গল্পের মধ্য দিয়ে সেই মানুষদের গ্রামে ফিরে যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যারা কর্মব্যবস্তার অজুহাতে গ্রাম থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেন।

'শিবগঞ্জের মেলা' (Ck‡ii c‖ZØ›Øx) গল্পে শওকত ওসমান প্রধানত অন্ধ ধর্ম সংস্কার, জুয়া খেলা, পকেটমার, বারবনিতা সমস্যাকে চিত্রিত করেছেন। "গল্পে প্রমাণিত হয় অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পবিত্র কোন কিছুকে দাঁড় করালেও সেখানে সৎকার্য অনেক সময় সংঘটিত হয় না। ক্লেদ থেকে ক্লেদেরই যে বিস্তার ঘটে তা লেখক প্রমাণ করে দেখিয়েছেন গল্পটিতে।" (অনীক, ১৯৯৫ : ১৩৩) মেলায় চিত্ত-বিনোদনের পাশাপাশি পঙ্কিলময় পরিবেশ সমাজ সমস্যাকে যে আরও প্রকট করে তোলে তা গল্পের বিশাল ক্যানভাসে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন।

শিক্ষার আলো যে অঞ্চলে পৌঁছায়নি কিংবা সীমাবদ্ধ, সামাজিক সমস্যা যেখানে প্রবল, সেখানে ধর্ম হয়ে ওঠে স্বার্থ পূরণের হাতিয়ার। গ্রামের জোতদার জাবেদ পাটোয়ারী পাকা ইমারত বা স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য সাধু ফকীরের মিথ্যা স্বপ্নাদেশের কথা প্রচার করেন। এই মিথ্যাচারের মাধ্যমে যেমন সাধু ফকীরের মাজার প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি জাবেদ পাটোয়ারীর পাকা ইমারত নির্মাণের উদ্দেশ্যের সফল বাস্তবায়নও লক্ষণীয়। সাধু ফকীরের মাজারকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর চৈত্র মাসের শেষ তিন দিন শিবগঞ্জে শত বিঘা জমি জুড়ে প্রায় লক্ষাধিক বিচিত্র ধর্ম-বর্ণের মানুষের সমাগমে, নানা চিত্ত-বিনোদনী দ্রব্য-সামগ্রীর সমবায়ে মেলা বসে। কিন্তু যার জন্যে মেলার আয়োজন, তার বিষয়টি

Dhaka University Institutional Repository

মেলায় থাকে উপেক্ষিত। এর মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়, ধর্মকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে জাবেদ পাটোয়ারীর উদ্দেশ্য পূরণে এবং সমাজের কিছু মানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে। লেখক জানাচ্ছেন :

> আসলে সাধু ফকীর জাবেদ পাটোয়ারীর আবিষ্কার। ফকীরের পাকা কবর আর মাজার না হলে তা তার পাকা ইমারত হতে পারে না। স্বপ্নে-দেখা তার জন্যে ছিল বাধ্যতামূলক। ফকীরের নামও স্বপ্নেই নিশ্চয় পাওয়া। (শওকত, ২০০৩ : ৬৫১)

শিবগঞ্জের মেলাকে উপলক্ষ্য করে সাধু-সন্ন্যাসীরা যেমন আসেন, তেমনি আসেন বিভিন্ন শ্রেণির উন্মাদ, পকেটমার, প্রতারকচক্র, গঞ্জিকা সেবক, দেহপসারিণী, ভিক্ষুক, ভালুক-বাদর-পুতুল-ভাঁড় নাচ, সাপ ও যাদুখেলা, নাগরদোলা, সার্কাস, মনিহারি, মিষ্টির দোকান, কাপড় বিক্রেতা, বাঁশিওয়ালা, জুয়ার আসর প্রভৃতি। আর এগুলো তত্ত্বাবধানের জন্য স্থানীয় মেলা কমিটির পাশাপাশি দারোগা-পুলিশও ছাউনি নির্মাণ করেন। মেলার সবচেয়ে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে জুয়ার আসর। মেলায় চিত্ত-বিনোদনের পাশাপাশি জুয়ার আসর যে অনেককে কপর্দকশূন্য করে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয় তা এ-গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন :

> মাজার থেকে তিনশ গজ পশ্চিমে।... তার চোখে পড়ে প্রথম গাছের ডাল থেকে গলায়-রশি ঝুলছে এক কিশোর। চৌদ্দ পনর বয়স। গায়ে শার্ট আছে, পরনে লুঙ্গি। পা খালি।... বেশিক্ষণ হয় নি রাত্রি দুটো তিনটের দিকেই ছেলেটা অন্ধকারে এই আত্মহনন সম্পন্ন করে।... মার কাছ থেকে টাকা এনেছিল ঘরের কিছু বাসন-কোষণ কিনতে। আর ভাই বোনদের বায়না ত ছিলই। সর্বশান্ত করে তাকে জুয়ার আসর।...বিবেকের তাড়না পরে শুরু হয়। তারই পরিণাম এই আঘাত অকাল মৃত্যু। (শওকত, ২০০৩ : ৬৫০)

এছাড়াও মেলা যে ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের নৈতিক অধঃপতনের কারণ হয়ে ওঠে এবং সমাজের শান্তি বিনষ্ট করে তা শিবগঞ্জের মেলার প্রেক্ষাপটে প্রমাণিত। তবে, প্রতারকচক্রও যে দেহপসারিণীদের ভালোবাসার ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখিয়ে তাদেরকে কপর্দকশূন্য করে তোলেন তা গল্পে প্রকাশিত :

> এক খরিদ্দার তাকে শাদী করার লোভ দেখিয়ে কাল তার ঘরে রাত কাটিয়েছিল। পানও এনেছিল সঙ্গে। বোধ হয় সেই পান-খাওয়ার পরিণাম। সকালে তার ঘুম ভাঙতে দেরী হয়। উঠে দেখে, তার টাকা-পয়সা যা ছিল সব নিয়ে দাগাবাজ উধাও। (শওকত, ২০০৩ : ৬৫০)

'শিবগঞ্জের মেলা' গল্পে শওকত ওসমান মেলার বিচিত্র বিষয় ফুটিয়ে তুললেও বিশ্বস্ততার গাঢ় রেখায় সমাজ-সমস্যাকেই প্রধান করে তুলেছেন। উল্লিখিত সমস্যাসমূহ গ্রাম্য সমাজকাঠামোর সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত দিক বিচারে গ্রামের মানুষের অশান্তির উৎসভূমি হিসেবে সক্রিয় তা গল্পে স্পষ্ট। মেলার আনন্দঘন পরিবেশের মাঝেই যে দুঃখের অন্তর্দহন, অবিশ্বাসের কালোছায়া, নিঃস্ব-রিক্ত হওয়ার পথ উন্মুক্ত থাকে তা বিভিন্ন সমস্যাকে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

সমাজ-সমস্যামূলক গল্পেও শওকত ওসমানের সমাজসচেতনতার পরিচয় স্পষ্ট। তাঁর এ-জাতীয় গল্পে সমাজসমস্যা তীব্র না হলেও সমস্যার মূলসমূহকে তিনি চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছেন। ফলে যৌতুকপ্রথা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, বিত্তবান কর্তৃক বিত্তহীনদের প্রতি নির্যাতন, ঘুষ-দুর্নীতি, মানুষের নৈতিক অধঃপতনের চিত্রগুলো উজ্জ্বলরেখায় এ-পর্বে অঙ্কিত।

Pvi : bi-bvixi m¤úK welqK

শওকত ওসমান তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বিচিত্র মানুষের সান্নিধ্য লাভ করেন। সুতরাং মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর ব্যাপক এবং গভীর। তাই তিনি সহজেই নর-নারীর সম্পর্কের বহুবর্ণিল চিত্র বহুমাত্রিকভাবে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে, শওকত ওসমানের এ-জাতীয় গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর বিভিন্ন কালপর্বের গল্পে মধ্যে কোনো বিভাজনরেখা দৃষ্টিগোচর হয় না। গল্পকার তিন কালপর্বের গল্পে একই সরলরেখায় নর-নারীর সম্পর্কের চিত্র উপস্থাপন করেছেন।

কাহিনিপ্রধান 'দম্পতি' (Ges ¯Zb ¯gR¨) গল্পে শওকত ওসমান নর-নারীর দাম্পত্য সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন। সময়-পরিবেশ-পেশাগত দায়িত্বজ্ঞান এবং ক্ষেত্র বিশেষে পারিপার্শ্বিক দায়িত্ববোধ যে সাংসারিক সমস্যার উৎসকেন্দ্রে অবস্থান করে তা এ-গল্পে বিবৃত।

'দম্পতি' গল্পটিতে ডাক্তার মোহসেন এবং তার স্ত্রী সাদেকার মানসিক এবং সাংসারিক টানাপড়েনের চিত্র প্রকাশিত। সাংসারিক জীবনে সাদেকার রুচিবোধ প্রশংসাযোগ্য। তিনি যেমন নিজেকে পরিপাটী রাখতে পছন্দ করেন, তেমনি ঘরটাকেও বাসর ঘরের ন্যায় সাজিয়ে রাখেন। তার এ সৌন্দর্যবোধ কখনও স্বাভাবিক মাত্রা অতিক্রম করে না। স্বামীসান্নিধ্য তার একান্ত আকাঙ্ক্ষিত এবং এ-আকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যর্থতা থেকেই তার মধ্যে সৃষ্টি হয় মানসিক টানাপড়েন ও সাংসারিক বৈরাগ্য। অন্যদিকে 'ডাক্তার ত রোগী ভুলতে পারে না।'– মন্ত্রে বিশ্বাসী মোহসেন পেশাগত এবং মানবিক কারণে স্ত্রী অপেক্ষা রোগীদের সান্নিধ্যে সময় অতিবাহিত করেন বেশি। তবে তার অর্থ এই নয় যে, তিনি স্ত্রীর প্রতি উদাসীন। ডাক্তারের কর্তব্যপরায়ণতা মোহসেনকে স্ত্রী থেকে সাময়িকভাবে দূরে সরিয়ে রাখে, এজন্য তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো শুধু অযৌক্তিকই নয়, অন্যায়ও বটে। স্বামী হিসেবে গার্হস্থ্যধর্ম পালনে তার কোনো ঘাটতি চোখে পড়ে না। তারপরেও স্ত্রীকে যথেষ্ট পরিমাণ সময় না দেওয়া, নিশিকালে একান্ত আবেগীয় মুহূর্তে স্ত্রীকে বিছানায় রেখে রোগী দেখতে বেরিয়ে পড়া, সিনেমা দেখতে না যাওয়া এবং স্ত্রীর সঙ্গে তার বান্ধবীর বাড়িতে ঘুরতে না যাওয়ার অভিযোগের তীরে বিদ্ধ হন ডাক্তার মোহসেন :

> তুমি আর সেই মানুষ নেই। তোমার রবীন্দ্র-সঙ্গীত, তোমার কাব্য, সামাজিকতা সব কোথায় গেল? এই ভাবে তোমার মন মরে যাচ্ছে। আর আমি অবান্তর হয়ে পড়ছি। একটা ছেলে থাকলে সময় কাটত। তারও উপায় নেই। কতদিন একসঙ্গে সিনেমা দেখি নি বলো ত? তুমি বলবে সময় হয় না। তা ঠিক। কিন্তু

> আমাদের বাঁচতে হবে ত। আর দুনিয়ার সব কিছু ভাল জিনিস থেকে ক্রমে সরে গেলে তুমি আর মানুষ থাকবে? (শওকত, ২০০৩ : ৫৪২)

মোহসেন মাঝে মাঝে সাদেকার অভিযোগের তীরে ক্লান্ত হয়ে পড়েন । তবে, তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না। কারণ তিনি বোঝেন তার স্ত্রী তার জায়গায় ঠিক আছেন, যেমন তিনি তার নিজের জায়গায়। তাদের সংসারে একঘেঁয়েমি আছে কিন্তু তা কখনও বিরক্তিহীনতায় বিষিয়ে ওঠেনি, আর এ-সবের সমবায়িত রূপের ফসল 'দম্পতি' গল্পটি।

'ন্যায়-অন্যায়' (Ges ‖Zb ‖gŔ) গল্পেও বৈবাহিক জীবনের সঙ্কটকে চিত্রিত করা হয়েছে। অসম বিবাহে বংশ রক্ষা হলেও মন-মান-জীবন কোনোটিই যে রক্ষা হয় না তা ঘটনাপ্রধান এ গল্পে উঠে এসেছে।
অসম বিবাহ শারীরিক এবং মানসিক টানাপড়েন সৃষ্টি করে সংসারের শান্তিকে দেয় বিষিয়ে, এর পরিণতিতে 'সুখ' নামের পাখিটি অধরাই থেকে যায়। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে প্রৌঢ়-বিপত্নীক-নিঃসন্তান মকসুদ আলি তার নাতির বয়সী চৌদ্দ-পনের বছরের এক কিশোরীকে বিয়ে করেন। সমাজের অনেকে বর-কনের বয়সের কথা বিবেচনা করে এ-বিয়েতে অমত জ্ঞাপন করেন এমনকি অনেকে প্রতিবাদও করেন। কিন্তু কনে পক্ষের বিশেষ করে তার ভাইদের আর্থিক লোভের কাছে যে একটি কিশোরীর স্বপ্ন-সাধ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় তা কনের ভগ্নিপতী বর্ষীয়ান রুহুল আমিন সাহেবের বক্তব্যে প্রতিধ্বনিত : "মৌলভী সাহেব, যান তাড়াতাড়ি, যান। কোরবানী হয়ে গেছে। এখন গোস্ত বাটোয়ারার সময়। যান ওদের ভাগ নেওয়ার দৃশ্য দেখেন গিয়ে।" (শওকত, ২০০৩ : ৫৫১) বিয়ের তিন বছর পরে মকসুদ আলির ঘরে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয় কিন্তু ততদিনে মকসুদ আলি দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পরপারে পাড়ি দেওয়ার জন্য হাসপাতালে মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করেন। মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে মকসুদ আলি শামসুল হুদার কাছে অসম বিবাহের জন্য ভুল স্বীকার করে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। এই শামসুল হুদা সেই ব্যক্তি যে অনেক চেষ্টা করেও প্রৌঢ় মকসুদ আলির অসম বিবাহকে রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

'ন্যায়-অন্যায়' গল্পে শওকত ওসমান "বিলম্ব বিবাহের কুফল এবং আত্মসুখকামী পারিবারিক জীবন রচনার অন্যায় চিত্র এখানে স্পষ্টতর করেছেন।" (অনীক, ১৯৯৫ : ১২১) নর-নারীর পরিণত বয়সের বিবাহ যেমন সংসারে সুখের বন্যা বইয়ে দিতে পারে, তেমনি অসম বিবাহ যে মৃত্যুকেও ডেকে আনতে পারে তা এ-গল্পে মকসুদ আলির পরিণতির মধ্য দিয়ে গল্পকার প্রতীকায়িত করেছেন।

'নিদয়-নিদয়া' (Ck‡i i c‖ZØ›Ø) গল্পে লেখক নর-নারীর সম্পর্ককে রোম্যান্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন। 'ক্ষিপ্র বুদ্ধির অধিকারী, ব্যবসায়ী, চলনে-বলনে স্মার্ট এবং সুশোভন' চরিত্রের হোসেন কামালের মুগ্ধতার কেন্দ্রে অবস্থান করেন আজেলিয়া। আজেলিয়ার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী রোজেনা, তিনি নিজের অবদমিত আকাঙ্ক্ষাকে চেপে রেখে আজেলিয়া এবং কামালের সম্পর্কস্থাপনে

Dhaka University Institutional Repository

দূতিয়ালির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। আজেলিয়া কামালের আহবানকে উপেক্ষা করে অন্যজনকে বিয়ে করেন এবং এর অল্পদিনের ব্যবধানে রোজেনারও বিয়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে দুবান্ধবী আজেলিয়া এবং রোজেনার জীবনে প্রায় সমসময়েই বৈধব্যপ্রাপ্তি ঘটে। বৈধব্য লাভের পরেও কামাল পুনরায় আজেলিয়ার দুই সন্তানের দায়িত্বগ্রহণসহ তাকে ভালোবাসার বাহুডোরে বাঁধতে চান, কিন্তু আজেলিয়া তখনও নির্বিকার। নার্স থেকে মেট্রন প্রমোশন পদবিধারী রোজেনা হঠাৎ একদিন জানতে পারেন কামাল পৃথিবীর এবং আজেলিয়ার মায়া ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। তবে, পাড়ি জমানোর পূর্বে তিনি আজেলিয়ার দু-সন্তানের জন্য চার লাখ এবং রোজেনার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকার বীমা করে গেছেন। কামালের জীবনবিয়োগের সংবাদে রোজেনার আবেগের বন্ধ দুয়ার খুলে যায়। লেখক জানাচ্ছেন :

> রোজেনা হঠাৎ ভেঙে পড়ে। চেয়ারে বসেছিল সে, সামনে বড় টেবিল মাথা গুজে কান্না জুড়ে দেয়। মুহূর্তে মুহূর্তে স্ফীতকম্পিত কলেবরে পরিস্ফুট তার যন্ত্রণা। রোজেনার জড়িত কণ্ঠস্বর থেকে বার বার ধ্বনিত হয়- 'না-না।' ... রোজেনার কান্নার বেগ থামে না। মাঝে মাঝে ডুকরে উঠে উচ্চারণ করে, 'আমি ত তার টাকা চাইনি-টাকা চাইনি।' (শওকত, ২০০৩ : ৬৭৬)

মূলত রোজেনার অবচেতন মনে কামালের জন্য যে ভালোবাসা সঞ্চিত ছিল তা এতদিনে কামালের অনুপস্থিতিতে প্রকাশ পায়। আজেলিয়া কামালের প্রতি নির্বিকার হলেও কামালের আরাধ্য ছিল আজেলিয়া, আবার রোজেনার আরাধ্য ছিল কামাল। কামালের প্রতি আজেলিয়া উদাসীন থাকলেও রোজেনা ভালোবাসার দয়াধর্মেই কামালকে কেন্দ্র করে কল্পনায় স্বপ্নের বাসর গড়ে। কিন্তু তা বাস্তবে রূপ নেওয়ার পূর্বেই কামালের চিরপ্রস্থান রোজেনাকে আশাহত এবং ব্যথাতুর করে তোলে. যা উপরের উদ্ধৃতিতে প্রতিবিম্বিত। তাই একথা বলা সঙ্গত যে, অনেকটা ত্রিভুজ প্রেমের একটি প্রতিচ্ছবি এ গল্পে ফুটে উঠেছে।

'স্বৈরিণী' (Ck‡i i c\ZØ›Ø\) গল্পে লেখক ছাপ্পান্নোর্ধ্ব এক নারীর অন্তর্যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথম যৌবনে প্রেমে প্রতারিত এবং পরবর্তীকালে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও পুনরায় বৈধব্যপ্রাপ্তি একজন নারীর জীবনকে কীভাবে বিষিয়ে তুলেছিল তা গল্পপাঠে অনুভূত হয়। সমাজের মধ্যে বাস করেও সমাজ অস্বীকৃত পরিবেশে একজন নারীর মর্মবেদনার শৈল্পিক রূপ এ গল্পে প্রতিভাসিত হয়েছে।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মায়মুনা প্রতিবেশী হাশেমকে ভালোবেসে সুখের নীড় বাঁধতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে নীড় বাঁধার স্বপ্নে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় পাত্রপক্ষের অভিভাবকবৃন্দ। প্রথাগত সুবোধ ছেলের মতো হাশেমও বাবা-মার কথামতো মায়মুনাকে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন। অগত্যা মায়মুনা অন্য কোথাও ঘর বাঁধেন এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে তার জীবনে বৈধব্যবাস নেমে আসে। এখান থেকেই আরম্ভ হয় মায়মুনার অন্ধকার জীবনের পথচলা, তিনি হাশেমের প্রতি প্রতিশোধের মানসিকতা থেকে নিজেরই বড় সর্বনাশ করেন। তিনি বহুগামী হয়ে গ্রামছাড়া এবং পরবর্তীকালে বারবনিতা পল্লিতে

আশ্রয় খুঁজে পান। এ-পল্লিতেই মায়মুনা নিশীথের অতিথি ‘হৃষ্টপুষ্ট-দীর্ঘকায়-সদালাপী-ব্যবসায়ী’ কুবাদ চৌধুরীর স্ত্রীর মর্যাদায় পৃথক বাসায় অবস্থান করেন। কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদায় কুবাদ চৌধুরী মায়মুনাকে স্বীকৃতি দান করলেও প্রথাগত সভ্যসমাজের আলোয় তাকে সামাজিক মর্যাদা দানে কার্পণ্য করেন। এমনকি মৃত্যুশয্যায় শায়িত পাঁচ সন্তান পরিবেষ্টিত কুবাদ চৌধুরীর বাড়িতে গিয়েও মায়মুনা অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হন। লেখক জানাচ্ছেন :

> আগন্তুক মায়মুনা বিবি পৌঁছেই রোগীর পায়ের কাছে মাথা রেখে বলেছিলেন, “তোমার সঙ্গে হলফ করেছিলাম এই বাড়ীতে কোনদিন আসব না। আজ কারার ভেঙেছি আমাকে মাফ করো।” (শওকত, ২০০৩ : ৬৮৫)

মায়মুনা “বারোয়ারি পল্লী থেকে হাত ফেরতের কবল থেকে রেহাই পেলেও সামাজিক মর্যাদা পায়নি। এমনকি মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর বাড়িতেও জোটেনি সামান্য স্বীকৃতি বা সম্মান। অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও দারিদ্র্য একজন অসহায় নারীকে কীভাবে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধতে পারে মায়মুনা তারই এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।” (অনীক, ১৯৯৫ : ১৩৩) মায়মুনার যন্ত্রণাদগ্ধ অন্ধকার জীবনে আলোর হাতছানি থাকলেও সে আলো তার জীবনে কোনো নতুন ভোরের ফল্গুধারা বয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছে, ফলে প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যেই তার অবস্থান থেকে গেছে।

শওকত ওসমান নর-নারীর সম্পর্ক-বিষয়ক গল্পে তাদের অবদমিত এবং অনাস্বাদিত মনের চিত্রই গাঢ় রেখায় উপস্থাপন করেছেন। তাছাড়া নর-নারীর দাম্পত্য কলহ-টানাপড়েন, পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অন্তর্যন্ত্রণা, নর-নারীর অবস্থানকে রোম্যান্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতীকায়িত করেছেন লেখক।

cvP : gb¯ÍËgjK ev gvbe cKwZ-welqK

শওকত ওসমানের বাংলাদেশ কালপর্বের গল্পেও নর-নারীর হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ করা যায়। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে জীবনের সঙ্গে অনিবার্য সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত করে লেখক কখনও নিজস্ব অনুভবময়তায় ব্যাখ্যা করেছেন আবার কখনও ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আলোকে তুলে ধরেছেন।

শওকত ওসমানের মনস্তত্ত্বমূলক গল্পের মধ্যে ‘মনিব ও তাহার কুকুর’ (gwbe I Zvnvi KKi) গল্পটি অন্যতম। এ-গল্পে লেখক বিপথগামী মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ইতরপ্রাণির সমান্তরালে বিন্যস্ত করে গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়কে আলোকিত করেছেন। গল্পে কাস্টমস বিভাগের ‘রাশভারি অফিসার’ রাজপুরুষ ঘুষগ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে কীভাবে পশুর স্তরে নামিয়ে এনেছেন তারই চমৎকার বর্ণনা স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উৎকোচ বা ঘুষ প্রধানত আর্থিক বা সম্পদের লেনদেন। কিন্তু তা শুধু অর্থনীতির ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এর পরিণাম সুদূরপ্রসারী যা চৈতন্যের দিগন্তকে ক্রমশ সংকুচিত করার মাধ্যমে মানুষের অধঃপতনকে ত্বরান্বিত করে। লোভ পরিত্যাগ করে নির্লোভ হওয়ার সাধনা মূলত মনুষ্যত্বের আত্মিক সাধনারই আরেক নাম। কিন্তু এ-সাধনায় যিনি পরাজিত হন, তার অবস্থান নেমে যায় পশুর স্তরে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শুল্কবিভাগের অফিসার রাজপুরুষের বন্ধু 'উজানি ট্রেডার্স' ফার্মের শুল্ক ফাঁকির মামলায় পনের হাজার টাকা উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে উদ্ধার পেতে তৎপর। রাজপুরুষের কাছে উৎকোচ গ্রহণের এ-প্রস্তাব তার স্বভাববিরুদ্ধ, তাই প্রথম দিকে দ্বিধান্বিত অবস্থায় তিনি তার বন্ধুকে নিরাশ করেন। তবে রাজপুরুষ বাসায় ফিরে আয়নার সামনে নগ্ন অবস্থায় বিদেশি কুকুরের সামনে প্রসাধনরত নিজ যুবতী স্ত্রীর অস্বাভাবিক আচরণ প্রত্যক্ষ করার পর তার মনোজগতেও পরিবর্তন আসে। স্বামীর অভিমান এবং কৌতূহল নিরসনে স্ত্রীর যুক্তি : "কুকুরের সামনে উলঙ্গ হওয়া দোষের কিছু না। মানুষের সামনে হলে ঘোর অপরাধ।" (শওকত, ২০০৩ : ৫৭৫) স্ত্রীর এ-জাতীয় কথায় রাজপুরুষ ঘুষ খাওয়ার উৎসাহ খুঁজে পান। পরের দিন স্ত্রীর আপ্তবাক্য, পার্থিব সুখের হাতছানি প্রভৃতির প্রভাবে বন্ধু প্রদত্ত ঘুষ গ্রহণে রাজপুরুষের মনুষ্যত্বের চরম পরাজয় ঘটে। বাসায় ফিরে রাজপুরুষ স্ত্রীর কাছে উৎকোচ গ্রহণের 'আশাজাগানিয়া' বাক্যটি শুনিয়ে নিজেকে আশ্বস্ত করতে চাইলেও এ-দিন স্ত্রী তাকে শোনায় ভিন্ন কথা :

> কুকুরের সামনে কুকুর নিশ্চিন্তে ন্যাংটো থাকে।...পশুর নিকট উলঙ্গ থাকতে কোনো লজ্জা থাকার কথা নয়। এক পশু বেমালুম ন্যাংটো থাকে অন্য পশু-সমীপে। (শওকত, ২০০৩ : ৫৭৬)

এ-গল্পে নৈতিক ও মানবিকতাবোধসম্পন্ন রাজপুরুষ এক চরিত্র এবং উৎকোচ গ্রহণকারী রাজপুরুষ আরেক চরিত্র। মূলত মনুষ্যত্বের বিসর্জন যে মানুষকে চরম অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যায় তা লেখক একই চরিত্রকে অবলম্বন করে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন। "মনিব ও তাহার কুকুর' গল্পে 'ঘুষদাতা এবং ঘুষগ্রহণকারীকে নরপশু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।" (অনীক, ১৯৯৫ : ১৩০) এ গল্পে মনিবের লালসা চরমভাবে সমর্পিত কুকুরের প্রতিরূপকে। নীতিবিবর্জিত এবং বিকৃত রুচি এবং মানসিকতা মানুষকেও যে পশুর অধম করে তোলে তা লেখক প্রতীকী ব্যঞ্জনার মাধ্যমে গল্পে পরিস্ফুটিত করেছেন।

শওকত ওসমান সুযোগসন্ধানী-স্বার্থান্বেষী মানুষের মুখোশ উন্মোচন করেছেন 'গোয়েন্দা কাহিনীর খসড়া' (gwbe I Zvnvi KKi) গল্পে। অবৈধ-অনৈতিক পথে অর্থবিত্ত অর্জনের মানসিকতা এবং নারীলোলুপ দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে কীভাবে অধঃপতনের দিকে ধাবিত করে তা গল্পের প্রধান চরিত্র আলী খানের জীবনেতিহাস বর্ণনাসূত্রে উপস্থাপিত হয়েছে।

মফস্বল শহরের ধনাঢ্য ব্যক্তি জন আলী খান প্রায় এক ডজন জনহিতকর ও সংস্কৃতি-সেবী প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক, প্রেসিডেন্ট। আলী খান কোনো এক রাতে হঠাৎ মারা গেলে চারদিকে শোকের মাতম বয়ে যায়, একাধিক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়; শোকবাণী ঘোষিত হয় এবং পত্র-পত্রিকায় তাকে নিয়ে বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রথমে জন আলীর মৃত্যুকে সবাই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করলেও বাড়ির পুরাতন এক চাকরানির হঠাৎ পলায়নের ঘটনায় সন্দেহ ঘনীভূত হয়। পুলিশের ডিটেকটিভ বিভাগ যখন মৃত্যু সম্পর্কে কোনো 'ক্লু' বের করতে ব্যর্থ, তখনই তাদের হস্তগত হয় পুরাতন ওই চাকরানির প্রেরিত একটি পত্র। পত্রের মাধ্যমে শুধু আলী খানের মৃত্যু-রহস্যই উদঘাটিত হয় না, একই সাথে উঠে আসে তার জীবনের কদর্য এক ইতিহাস। এই চিঠির মাধ্যমে উদঘাটিত হয় আলী খানের অকৃতজ্ঞ, স্বার্থান্বেষী, নারীলোলুপ ও হত্যাকারীর আরেক ক্লেদাক্ত চেহারা। পত্রের ভাষা থেকে জানা যায়, এই পুরাতন চাকরানিই এক সময় আলী খানের আশ্রয়দাত্রী ছিলেন। যৌবনে আলী খান তার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করতেন এবং আশ্রয়দাত্রীর কেরানি স্বামীর মৃত্যুর পরও আলী খান টানাপড়েনের সংসারে আদরেই ছিলেন। কিন্তু এক রাতে আলী খান আশ্রয়দাত্রীর ষোল বছরের যুবতী মেয়ে এবং গহনার বাক্স ভেঙে সব অলঙ্কার ও টাকা-পয়সা নিয়ে পালিয়ে যান। পরবর্তীকালে আলী খান নিজের লোক দিয়ে যুবতী মেয়েটিকে হত্যা এবং একাধিক বিয়ে করেন। একসময়কার আশ্রয়দাত্রী নিজ পরিচয় গোপন করে বিশ্বাসঘাতক আলী খানের বাড়িতে চাকরানির কাজ নেন নিজ মেয়ের সন্ধান লাভের জন্য। কিন্তু ততদিনে মেয়েটি মাটির সাথে মিশে গেছে। চাকরানি হিসেবে আশ্রয়দাত্রী আরও কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেন আলী খানের ভণ্ডামি, লেবাসধারী সমাজকর্মী ও মিথ্যা-মেকির আবরণে ঢাকা দানবীর চেহারা। পত্রের ভাষ্য থেকে আলী খানের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

> মুখোশ পরতে শিখেছিল আলী খান সেই বয়সে। এই মুখোশই তাকে সমাজের কেউ-কেটা বানিয়ে দিয়েছে। ওর দান, ধ্যান, জনহিতকর কাজ সবই মুখোশ। সব রাজনৈতিক পার্টিতে চাঁদা দিত আলী খান, কিন্তু নিজে রাজনীতি করত না। ফায়দা ওঠাত সব জায়গা থেকে। মুখোশের রাজা বলা যায় ওকে, এক কথায়। (শওকত, ২০০৩ : ৫৮০)

মূলত আলী খানের বাহ্যিক আবরণ তার ভিতরের বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে নি, বরং তিনি মুখোশের আড়ালে তার অতীত কুকর্মকেই ঢেকে রাখতে চেয়েছেন। অন্যদিকে একসময়কার আশ্রয়দাত্রী, বর্তমানে অবস্থার বিপাকে পড়ে চাকরানিও বিশ্বাসঘাতক ও মেয়ের হত্যাকারীকে হত্যার জন্য সংকল্পবদ্ধ হন প্রতিহিংসার আগুন নেভাতে। অবশেষে চাকরানি আলী খানকে হত্যার মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য সফল করেন এবং পুলিশের হাতে ধরা দেওয়ার পূর্বে আলী খানের 'পুরো গ্যাং' ধরিয়ে দিতে সমর্থ হন।

অর্থ-বিত্তের হাতছানি মানুষের চারিত্রিক স্খলনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, যা 'গোয়েন্দা কাহিনীর খসড়া' গল্পের আলী খানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। কিন্তু চারিত্রিক স্খলন যে

ব্যক্তির পতনকে ত্বরান্বিত করে আলী খানের পরিণতিই সে ইঙ্গিত প্রদান করে। অন্যদিকে স্বজন হারানোর বেদনা, বিশ্বাসঘাতকতার যন্ত্রণা মানুষের অন্তর্জগৎকে বিষিয়ে দিয়ে যে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে তা আশ্রয়দাত্রী-চাকরানি চরিত্রে প্রকাশিত।

উপকথা-কল্পকথা-পৌরাণিক উপাদানের সাথে মানুষের অতিপ্রাকৃতিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস দুই-ই জড়িত যা গল্পকার 'কবন্ধ কাহিনী' (ci/Zb LÄi) গল্পে প্রতীকায়িত করেছেন। আধুনিকতার ছোঁয়ায় বা বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে এগুলোর প্রতি বিশ্বাস হ্রাস পেলেও বয়স্ক মানুষের কাছে বা গ্রামাঞ্চলে আজও সমভাবে বিশ্বাসযোগ্য। পাড়াগাঁয়ে নানা রকমের উপকথা, লোককাহিনি প্রভৃতি আবহমানকাল থেকে প্রচলিত আছে। লেখক জানাচ্ছেন : "পণ্ডিতদের ধারণা, আদিম মানুষ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি এভাবে এঁকে যেত।" (শওকত, ২০০৩ : ৫৯৪) এ-জাতীয় উপকথার মধ্যে 'কবন্ধ কাহিনী' উল্লেখযোগ্য। অভিধানে 'কবন্ধ' শব্দের অর্থ স্কন্ধকাটা-মস্তকহীন দেহধারী ভূত, 'রামায়ণ' এর অরণ্য পর্বে এর অর্থ মাথাকাটা সন্ন্যাসী এবং গ্রামাঞ্চলে এর অর্থ কন্দকাটা।

শওকত ওসমান এ-গল্পে লোককথা, রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক উপাদানের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কবন্ধের পরিচয় প্রদান করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, বিভিন্ন যুগে কবন্ধের আকার ও উপস্থিতি নতুন নতুন তথ্যে পল্লবিত। প্রাচীন যুগে কবন্ধ মানুষরূপে নয় মস্তকহীন দৈত্যরূপে কল্পিত, কৃত্তিবাস ওঝার 'রামায়ণে' কবন্ধ দৈত্য ঠিকই তবে মস্তকহীন নয়, আবার পুরাণে কুবের পতনের ফলে কবন্ধ হয়েছে, গ্রামাঞ্চলের মানুষের ধারণা মৃত্যুর পর খারাপ আত্মা ভূত-প্রেতিনী রূপ ধারণ করে এবং এরাই কবন্ধ। গ্রাম্য সাধারণের বিশ্বাস কবন্ধ খোলা মাঠ এবং রাস্তায় চলাফেরা করে। কবন্ধদের কর্ম সম্পর্কে গল্পকার জানিয়েছেন :

> নির্জন মাঠে রাত্রির অন্ধকারে সে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তার হাঁটার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। কবন্ধ খামখা হাঁটে না। হাঁটার সময় সে লম্বা দুই হাত আলিঙ্গনের কায়দায় বার বার খোলে আর বন্ধ করে। সেই আলিঙ্গনের জালে পড়লে আর রক্ষা নেই। টিপে পিষে ফেলবে যা কিছু আসুক এই জালে। অর্থাৎ একদম মরণ-আলিঙ্গন। (শওকত, ২০০৩ : ৫৯৫-৫৯৬)

শুধু কবন্ধের কাহিনি নয়, কবন্ধকে জব্দ করার জনশ্রুতিও গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে। এক চাষির জবানি থেকে জানা যায়, অনেক মানুষের সমবায়িত প্রচেষ্টার ফলে কবন্ধ তার স্বাভাবিক কাজ করতে ব্যর্থ হয় এবং কবন্ধ অসহায় হয়ে পড়ে। 'হাজার হাজার মানুষ মিলে কি না করতে পারে। সাব, দশ লাগে ভূত ভাগে।' এ-জাতীয় কল্পকাহিনি সম্পর্কে গল্পকার জানিয়েছেন : "উদ্ভট কাহিনি। বিশ্বাস অবিশ্বাস করার কিছু থাকে না। তবু চালু আছে।" (পৃ. ৫৯৯) প্রকৃত অর্থে মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কারের জগতের Archetype রূপ বা তার বিশ্বাস কখনও পরিবর্তিত হয় না. শুধু পারিপার্শ্বিক চাপে কিছুটা চাপা থাকতে পারে। কিন্তু অনুকূল পরিবেশে তা আবার চেতন বা অবচেতন মনে ক্রিয়া করে, যা গল্পকার 'কবন্ধ কাহিনী' গল্পের অন্তরালে তুলে ধরেছেন।

'ওয়েটিং রুম' (ciIZb LÄi) গল্পে মনুষ্য জীবনের অন্তঃসত্য উপস্থাপনে শওকত ওসমান মানুষের বিবেকহীন প্রতারণার চিত্র এবং একই সমান্তরালে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর সমান গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রেম-ভালোবাসা শুধু একে-অপরের মনই হরণ করে না, মাঝে মাঝে তা মূল্যবান অলঙ্কার সামগ্রী হরণেরও হাতিয়ার হয়ে ওঠে। শুধু ঘর বাঁধার স্বপ্নেই নয়, আজকাল প্রেমকে যে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে বা প্রতারণার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয় তা সমাজাভিজ্ঞ লেখক বক্ষ্যমাণ গল্পে তুলে ধরেছেন।

এক তরুণীর স্বপ্নের মধুর বিহবলতা কী করে বাস্তবতার পাশব আঘাতে জর্জরিত হয় ও লুণ্ঠিত হয় 'ওয়েটিং রুম' গল্পে তাই দেখানো হয়েছে। এক তন্বী-তরুণীর প্রণয়, বেঁচে থাকবার বুকভরা আর্তি, স্বজনদের ছেড়ে আসার যন্ত্রণা তার প্রতারক প্রেমিকের নিদারুণ আঘাতে বিষিয়ে ওঠে তার প্রতিচ্ছবি আঁকা হয়েছে এ-গল্পে। ষোড়শী তরুণীটি প্রেমিকের দেখানো সুখের হাতছানিতে বাড়ি থেকে মূল্যবান অলঙ্কার সামগ্রী লুকিয়ে এনে প্রেমিকের হাত ধরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। যাত্রা পথে তারা রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করেন ভোরের ট্রেনের জন্য। অপেক্ষারত তরুণীটির জীবনে ভোর আসে নির্মম সত্য হয়ে, কেননা তার প্রেমিক পুরুষ প্রতারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাকে ফেলে রাতের আঁধারে অলঙ্কার নিয়ে পালিয়ে যান। নিরুপায়-অসহায় মেয়েটির তখন ওয়েটিং রুমে আর্তনাদ করা ছাড়া আর কিছুই করা থাকে না। কিন্তু এসময় ওয়েটিং রুমে অপেক্ষারত এমন অসংখ্য প্রতারণার সাক্ষী এক প্রবীণ ব্যক্তি তরুণীটিকে প্রগাঢ় পিতৃস্নেহে কাছে টেনে নেন এবং মেয়ের মত রাখার আশ্বাস প্রদান করেন। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> —আমার বুকের বাইরে মাথা রাখার কোন দরকার নেই। ভেতরে তোর জায়গা আগেই হয়ে আছে। আমি কোন প্যাসেঞ্জার নই। রাত্রি কাটানোর জন্যে এখানে এসে পড়েছিলাম। অপরের কান্না বুকে নিতে পারলেই সব প্রতারণার হাত থেকে বাঁচা যায়। (শওকত, ২০০৩ : ৬২২)

'ওয়েটিং রুম' গল্পে মনুষ্যত্বের ভাষাহীন রিক্ততার অনুভবময় প্রকাশ উপস্থাপিত। এ-গল্প রচনার মূলে যেমন আছে মানুষের নীতিহীন বিবেকের খণ্ডচিত্র, তেমনি গল্পে আছে বিবেকবান মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত মানসিকতার রূপায়ণ। গল্পটির পরিণতিতে সব ঘটনা অতিক্রম করে প্রবীণ ব্যক্তির উক্তির মাধ্যমে মানসিক পরিচর্যাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

প্রেমের জন্য জীবন বিসর্জন কিংবা প্রেমে প্রতারিত হওয়া পৃথিবীতে নতুন কিছু নয়। 'অনন্ত বাসর' (Ck‡ii cIZØ›ØX) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র জেরিনা প্রেমে প্রতারিত হয়ে জীবন থেকে পালাতে অনন্ত বাসর (মৃত্যু বরণ) রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নববধূর সাজে সজ্জিত হয়ে আয়নার সামনে নিজের প্রতিচ্ছায়ার সাথে বর-বধূর অভিনয় করেন। বার বার তিনি কল্পনায় তার প্রতারক প্রেমিককে 'একবার চাইয়া দেখো' বলে আহবান করেন। মূলত, নিজের জীবনজ্বালা

নিবারণের জন্য নয়, বিশ্বাসঘাতক প্রেমিকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণসহ তার জীবনকে বিষিয়ে দিতেই ঘৃণার বশবর্তী হয়ে ঘুমের ট্যাবলেট সেবনের মাধ্যমে মৃত্যুচিন্তায় তিনি বুঁদ হয়ে থাকেন। কিন্তু আবেগঘেরা মানসিকতার অবচেতন স্তর থেকে জেরিনা যখন বাস্তবতার যুক্তিনির্মিত চেতন স্তরে প্রবেশ করেন, তখনই তিনি জীবনের ভিন্ন অর্থ এবং ভিন্ন রূপ খুঁজে পান। আবেগহীন বাস্তবচিন্তাই তাকে আবার স্বাভাবিক মানুষে রূপান্তরিত করে। গল্পের ভাষায় :

> শিশি থেকে সমস্ত স্লিপিং পিল নিজের তালুর উপর ঢেলে বললে, 'এগুলো গুমুতের সমান— এগুলো যারা খায় তারা অন্য কিছু খায় না।...এগুলো কমোডের খোরাক–কমোডের আহার্য।...ঝোঁকের মাথায় কী করতে না বসেছিলাম। জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের বাজি ধরা উচিত নয়। মানুষের জন্য তা সাজে না।'
> (শওকত, ২০০৩ : ৬৫৭)

গল্পের পরিণতিতে "মানসিক পরিসরে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণার প্রকাশ ঘটিয়ে নির্ঘাত আত্মহত্যার প্রবণতা থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিল জেরিনা।" (অনীক, ১৯৯৫ : ২২৯) প্রথম দিকে জেরিনার মধ্যে দুর্বল চিত্তের প্রকাশ লক্ষ করা গেলেও সময়ের স্রোতে তিনি শক্তচিত্তের এবং যুক্তিবাদী নারীতে পরিণত হন। এখানে উল্লেখ্য যে, যারা দুর্বল তারাই সমস্যা থেকে, জীবন থেকে পালাতে চান কিন্তু যুক্তিবাদীরা সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করেন। প্রেমিক পুরুষের উপর দুর্বল জরিনা গল্পের পরিণতিতে সাহসী এবং যুক্তিবাদী হয়ে ওঠেন। "চোরের সঙ্গে আড়ি করে বাসন না কিনে মাটির উপর ভাত খাওয়া অনুচিত।" (পৃ. ৬৫৭)— এই আপ্তবাক্যই তাকে অনন্ত বাসর রচনা বা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে।

এখানে স্মর্তব্য যে, 'অনন্ত বাসর' গল্পের জেরিনা চরিত্রের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) 'কঙ্কাল' গল্পের কনকচাঁপা চরিত্রের সামান্য একটি সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কনকচাঁপা মৃত্যুর পূর্বে সুন্দর পোশাকে নিজেকে সজ্জিত করে মৃত্যুবাসর সাজিয়েছিলেন, জেরিনাও মৃত্যুচিন্তা থেকে নিজেকে অনুরূপভাবে সাজিয়েছিলন। তবে, তাদের মধ্যে পরিণতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। কনকচাঁপা জীবনবিনাশী বিষজাতীয় ওষুধের মাধ্যমে অনন্ত বাসর গ্রহণ করলেও, জেরিনা শেষ পর্যন্ত তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে নিজেকে রক্ষা করেন।

'ভুবন পাগলার সমস্যা' (Ck‡ii c¤ZØ›ØX) গল্পে মানবমনের অবচেতন স্তরের টানাপড়েন অত্যন্ত চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে। নদীভাঙনের দুর্ঘটনায় ভুবনের মনে জন্ম নেয় বিভিন্ন ধরনের জটিলতা। নদীভাঙন তার জীবনে নিয়ামকরূপে বার বার প্রভাব ফেলেছে। নদীভাঙনের স্মৃতি তার মস্তিষ্ক হতে অন্তর্হিত হলেও নানা উপসর্গ এসে বাসা বাঁধে। তার চরিত্রে উপসর্গরূপে দেখা দিয়েছে ভয়, ক্রোধ এবং হিংসা, একই সাথে বিচিত্র অনুভূতির সমাবেশ তার চরিত্রকে জটিল করে তুলেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে তার মধ্যে যে অনুভূতির জন্ম হয়েছে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতিতে তার আবার রূপান্তর ঘটেছে।

বিশ-বাইশ বছর বয়স থেকে উপর্যুপরি পারিবারিক ও বৈষয়িক বিপর্যয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েন ভুবন সেনগুপ্ত। নদীগর্ভে ঘর-বাড়ি-জমিন অন্তর্লীন হওয়া, সম্পত্তির শরিক, প্রতিবেশীদের নির্দয় লোলুপতা, চিকিৎসার অভাবে স্ত্রী-পুত্র হারানোর বেদনায় মানসিক বিপর্যয়ে ভুবন সেনগুপ্ত তার পদবি হারিয়ে 'ভুবন পাগলা' হয়ে ওঠেন। সেই থেকে ভুবনের যাযাবর জীবনের পথচলা। দীর্ঘ যাযাবর জীবনে অনেকবার জায়গা পরিবর্তন করলেও তিনি কখনো কোনো মানুষের সমস্যার কারণ হয়ে ওঠেননি। তার শুভ্র গোঁফ-দাড়ির জন্য অনেকে ভুবন পাগলকে 'সন্ন্যাসী' বলে সম্বোধন করেন। খেয়ালের বশবর্তী হয়ে বারবার নিরুদ্দেশ গমন, আশ্রয়স্থলের পরিবর্তন সাধন, বালক-কিশোরদের গুরু হয়ে ওঠা, লোকজনের দেওয়া টাকা-পয়সা জমিয়ে তা মানুষের মধ্যে বিলি করার এক অদ্ভুত ইচ্ছা তার মধ্যে জাগ্রত হয়। কিন্তু তার প্রস্তাব শুনে অনেকে সেই টাকা নিতে অস্বীকার করেন, এমনকি অনেকে প্রকাশ করেন নির্মম বিদ্রূপতা। ফলে তার অপমানাহত মনে জাগ্রত প্রতিহিংসার আগুনে প্রজ্বলিত হয় চাষিদের ঘর। গল্পের ভাষায় :

> "ব্যাডাগো কী, অহংকার। কয় ভিক্ষা নিমু না। অহন দ্যাখ মজা। তুই ব্যাডারা না নিলে আমরা পুণ্য কামাই করব ক্যামনে? কামাই করব কোত্থন? অহন ঠ্যালা সামলা।"
> 'তুমি আগুন লাগিয়ে দিয়েছ নাকি, বাবা?' প্রশ্ন যোগীর।
> "চুপ কর, ব্যাডা। খামখা ফটর ফটর করস না। চুপ থাক।" (শওকত, ২০০৩ : ৬৬২)

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভুবন পাগলের মানসিক বিপর্যয়ের চিত্র উন্মোচনে লেখক বিভিন্ন অনুভূতির শৈল্পিকরূপ অঙ্কন করেছেন। ভুবন পাগলের মনোবিশ্লেষণে বলা যায়, যখন বহির্গত চাপ কোনো ব্যক্তিমনে অসহনীয় পীড়নের সৃষ্টি করে কিংবা, বাহ্যিকভাবে আরোপিত কোনো সমস্যার সমাধানে যখন ব্যক্তিমানস অসমর্থ হয়ে ওঠে, তখনই তার মানসিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়। যদি কোনো উপায়ে সেই চাপের অপসারণ ঘটানো যায়, তাহলে ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্যও পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। কিন্তু ভুবন পাগলার ক্ষেত্রে এ-জাতীয় কোনো কিছু ঘটানো সম্ভব না হওয়ার কারণে তার মানসিক অবস্থা একই জায়গায় স্থির আছে।

বাহ্যিক পরিবেশ থেকে মনস্তাত্ত্বিক সংকট এবং মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ধীরে ধীরে কীভাবে জটিল ব্যাধিতে রূপান্তরিত হয় তা 'কালব্যাধি' (i√Rci¤l) গল্পে বর্ণিত হয়েছে। 'গ্রামে জন্ম কিন্তু শহরে বেড়ে ওঠা' দশ-বারো বছরের আশেক গ্রামে গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে শহরে ফিরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। গ্রামের পরিবেশ তাকে নদীতে সাঁতার কাটা, প্রশস্ত খোলা মাঠে হাওয়া খাওয়া, বন-জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করা এবং সমবয়সীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের গল্পশোনার স্বাধীনতা দিয়েছিল। হয়ত সেই উন্মুক্ত পরিবেশ এবং বিভিন্ন ধরনের গল্পের সমবায়িতরূপ আশেকের মনোরাজ্যে একটি ভিন্ন ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করেছিল, আর এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে ঘুমের মধ্যে "আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও। আমি তলিয়ে যাচ্ছি অতলে। এখানে অনেক জল...এত জল...তার ভেতরে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে...আমাকে ধরেছে দাঁতে কামড়ে ধরেছে...উঃ প্রচণ্ড যন্ত্রণা।" (পৃ. ৭২৭)— শব্দের আর্তনাদে।

মানবপ্রেমিক আহরাম চৌধুরীর অনুরোধে গল্পের কথক মনোচিকিৎসক আশেকের চিকিৎসা করতে গিয়ে 'হ্যালিউসিনেশান' রোগের আবিষ্কার করেন। এ-ব্যাধির কারণে আশেকের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা যে ক্ষীণ তা কথক এবং আহরাম চৌধুরীর কথোপকথনে ফুটে উঠেছে :

> 'অলীক কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মালে তা-কে কি বলা হয়?'
> প্রশ্নের জবাবে আহরাম বললে, 'হ্যালিউসিনেশান hallucination।'
> 'আশেক ভুগছে তা থেকে। তোমার সব নোট না থাকলে আমি ধরতে পারতাম না।'
> 'কি রকম?'
> 'টিকটিকি-কে ও মনে করে কুমীর। তাই জলে তলিয়ে যায়, দাঁতে গাঁথা হয়।'
> 'বাঁচবে না কেন?'
> 'হ্যালিউসিনেশান খুব গভীর। বোঝো টিকটিকি হয়েছে কুমীর।'
> 'তাহলে?'
> "এমন রোগের দাওয়াই নেই। ভয় মিথ্যে বিশ্বাসের জন্মদাতা। তা যদি খুব গভীর হয়– বুঝতেই পারো, কোথা নিরীহ টিকটিকি আর কোথা হিংস্র কুমীর-তাহলে রোগীকে বাঁচানো দায়। চিকিৎসা অনর্থক।" (শওকত, ২০০৩ : ৭২৮)

মনোচিকিৎসাশাস্ত্রে বলা হয় অলীক অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মালে তা দূর করা সহজ নয়; বিশ্বাস স্থির অবস্থায় পৌঁছালে এখান থেকে সহজে মুক্তি মেলে না। ফলে, স্থির বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত ব্যাধিতে রূপান্তরিত হয়ে ধীরে ধীরে ব্যাধি-আক্রান্ত রোগীকে মৃত্যুপথে ঠেলে দেয় যা 'কালব্যাধি' গল্পের ব্যাধি-আক্রান্ত আশেক চরিত্রের মাধ্যমে নির্মমভাবে প্রতিফলিত।

শওকত ওসমান মানব-মনস্তত্ত্বমূলক গল্পে মানব-মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন প্রান্তকে উন্মোচন করেছেন সযত্ন প্রয়াসে। তাই এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গল্পে উঠে এসেছে নরনারীর ভাষাহীন রিক্ততার অনুভবময় প্রকাশ, মানবমনের অবচেতন স্তরের নানামুখী টানাপড়েন, বিবেকবান মানুষের নীতিহীন পথে ধাবিত হওয়ার কার্যকারণ সম্পর্ক, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব থেকে সৃষ্ট মনুষ্যত্বের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

Qq : agxq ˆewkó¨m¤úb

তিন কালপর্বে রচিত ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য বিষয়ক গল্পে শওকত ওসমানের ধর্মীয় চিন্তার তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। ধর্মীয় কুসংস্কার, ভণ্ডামি, স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করার অপকৌশলসহ বিবিধ চিত্র এ-পর্বের গল্পেও স্থান পেয়েছে।
'ধর্মের দোহাই জবর' (g¨be I Zvnvi KKi) গল্পে ধর্মচিন্তা নয় কর্মচিন্তাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে ধর্মকে যে কতভাবে স্বার্থ-সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায় তা শওকত ওসমান এ-গল্পে তুলে ধরেছেন।

'ধর্মের দোহাই জবর' গল্পে আত্মস্বার্থচরিতার্থকারী ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার নাগ ও নারীলোভী এ্যান্টনী রিচার্ডসন উভয়ে স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। ব্রিটিশ শাসনামলে (১৯২০/২১) কর্মের সূত্র ধরে ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার নাগ ও ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট এ্যান্টনী রিচার্ডসনের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্পকের্র পথ ধরে মিস্টার নাগের বাসায় রিচার্ডসনের অবাধ যাতায়াত ছিল। নাগ সাহেবের তিন কন্যা 'ইঙ্গ-বঙ্গীয় তরুণী' মানসী, মাধবী ও মালতী। আধুনিক জীবনযাপনে বিশ্বাসী, সামাজিক অনুশাসনের বেড়াজাল ছিন্ন করা নাগ সাহেবের বড় মেয়ে মানসীর সাথে রিচার্ডসনের প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রণয় পরিণতিতে রূপ নেওয়ার পূর্বেই ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়া রোগে মানসী মৃত্যুবরণ করেন। শোক-দুঃখ পালন শেষে রিচার্ডসন আবার নতুন করে মাধবীর প্রতি আসক্ত হন। অন্যদিকে নাগ সাহেব রিচার্ডসনের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে অঢেল সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠেন, এমনকি প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্যপদও লাভ করেন। নাগ সাহেব মাধবীর বিয়ের বিষয়টি নিষ্পত্তি করার অভিপ্রায়ে নিজ বাড়িতে রিচার্ডসনকে নিমন্ত্রণ করলে দুজনের মধ্যে যে কথোপকথন হয়, তাতে স্বার্থসচেতন দুজন পাকা ব্যবসায়ীর মুখোশ উন্মোচিত হয়। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> আমি স্বপ্নে দেখলাম মানসী-কে। সে আমাকে বললে, আমার ছোট বোন মালতীর ভেতর আমার রিবার্থ (পুনর্জন্ম) হয়েছে। আমার সব ওম্যান্‌হুড (নারীত্ব) নিয়ে এখন আমি আমার বোনের আত্মার ভেতর আছি। তুমি ওকে বিয়ে করো। আমার কথা খেলাপ করো না। উপর-উপরি তিন দিন দেখলাম একই স্বপ্ন। স্বপ্নের ব্যাপারে পৃথিবীর সব ধর্ম এক। কারণ, ভবিষ্যদ্বাণী দৈববাণী।...
> নাগ সাহেব অনেকক্ষণ বসে রইলেন। একদম বজ্রাহত। কিন্তু বহু দিনের ঝানু কন্ট্রাক্টর জানেন, জগৎ ভাব-প্রবণতা নয়। সব ফস্কে যেতে পারে। নিজ সমাজ থেকে দূরে-দূরে থাকলেও এদেশের বাসিন্দা তিনি। শেষে বললেন, "মিঃ রিচার্ডসন তবে তাই হোক। ইটস্‌ গড্‌স উইশ। এ ভগবানের ইচ্ছা। আমেন।" (শওকত, ২০০৩ : ৫৮৮)

ধূর্ত রিচার্ডসনের প্রস্তাবে ঝানু প্রকৌশলী নাগ সাহেব প্রথমে স্তম্ভিত হলেও কল্পনার জগতে অল্প সময়ের ব্যবধানে তার ভবিষ্যৎ ব্যাকরণ পাঠ করে ধর্মের নামে বিয়েতে সম্মতি প্রদান করেন। এরপর এক সপ্তাহের মধ্যে মালতী-রিচার্ডসনের সিভিল ম্যারেজ হয়। অবশ্য এর পশ্চাতে নাগ সাহেবের স্বার্থ উদ্ধারের হীন কৌশল লুকায়িত ছিল তা পাঠক সহজেই অনুধাবন করতে পারে। তবে, রিচার্ডসন এবং নাগ সাহেব দুজন একই বিন্দুতে অবস্থান করেন, কেননা রিচার্ডসন তার নারীলোলুপ মানসিকতা চরিতার্থ করার জন্য যেমন ধর্মকে ব্যবহার করেন তেমনি মিস্টার নাগও তার ব্যবসায়িক মানসিকতার জন্য ব্যবসায়িক মূলধন হিসেবে পরপর তিন মেয়েকে ধর্মের নামে রিচার্ডসনের সন্তুষ্টি বিধানে নিয়োগ করেন।

আবহমান কাল থেকে মানুষের সূক্ষ্মতম আবেগ ও অনুভূতির বিষয় হিসেবে প্রাধান্য লাভ করেছে ধর্ম। তবে রূপান্তর এবং পরিবর্তনের চাকায় আচরিত ধর্মের রীতি নীতিতে পরিবর্তন আসায় সংঘাত

ও সংঘর্ষেরও অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে ধর্ম। ধর্মকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট মতবিরোধ কীভাবে মনুষ্যবিনাশী হয়ে ওঠে তা শওকত ওসমান 'শিয়া-সুন্নীর পূর্বপুরুষ' (ciÜZb LÄi) গল্পে আলোকপাত করেছেন।

'শিয়া-সুন্নীর পূর্বপুরুষ' গল্পে শওকত ওসমান জৈন ধর্মাবলম্বীদের শিয়া-সুন্নীদের পূর্ব পুরুষ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। জৈনধর্মের আদি তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ এবং সর্বশেষ তীর্থনাথ মহাবীর– এদের দুজনের মধ্যে কালগত ব্যবধান প্রায় আড়াইশ বছর। জৈনধর্ম অতি প্রাচীন কালের (খ্রিষ্টপূর্ব আটশ সন) হলেও এর মধ্যে স্রষ্টার আরাধনার কোনো স্থান ছিল না। আধুনিক কালের দৃষ্টিতে জৈন তীর্থঙ্কর মাত্রেই নাস্তিক ছিলেন। বাস্তব জীবনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে জৈন ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন মত এবং পথের সৃষ্টি হয়। পার্শ্বনাথের অনুসারীগণ দিগম্বর জৈন এবং মহাবীরের অনুসারীগণ শ্বেতাম্বর জৈন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ফলে মতবিরোধের পথ ধরে কালের পরিক্রমায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ-গল্পে খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীর দুটি চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, যার একজন দিগম্বর এবং আরেকজন শ্বেতাম্বর। পথ চলতে চলতে একজনের সাথে আরেকজনের সাক্ষাৎ ঘটে এবং অপরিচয়ের গণ্ডির মধ্যেই একে অপরের আহার্যে এবং সাহচর্যে পুলকিত হন। কিন্তু অপরিচয়ের গণ্ডি অতিক্রম করে তারা পরিচয়ের জগতে প্রবেশ করলে সম্প্রদায়গত ধর্মাচার তাদের মধ্যে আবারও প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে দিগম্বর এবং শ্বেতাম্বর 'আবার রুদ্রমূর্তি ধারণ করে, একের চক্ষু আরেক চক্ষুর উপর ছোবল-দানে উদ্যত'। ধর্মকে কেন্দ্র করে তাদের চলার এবং বলার পথ আবারও পৃথক হয়ে যায়। তাছাড়া মতবিরোধ থেকে দুই সম্প্রদায় যে অস্তিত্ববিনাশী সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তা লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন :

> হঠাৎ দিগম্বর হাঁক দিয়ে উঠল শত্রুর উদ্দেশ্যে, "পশ্য- পশ্য- দ্যাখ্ দ্যাখ্– ।" তারপর সে দিগন্তের উত্তর পূর্ব কোণ– অর্থাৎ ঈষাণ কোণের দিকে ইশারায় তর্জনী বাড়ায়। একই সময়ে পাল্টা দিতে শ্বেতাম্বর চীৎকারে ফেটে পড়ল, "পশ্য-পশ্য- দ্যাখ্ দ্যাখ্– ।" তার আঙুলও সংকেতবাহী। পূর্ব-দক্ষিণ কোণের দিকে ন্যস্ত।... দেখা যায়, তরু সংঘের শীর্ষ-সীমানা-পাড়ে ঘনকৃষ্ণ পুঞ্জ ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে ঊর্ধ্বমুখী দিগন্ত জুড়ে। নীচে দুই জনপদ পুড়ে-পুড়ে ছাই হচ্ছে। (শওকত, ২০০৩ : ৬১৪)

শুধু এ-কালের শিয়া-সুন্নী বা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-শুদ্র-বৈশ্য নয় কিংবা রোমান ক্যাথলিক-প্রটেস্ট্যান্টের মধ্যে নয়, প্রাচীন কালেও যে সমাজে ধর্মীয় বিভেদ প্রবল ছিল তা উপরের উদ্ধৃতিতে উপস্থাপিত। লোকদেখানো আচরিত ধর্মবোধ যে সমাজের এবং মানবের জন্য আত্মিক সাধনার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তা লেখক 'শিয়া-সুন্নীর পূর্বপুরুষ' গল্পে তুলে ধরেছেন।

শওকত ওসমান বাংলাদেশ কালপর্বে রচিত গল্পেও জাতিবিদ্বেষ, ধর্মীয় কলহ, স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ধর্মের বিবিধ ব্যবহার, ব্যক্তির ধর্মচিন্তা অপেক্ষা কর্মচিন্তার প্রাধান্যের বিষয়টিকে বিশ্বস্ততার সাথে উপস্থাপন করেছেন।

mvZ : †ckvRxex Rxeb-Avkqx

বাংলাদেশ কালপর্বে রচিত শওকত ওসমানের গল্পেও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে, ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান কালপর্বের গল্পে পেশাজীবী মানুষের বাহ্যিক জীবনাচরণের প্রাধান্য থাকলেও এ-পর্বের গল্পে পেশাজীবী মানুষের অন্তর্জটিলতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

'অসংখ্য শিকড় দুর্বার' (civZb LÄi) গল্পে শওকত ওসমান ব্যবসায়ী মিনহাজ সাহেবের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি বর্ণনার সূত্রে তার স্বার্থ উদ্ধারের এবং নীতিহীন কর্মকাণ্ডের প্রতি আলোকপাত করেছেন। তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির অল্প ব্যবধানেই সম্পদশালী হয়ে ওঠেন। তার জৌলুস প্রকাশার্থে তিনি নতুন শহরে বাড়ি-গাড়ির সাথে একাধিক দারওয়ান-চাকর-চাকরানি-বয়-বাবুর্চি রাখেন। বাড়ির সাথে তিন কাঠা জায়গা জুড়ে সবুজ ঘাসের লন এবং গ্যারেজ থেকে গেট পর্যন্ত প্রচুর অর্থ ব্যয়ে কংক্রিটের রাস্তা নির্মাণ করেন। তিনি লনে প্রতি শনিবার, গরমের দিনে, জোছনা রাতে কাজী মালেক, ডক্টর আসিফ, হি-ম্যানসহ বহু বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডা জমিয়ে তোলেন। এমনকি মাঝে মাঝে সেখানে নারীদেরও আগমন ঘটে। আড্ডার রাতে মিনহাজ সাহেব উত্তমরূপে পানাহার এবং বিনোদনের আয়োজন করেন। সারারাত ধরে চলে পানাহার এমনকি সাহেবদের মধ্যে হাতাহাতি পর্যন্ত সংঘটিত এবং পরক্ষণে মিলনও ঘটে সবুজ লনে। এমনি বিভিন্ন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এ বাড়ির পঞ্চাশোর্ধ বয়সী দারওয়ান। অকস্মাৎ একদিন কংক্রিটের রাস্তায় দুর্বা ঘাস গজাতে দেখে মিনহাজ সাহেব দারওয়ানকে গালমন্দ করে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেন। দারওয়ানের অনুপস্থিতি মিনহাজ সাহেবদের আড্ডায় কোনো প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয় কিন্তু এক রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে লনের বহু জায়গায় হাঁটু পর্যন্ত ধস নামে। অনেক চেষ্টা করেও মিনহাজ সাহেব আর লনের পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়ে বন্ধুদের কাছ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মিনহাজের এ-অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন মানসিক চিকিৎসক ডক্টর আসিফ। গল্পের ভাষায় :

> ঘাসের শিকড় অনেক। সংখ্যা কি গুণে শেষ করতে পারবেন?...সংখ্যা অনেক। তাই মাটি আর শিকড়ের সঙ্গে লড়াই করা চলে না। অসম্ভব নিয়ে খামখা মাথা ঘামান কেন? প্রয়োজন হলে আবার লন ঠিক করুন। কিন্তু তা মৌরসী ভাববেন না।...বাইরে থেকে ঘাসগুলো মনে হয় পোষমানা। আসলে তা না। সাধারণ বিজ্ঞানের ব্যাপার। মাটি আর শিকড়ের কথা ভুলে যাবেন না। (শওকত, ২০০৩ : ৬০৯)

ডাক্তারের এই উক্তির মাধ্যমে লেখক একটি ধনিক চরিত্রের মানসিক পরিচর্যা করেছেন। বিত্তশালীরা ভাগ্যের বন্ধ দরজা খুলতে এবং উপরতলায় ওঠার সিঁড়ি হিসেবে যাদের ব্যবহার করেন, প্রয়োজন শেষে তাদেরই আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। 'অসংখ্য শিকড় দুর্বার' গল্পে দারওয়ানের প্রস্থান এবং লনে ধস নামা সবই গল্পকার প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছেন। এর মধ্য

দিয়ে গল্পকার বিত্তবান শ্রেণিপেশার মানুষের মধ্যে নীতিবোধের প্রস্থান এবং ধস নামার বিষয়টিকেই শিল্পিতভাবে তুলে ধরেছেন।

'এক কাফন-চোরের আত্মকাহিনী' (ci/Zb LÄi) গল্পে এক পেশাদার কাফন-চোরের জীবন-ইতিহাস শওকত ওসমান উপস্থাপন করেছেন। পাঁচ সদস্য-পরিবারের অভিভাবক হিসেবে নামহীন লোকটি অন্যের জমি বর্গা নিয়ে কায়িক শ্রমদানেও দুবেলা-দুমুঠো খেতে না পেয়ে দুর্ভিক্ষকালে প্রতি রাতে কবরস্থান থেকে কাফন চুরির মাধ্যমে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা আয় করে তার পরিবারকে আর্থিক টানাপড়েন থেকে রক্ষা করেন। অর্থনৈতিক দীনতার কারণে অনন্যোপায় হয়েই স্বাচ্ছন্দে বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসেবে তিনি গ্রহণ করেন কাফন চুরির মতো নীতিহীন-অপরাধমূলক কাজ। কাফন চুরি করতে গিয়ে লোকটি কবরস্থানে বিভিন্ন ঘটনার মুখোমুখি হন। শুধু তাই নয়, তার এ-পেশাতেও আগমন ঘটে একাধিক অংশীদারের। কাফন-চোর রাতারাতি হয়ে ওঠে কাফন-চোরদের গুরু এবং তখন তারা সংঘবদ্ধভাবে কাফন চুরি, ডাকাতি এমনকি একাধিক হত্যাকাণ্ডও ঘটায়। এসব ঘটনার মাধ্যমে কাফন চোরের আর্থিক নিরাপত্তার বিষয় নিশ্চিত হলে তিনি গ্রামের আবাস উঠিয়ে শহরে বাড়ি নির্মাণ করেন। কিন্তু কোনো এক রাতে সাপে কাটা মানুষের কবর থেকে কাফন চুরি করতে গিয়ে একটি বিশেষ ঘটনা তাকে কাফন চুরি করা থেকে চিরতরে দূরে ঠেলে দেয়। ঘটনাক্রমে সাপে কাটা মানুষটি কবরের মধ্যেই জীবিত হয়ে ওঠেন এবং সে মুহূর্তেই কাফন-চোর তার ব্যবসার মূলধন কাফন নিয়ে পালানোর সব আয়োজন সম্পন্ন করেন। গল্পের ভাষায় :

> জ্যান্ত মানুষ আমার মতই দৌড়াচ্ছে দশ কি বিশ হাত দূরে। মানুষ বোঝা গেল যখন চিক্কর দিয়ে উঠল "ও কাফন-চোর, আমার ছদর ঢাকার কিছু নেই, আমি উলঙ্গ, আমি গাঁয়ের মানুষের কাছে কী করে মুখ দেখাব কাল ফজরে? ও কাফন-চোর, আমার গোটা কাফন নয়, অন্ততঃ মাথার কাপড়া ফেলে দাও, তবু ছদর ঢাকা যাবে।" (শওকত, ২০০৩ : ৬২৬)

'এক কাফন-চোরের আত্মকাহিনী' গল্পে লেখক চোরের কাফন চুরির নেপথ্যের কাহিনি তুলে ধরার সাথে সাথে তার সামাজিক এবং মানসিক স্তরের বিবর্তনকেও চিহ্নিত করেছেন।

'রত্নাকর : একটি উপন্যাসের খসড়া' (i/Rci$\circledast$l) গল্পে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী হালেক চৌধুরীর জীবন বর্ণনসূত্রে তার অপকর্মের বিভিন্ন চিত্র উপস্থাপন করেছেন। এম.এ পাস চৌধুরী অল্প বয়সেই বিত্তশালী হয়ে ওঠেন এবং দেশে-বিদেশে একাধিক কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদ অলঙ্কৃত করেন। প্রথম জীবনে পত্রিকায় কবিতা রচনার মাধ্যমে কবিখ্যাতি অর্জন করলেও বিত্তশালী হওয়ার পরেই তিনি আর কোনো কবিতার রচনা করেননি। তবে, অর্থ-প্রাচুর্যের মালিক হওয়ার সূত্রে শিল্প-সাহিত্য, ব্যঙ্ক-বীমা, পেইন্টিং-ফটোজার্নালিস্ট, সংবাদপত্রসহ বিভিন্ন জায়গায়ও তার প্রভাব বেড়ে যায়। চৌধুরীর 'সম্পদের শিকড় বৃক্ষমূলের মতো বহু দূর ছড়িয়ে যায় গোপনে গোপনে।' কিন্তু তিনি মাত্র আটান্ন বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। চৌধুরীর গ্রাজুয়েট ছেলে বাবাকে স্মরণীয় করে রাখার

অভিপ্রায়ে জীবনীকারের মাধ্যমে তার বাবার জীবন-চরিত রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হালেক চৌধুরী তথা রত্নাকরের অতীত জীবন সম্পর্কিত গবেষণা করতে গিয়ে জীবনীলেখক তার পুত্রের সরবরাহকৃত পারিবারিক ইতিহাস, অগ্রগতির ইতিহাস, চিঠিপত্র, ডায়েরি থেকে অনেক ক্লেদাক্ত তথ্যের সন্ধান পান। চৌধুরী সম্পদশালী হবার পর নেশার পথে পা বাড়ান এবং এ-নেশায় তাকে মৃত্যুর দুয়ারে দ্রুত পৌঁছে দেয়। তাছাড়া তিনি যৌবনে একাধিক নারীর সাহচর্য ভোগ করা ছাড়াও হত্যাকাণ্ডের সাথেও জড়িত ছিলেন। এ পর্যায়ে লেখক চৌধুরী চরিত্রের সার্বিক পরিচয় দিতে গিয়ে বাল্মীকি প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। যেমন :

> রামায়ণ-রচয়িতা বাল্মীকি কাব্যের প্রাঙ্গনে প্রবেশের পূর্বে দস্যু ছিলেন। নাম রত্নাকর। পথিকের প্রাণনাশ ছিল তার জীবিকা অর্জনের পথ। দস্যু রত্নাকর পরে বাল্মীকি হন। এ যুগের বাল্মীকি দস্যু রত্নাকর হয়। (শওকত, ২০০৩ : ৭২০)

সম্পদের বৃদ্ধি এবং ঘাটতি মানুষের জীবনকে বিপন্নতার দিকে ঠেলে দেয় যা গল্পকার 'রত্নাকর : একটি উপন্যাসের খসড়া' গল্পে ধনাঢ্য হালেক চৌধুরীর জীবনপ্রবাহ এবং পরিণতির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

শওকত ওসমান বাংলাদেশ কালপর্বে মানুষের পেশাজীবী জীবন তুলে ধরতে গিয়ে একই সাথে উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত বা প্রান্তিক-শ্রেণি মানুষের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। ফলে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের পার্থক্যের স্বরূপটি গল্পকার যেমন চিহ্নিত করেছেন, তেমনি সমাজে সমপেশার এবং সমশ্রেণির বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য স্পষ্ট রূপাঙ্গিকে প্রতিফলিত হয়েছে।

AvU : ¯‡'k-fvebvgjK

শওকত ওসমানের চিন্তা-জগতে বেশি ক্রিয়াশীল বিষয় ছিল স্বদেশ। তিনি তিন কালপর্বের গল্পেই স্বদেশকে বিভিন্ন রূপাঙ্গিকে চিত্রিত করেছেন। তাঁর স্বদেশ ভাবনার উৎসমূলে সামাজিক দায়বদ্ধতার সাথে কাজ করেছে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সময় বা দেশমাতৃকার প্রধান প্রধান ঘটনাপ্রবাহ। বাংলাদেশ কালপর্বের গল্পে গল্পের বাহ্যাবরণ অপেক্ষা গল্পের অন্তর্বয়নেই স্বদেশভাবনার প্রতিফলন অধিক লক্ষ করা যায়। তাই, এ-পর্বের গল্পগুলোতে স্বদেশভাবনা প্রকাশার্থে শওকত ওসমান অতি সূক্ষ্মভাবে রূপক-প্রতীকের ব্যবহার করেছেন।

শওকত ওসমানের রূপক-প্রতীকধর্মী গল্পের মধ্যে 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' (Ck‡ii cÖwZØ›Øx) অন্যতম। শিল্প-সাফল্যের প্রান্তস্পর্শী এ-গল্পটির বাহ্যাবরণে সাধারণ একটি ঘটনা বিবৃত হলেও এর অন্তর্বয়নের তাৎপর্য গল্পটিকে ভিন্ন একটি মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। গল্পটি বিশ্লেষণের পূর্বে এ-গল্প সম্পর্কে সমালোচকদের মতামত উপস্থাপন করা হল :

> অনীক মাহমুদ : 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' নামগল্পেও প্রতীকধর্মিতা সুস্পষ্ট।...প্রচলিত চিন্তার গণ্ডি অতিক্রমের প্রচেষ্টা।...বাংলাদেশের সত্তরের মাঝামাঝি থেকে যে দুর্বার সামরিক শাসন এদেশের মানুষকে নিস্পৃষ্ট করে এই হোতাদের ইচ্ছার সঙ্গে মুরারীর ইচ্ছার মিল পাওয়া যায়। বিশেষত দ্বিতীয় স্বৈরশাসক ধীরে ধীরে কিভাবে নিজেকে সর্বস্তরের মানুষের কাতারে সামিল করবার প্রচেষ্টা চালায় সমকালীন ইতিহাস তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। (অনীক, ১৯৯৫ : ২০৮-২০৯)

> সমরেশ দেবনাথ : পরবর্তীকালে যখন তাঁর 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' পড়লাম তখন বুঝতে পারলাম শিল্পকর্ম শুধু অভিজ্ঞতা থেকে হয় না। হয় হৃদয়ের এক বিশাল উত্তাপ থেকে। এই উত্তাপ শেক্সপিয়ারের ছিল, রবীন্দ্রনাথের ছিল, ছিল জীবনানন্দের মধ্যে। 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পটা শুধু গল্প শাস্ত্রের নিয়মে গল্প নয়– এখানে আছে Doctor Fausts এর অর্ন্তদাহ বা inner conflict। অন্তর্লোকের তাগিদে Doctor Fausts যেমন ঈশ্বরকে অস্বীকার করে শয়তানের Black Magic -এর প্রতি ঝুঁকেছিলেন, পরিণামে নিয়তি এসে তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। এখানে মানুষের নিয়তি নির্ধারিত ধ্বংস হলেও পরাজয় হয় না। কেননা 'Man can be destroyed but not be defeated'- শিল্পিত এবং সৃষ্টিশীল মানুষের জন্য এটাই শেষ কথা। শওকত ওসমানের নায়ক মুরারীও হয়তো জানতো তার চূড়ান্ত পরিণতি। এর পরেও সে আকাঙ্ক্ষার রাস্তাকে বহুদূর পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। (সমরেশ : ২০০৮ : ৫০-৫১)

'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মুরারী পাচাল মেধাবী ছাত্র। পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে তার মাথায় সমস্যা দেখা দেয়। মাঝে মাঝেই মাথার এই সমস্যা তাকে লেখাপড়া থেকে দূরে ঠেলে দিত। স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির কারণে মুরারী প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক, আই.এ পাস করেন এবং পরবর্তীকালে বি.এ-তে ভর্তি হন। সদাচারি-মিষ্টিভাষী, তুখোড় বক্তা মুরারী অল্পদিনের ব্যবধানেই কলেজের শিক্ষকসহ সহপাঠীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে আবার তার মাথার সমস্যা তীব্র হয়ে ওঠে এবং তখন তিনি ঈশ্বরের সর্বব্যাপী অস্তিত্ব ও জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে নিজেকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার অভিপ্রায়ে ঈশ্বরের প্রতিযোগী হিসেবে ঘোষণা করেন। মুরারীর ভাষ্যমতে : "আমি মানুষের ইতিহাসে পথিকৃৎ হতে চাই।...যদ্দূর পারা যায় আমি নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। ঈশ্বরের সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতা।" (শওকত, ২০০৩ : ৬৩৭) অসম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে মুরারী সর্বত্র অবাধ যাতায়াত করেন। এমনকি জলের ট্যাংকের ছাদে ও টেলিফোনের তারের উপর দাঁড়িয়ে তিনি বক্তৃতা করেন, বড় বড় জনসভা সর্বত্রই তিনি তার উপস্থিতি জানান দেন, সেটা মাটির সাথে গড়াগড়ি দিয়ে হলেও তিনি তা করতে দ্বিধাবোধ করেন না।

মুরারী অদৃশ্য ঈশ্বরের সাথে অসম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করেন। কোনো এক শীতের রাতে শহরের শেষ প্রান্তে মেথর পট্টির দাঁতাল শুয়োরের চারণ ভূমিতে প্রবেশ করায় শুয়োরদের নির্দয় আঘাতে তার মৃত্যু ঘটে। প্রকৃত অর্থে "মুরারী চরিত্রের মাধ্যমে গল্পকার এদেশের সামরিক একনায়কদের প্রতিরূপ অঙ্কন করেছেন।... শওকত ওসমান ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পের সামাজিক ও রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সত্তর-আশির দশকে বারবার রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে সামরিক

জান্তারা। জনজীবনে নেমে এসেছে স্বৈরশাসন। সামরিক একনায়করা মুরারীর মতো নিজেদের ঈশ্বরপ্রতিম কল্পনা করে। গল্পে মুরারীর সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান হবার উচ্চাভিলাষ ও ঔদ্ধত্যের পরাভব ঘটে।... বাংলাদেশের নব্বইয়ের দশকে জনবিদ্বেষী গণবিরোধী সামরিক একনায়কত্ব মুরারীর ভাগ্যকেই বরণ করে নিতে বাধ্য হয়।" (চঞ্চল, ২০০৯ : ২৩৩-২৩৪) মূলত স্বদেশ ভাবনায় নিমগ্ন শওকত ওসমান 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পে অতি সূক্ষ্ম রেখায় প্রতীকের নিখুঁত ব্যবহারের মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্রের পতনেরই ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।

লেখক 'রাজপুরুষ' (i\Rci\#l) গল্পে পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের রাজকর্মচারীদের অনৈতিক ক্রিয়াকর্মকে তুলে ধরেছেন। এ-গল্পের পটভূমি পাকিস্তানের করাচি শহর থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে মরুভূমির বুকে বিঘা দশেক জমির উপর নির্মিত 'ওয়েশীশ হোটেল'কে কেন্দ্র করে আবর্তিত। পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের মোমন্দ এলাকার কলন্দর এবং পূর্ব পাকিস্তানের আব্দুল আলী এ হোটেলে 'বার বয়' হিসেবে কর্মরত। কর্মসূত্রে তারা প্রত্যক্ষ করেন ধর্মের নামে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলেও এ হোটেলে সব ধরনের অধর্ম নির্বিঘ্নে করা যায়। বিশেষ করে সপ্তাহান্তে 'নয়া রাষ্ট্র, নয়া ধনী, নয়া ধন, আরাম আয়েশের লুটেরা, ইহজগতের নয়া বাসিন্দা'রা এই হোটেলে নারী এবং মদকে প্রধান উপকরণ করে উৎসবে মেতে ওঠেন। কলন্দর পাকিস্তান রাষ্টের প্রশংসা করলে আব্দুল আলী সে-ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানান। তার এ-আপত্তির মধ্যেই ফুটে ওঠে পাকিস্তান সৃষ্টির কলঙ্কময় ইতিহাস। যেমন :

> আমি বাচপান (শৈশব) থেকে দেখছি। যে-বছর পাকিস্তান হয়, কী হাংগামা। হাজার হাজার হিন্দু দেশ ছেড়ে চলে গেল। কতো খুনখারাবী জখম, ঘরে আগুন, দেখলাম। (শওকত, ২০০৩ : ৬৯৬)

আলীর কথায় 'জোয়ার-ভাটা, উত্থান-পতনের জীবনপ্রবাহে কলন্দরের বিশ্বাসের কাটাটিও দুলে ওঠে।' তার কাছেও উন্মোচিত হয় নয়া পাকিস্তানি রাজপুরুষ বা রাজকর্মচারীদের প্রকৃত চেহারা। তাই পাকিস্তান প্রীতির জায়গা থেকে সরে এসে কলন্দরও আব্দুল আলীর কথার সাথে একমত পোষণ করেন। বিপথগামী, নারীলোলুপ, মদখোর-ঘুষখোর, দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজকর্মচারীদের কাজে বীতশ্রদ্ধ কলন্দরও ক্ষোভে-ঘৃণায় ফেটে পড়েন এবং রাজপুরুষদের আসল চেহারা উন্মোচন করেন : "আরে চাচ্চা, বাদশা, দেখ দেখ– এহি শুয়ার কা বাচ্চা লোগ পাকিস্তান চালাতো আওর চালায়েগা।" (শওকত, ২০০৩ : ৬৯৮)

ধর্মের ঝান্ডা উড়িয়ে সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তঃসারশূন্যতা এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আমলাদের অনৈতিক কাজের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এ গল্পে পাওয়া যায়। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির অল্প সময়ের ব্যবধানে রাজকর্মচারীগণ খোলস পরিবর্তনের মাধ্যমে কীভাবে রাজপুরুষে পরিণত হন তা গল্পকার তাদের দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। দেশপ্রেম ভাবনায় নিমগ্ন গল্পকার শওকত ওসমান মূলত 'রাজপুরুষ' গল্পে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের কদর্য চেহারাকেই চিহ্নিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'স্বজন স্বজাতি' (i/Rci8l) গল্পের স্বল্প অবয়বে একদিকে স্বজাতি দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার এবং অন্যদিকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মানুষের পরজনকে স্বজন করে নেওয়ার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে রচিত এ গল্পে "বাঙালি মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পক্ষান্তরে দেশপ্রেমিক অনিল রক্ষিত মহানুভবতায় হয়েছেন অতুলনীয়।" (চঞ্চল, ২০০৯ : ২০৮-২০৯)

'স্বজন স্বজাতি' গল্পের প্রেক্ষাপট ১৯৫৯ সালের তদানীন্তন ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামল। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আজহার নিরাপত্তা আইনে আটক হয়ে 'উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের পাঁচ জেলের পানি খেয়ে' রাজবন্দি হিসেবে দুবছর কারাবাস শেষে নড়াইলের জেলখানা থেকে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের পরেই তিনি চাটগাঁর উদ্দেশে রওনা হয়ে রাত বারোটায় জন্মস্থানে পৌছাঁলেও নিজ বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হন। কেননা, বাবার চোখে 'কুলাঙ্গার', সরকারি চাকুরীরত ভাইয়ের চোখে 'অসোয়াস্তির কারণ' — এসব কথা ভেবে নিজের বাড়ির পরিবর্তে আজহার স্বধর্মীয় কোনো স্বজাতির বাড়িতে আশ্রয়ের খোঁজ করেন। কিন্তু আত্মীয় বা স্বজাতিরা কেউই তাকে আশ্রয় দেয়নি, বরং তার "নাম উচ্চারণ-মাত্র তারা বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল এবং চাকর দিয়ে বলে পাঠালে, যার সারমর্ম : রাস্তা দ্যাখো।" (শওকত, ২০০৩ : ৭২৪)। এসময় আজহারের মনে পড়ে অনিল রক্ষিতের কথা— একদা যিনি সূর্য সেনের সহযোগী হিসেবে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। অবশেষে মধ্যরাতে অনিল রক্ষিত এবং তার স্ত্রী শ্রীমতী স্নেহ রক্ষিত তাকে সমাদরের সাথে গ্রহণ করে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। গল্পের ভাষায় :

> অনিলদা আমাকে ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে গেছেন আধা বুকে জড়িয়ে এবং মুখ চালু রেখে। "স্নেহদি, ভাল আছেন?" ঘুম-ছুট রমণী তখন আমার সামনে খাড়া। "আ রে ভাই, আজহার তুমি?"
>
> আহার শেষে অনিলদা বললেন, "ভাই জলদি শুয়ে পড়ো।...আমি ঠিক চারটের সময় তোমাকে তুলে দেব। অন্ধকার থাকতে থাকতে। আর এক বাড়ীতে তোমাকে রেখে আসব।...তুমি ত জানো আমার বাড়ী সেফ নয়। (শওকত, ২০০৩ : ৭২৪)

'স্বজন স্বজাতি' গল্পে দেশাত্মবোধের যেমন প্রতিফলন ঘটেছে আজহার, অনিল রক্ষিত ও স্নেহাদির মধ্যে, তেমনি আত্মস্বার্থকামী মানুষেরও মুখোশও উন্মোচিত হয়েছে আজহারের বাবা, ভাই এবং আত্মীয়দের ব্যবহারের মাধ্যমে। মূলত, দেশপ্রেমহীন মানুষগুলো স্বজাতি হয়েও কীভাবে পরজন এবং দেশপ্রেমের মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত চরিত্রগুলো কীভাবে পরজন হয়েও স্বজনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় বক্ষ্যমাণ গল্পে তার প্রমাণ মেলে।

Dhaka University Institutional Repository

রূপকধর্মী 'আলিবাবা : লোকভাষা' (ivRcig‡l) গল্পেও অতি সূক্ষ্ম রেখায় শওকত ওসমানের স্বদেশ চিন্তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। এখানে উল্লেখ্য, লেখক ইতঃপূর্বে বর্বর পাকিস্তানি শাসক কর্তৃক পূর্ব বাংলার মানুষের মুখের হাসি কেড়ে নেওয়ার চিত্র উপস্থাপনে যেমন µxZ'v‡mi nwm (১৯৬২) উপন্যাসে আরব্য উপন্যাসকে আশ্রয় করেছিলেন, তেমনি আলোচ্য গল্পে পাকিস্তানি শাসকদের অনৈতিক পথে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা এবং তাদের ধ্বংস হওয়ার চিত্র ফুটিয়ে তুলতেও আরব্য উপন্যাসকে গল্পের প্লট নির্মাণে ব্যবহার করেছেন।

কাঠুরিয়া আলিবাবা মর্জিনার সহযোগিতায় দস্যুসর্দারকে হত্যা করে অঢেল সম্পত্তির অধিকারী হন। আলিবাবার প্রতিবেশী বেজারীর জবানিতে জানা যায় : "সে (আলিবাবা) তার বড় ভাই কাশেমকে হত্যা করে তার স্ত্রীকে বিয়ে করে এবং মর্জিনাকে কাছাকাছি রাখার অভিপ্রায়ে কাশেমের ছেলে নাসেরের সাথে তার বিয়ে দেয়।" (পৃ. ৭০৫) সম্পদশালী আলিবাবার আচরণ, লেবাস, দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহেও দ্রুত পরিবতর্ন সাধিত হয়। জীবন উপভোগ এবং সম্পদের অর্জনের নেশায় তিনি আবার তেল ব্যবসার জড়িয়ে পড়েন। তবে, এখানেও তিনি অধিক অর্থ উপার্জন করেন। জনশ্রুতি আছে আলিবাবা তার 'অনেক ঘটনার সাক্ষী গোলাম আবদালাসহ অনেককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ভয়শূন্য হন।' তাছাড়া দেশে দস্যুদের উৎপাত বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বাড়ির লোকেরা সন্দেহজনক হয়ে ওঠায় আলিবাবা প্রায়ই তার সম্পদ সেই ডাকাতদের গুহায় নিরাপদ আশ্রয় ভেবে রেখে আসেন কিন্তু তার দিনও একদিন ফুরিয়ে আসে। গল্পের ভাষায় :

> একদিন আলিবাবা জঙ্গলে গেল। আর ফিরে এলো না।... খোঁজাখুঁজি কোনো কাজে এলো না। পরিণামে তৈলব্যবসায়ী আলিবাবা দস্যু ও তার সহচরবৃন্দ এবং আবদালা ইত্যাদির মতো নিখোঁজ হয়ে গেল।...আলিবাবার মানসিক দাঁড়িপাল্লার দুইদিকের বাটি সমান ছিলো না। এমন অবস্থায় গুহার ভেতর সে ঢুকেছিল। একদিন দস্যুদের ধনরত্ন সেখানে জমা হতো। পরে একই জায়গায় আলিবাবার নিজের ধনরত্ন জমা হচ্ছিল। কাঁড়ি কাঁড়ি সোনাদানার সামনে আলিবাবার ঠিক সেই দশা হয়েছিল– একদিন তার ভাই কাশেম যে দশায় পৌঁছায়। মানসিক নানা চাপ তা-কে রেহাই দেয় নি। গুহার দরজা খোলার মন্ত্র আলি বাবা নিশ্চয় ভুলে গিয়েছিল। (শওকত, ২০০৩ : ৭০৭)

গল্পের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণসূত্রে বলা যায়, আলিবাবার সম্পদ কুক্ষিগত করার নেশা, ধর্মীয় লেবাস ধারণ, তার সকল ঘটনার প্রত্যক্ষসাক্ষীদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার সাথে পাকিস্তানি শাসকদের চারিত্রিক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আলিবাবার 'মানসিক দাঁড়িপাল্লার দুই দিকের বাটি সমান' না থাকার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উভয় অঞ্চলের মধ্যকার অর্থনৈতিক অসম বণ্টনকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। লোকভাষ্যানুসারে আলি বাবা যেমন তার ভাই কাশেমকে হত্যা করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলেন– তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রও পূর্ব বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক অধিকারকে হরণ করে অঢেল সম্পদের মালিক হন। ধনদৌলত সংগ্রহের নেশায় মত্ত আলিবাবা ধর্মীয় লেবাসের বাতাবরণে অতি সুকৌশলে প্রত্যক্ষদর্শীদের যেমন আত্মগোপনে যেতে বাধ্য করেন, তেমনি

পাকিস্তানি সামরিক জান্তারাও কূটকৌশলে অনেককে বন্দি ও গুপ্ত করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু পরিণতিতে আলিবাবা যেমন মন্ত্রভুলে প্রস্তর ঘেরা গুহার মধ্যে অনন্ত শয্যা গ্রহণ করেন, তেমনি আদর্শচ্যুত পাকিস্তান রাষ্ট্রেরও ১৯৭১ সালে বাঙালির সমবেত প্রচেষ্টার ফলে শেষ সমাধি রচিত হয়।

শওকত ওসমানের বাংলাদেশ কালপর্বের গল্পেও স্বদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। এ-পর্বে জাতীয় জীবনের এবং সমাজজীবনের বিচিত্র ঘটনাস্রোত তাঁর সাহিত্য সাধনাকে অনেকখানি প্রভাবিত করে সাহিত্যের বিষয়-রূপ-রীতি বিনির্মাণে সাহায্য করেছে। বিশেষ করে তাঁর স্বদেশ-ভাবনামূলক গল্পের স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ এবং শিল্প-নৈপুণ্যের সার্থকতা তাঁকে নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্য জগতে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। সমালোচকের ভাষায় : “দ্বন্দ্বময়, জটিল ও প্রতিকূল বাস্তবতার মধ্যেও যাঁরা একক সাধনায় রাষ্ট্রিক-সামাজিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সৃজন-মননের এক সমৃদ্ধ ব্যক্তিভূগোল তৈরি করেছেন, শওকত ওসমান তাঁদের অন্যতম।” (রফিকউল্লাহ, ২০০৭ : ১৭০) সষ্টিশীলতার বৈচিত্র্যে, সমাজমানসে নাগরিক বৈদগ্ধ্যের ক্রমসম্প্রসারণে এবং সমাজ-স্বদেশ ও রাজনীতিভাবনার ক্ষেত্রে অনিবার্য দিকনির্দেশনায় শওকত ওসমানের অবদান অবশ্যই স্বীকার্য।

UxKv

১. গল্পটি লেখক পশ্চিম বঙ্গের প্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ‘কথাসরিৎসাগর’-এর আসরে ১৯৯০ সালে জানুয়ারি মাসে রেওয়াজ মেনে মুখে মুখে বলেছিলেন, (শওকত ওসমান, nš ÍviK, সময় প্রকাশন, ১৯৯১, গ্রন্থের ‘লেখকের কথা’ অংশে উল্লিখিত, পৃ. ৬)
2. শ্রী অনিল রক্ষিত চট্টগ্রাম শহরের রহমতগঞ্জ এলাকার অধিবাসী ছিলেন। ১৯৩১ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে তিনি ছিলেন শহীদ সূর্য সেনের সহযোগী। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে অনিল রক্ষিত সপরিবারে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

Mš I ceÜcwÄ

অনীক মাহমুদ (১৯৯৫)। evsjv K_vmwn‡Z¨ kIKZ Imgvb, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী।
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (২০০৩)। iPbvmgM 1, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
আবদুল মতিন (১৯৯৯)। eÜeÜ †kL gwRe gw³h‡×i ci, র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯৭৪)। Ave Rvdi kvgmÏx‡bi †kô Mí, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।
চঞ্চল কুমার বোস (২০০৯)। evsjv‡`‡ki †QvUM‡íi wkíiƒc, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
জাহানারা ইমাম (২০১২)। GKv˂‡ii w`b¸wj, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা।
বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। evsjv‡`‡ki mwnZ¨, আজকাল, ঢাকা।
বুলবন ওসমান (২০০৪)। K_v-mwn‡Z¨ kIKZ Imgvb, সময় প্রকাশন, ঢাকা।
বেগম মুশতারী শফী (১৯৯৬)। ¯vaxbZv Avgvi i³ Siv w`b, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।
রফিকউল্লাহ খান (২০০৭)। gvB‡Kj iex›`bv_ I Ab¨vb¨, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম (১৯৯৮)। ‘মুক্তিযুদ্ধের বই’; GK‡ki ¯§viKMš 1998 [সম্পা. সেলিনা হোসেন এবং অন্যান্য], বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শওকত ওসমান (১৯৯১)। nš Í viK, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০০৩)। kIKZ Imgvb MÍmgM [সম্পা. বুলবন ওসমান], সময় প্রকাশন, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০০৭)। ivnbvgv 1 †Q‡j‡ejv I ‰K‡kvi †Kvjvnj, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

শোয়েব শাহরিয়ার (১৯৯১)। ‘শওকত ওসমানের গল্প : জীবনের আরেক নাম’; wbmM [সম্পা. সরকার আশরাফ], বাণী প্রকাশনী, বগুড়া।

সমরেশ দেবনাথ (২০০৮)। ‘শওকত ওসমানের গল্প’। e¨w³ I mwnwZ¨K kIKZ Imgvb [সম্পা. বুলবন ওসমান], দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা।

সালাউদ্দীন আইয়ুব (২০০৮)। ‘ছোটগল্পে শওকত ওসমান’; e¨w³ I mwnwZ¨K kIKZ Imgvb [সম্পা. বুলবন ওসমান], দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা।

সালাহউদ্দীন আহমদ এবং অন্যান্য (১৯৯৯) [সম্পা.]। evsjv‡`‡ki gyw³msMÖv‡gi BwZnvm, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

সুব্রত বড়ুয়া (১৯৯৫)। ‘মুক্তিযুদ্ধ ও আমাদের সাহিত্য’; GK‡ki wbewPZ ceÜ 1963-1976 [সম্পা. মোবারক হোসেন], বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (২০০৫)। ˆmq` IqvjxDjøvn MÍmgM [সম্পা. হায়াৎ মামুদ], প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা।

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৮৪) [সম্পা]। evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZv hy×i `wjjcÎ, অষ্টম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ZZxq cwi‡”Q‘
evsjv‡‘k Kvjc‡ei M‡íi wkíixwZ

বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জীবনের সোনালি ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ একটি স্মরণীয় অধ্যায়। এই মুক্তিযুদ্ধের সফলতার মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটেছিল একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। পরবর্তীকালে ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং হত্যাকাণ্ড পরবর্তী সামরিক শাসনের কালো ছায়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে জটিল করে তুলেছিল। রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের বিষয়-আঙ্গিক এবং সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও এসেছিল পরিবর্তনের সুর। এ-সময়ে সৃষ্টিশীল লেখকেরা আশ্রয় করেন ভিন্নতর প্রকরণ কৌশল। নবীন লেখকদের পাশাপাশি চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের প্রবীণ লেখকরাও নতুন আঙ্গিক-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। “উদ্ধত সামরিক দানবের নৃশংস ভ্রূকুটির ভয়ে লেখকদের আড়াল খুঁজতে হয়েছে। ফলে তারা প্রথাগত বর্ণনার চেয়ে প্রতিরূপকী আশ্রয়ে গল্পরচনায় অগ্রসর হয়েছেন। চল্লিশের গল্প লেখা শুরু করলেও আশির দশকে এসেও যিনি সমানভাবে সমাজচৈতন্যের অগ্রসর রূপকার ছিলেন এবং খোলামেলা চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন রাষ্ট্রের উপর সামরিক জান্তার নগ্ন আগ্রাসন, তিনি হলেন বাংলাদেশের সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা শওকত ওসমান।” (চঞ্চল, ২০১১: ১২৭-১২৮)

শওকত ওসমান মূলত সমাজ-সচেতন ও প্রজ্ঞাবান একজন কথাসাহিত্যিক। ক্রমাগত সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে, কালের পরিক্রমায় লেখকের শিল্পিসত্তা ক্রমেই হয়ে উঠেছে আরও ক্ষুরধার। নিবিষ্টচিত্তে সাহিত্যরচনার প্রয়াস কিংবা সৃষ্টির নেশা তাঁকে সরকারি চাকরি ছাড়তে বাধ্য করে। ফলে, অন্তর্তাগিদে তিনি নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে হয়ে উঠেছেন সমকালের কণ্ঠস্বর।

GK

শওকত ওসমানের গল্পের কাহিনি বিন্যাসের কালানুক্রমিক পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয়, তিনি ক্রমশ স্বভূমিতে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে লেখকের বিষয়ভাবনা ও শিল্পরীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বাঁক পরিবর্তন ঘটে। এ-পর্বে গল্প-শরীর আরও বেশি সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। জীবনের খণ্ড খণ্ড মুহূর্ত, মানুষের খণ্ড খণ্ড বিশ্বাস, ইতিহাসের অলিগলি, রাষ্ট্রযন্ত্রের খণ্ড খণ্ড ঘটনাপুঞ্জকে তিনি ছোটগল্পের শিল্প-শরীরে বেঁধে দিয়েছেন। গল্পকার তাঁর এ-পর্বের গল্পে প্রথাগত জীবনবোধ, আধুনিক জীবনপ্রবাহকে যেমন তুলে এনেছেন, তেমনি সেই জীবনের ভালো-মন্দ, হিংসা-বিদ্বেষ, ত্রুটি-বিচ্যুতি নানা অভিঘাতে পর্যুদস্ত মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত-প্রান্তিক মানুষের জীবনচিত্রের রূপায়ণও ঘটিয়েছেন।

শওকত ওসমানের ছোটগল্পে পরিবেশ সৃজনে ও কাহিনিবিন্যাসে মুখ্য হয়ে উঠেছে লেখকের বাস্তবোধসম্পন্ন পর্যবেক্ষণশক্তি, ঔচিত্যবোধ এবং সচেতন বর্ণন বৈশিষ্ট্য। শৈল্পিক "সৃজন-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামাজিক দায়িত্বচেতনার সমন্বয় তাঁর অধিকাংশ রচনার বৈশিষ্ট্য। সৃজনশীলতার এবং মননশীলতার মাত্রাগত পার্থক্য তাঁর সাহিত্যকর্মে নতুন তাৎপর্যে অভিব্যক্ত হয়েছে।" (রফিকউল্লাহ, ২০০৭ : ১৭০) এ-পর্বে লেখক গল্পের কাহিনি বিন্যাসে ঘটনাধর্মিতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, ক্ষেত্রবিশেষে ঘটনাধর্মিতাকে বর্জন করে গল্পকে অন্তর্মুখী ও প্রতীকী করে তুলেছেন। শওকত ওসমান গল্পের মৌলিক বোধ, অভিপ্রায় কিংবা পরিণামী বাস্তবতাকে দ্যোতিত করার তাগিদে প্রতীকতার আশ্রয় নেন। যেমন 'বার্তাবহ' (Rb¥ hw' Ze e‡½) গল্পে লেখক প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদে আলোকপাত করেছেন কাহিনির কেন্দ্রীয় ভাবের দিকে। কিন্তু গল্প-কাহিনি যত এগিয়েছে, লেখক তত কেন্দ্রীয় ভাব থেকে সরে গিয়ে প্রতীক উপস্থাপনার দ্বারা অব্যর্থ পরিবেশ নির্মাণ করেন এবং একই সঙ্গে তিনি সঙ্কেতিত করেন গল্পের অন্তর্প্রকৃতি, চারিত্র্যকে। এছাড়া এ জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধারণকারী গল্পের মধ্যে 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' (Rb¥ hw' Ze e‡½), 'দ্বিতীয় অভিসার' (Ges wZb wgR©v), 'ধর্মের দোহাই জবর' (gwbe I Zvnvi KKi), 'নিজের লাশ লইয়া' (civZb LÄi) অন্যতম। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> (ক) জানাযা শেষ হয়ে গেছে। খোয়াজ খিজির বা জলের দেবতা বরুণ– সাঙ্গোপাঙ্গসহ কাঁধ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে খাট। পিছু পিছু তারা হাঁটছে, যেন গোরস্থান পর্যন্ত এইভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে। (বার্তাবহ ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৯২)
>
> (খ) মানবীর বুকে সকল ভাবনা সঁপে দিয়ে তখন পৃথিবী শান্ত। ...পৃথিবী ও প্রসূতি তখন নিঃশব্দ। বোবা স্তব্ধতা দিকচক্রবাল পর্যন্ত বিস্তৃত, নদীর দৌরাত্ম্য বাদ দিলে।...জলের প্রহারে ধস নামার পূর্বেই মাজু উপর থেকেই তার পৃথিবী ধসিয়ে দিলে। (দ্বিতীয় অভিসার ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫৫৪)

রূপ ও প্রকরণের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতায় এবং সময়ের নিখুঁত ব্যবহারে ছোটগল্পের ঐশ্বর্য ও মুক্তি। নানা রীতি ও আয়তনের শাখারূপগুলি এসে মিশেছে একালের 'ছোটগল্প' নামক মহানদীতে।

শওকত ওসমান এ-পর্বে কিছু গল্পের আখ্যানভাগ বিন্যাসে সময়ের নিখুঁত ব্যবহার করেছেন। এ-জাতীয় বিন্যাসগত বৈশিষ্ট্যের কারণে গল্পে কালানুক্রমিকতা রক্ষিত হয় এবং একই সাথে ঘটনা বিন্যাসের পারম্পর্যও বজায় থাকে। এ-ধরনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গল্পের মধ্যে 'আলোক অন্বেষা' (Rb¨ hw' Ze e‡½), 'ভারতীয় গোয়েন্দা' (Rb¨ hw' e‡½), 'এবং তিন মির্জা' (Ges wZb wgR©v), 'দ্বিতীয় অভিসার' (Ges wZb wgR©v), 'মুষ্টিবদ্ধ লঘুনৃত্য' (gwbe I Zvnvi KKi), 'ধর্মের দোহাই জবর' (gwbe I Zvnvi KKi) উল্লেখযোগ্য। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> (ক) ঘটনাটা ঘটেছিল খ্রিষ্টীয় ১৯৬৫ সনে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়। ঠিক আট বছর পূর্বে। (ভারতীয় গোয়েন্দা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫০৬)
> (খ) এক শ' আঠাশ বছর পূর্বে সিপাহী বিদ্রোহ তখন শেষ হওয়ার পথে। ইংরেজদের সুগঠিত, বিন্যস্ত সেনাবাহিনীর সামনে শেষ পর্যন্ত দেশী ফৌজ টিকে থাকতে পারেনি। (এবং তিন মির্জা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫২১)

ছোটগল্প তার স্বল্পপরিসরে কিংবা প্রকার ও প্রকরণগত স্বতন্ত্রতায় ধারণ করে জীবনের একমুখী বিন্যাসের খণ্ড রেখাঙ্কন। তা যেন জীবনসমুদ্র থেকে ছিটকে আসা এক অতর্কিত ঢেউয়ের মতো, কোথায় তার শুরু আর কোথায় শেষ, তা ভালো করে ধরার আগেই শেষ হয়ে যায়। শওকত ওসমানের এ-পর্বের কিছু গল্পের শুরুটা যেমন আকস্মিক, তেমনি সমাপ্তিও নাটকীয়। গল্পের কাহিনি-সূচনা থেকে তা ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে গেছে পরিণতির দিকে। এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধারণকারী গল্পের কাহিনি বিন্যাসে কোথাও অতি কথন বা অতি রঞ্জন চোখে পড়ে না। এ-ধরনের বৈশিষ্ট্যের আলোকে রচিত গল্পের মধ্যে 'আলোক অন্বেষা' (Rb¨ hw' Ze e‡½), 'সারেঙ সুখানী' (Rb¨ hw' Ze e‡½), 'বার্তাবহ' (Rb¨ hw' Ze e‡½), 'রক্ত চিহ্ন' (Rb¨ hw' Ze e‡½), 'দ্বিতীয় অভিসার' (Ges wZb wgR©v), 'ধর্মের দোহাই জবর' (gwbe IZvnvi KKi), 'স্বজন স্বজাতি' (ivRcix¿I) উল্লেখযোগ্য। তবে, এ-গল্পগুলোর আরও একটি বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে; আয়তনগত দিক থেকে এ-গল্পগুলো সংক্ষিপ্ত পরিসরে রচিত।

তবে, এ-পর্বের কিছু গল্পের কাহিনি বিন্যাসে লেখক ব্রিটিশ কালপর্বের বহু-ব্যবহৃত ভিক্টোরীয় বর্ণনরীতিকেই আবার ফিরিয়ে এনেছেন। এ-ধরনের গল্পের মধ্যে 'ক্ষমাবতী' (Rb¨ hw' Ze e‡½), 'দম্পতি' (Ges wZb wgR©v), 'ন্যায় অন্যায়' (Ges wZb wgR©v), 'গ্রহচ্যুত' (gwbe I Zvnvi KKi), 'অসংখ্য শিকড় দুর্বার' (civZb LÄi), 'শিবগঞ্জের মেলা' (Ck‡ii cwZØ›Øx), 'আলিবাবা : লোকভাষ্য' (ivRcix¿I) অন্যতম।

শওকত ওসমানের বাংলাদেশ কালপর্বের গল্পের কাহিনি বিন্যাসের পরিণতগত দিক বিবেচনায় একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়, প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি গল্পের শেষতম বাক্য বা অংশকে ব্যঞ্জনাগর্ভ করে তুলেছেন। 'মনিব ও তাহার কুকুর' (gwbe I Zvnvi KKi) গল্পে ঘুষখোর অফিসার

রাজপুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে গল্পকার জানাচ্ছেন : "পশুর কাছ উলঙ্গ থাকতে মানুষের কোনো লজ্জা থাকার কথা নয়। এক পশু বেমালুম ন্যাংটো থাকে অন্য পশু-সমীপে।" (শওকত, ২০০৩ : ৫৭৬) আবার 'নিজের লাশ লইয়া' (ciVZb LÄi) গল্পে উত্তম পুরুষে বর্ণিত বীর মুক্তিযোদ্ধার জবানিতে উচ্চারণ করিয়েছেন : "আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। জীবিত। উপলব্ধি করলাম, আমি রক্ত-বীজ। আমি মৃত্যুহীন।" (শওকত, ২০০৩ : ৫৯৪) এছাড়া 'রত্নাকর : একটি উপন্যাসের খসড়া' (iVRci¤ÍI) গল্পে অর্থলোভী-নৈতিকতা বিবর্জিত এক লেখকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করে লিখেছেন : "দস্যু রত্নাকর পরে বাল্মীকি হন। এ যুগের বাল্মীকি দস্যু রত্নাকর হয়।" (শওকত, ২০০৩ : ৭২০) অনুরূপধর্মী গল্পের মধ্যে 'আলোক অন্বেষা' (Rb¥ hw' Ze e‡½), 'জন্ম যদি বঙ্গে' (Rb¥ hw' Ze e‡½), 'দ্বিতীয় অভিসার' (Ges wZb wgR©v), 'শিয়া-সুন্নীর পূর্ব পুরুষ' (ciVZb LÄi) অন্যতম।

তবে এ-পর্বের কিছু গল্পের কাহিনি বিন্যাসে একাধিক অনুচ্ছেদের বিভাজন রেখা টেনেছেন। যেমন 'সারেঙ সুখানী' (Rb¥ hw' Ze e‡½) গল্পে ২টি, 'ওয়াগান ব্রেকার' (Rb¥ hw' Ze e‡½) গল্পে ৩টি, 'এবং তিন মির্জা' (Ges wZb wgRv) গল্পে ৩টি, 'দম্পতি' (Ges wZb wgR©v) গল্পে ২টি, 'ন্যায় অন্যায়' (Ges wZb wgR©v) গল্পে ২টি, 'মুষ্টিযুদ্ধ লঘুনৃত্য' (gywó hy× I Zvnvi KKi) গল্পে ২টি, 'দস্যু দারোগা সংবাদ' (ciVZb LÄi)-এ ২টি, 'স্বৈরিণী' (Ck‡ii cwZØ›Øx) গল্পে ২টি, 'হন্তারক' (nšÍviK)এ-৬টি, 'আলিবাবা : লোকভাষ্য' (iVRci¤ÍI) গল্পে ৩টি, 'রত্নাকর : একটি উপন্যাসের খসড়া' (iVRci¤ÍI) গল্পকে ৫টি অনুচ্ছেদে বিভাজন করার মাধ্যমে কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে।

এ-পর্বের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গল্পে তিনি আকস্মিকতা আনয়ন অপেক্ষা গল্পের বিষয়কে ব্যাখ্যা করে কাহিনি রচনায় মনোনিবেশ করেন। অর্থাৎ গল্পের শুরুতে লেখক দুই বা ততোধিক বর্ণনধর্মী অনুচ্ছেদের সাহায্যে গল্প-কাহিনির মুখবন্ধ রচনা করেন। এ-সব গল্পের কাহিনি বর্ণনায় লেখক প্রথাগত কোনো বিন্যাসপদ্ধতিকে গ্রহণ করেননি। এ-গল্পগুলো অনেকটা প্রবন্ধধর্মিতায় রূপ নিয়েছে। 'নিজের লাশ লইয়া' (ciVZb LÄi), 'কবন্ধ কাহিনী' (ciVZb LÄi), 'আলিবাবা : লোকভাষ্য' (iVRci¤ÍI), 'ফলাফল জানা ছিল না' (iVRci¤ÍI), 'রত্নাকর : একটি উপন্যাসের খসড়া' (iVRci¤ÍI) গল্পগুলো এ-জাতীয় রূপাঙ্গিকে বিন্যস্ত। ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড

শওকত ওসমানের বাংলাদেশ কালপর্বে রচিত গল্পে শিল্পদৃষ্টি আরও বেশি তীক্ষ্ম এবং শানিত। এ-পর্বে তিনি ছোটগল্পের কাহিনিবিন্যাসে রূপক-প্রতীকধর্মী, ঘটনাধর্মী, নাটিক্য পরিচর্যা, কাব্যিক পরিচর্যা, শানিত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, ফ্ল্যাশ ব্যাক, ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড, চেতনাপ্রবাহরীতির (Stream of conciousness) প্রয়োগ করেছেন। নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পকৌশলের পরিচর্যা রীতিতে তিনি হয়ে ওঠেন আরও বেশি নিরীক্ষাধর্মী। অন্যভাবে বলা যায়, ছোটগল্পের

আঙ্গিক-বিন্যাস ও প্রকরণ সন্ধানে শওকত ওসমানের শিল্পমানস ক্রমোত্তরণের মধ্য দিয়ে নিজস্ব মাত্রায় উপনীত হয়েছে।

শওকত ওসমান বাংলাদেশ কালপর্বের ৪৯টি গল্পের অধিকাংশ গল্পে ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতির ব্যবহার করেছেন। "ফ্ল্যাশব্যাক বা বিপ্রতীপতা উদঘাটনরীতিতে তিনি অতীতের ঘটনাপুঞ্জকে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে রূপদান করেছেন। কেন্দ্রীয় বা প্রান্তিক চরিত্রের স্মৃতিচারণায় কিংবা চরিত্রের অন্তর্মময় অনুভবে, কখনোবা লেখকের সর্বজ্ঞ বর্ণনায় উপস্থাপিত হয়েছে বিগত ঘটনাপুঞ্জ, অভিজ্ঞতা, চেতনা বা মনোজাগতিক স্তর।" (চঞ্চল, ২০১১ : ১১৩) গল্পকার এ-পর্বের যে-সব গল্পে ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতির ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে 'ক্ষমাবতী' (Rb¥ hw' Ze e‡½), 'ভারতীয় গোয়েন্দা' (Rb¥ hw' Ze e‡½), 'ওয়াগান ব্রেকার' (Rb¥ hw' Ze e‡½), 'এবং তিন মির্জা' (Ges wZb wgR©v) 'দ্বিতীয় অভিসার' (Ges wZb wgR©v), 'দম্পতি' (Ges wZb wgR©v), 'ন্যায়-অন্যায়' (Ges wZb wgRv), 'গ্রহচ্যুত' (gwbe I Zvnvi KKi), 'কে প্রাদে' (gwbeI Zvnvi KKi), 'গোয়েন্দা কাহিনীর খসড়া' (gwbe I Zvnvi KKi), 'ফলাফল জানা ছিল না' (ivRciæl) উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও 'হন্তারক' (nšÍviK) গল্পটি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি ফ্ল্যাশ ব্যাক এবং ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড রীতির সাহায্য নিয়েছেন। হিজু-গেজুর মধ্য দিয়ে গল্পকার ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতির ব্যবহার এবং দারাশিকো ও আওরঙ্গজেব চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড রীতির ব্যবহার দেখিয়েছেন। 'হন্তারক' গল্পে লেখক মোগল রাজপ্রাসাদের অলিন্দে নৈশকালীন দুই খোজা প্রহরীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতির সাহায্যে পাঠককে পৌঁছে দিয়েছেন মোগল সাম্রাজ্যের অন্তঃপুরে এবং মোগল শাসনের পরবর্তী বাস্তব চিত্র অবলোকনে। লেখক যুগ-কাল-বাস্তবতা নিরাসক্ত-নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের ঘটনাধারা বর্ণনা করেছেন শিল্পের কঠোর সংযমে।

বাংলাদেশ কালপর্বে মাত্র 'স্বৈরিণী' (Ck‡ii cwZØ›Øx) ও 'হন্তারক' (nšÍviK) দুটি গল্পে শওকত ওসমান চেতনা প্রবাহরীতির ব্যবহার করেছেন। এ-দুটি গল্পে লেখকের দৃষ্টিকোণের পরিচর্যা, সাংকেতিক পরিবেশ নির্মাণ, আলো-অন্ধকারের দ্যোতনা সৃষ্টি এবং চরিত্রের অবচেতন মনের বিভিন্ন প্রান্তকে উন্মোচিত করার ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-১৯৭১) প্রভাব স্পষ্ট। যেমন : 'হন্তারক' গল্পেও হিজুর মনোবীণায় চেতনাপ্রবাহরীতির প্রয়োগ দেখিয়েছেন এভাবে—

> আমার শুধু শব্দ হিসেবে সেই নাম মনে আছে, সেই নদীর নাম।...আমার কানে বাজে সেই নদীর নাম : ইলিশবিল...ইলিশবিল। (হন্তারক ॥ শওকত, ১৯৯১ : ৪৭)

"সাধারণভাবে যে কোন গল্পের নাম তার বিষয়কে টেনে ধরে রাখে। কেন্দ্রীয় ভাববস্তু কোন না কোনভাবে গল্পের নামে জড়িয়ে যায়। কখনো ভাববস্তু ব্যঞ্জনায় নামে ছায়া-কায়ার সম্বন্ধে যুক্ত থাকে, কখনো চরিত্রের ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসন গল্পের নামে অমোঘ সম্পর্কের অর্থদ্যোতনা আনে।" (বীরেন্দ্র,

২০০০: ৬৭) বাংলাদেশ কালপর্বের গল্পের নামকরণে শওকত ওসমান কখনও ঘটনাশ্রয়ী, কখনও রূপক-প্রতীকের আশ্রয়-অন্বেষী, আবার কখনও ইতিহাস-ঐতিহ্যের পথ ধরেছেন। গল্পের অন্তর্নিহিত বক্তব্যের সঙ্গে গভীর সম্পর্কসূত্রে রূপক-প্রতীকের ব্যবহার গল্পে যেমন ব্যঞ্জনা এনেছে, তেমনি নামকরণেও সৃষ্টি করেছে চমৎকারিত্ব। গল্পকার প্রতীকী শব্দ, সঙ্কেতমূলক বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমেও গল্পের নামকরণে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য স্মরণীয় যে, এ-জাতীয় শব্দ-বাক্য প্রয়োগে লেখকের উদ্দিষ্ট থাকে নিগূঢ় কোনো অর্থের উদ্ভাসন ঘটানো। এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যের আলোকে লেখক যে গল্পগুলোর নামকরণ করেছেন তার মধ্যে 'বার্তাবহ' (Rb¥ h¨w' Ze e‡½), 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' (Rb¥ h¨w' Ze e‡½), 'জননী-জন্মভূমি' (Rb¥ h¨w' Ze e‡½), 'দ্বিতীয় অভিসার' (Ges wZb wgR©v), 'মনিব ও তাহার কুকুর' (gwbe I Zvnvi KKi), 'পুরাতন খঞ্জর' (civZb LÄi), 'কুটিলা ভবেৎ' (Ck‡ii cwZØ›Øx), 'স্বৈরিণী' (Ck‡ii cwZØ›Øx) উল্লেখযোগ্য।

এ-পর্বে কিছু গল্পের নামকরণে বক্তব্যধর্মিতার প্রকাশ লক্ষণীয়, এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন গল্পের মধ্যে 'আলোক-অন্বেষা' (Rb¥ h¨w' Ze e‡½), 'ক্ষমাবতী' (Rb¥ h¨w' Ze e‡½), 'গোয়েন্দা কাহিনীর খসড়া' (gwbe I Zvnvi KKi), 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' (Ck‡ii cwZØ›Øx), 'স্বজন স্বজাতি' (ivRciæl) স্মরণযোগ্য।

তবে, গল্পের মধ্যে চমৎকারিত্ব বা ব্যঞ্জনা থাকলেও এ-পর্বের কিছু গল্পের নামকরণ সাধারণ মানের। এ-জাতীয় গল্পের মধ্যে 'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া' (Rb¥ h¨w' Ze e‡½), 'সারেঙ সুখানী' (Rb¥ h¨w' Ze e‡½), 'দুই ব্রিগেডিয়ার' (Rb¥ h¨w' Ze e‡½), 'এবং তিন মির্জা' (Ges wZb wgR©v), 'শিবগঞ্জের মেলা' (Ck‡ii cwZØ›Øx), 'চিৎকার' (ivRciæl) অন্যতম।

'B

শওকত ওসমানের বাংলাদেশ কালপর্বের গল্পে চরিত্রায়ণ কৌশল প্রতিনিধিত্বমূলক, কৃত্রিমতাবর্জিত ও আত্মানুসন্ধানী। তিনি এ-পর্বের চরিত্র নির্মাণে কাহিনিধর্মিতা বা ঘটনাধর্মিতাকে নয়, চিত্রাত্মক পরিচর্যারীতি, ইঙ্গিতময়তা বা সংকেতময়তাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ-পর্বে "শওকত ওসমানের মানবচৈতন্য ও সমাজচৈতন্যের সন্ধিবিন্দু তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসমগ্র, দৈনন্দিনতার অপরিমার্জিত প্রকাশে তারা রূপময়।" (চঞ্চল, ২০১১ : ৭৫)

এ-পর্বের বেশ কিছু গল্প অন্তর্মুখী ও প্রতীকধর্মী হওয়াতে ব্যক্তির শরীরী ভাষ্য নয়, বরং চরিত্রের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া বা তার মানসদ্বন্দ্বটিই বড় হয়ে উঠেছে। আর মানসদ্বন্দ্বের উৎসমূলে ক্রিয়াশীল তার দৈশিকচেতনা বা দেশপ্রেম। ফলে প্রতীকী ভাবনায় এবং দৈশিকচেতনার আলোকে ধরা পড়েছে ব্যক্তির অন্তঃস্বরূপ। শওকত ওসমানের এ-পর্বের অধিকাংশ গল্পের "চরিত্রসমূহ একাত্তরে ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্ম-যন্ত্রণার রক্তিম

লাবণ্যে গল্পের চরিত্রগুলো সজীব। কাল্পনিক নয়, বরং গল্পের চরিত্রগুলো অভিজ্ঞতা-নির্ভর সৃষ্টি। উত্তম পুরুষে অধিকাংশ গল্পের কাহিনি বিবৃত হওয়ায় একাত্তরের ভয়াবহ আতঙ্ক জীবন্ত হয়ে উঠেছে, চরিত্রের মর্মান্তিক নিগ্রহভোগের সঙ্গে মুহূর্তেই পাঠককুল হয়ে উঠেছে অনুভূতিবিজড়িত। বিচিত্র ঘটনা ও অভিজ্ঞতার ফ্রেমে শওকত ওসমান এ গ্রন্থের মানুষগুলোকে চিত্রিত করেছেন।" (চঞ্চল, ২০১১ : ৭৫) তবে, তাঁর এ-পর্বের গল্পের চরিত্র-পাত্ররা আদর্শের বরপুত্র নয়, দ্বন্দ্ব-জটিল এক সময়ে সন্তান। এ-জাতীয় গল্পের মধ্যে 'আলোক অন্বেষা' (Rb¨ hw' Ze e‡½), 'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া' (Rb¨ hw' Ze e‡½), 'সারেঙ সুখানী' (Rb¨ hw' Ze e‡½), 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' (Rb¨ hw' Ze e‡½), 'রক্তচিহ্ন' (Rb¨ hw' Ze e‡½), 'দুই ব্রিগেডিয়ার' (Rb¨ hw' Ze e‡½), 'এবং তিন মির্জা' (Ges wZb wgR©v) অন্যতম।

ঘটনাপ্রধান 'আলোক অন্বেষা' (Rb¨ hw' Ze e‡½) গল্পে সালামৎ আলি একটি জটিল চরিত্র। তার চরিত্রের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উন্মোচনে নাটকীয় পরিচর্যার সাথে বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যা এ-গল্পে অনিবার্যতা পেয়েছে : "দুশনের কাছ থেকে করুণা ভিক্ষা করো না, হয় ধ্বংস করো অথবা ধ্বংস হও।" (শওকত, ২০০৩ : ৪৮৩)

'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া' (Rb¨ hw' Ze e‡½) গল্পে গেরিলাবাহিনীর লেডার রণেশ-দা একমুখী চরিত্র, দেশমাতৃকার স্বাধীনতা এবং মানুষের কল্যাণচিন্তা তার চরিত্রের উজ্জ্বলপ্রান্ত। লেখক এ চরিত্রসৃষ্টিতে উপস্থিত বুদ্ধি, স্বাজাত্যবোধ, অসাম্প্রদায়িক চিন্তা আরোপ করেছেন। তাছাড়া গল্পে লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের সঙ্গে অনিবার্যভাবে সমীকৃত হয়েছে চরিত্রের দৃষ্টিকোণ। যেমন :

> 'স্বাভাবিক মৃত্যুর কাছে, অপমৃত্যু নিয়ে যাদের কারবার এমন বর্বরও নাড়া খায়। বাজি ধরেছিলাম। এখন দেখছি ঠিক ঠিক কাজে লেগে গেছে।' (বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৮৬)

'সারেঙ সুখানী' (Rb¨ hw' Ze e‡½) গল্পের মূল বিষয়কে শওকত ওসমান চিত্রিত করেছেন গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সোলেমান সারেঙের দৃষ্টিকোণ থেকে। তার চরিত্র রূপায়ণে লেখক নিগূঢ় প্রতীকী ব্যঞ্জনার আশ্রয় করেছেন এবং তার ভীতিতাড়িত অস্তিত্বের প্রান্তিক পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করে তাকে ভীতিশূন্য চরিত্রে রূপদান করেছেন গল্পের পরিণতিতে। যেমন :

> একসময় তলিয়ে যেতে হয় সমস্ত বারিরাশির স্নেহের ভিতরে, যখন নির্বাত হয়ে আসে অতলান্ত মেঘনার অন্তর্জগত। তারই মধ্যে ধরা দেওয়ার পূর্বে সোলেমান সারেঙের বুকে পরিতৃপ্তির ঘনঘটা, ঠোঁটে হাসির আঁচড় লেগেছিল বইকি : আর ঈষৎ সময়, থোড়া রক্ত। (সারেঙ সুখানী ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৯০)

'রক্তচিহ্ন' গল্পের নাজেম চরিত্রে লেখক মনোজাগতিক আলোড়ন, চিন্তা, প্রতিক্রিয়া ও অনুভবকে চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে উন্মোচন করেছেন। লেখক নাজেম চরিত্রটিকে ভীতিগ্রস্ত মানুষের মনস্তাত্ত্বিক

অবদমন থেকে মুক্ত করে নাটকীয়তা, বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যা এবং চরিত্রের স্বগতোক্তির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখকের আশাবাদী চেতনার বর্ণে নাজেম চরিত্রটি উজ্জ্বল :

> গ্রাম জেগে উঠুক, গ্রামের মানুষের ধড়ে প্রাণ ফিরে আসুক। আসুক অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, মায়া-মহব্বত...সবই পুড়ে গেছে দারিদ্র্যের আগুনে। সেই আগুন নিভাতেই ত নাজেম ঘরছাড়া হয়েছিল, নিজের গ্রামছাড়া হয়েছিল। সে ত গ্রাম গড়ে তুলতে চায়...ধ্বংস করার জন্যে তার জন্ম হয় নি। (রক্তচিহ্ন ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৯৮)

এছাড়াও ‘এবং তিন মির্জা’ (Ges wZb wgRv©) গল্পের মির্জা হায়দার, মির্জা আলি আনোয়ার ও মির্জা আলি আশরার, ‘জনপদে’ (Ck‡ii cwZØ›Øx) গল্পের জগদীশ, ‘স্বজন স্বজাতি’ (ivRciæl) গল্পের আজহার ও অনিল রক্ষিত চরিত্রগুলো দৈশিক-ভাবনায় নির্মিত। দেশ-মাতৃকার মুক্তির লক্ষ্যে এ-সব চরিত্রের আত্মত্যাগ ইতিহাস-সম্পৃক্ত। জাতীয় ও আন্তজার্তিক আন্দোলন-সংঘাতের মধ্য দিয়ে এসব চরিত্রের চেতনা ও কর্মধারার যে রূপান্তর, তাকে রূপায়ণ করতে গিয়ে গল্পকার অনেকটা নাটকীয় রীতির প্রয়োগ করেছেন। লেখকের বিশেষ মনোযোগ-সহকারে সৃষ্ট এ-চরিত্রগুলো ইতিহাস এবং সাহিত্যের অন্যতম স্থান দখল করে আছে।

নারীচরিত্রের ক্রমবিকাশ বাংলাদেশ কালপর্বে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটিশ কালপর্বের জুনু আপা (জুন আপা), হাসিনা (সাদা ইমারত), জব্বারের মা (গেহু), পাকিস্তান কালপর্বের আমিরণ (উদবৃত্ত), সৌদামিনী মালো (সৌদামিনী মালো), করিমা বিবি (রাতা) প্রভৃতি চরিত্র অপেক্ষা পরবর্তীকালের নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ উজ্জ্বলরেখায় ফুটে ওঠে। এ-সম্পর্কে অনীক মাহমুদ-এর মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য :

> স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নারীদের বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ উপস্থাপন লক্ষ করা যায়।...‘পিতৃপুরুষের পাপের’ লালবানু, ‘দ্বিতীয় অভিসার’ গল্পের মাজু প্রভৃতি নারীরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং প্রতিবাদ করেছে। অর্থাৎ উপজীব্যের ক্ষেত্রে যেমন শওকত কথাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ আছে চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রেও তার উত্তরণমুখী প্রবণতা লক্ষ করা যায়। (অনীক, ১৯৯৫ : ২৬৭)

বাংলাদেশ কালপর্বের যে-সব গল্পে নারী চরিত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা যায় তার মধ্যে ‘ক্ষমাবতী’ (Rb¥ hw‘ Ze e‡½), ‘জননী : জন্মভূমি’ (Rb¥ hw‘ Ze e‡½), ‘দম্পতি’ (Ges wZb wgRv©), ‘দ্বিতীয় অভিসার’ (Ges wZb wgRv©), ‘ওয়েটিং রুম’ (civZb LÄi), ‘নিদয়-নিদয়া’ (Ck‡ii cwZØ›Øx), ‘স্বৈরিণী’ (Ck‡ii cwZØ›Øx) গল্পগুলোর নাম উদ্ধারযোগ্য।

‘ক্ষমাবতী’ (Rb¥ hw‘ Ze e‡½) গল্পে গণতন্ত্র ও মানবতার বিরুদ্ধে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে পাকসেনা কর্তৃক নারীর চূড়ান্ত সম্ভ্রমহানির অনুপুঙ্খ ভাষাচিত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে তহমিনা চরিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে। অত্যাচারের নির্মমতায় মেয়েটি বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। “তার এই বিপন্ন জীবনের গোপন যন্ত্রণা

উন্মোচনে লেখক স্বভাবতই মিতকথনের আশ্রয় নিয়েছেন। এক নিবিড় নৈঃশব্দের পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্কিত চরিত্রটি মূলত ব্যঞ্জনাময়। তার আত্মহননের ঘটনাটিও স্কেচধর্মী, সংক্ষিপ্ত ঘটনার অনুষঙ্গে উন্মোচিত।" (চঞ্চল, ২০১১ : ৮৮) তহমিনা তার অশুচি শরীর নিয়ে আর বাঁচতে চাননি— আর এ বিষয়কে লেখক বহির্বাস্তবের সংকেতময় ব্যবহারে চিত্রিত করেছে। তাছাড়া সম্ভ্রমহানির দশ-বারো দিন পরে গোমতী নদীতে তহমিনার আত্মবিসর্জনের ঘটনাকে গল্পকার নাটকীয় রীতিতে বিন্যাস করেছেন। মূলত তহমিনা চরিত্রটি স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সারাদেশে নির্যাতিত নারীর প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত।

'জননী : জন্মভূমি' (Rb¨ hw' Ze e‡½) গল্পেও একই সাথে কসিমন বিবি, অলিমন বিবি ও খাতু বিবির সম্ভ্রমহানির বিষয়টি উঠে এসেছে। গল্পের শুরুতে এ তিনটি চরিত্রের ভীতিশূন্য নির্ভীক চরিত্র অঙ্কনে গল্পকার সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের পাশাপাশি চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দুকে ব্যবহার করেছেন। তবে, গল্পের পরিণতিতে ছেলের সমান বয়সী পাকসেনাদের নির্মম পাশবিকতা ও লালসার শিকার হওয়ার ঘটনা এবং চরিত্রসমূহের দূরাগত পরিণাম লেখক বহির্বাস্তবের সংকেতময় ব্যবহারে চিত্রিত করেছেন। যেমন :

> পরিত্যক্ত মাটির হাড়িগুলো পর্যন্ত রেহাই পেলো না। টিনের ঘর মুখ থুবড়ে পড়ল।...স্তব্ধ বৃদ্ধা যাদুকরের মন্ত্রচালিত যেন কোন পুতুল। ঘরের ভেতরে আর্তনাদ উঠেছিল বৈকি। অসহায়ের এই আর্তনাদ নতুন নয় পৃথিবীতে। (জননী : জন্মভূমি ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫১৩-৫১৪)

'দ্বিতীয় অভিসার' (Ges wZb wgRví) গল্পে গল্পকার যুগপৎভাবে নারীর চূড়ান্ত সম্ভ্রমহানি এবং পাকসেনাদের প্রতি এদেশবাসীর ঘৃণার চরম নিদর্শনের চিত্র উপস্থাপন করেছেন মাজুর চরিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে। "মাজু চরিত্রের নির্মেদ কাঠামোতে শওকত ওসমান নির্যাতিতা বাঙালি নারীর চরম আত্মদানকে চিত্রিত করেছেন।" (চঞ্চল, ২০১১ : ৮৯) অভিশপ্ত সন্তানের দায়ভার গ্রহণের ব্যর্থতা, বিষিয়ে ওঠা তিক্ততা, আবার অন্যদিকে সন্তানের প্রতি সুপ্ত ভালোবাসা মাজু চরিত্রটিকে জটিলতার বেড়াজালে বেঁধেছেন লেখক। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বারের মত অভিসারিকা হয়ে নবজাতক সন্তানকে ধলেশ্বরীতে 'ধসিয়ে' (বিসর্জন) দেওয়ার মাধ্যমে মাজুর তীব্র নির্দয়-আকাঙ্ক্ষা এবং তার চারিত্রিক দৃঢ়তার চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> মরিয়ম বাধা দিতে হাত বাড়ালে এবং বললে, 'আর মায়া বাড়াস নে। একডু বায়ে সরে যা। তারপর ফেইলা দে। বেজন্মা মিলিটারীর ছাওয়ালের লগের আবার মুহব্বত!'...
> জলের প্রহারে ধস নামার পূর্বেই মাজু উপর থেকেই তার পৃথিবী ধসিয়ে দিলে। (দ্বিতীয় অভিসার ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫৫৪)

পাকসেনাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার কাছে মাতৃত্বেরও পরাজয় ঘটেছে, যা মাজুর চরম নির্দয় সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রতিফলিত। এ-চরিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে গল্পকার বাঙালি নারীত্বের মধ্যে যেমন প্রতিশোধ

গ্রহণের মানসিক শক্তিকে প্রগাঢ় রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনই কলঙ্কমুক্ত মাতৃত্বের বিজয়-গাথাকে নতুন রঙে রাঙিয়েছেন।

‘ওয়েটিং রুম’ (ci\Zb LÄi) এবং ‘শিবগঞ্জের মেলা’ (Ck‡ii cwZØ›Øx) গল্পে নারীর প্রতারিত হওয়ার চিত্র পাওয়া যায়। ‘ওয়েটিং রুম’ গল্পে এক তরুণীর চরিত্র নির্মাণের মাধ্যমে স্বপ্নের মধুর বিহবলতা কী করে বাস্তবতার পাশব আঘাতে লুণ্ঠিত হয় তা তুলে ধরা হয়েছে। আবার ‘শিবগঞ্জের মেলা’ গল্পেও বারবনিতার ঘর-বাঁধার স্বপ্ন ভূলুণ্ঠিত হয়েছে ভণ্ড প্রেমিক-পুরুষের প্রতারণার শিকার হয়ে। এছাড়াও ‘কুটিলা ভবেৎ’ (Ck‡ii cwZØ›Øx) এবং স্বৈরিণী’ (Ck‡ii cwZØ›Øx) গল্পে নারীজীবনের বিপন্নতাবোধ, তার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ এবং অচরিতার্থ বাসনার শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এ-পর্বে নারী-চরিত্র অঙ্কনে গল্পকার নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

এ-পর্বের চরিত্র নির্মাণে শওকত ওসমান নৈর্ব্যক্তিকতা পরিহার করে আত্মকথনরীতির সাহায্যে চরিত্রকে ব্যঞ্জনার রঙে রাঙিয়েছেন। এ-জাতীয় চরিত্রের মধ্যে ‘জন্ম যদি তব বঙ্গে’ গল্পের নামহীন বৃদ্ধ বাঙালি স্বদেশপ্রেমিক, ‘অনন্ত বাসর’ গল্পের জেরিনা উল্লেখযোগ্য।

‘অনন্ত বাসর’ (Ck‡ii cwZØ›Øx) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রেমে প্রতারিত জেরিনাকে জটিল চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করেছেন। বিশৃঙ্খল-নেতিবাচক চিন্তার-পরিপ্রেক্ষিতে জেরিনার দ্বন্দ্বময় আত্মজিজ্ঞাসা জন্ম দেয় মনস্তাত্ত্বিক সংকটের। কিন্তু আবেগঘেরা মানসিকতার অবচেতন স্তর থেকে জেরিনা যখন বাস্তবতার যুক্তিনির্মিত চেতন স্তরে প্রবেশ করে, তখনই সে জীবনের ভিন্ন অর্থ এবং ভিন্ন রূপ খুঁজে পায়। মূলত জেরিনা চরিত্রটি অঙ্কনে লেখক চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু এবং আত্মকথনরীতি ব্যবহার করেছেন। যেমন :

> এতক্ষণ ভুল চিন্তায় বুঁদ ছিলাম। চোরের সঙ্গে আড়ি করে বাসন না কিনে মাটির উপর ভাত তরকারি ঢেলে খেতে যাচ্ছিলাম। আর না, আর না...। তোমার ঠোঁটে অনেক থুতু দিয়েছি। অবশ্যি। সে-টা লেনদেনের ব্যাপার। কিন্তু তোমার মুখে কোনদিন থুতু দিইনি। আজ সেটাই সম্পন্ন করা দরকার। (অনন্ত বাসর ॥ শওকত, ২০০৩ : ৬৫৭)

বাংলাদেশ কালপর্বের নিম্নবিত্ত চরিত্রাঙ্কনে গল্পকার আবার ভিক্টোরীয় রীতি বা আদর্শের অনুরসরণ করেছেন। এ-জাতীয় চরিত্র নির্মাণে গল্পকার নিম্নবিত্ত মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়, তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকেই প্রধান করে তুলেছেন। এ-পর্বে নিম্নবিত্তের প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র হিসেবে তমিজ মিয়া (ক্ষমাবতী), নামহীন কাফন-চোর (এক কাফন-চোরের আত্মকাহিনী) সুবল মাঝি (জনপদে) উল্লেখযোগ্য।

'ক্ষমাবতী' (Rb¥ h¨' Ze e‡½) গল্পে তমিজ মিয়ার পঞ্চদশী কন্যা তহমিনা পাঁচজন পাকসেনার দ্বারা ধর্ষিত হয়ে গোমতী নদীর জলে আত্মবিসর্জন দেয়। পরিণতিতে তমিজ মিয়া বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ-উন্মাদগ্রস্ত তমিজ মিয়ার চরিত্রাঙ্কনে লেখক ব্যবহার করেছেন উলম্ফনরীতি। তবে চরিত্রটির বিকারগ্রস্ত মনঃসংকট, নিঃসঙ্গ মনস্তত্ত্ব উন্মোচনে লেখক বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যা এবং লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের সাথে চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন। যেমন :

> তোমরা যদি কোনদিন আরিচা-নগরবাড়ী- কি ডেমরা- কি মুন্সীগঞ্জ- বাংলাদেশের যে কোন নদীর ঘাটে যাও, হয়ত কোন এক জায়গায় বাউণ্ডেলে তমিজ মিয়ার দেখা পেয়ে যেতে পারো। ...তুই আমার মাফ কইর‌্যা দে, মা— মা— মা— । আমি আর মানুষ নাই, মাফ কইরা দে, মা— মা— মা—। (শওকত, ২০০৩ : ৫০৬)

'এক কাফন-চোরের আত্মকাহিনী' (ci¨Zb LÄi) গল্পে এক নামহীন পেশাদার কাফন-চোরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন। এ-চরিত্রটি নির্মাণে গল্পকার যেমন ঘটনাধর্মিতা-নাটকীয়তার আশ্রয় নিয়েছেন, তেমনি উত্তম পুরুষের বর্ণনসূত্রে তার জীবনিতিহাসের সামগ্রিক রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বাংলাদেশ কালপর্বে শওকত ওসমান একাধিক উচ্চবিত্ত শ্রেণি-চরিত্র নির্মাণ করেছেন। তবে, নিম্নবিত্ত শ্রেণি-চরিত্রের অনুরূপ উচ্চবিত্ত শ্রেণির বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা নয়, তাদের অবস্থানগত বা ব্যক্তিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে রূপদান করাই গল্পকারের উদ্দিষ্ট। যে-সব গল্পে বিত্তবান শ্রেণির প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হয়েছে তার মধ্যে 'গ্রহচ্যুত' (g¨be I Zvnvi KKi), 'মনিব ও তাহার কুকুর' (g¨be I Zvnvi KKi), 'গোয়েন্দা কাহিনীর খসড়া' (g¨be I Zvnvi KKi), 'ধর্মের দোহাই জবর' (g¨be I Zvnvi KKi), 'অসংখ্য শিকড় দুর্বার' (ci¨Zb LÄi), 'কেন মৌন' (Ck‡ii c¨ZØ›Øx), 'স্বৈরিণী' (Ck‡ii c¨ZØ›Øx), 'রত্নাকর : একটি উপন্যাসের খসড়া' (i¨Rci¤l) অন্যতম।

'মনিব ও তাহার কুকুর' গল্পের রাজপুরুষ, 'গোয়েন্দা কাহিনীর খসড়া' গল্পে নারীলোলুপ আলী খান বর্ণনসূত্রে উপস্থাপিত, 'রত্নাকর : একটি উপন্যাসের খসড়া' গল্পের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী হালেক চৌধুরী প্রতারণা এবং অবৈধ পন্থায় সম্পদের পাহাড় গড়েন। অপরদিকে 'গ্রহচ্যুত' গল্পের মিরাজ সরকার, 'ধর্মের দোহাই জবর' গল্পের আত্মস্বার্থচরিতার্থকারী ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার নাগ ও নারীলোভী এ্যান্টনী রিচার্ডসন, 'অসংখ্য শিকড় দুর্বার' গল্পের ব্যবসায়ী মিনহাজ সাহেব, 'স্বৈরিণী' গল্পের কুবাদ চৌধুরী স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা চালিত। এছাড়াও 'কেন মৌন' (Ck‡ii c¨ZØ›Øx) গল্পে মোবেদ মজুমদারকে গল্পকার দেশপ্রেমহীন এক জড় পদার্থের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

শওকত ওসমানের প্রতীকী গল্পের মধ্যে 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পটি যেমন শিল্পসফল, তেমনি এ-গল্পের মুরারী চরিত্রটি ব্যতিক্রম ও চমকপ্রদ চরিত্র হিসেবে উল্লিখিত। আপাতদৃষ্টিতে লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে মুরারী চরিত্র উৎসারিত হলেও প্রকৃতপক্ষে চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দুই শেষ পর্যন্ত প্রধান হয়ে উঠেছে। এর ফলে (চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু-উৎসারিত পরিচর্যা) চরিত্রের অন্তর্জগত হয়ে উঠেছে সংকেতধর্মী, প্রগাঢ় এবং চরিত্রের পরিণামস্পর্শী। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> তিনি সর্বত্র আছেন। জনপ্রিয়তার মধ্যে সে লক্ষণ মেলে, যা সর্বত্র বিরাজমানতার মধ্যে পাওয়া যায়। আমিও তেমন সর্বত্র থাকব। কেন থাকব না? (ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ॥ শওকত, ২০০৩ : ৬৩৮-৬৩৯)

শওকত ওসমান বাংলাদেশ কালপর্বে উচ্চবিত্ত শ্রেণি চরিত্র অপেক্ষা নিম্নবিত্ত শ্রেণি চরিত্র, বিশেষ করে চোর, ডাকাত, দারওয়ান শ্রেণির চরিত্রগুলো উজ্জ্বলরেখায় অঙ্কন করেছেন। তবে, এ-পর্বে সামগ্রিকভাবে দৈশিক ভাবনায় উজ্জীবিত, বিশেষ করে, দেশপ্রেমিক চরিত্রগুলো অঙ্কনেই শওকত ওসমানের কুশলতা ধরা পড়ে। "জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে চরিত্রসমূহ অকৃত্রিম।...শওকত ওসমান সমাজ ও সমকালের গভীরে শেকড় সঞ্চার করে পুনর্জাত হয়েছেন; প্রতীকী চরিত্রের অনুষঙ্গে তুলে এনেছেন সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বাস্তবতা। চরিত্রনির্মাণ প্রশ্নে শওকত ওসমান রূপান্তরশীল, ক্রমবিকাশধর্মী। প্রথম পর্যায়ের চরিত্রসমগ্রে বিদ্যমান আবেগময়তা ক্রমশ পরিশীলিত হয়েছে নাগরিক মননে।...তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো শাশ্বত মানবিকতার অমলিন দ্যুতি। চল্লিশের দশক থেকে জীবনের যে-পাঠ উৎকীর্ণ হয়েছে তাঁর গল্পে, নব্বই-এর দশকের অন্তিম পর্যায়ে এসেও সে জীবন শতধারায়, শতবর্ণে উৎসারিত।" (চঞ্চল, ২০১১ : ৯৩-৯৪)

wZb

বাংলাদেশ কালপর্বে রচিত শওকত ওসমানের গল্পগুলো সমকাল-ভাবনার স্মারকচিহ্ন। পাকিস্তান কালপর্ব অপেক্ষা বাংলাদেশ কালপর্বের গল্পে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি আরও বেশি শানিত-তীক্ষ্ণ এবং পরিশীলিত। এ-পর্বের ঊনপঞ্চাশটি গল্পের তেরটি গল্প উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ এবং একত্রিশটি গল্প সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের আশ্রয় নিয়েছেন। তবে, 'গোয়েন্দা কাহিনীর খসড়া' (gwbe I Zvnvi KKi), 'শিয়া-সুন্নীর পূর্ব পুরুষ' (civZb LÄi), 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' (Ck‡ii cwZØ›Øx), 'স্বৈরিণী' (Ck‡ii cwZØ›Øx) এবং 'হন্তারক' (nšÍviK) গল্প পাঁচটিতে একই সাথে উত্তম পুরুষ এবং সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহার করেছেন।

শওকত ওসমান এ কালপর্বের গল্পে বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশপ্রেমমূলক গল্পগুলো কখনও উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণে উপস্থাপিত, আবার কখনও তা সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের আলোকে বর্ণিত। এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গল্পের মধ্যে 'আলোক-অন্বেষা' (Rb¥ hw' Ze e‡½), 'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া' (Rb¥ hw' Ze e‡½), 'সারেঙ সুখানী' (Rb¥ hw' Ze e‡½), 'বার্তাবহ' (Rb¥ hw' Ze e‡½), 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' (Rb¥ hw' Ze e‡½), 'রক্ত চিহ্ন' (Rb¥ hw' Ze e‡½), 'ক্ষমাবতী'

(Rb¨ hw' Ze e‡½), 'জননী : জন্মভূমি' (Rb¨ hw' Ze e‡½), 'এবং তিন মির্জা' (Ges wZb wgR©v), 'দ্বিতীয় অভিসার' (Ges wZb wgR©v), 'নিজের লাশ লইয়া' (ciwZb LÄi), 'স্বজন স্বজাতি' (iwRciæl) উল্লেখযোগ্য । এখানে এ জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধারণকারী একটি গল্প থেকে উদাহরণ উপস্থাপিত হলো :

> বন্ধুগণ, তোমরা কেউ কেউ ভাবতে পারো, শত্রুর হাতে আমার লাশ পড়বে। ত পড়ুক। পরে পুঁতে দেবে মাটিতে। জননী বাঙলাদেশের মাটির বুকে ঘুমাবো...তার চেয়ে প্রশান্তিময় আর কী আছে দুনিয়ায়।... অতঃপর তিনি আবার ক্লান্ত হাত নাড়লেন। যে ইশারার একটি মাত্র অর্থ হতে পারে, 'তোমরা তাড়াতাড়ি সরে পড়ো।' (এবং তিন মির্জা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫২৮)

শওকত ওসমান এ-পর্বে উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণের সাথে চরিত্রের দৃষ্টিকোণের সমবায়িত রূপের মাধ্যমে গল্প-পরিবেশ এবং গল্প-ঘটনা, ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে আরও বেগবান করতে সমর্থ হয়েছেন। যেমন লেখক 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' গল্পে সংগ্রামশীল অগ্নিগর্ভ জীবনচেতনার রূপায়ণ করতে গিয়ে চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দুকে গল্পের দৃষ্টিকোণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এ-ধরনের গল্পের মধ্যে 'কে প্রাদে' (gwbe I Zvnvi KKi), 'মনিব ও তাহার কুকুর' (gwbe I Zvnvi KKi), 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' (Ck‡ii cwZØ›Øx) গল্পগুলো অন্যতম।

এছাড়াও সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের সাথে চরিত্রের দৃষ্টিকোণের ব্যবহারেও তিনি কিছু গল্প রচনা করেছেন। এ-ধর্মী গল্পের মধ্যে 'দুই ব্রিগেডিয়ার' (Rb¨ hw' Ze e‡½), 'ভারতীয় গোয়েন্দা' (Rb¨ hw' Ze e‡½), 'ওয়াগন ব্রেকার' (Rb¨ hw' Ze e‡½), 'ফয়সালা' (Ges wZb wgRv), 'শেষ আগে শুরু হয়' (Ges wZb wgR©v), 'দম্পতি' (Ges wZb wgRv), 'দ্বিতীয় অভিসার' (Ges wZb wgRv), 'দস্যু-দারোগা সংবাদ' (ciwZb LÄi), 'ফলাফল জানা ছিল না' (iwRciæl) অন্যতম। সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের সঙ্গে চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দুর সমন্বয়ে তৈরি গল্পের কাহিনি গতি লাভ করে, আখ্যানভাগ হয়ে ওঠে নাটকীয়। যেমন :

> (ক) পুলিশের যা খবর– দিনে দুপুরে মিলের বেতন আনছিল গাড়ী করে– তার উপর অমন জায়গায় হামলা কম দুঃসাহস নয়। তিনজনই পুলিশের গুলিতে নিহত।....আমি ত আপনাদের গাঁয়ের ঠিকানা জানিনে। নচেৎ আমিই খবর দিতে যেতাম। খবরের কাগজটা আমার–" গিয়াস হঠাৎ থেমে গিয়েছিল।
> -"কেন এমন হোলো, বাবা?" বৃদ্ধ প্রায় ডুকরে ওঠেন।
> -"চাচা, বেওয়ারিশ কবর এখানে। আপনি আর কাঁদবেন না। যুদ্ধের কাজ ফুরিয়ে গেছে। তাই এখন আমরা বেওয়ারিশ।" (ওয়াগান ব্রেকার ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫১৮)
> (খ) আমি মেয়ে নিয়ে গাঁয়ে ফিরে যাব। আমার মেয়ে বাঁচবে না। আমি বদদোয়া দিয়ে যাচ্ছি, এই দেশ থেকে আল্লা তোমার নাম নিশানা মুছে দেবে, কাকপক্ষীও আর জানবে না। (ফলাফল জানা ছিল না ॥ শওকত, ২০০৩ : ৭১৫)

শওকত ওসমান তিন কালপর্বের ছোটগল্পেই নিজের মতো করে কিছু গল্পে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, যা একান্তই গল্পকারের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির মত-পথ-ভাষার সমন্বয়ে সৃষ্টি। এ-গল্পগুলোর মধ্যে ‘কবন্ধ কাহিনী’ (ci\Zb LÄi), ‘শিয়া-সুন্নীর পূর্ব পুরুষ’ (ci\Zb LÄi), ‘কুটিলা ভবেৎ’ (Ck‡ii cwZØ›Øx), ‘রত্নাকর : একটি উপন্যাসের খসড়া’ (i\Rciæl), ‘হন্তারক’ (nšÍ\iK) স্মরণযোগ্য। এ-জাতীয় গল্প-রচনায় লেখক উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণকে ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া এ-ধরনের গল্প-কাহিনির মূলে প্রবেশ করার পূর্বেই গল্পকার নিজের মতো করে একটি ভূমিকাংশ বা টীকা-টিপ্পনি দ্বারা গল্পরচনার ইতিহাস বা প্রেক্ষাপটকে তুলে এনেছেন। যেমন ‘রত্নাকর : একটি উপন্যাসের খসড়া’ গল্পের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ-গল্পটিকে গল্পকার পাঁচটি অংশে বিভক্ত করে প্রথম অংশটিতে শুধু ঈশপ এবং তাঁর নীতিকথার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, গল্পের মূল কাহিনি আরম্ভ করেছেন দ্বিতীয় অংশ থেকে। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> ঈশপের এই উপন্যাস লেখা উচিত ছিল। তাঁর নীতিগল্পগুলো সঙ্গে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে পরিচিত।...আমাদের প্রকল্পিত উপন্যাসে উপদেশমূলক সিদ্ধান্ত আছে। তাই গোড়ায় উল্লেখিত, ঈশপই এই উপন্যাস সুচারুরূপে লিখতে পারতেন। (রত্নাকর : একটি উপন্যাসের খসড়া ॥ শওকত, ২০০৩ : ৭১৬-৭১৭)

বাংলাদেশ কালপর্বের কয়েকটি গল্প চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতীকায়িত। গল্পের চরিত্রের আত্মকথন প্রক্রিয়ার সাহায্যে এ-গল্পগুলোর শরীর নির্মিত। ‘জন্ম যদি তব বঙ্গে’ (Rb¥ hw‘ Ze e‡½), ‘নিজের লাশ লইয়া’ (ci\Zb LÄi), ‘অনন্ত বাসর’ (Ck‡ii cwZØ›Øx) এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে।

শওকত ওসমানের বাংলাদেশ কালপর্বের গল্পের পরিচর্যায় বিবরণধর্মিতার ব্যবহার তিরোহিত। ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান কালপর্বের গল্পে ব্যবহৃত বর্ণনাধর্মিতা সময়ের হাত ধরে যেন প্রতীকধর্মিতায় রূপান্তরিত হয়েছে। “পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে প্রতীকের সরলায়িত ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও স্বাধীনতা-উত্তর ছোটগল্পে প্রতীক মূলত মননস্পর্শী হয়ে ওঠে। আশির দশকের ছোটগল্পে প্রতীকের সূক্ষ্মব্যঞ্জনাধর্মী প্রকাশে” (চঞ্চল, ২০১১ : ১৩৩) শওকত ওসমানের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত। বাংলাদেশ কালপর্বে যে-সব গল্পে প্রতীকী পরিচর্যার ব্যবহার ফুটে উঠেছে তার মধ্যে ‘বার্তাবহ’ (Rb¥ hw‘ Ze e‡½), ‘জন্ম যদি তব বঙ্গে’ (Rb¥ hw‘ Ze e‡½), ‘দ্বিতীয় অভিসার’ (Ges wZb wgR©), ‘মনিব ও তাহার কুকুর’ (gwbe I Z\n\i KKi), ‘নিজের লাশ লইয়া’ (ci\Zb LÄi), ‘অসংখ্য শিকড় দুর্বার’ (ci\Zb LÄi), ‘কুটিলা ভবেৎ’ (Ck‡ii cwZØ›Øx) অন্যতম। যেমন ‘নিজের লাশ লইয়া’ গল্পটির কথাই উল্লেখ করা যেতে পারে। গল্পটিতে শুধু প্রতীকী পরিচর্যায় নয়—গল্পটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনি প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত। উত্তম পুরুষে বর্ণিত এ-গল্পে ইতিহাসে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার বিষয়টিকে গল্পকার প্রতীকীমূল্যে তুলে ধরেছেন। উদাহরণ :

‘কুটিলা ভবেৎ’ গল্পে মাহেলার প্রতি সাজেদের প্রচণ্ড আকর্ষণ আবার মাহেলা কর্তৃক সাজেদকে ছেড়ে যাওয়ার তীব্র ইচ্ছাশক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীকী চিত্রকল্পে গল্পের পরিণাম নির্দেশিত :

> ট্রেন জোরেই চলতে শুরু করেছে। দরজার মুখে তেমনই দাঁড়িয়ে আছে মাহেলা। হঠাৎ ইঞ্জিন চাপ-চাপ ধোঁয়া উগরাতে লাগল। আশেপাশে আর কিছুই দেখা যায় না। (কুটিলা ভবেৎ ॥ শওকত, ২০০৩ : ৬৪৩)

আয়তনের স্বল্পতা, ক্লাইম্যাক্সের দিকে ঘটনার একমুখী গতি, কম সংখ্যক চরিত্রের সন্নিবেশ, শিল্পরূপের সংহত প্রাণশক্তি আধুনিক ছোটগল্পের প্রধান লক্ষণ বলে বিবেচনা করা হয়। আবার এগুলোর মধ্যে শীর্ষবিন্দু বা ক্ল্যাইমেক্স-এর বিস্তারের ওপরই ছোটগল্পের গঠনবিন্যাস নির্ভর করে। এ-পর্বের একাধিক গল্পে লেখক ক্লাইম্যাক্স বা নাটকীয় পরিচর্যার ব্যবহার করেছেন। এ পর্বে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গল্পে গল্পকার একই সাথে নাটকীয়তা, আবেগধর্মিতা, ঘটনার উত্তরোল প্রবাহের মধ্য দিয়ে প্লট নির্মাণ করে গল্পের বাস্তবতাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। এ-জাতীয় গল্পের মধ্যে ‘বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া’ (Rb¨ hw‘ Ze e‡½), ‘সারেঙ সুখানী’ (Rb¨ hw‘ Ze e‡½), ‘বার্তাবহ’ (Rb¨ hw‘ Ze e‡½), ‘রক্তচিহ্ন’ (Rb¨ hw‘ Ze e‡½), ‘ওয়াগান ব্রেকার’ (Rb¨ hw‘ Ze e‡½), ‘এবং তিন মির্জা’ (Ges wZb wgR©v), ‘ফয়সালা’ (Ges wZb wgR©v), ‘দ্বিতীয় অভিসার’ (Ges wZb wgR©v), ‘ধর্মের দোহাই জবর’ (gwbe I Zvnvi KKi), ‘ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী’ (Ck¦‡ii cwZØ›Øx) উল্লেখযোগ্য। গল্প থেকে উদ্ধৃতি :

> (ক) ঝাঁপিয়ে পড়ার পর বাংলার নদী কিছুক্ষণ আলিঙ্গনে আলিঙ্গনে সারেঙকে নিয়ে লোফালোফি করেছিল, যখন লাল হয়ে উঠেছিল পানির সমতল প্রৌঢ় মানুষের রক্তে। একসময় তলিয়ে যেতে হয় সমস্ত বারিরাশির স্নেহের ভিতরে, যখন নির্বাত হয়ে আসে অতলান্ত মেঘনার অন্তর্জগত। (সারেঙ সুখানী ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৯০)
>
> (খ) ঘাট থেকে মাঠ থেকে যে-যেখানে থেকে পারে ছুটে আসছে। আব্রুভীতু গৃহবধূ এগিয়ে আসছে ঘোমটা টেনে গাছ-গাছালীর আড়াল সম্বল করে। নচেৎ যে-ব্যক্তি বাংলাদেশের সংবাদ বয়ে এনেছে, তার জানাযায় শরীক না হলে যে সারা জীবন আফসোস থেকে যাবে। (বার্তাবহ ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৯২)

‘দ্বিতীয় অভিসার’ (Ges wZb wgR©v) গল্পে একই সাথে আবেগধর্মিতা-ঘটনাধর্মিতা এবং নাটকীয়তার মেল-বন্ধন লক্ষ করা যায়। এ-গল্পে মাজুর গর্ভে পাকসেনাদের ঔরসজাত সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে ধলেশ্বরী নদীতে বিসর্জন দিতে গিয়ে গল্পে জমাট বেঁধেছে নাটকীয়তা। যেমন :

> মাজু ককিয়ে উঠল ‘মরিয়ম বুবু, আপনার পায়ে পড়ি। লন আপনে ফেইলা দেন।’
> ‘আমি পারুম না।’ মরিয়ম সাফ জবাব দিল।
> মাজু পুটলি বুকে, মাটির উপর বসে পড়ে ডুকরে উঠছিল। কান্না, গোঙ্গানি, কথা তখন একত্র জড়িত। (দ্বিতীয় অভিসার ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫৫৪)

শওকত ওসমান "জীবন ও বাস্তবতার প্রত্যক্ষ অভিনিবেশ সৃষ্টির জন্য তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্পে নাটকীয় রীতির প্রয়োগ করেছেন।...তিনি নিজেও একজন নাট্যকার বিধায় তাঁর ছোটগল্পে নাটকীয়তার সংযুক্তি বলিষ্ঠ ও উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয়।" (অনীক, ১৯৯৫ : ২৬৭) তাঁর এ-জাতীয় গল্পের মধ্যে 'ফয়সালা' (Ges ॥Zb ॥gRv॥), 'শেষ আগে শুরু হয়' (Ges ॥Zb ॥gRv॥), 'দম্পতি' (Ges ॥Zb ॥gRv॥), 'শিয়া-সুন্নীর পূর্ব পুরুষ' (ci\Zb LÄi), 'ফলাফল জানা ছিল না' (i\Rci$l) প্রভৃতি। এ-পর্বের গল্পে ব্যবহৃত সংলাপধর্মিতার উদাহরণ :

(ক)-সবাই হাত পাতে না। বুঝতে পারছো?
-জী না।
-কী করে জানো?
-না, স্যার।
-হাত উপুড় করে। বুঝলে? (ফয়সালা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫৩৩)
(খ) মানব। ছেড়ে দাও লক্ষ্মী।
মানবী। না।
মানব। টেলিফোন ধরে আসি।
মানবী। না।
মানব। আর জড়িও না।
মানবী। বাজুক না যত খুশী। (দম্পতি ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫৪০)

শওকত ওসমান এ-পর্বের একাধিক গল্পে প্রবাদ-প্রবচনেরও ব্যবহার করেছেন। যেমন :

(ক) যা বিষ, তাই আবার বিষহর। (আলোক অন্বেষা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৮০)
(খ) কালির আখর কাজে লাগে আখরে। (ফয়সালা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫২৮)
(গ) যাদৃশ্য ভাবনা যস্য। (শেষ আগে শুরু হয় ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫৩৪)
(ঘ) নিয়ৎগুণে বরকত, বাসনাগুণে মাহাত্ম্য। (গোয়েন্দা কাহিনীর খসড়া ॥ শওকত, ২০০৩ ৫৭৮)
(ঙ) খো বদেরা বাহানা বেশিয়ার, বদ লোকের বাহানা বহু। (হন্তারক ॥ শওকত, ১৯৯১ : ২২)
(চ) আপনি বাঁচি তো বাপের নাম। (হন্তারক ॥ শওকত, ১৯৯১ : ২৫)
(ছ) অজ্ঞানতাই সকল ঘৃণার উৎস, পাপের উৎস, অপরাধের উৎস। (হন্তারক ॥ শওকত, ১৯৯১ : ২৭)
(জ) অভাবই যত দুর্দশার মূল। (হন্তারক ॥ শওকত, ১৯৯১ : ৩২)

শওকত ওসমান এ-পর্বে গল্পে নাট্যিক পরিচর্যার সাথে চিত্রাত্মক পরিচর্যার ব্যবহার করে ভাষাকে অলঙ্কারমণ্ডিত করে তুলেছেন। এর ফলে গল্পের শিল্প-সৌকর্য সহজেই পাঠকের চোখে ধরা পড়ে। এ-ধরনের গল্পের মধ্যে 'আলোক অন্বেষা' (Rb¨ h॥' Ze e‡½), 'সারেঙ সুখানী' (Rb¨ h॥' Ze e‡½), 'ফয়সালা' (Ges ॥Zb ॥gRv॥), 'দম্পতি' (Ges ॥Zb ॥gRv॥), 'নিজের লাশ লইয়া' (ci\Zb LÄi) উল্লেখযোগ্য। গল্পকারের চিত্রাত্মক পরিচর্যার উদাহরণ :

> তবু হাতড়ে ফেরা দৃষ্টি ফেটির মধ্যেই ছবি আঁকতে থাকে। অজস্র বুদ্‌বুদ্‌, অজস্র রঙের স্রোত কেবল অক্ষিপটের ভেতর দিয়ে হু হু ঢুকে যাচ্ছে গন্তব্যহীন যাত্রায়। (আলোক-অন্বেষা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৭৯)

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া শওকত ওসমান এ-পর্বে ‘জন্ম যদি তব বঙ্গে’ (Rb¥ hw‘ Ze e‡½), ‘নিজের লাশ লইয়া’ (ciVZb LÄi) এবং ‘অনন্ত বাসর’ (Ck‡ii cwZØ›Øx) গল্পে মনস্তাত্ত্বিক পরিচর্যার সাহায্যে আখ্যানভাগ গড়ে তুলেছেন।

শওকত ওসমানের গল্পের “বিষয়ের পরিবেশনা যেমন উজ্জ্বল ও স্বতস্ফূর্ত, তার নাটকীয়তা তেমনি মৃদুমধুর: সংলাপ-সৃষ্টিতে বুদ্ধির চাতুর্য লক্ষযোগ্য এবং শিল্পময় ভাবনার ত্বরিত উদ্ভাবনা ও তার যথোপযুক্ত প্রয়োগ-কৌশল তাঁর ছোটগল্পের স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত বিজয়।” (আজহার, ১৯৯৬ : ১১৭)

Pvi : fvlv e¨envi

ছোটগল্প এক ধরনের ‘ইমপ্রেশনিস্ট’ শিল্পরূপ। একটিমাত্র প্লট, অল্প দু-একটি চরিত্রের খণ্ড-অভিজ্ঞতা, কয়েকটি বাছাই করা ঘটনার মধ্যে দিয়ে দ্রুত একটি প্রতীতিগত ঐক্যে পৌছানোই ছোটগল্প-লেখকের অভ্রান্ত লক্ষ্য। আর এ-জন্য লেখককে ছোটগল্পের শিল্পরূপের সংহত প্রাণশক্তি প্রকাশে ভাষা-ব্যবহারে অত্যন্ত সচেতনতার পরিচয় দিতে হয়। শওকত ওসমান তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনের পথপরিক্রমায় “বক্তব্য ও বাগভঙ্গির যে সাধনা করেছেন, তা অবশ্যই তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশক ও স্বকীয় দ্যোতনার পরিবাহী। রচনার বিষয় নির্বাচনে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর যেমন নিজস্বতা আছে, অনুরূপভাবে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও রয়েছে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি” (অনীক, ১৯৯৫ : ২৫১) যার প্রমাণ তিনি তিন কালপর্বের গল্পেই রেখেছেন।

বাংলাদেশ কালপর্বের উনপঞ্চাশটি গল্পের সবগুলোই চলিত রীতিতে রচিত। এ-পর্বের গল্প-ভাষা সাধারণত আবেগতাড়িত, কোথাও ত্রস্ত-অস্থির, কোথাও শানিত প্রতিক্রিয়ায় উজ্জ্বল, আবার কোথাও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের আধার। তাছাড়া এ পর্যায়ে শওকত ওসমানের ব্যঙ্গ ও শ্লেষাত্মক কটাক্ষ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। শব্দ ব্যবহারে গল্পকারের শুচিবায়ুগ্রস্ততা নেই, বাস্তবতাই তাঁর অন্বিষ্ট। গল্পে তিনি দেশজ শব্দ থেকে আরম্ভ করে আঞ্চলিক, সংস্কৃত, আরবি-ফারসি-উর্দু-ইংরেজি সব ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাঁর ভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মন্তব্য করেন:

> তিনি ঘোরতরভাবে সমকাল সচেতন।...বয়স তাঁকে ভোতা করে না, বরং বয়সের সঙ্গে তাঁর অনুভূতি আরো ধারালো, আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।...অবিরাম তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া শওকত ওসমানের রচনায় অস্থির ছায়া ফেলে। তাঁর বাক্য হয়ে আসছে ছোটো ও তীক্ষ্ণ। ব্যঙ্গ করে ও শ্লেষ মিশিয়ে কথা বলার প্রবণতা তাঁর এখন অনেক বেশি। যখন তিনি বিদেশী শব্দ প্রয়োগ করেন— এ কেবল ভাষাকে গয়না পরাবার সখ মেটানোর জন্য নয়, তীব্র প্রতিক্রিয়াকে শানিত করে বলাই এ ধরনের শব্দ ব্যবহারের একমাত্র লক্ষ্য। সাহিত্যিক শওকত ওসমানের যে বৈশিষ্ট্য আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে এবং মুগ্ধ করে তাহল তার গল্পে (কখনও-বা উপন্যাসের সংলাপে) ‘বুদ্ধিদীপ্ত বাককুশলতা যা বিদ্যুতবিভার চরিত্র নিয়ে প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

পায়। 'উইট' শব্দটির লাগসই এবং পছন্দমত প্রতিশব্দ অভিধানে মেলেনা, তাই মূল শব্দেই বলি— এই 'উইট' এর ব্যবহারে আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে শওকত ওসমানের তুলনা বিরল, প্রায় নেই বললেই চলে। এখানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীহীন বলা যেতে পারে।' (আখতারুজ্জামান, ১৯৯১ : ১১২)

শওকত ওসমানের বাংলাদেশ কালপর্বে রচিত একাধিক গল্পে উর্দু ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায় । এ-পর্বের গল্পে উর্দু ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে গল্পকারের উদ্দিষ্ট গল্পের আবহ তৈরি, পাক হানাদার বাহিনীর স্বরূপ উন্মোচন, চরিত্রসমূহকে প্রাণবন্ত রূপ দেওয়া এবং বাস্তবের কঠিন মাটিতে গল্পের ভিত্তিভূমি নির্মাণ করা। এ-জাতীয় গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'আলোক-অন্বেষা' (Rbś hw' Ze e‡½), 'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া' (Rbś hw' Ze e‡½), 'সারেঙ সুখানী' (Rbś hw' Ze e‡½), 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' (Rbś hw' Ze e‡½), 'রক্তচিহ্ন' (Rbś hw' Ze e‡½), 'দুই ব্রিগেডিয়ার' (Rbś hw' Ze e‡½), 'জননী : জন্মভূমি' (Rbś hw' Ze e‡½) উল্লেখযোগ্য। গল্পকারের উর্দু ভাষা ব্যবহারের নমুনা :

(ক) মেরা সাথ আও। এই রশি পাকড়ো। বাঙালীকা বাচ্চা ইধার উধার করেগা তো পেট মে কিরীচ ঘুঁসা দুংগা। (আলোক-অন্বেষা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৮৩)
(খ) স্টুডেন্ট লোগ বড়া বদমাস। বাংলাদেশ, বাংলাদেশ করতা হ্যায়, শোর মাচাতা হ্যায়। উসকা সাজা ভি হামলোগ দিয়া। (বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৮৪)
(গ) -ও বইদ বাজার কিৎনা দূর? (সারেঙ সুখানী ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৯০)
(ঘ) মুকুত বাহিনী কিদার জানতা? (জন্ম যদি তব বঙ্গে ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৯৪)
(ঙ) গনী খান কা দাদ লেনা হায়। (রক্তচিহ্ন ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৯৮)
(চ) 'ভাইলোগ আপলোগ মেরা সব ফায়ারম্যান কো কিঁউ মারা...হাম লোগ সব ডিউটি মে নিকলা...শহর মে আগ (আগুন) লাগা...হাম লোগ সব ফ্রায়ার ব্রিগেড কা আদমী।' (দুই ব্রিগেডিয়ার ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫০১)
(ছ) দেখো, ইয়ে বাংগালী শালা কিয়া বোলতা? ইসকো মুখ মে পাকিস্তান নেহী আতা। (ভারতীয় গোয়েন্দা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫০৯)
(জ) ছোড়নেওয়ালা বান্দা নেহি। (জননী : জন্মভূমি ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫১৩)
(ঝ) ইসিকো মঞ্জুর কর লিজিয়ে। দুলা মিয়া কা আওকাত হ্যায়, পিছে খরিদ দেংগে। (ফয়সালা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫৩৩)
(ঞ) স্যার উঠ জাইয়ে। আপনা আপনা কামরা মে যা-কে শোইয়ে। (রাজপুরুষ ॥ শওকত, ২০০৩ : ৬৯৮)

শওকত ওসমান তিন কালপর্বের গল্পেই উপভাষার বহুবিধ ব্যবহার করেছেন। গল্প-কাহিনিতে উপভাষার ভাষা ব্যবহারের কারণে পাঠকের সম্মুখে একটি ভৌগোলিক অঞ্চল এবং সে-অঞ্চলের মানুষ সম্পর্ক একটি প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। যেমন :

(ক) জ্যাডা, তলদি নল আছে যে ইবার মুখ খুলি দিবি। ফানি ফডের অরধেক অইলে তোরা বেগগুনে ফানির মদ্দি ঝাঁপ দিস। (সারেঙ সুখানী ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৯০)
(খ) খান্‌কির পুৎ মুসলিম লীগারগুলো বারাইছে চুপ কইরা যাও। (বার্তাবহ ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৯২)
(গ) দ্যাশ স্বাধীন হৈছে, আরো মেহনৎ করা লাইগব। দ্যাশ গড়তা হৈব না? অত আরাম চাইলে খাসলৎ খারাপ হৈয়া যাইব। (ওয়াগান ব্রেকার ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫১৫)
(ঘ) দ্যাশ ত অহন কসাইখানা। কখন কার কল্লাডা ঘাড়থন খইস্যা যাইব কেউ জানে না। তাই কি আর মন ভালা থাহে? (কেন মৌন ॥ শওওকত, ২০০৩ : ৬৮০)
(ঙ) লুইত ন চা? অর্থাৎ লৌকিকতা চাও না? (স্বজন স্বজাতি ॥ শওকত, ২০০৩ : ৭২৪)
(চ) এই শালা হিজু তুই আর কাজ খুঁজে পেলিনে। (হন্তারক ॥ শওকত, ১৯৯১ : ৭)
(ছ) আছে শুধু খেদমত তা পালন করার সময় একটু এদিক ওদিক হলি ধড়ে কল্লা নেই। (হন্তারক ॥ শওকত, ১৯৯১ : ১১)

শওকত ওসমান গল্পে উর্দু এবং ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে উর্দু-ইংরেজির পাশাপাশি ব্রাকেটবন্দি করে সে-ভাষার বাংলা অর্থও উল্লেখ করেছেন। এর ফলে ক্ষেত্রবিশেষে ভাষায় এসেছে ধীরগতি ও কোথাও পৌনঃপুনিকতা। তবে, এ-জাতীয় ভাষা ব্যবহারে তাঁর দুটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে । যথা :

(১) সবার কাছে গল্পটিকে বোধগম্য করে তোলা।
(২) সবশ্রেণির মানুষের কাছে গল্পটিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা।

বিভিন্ন গল্পে ব্যবহৃত এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভাষার নমুনা :

(ক) দেশ কো ভী তোমলোগ মা বোলতা (অর্থাৎ দেশকেও ত তোমরা মা বলো) ওসব বাৎ-কা-বাৎ।" (জননী : জন্মভূমি ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫১৪)
(খ) "আই এ্যাম দি হ্যাপিয়েস্ট ম্যান হোয়েন আই এ্যাম দি বজম অফ সামবডিজ ওয়াইফ।" (আমি চরম সুখ পাই, যখন অন্য কোন জনের স্ত্রীর বুকে আমি আরোহী) / (এবং তিন মির্জা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫২২)
(গ) যো জেয়াদা কামাতে ও ভী মাহাংগা কা দিন, খুব ফারাগত সে রহ নেহি সাকতে। অর্থাৎ যে যা আয় করে, বেশী মাইনে দিলেও সকলে স্বচ্ছন্দে সংসার চালাতে পারে না। (ফয়সালা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫৩৩)
(ঘ) 'বেকার লিক্‌তার সুলতান লিকতার।' To be a bachalor is to be a sultan. অর্থাৎ কুমার জীবন সুলতানের জীবন। (কে প্রাদে ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫৬৬)
(ঙ) "আরে চাচ্চা, বাদশা, দেখ দেখ– এহি শুয়ার কা বাচ্চা লোগ পাকিস্তান চালাতো আওর চালায়েগা।" (চেয়ে দ্যাখ, এই শুয়োরের বাচ্চারা পাকিস্তান চালায় এবং চালাবে) (রাজপুরুষ ॥ শওকত, ২০০৩ : ৯৮)

শওকত ওসমানের কথাসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা বরাবরই সক্রিয় থেকেছে কখনও তা ব্যঙ্গের আবরণে আবার কখনও তা রূপক-প্রতীকের সংমিশ্রণে। "তাঁর ব্যঙ্গ প্রায়ই ছাপিয়ে ওঠে তাঁর বক্তব্যকে, গল্পের চরিত্রের স্বভাবও আকার উপচে ওঠে তাঁর প্রতিক্রিয়া। প্রথম দিকের রচনায় তাঁর

ঝাঁঝ কম, কথা বলার স্বর একটু নিচু, কিন্তু তাতে পাঠককে স্পর্শ করতে, এমনকি ধাক্কা দিতেও কোনো অসুবিধা হয় নি।” (আখতারুজ্জামান, ১৯৯১ : ১১২) সাহিত্যিক হিসেবে বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর এ-ভাষাশৈলী আরও বেগবান হয়েছে, যার প্রমাণ গল্পগুলোর পাশাপাশি wbR¯ msev‘ ‘vZv †cwiZ (১৯৮২), †k‡Li m¤iv 1g I 2q LÐ (১৯৯২) ব্যঙ্গধর্মী কাব্যগ্রন্থে এবং bóf vb AóZvb (১৯৮৬) নাটকে স্পষ্ট। “মানুষের তৈরি সমাজ মানুষের জীবনের জন্যেই কখনো কখনো অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়, এই অবস্থায় সমাজের প্রতি ব্যঙ্গের কশাঘাত হানতে শিল্পী যদি নির্বিকার থাকেন, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া চলে না। সেজন্যে দেখি মানুষ যেখানে দুর্বল, শওকত ওসমান সেখানে কৌতুকপ্রবণ, অন্যদিকে সমাজ যেখানে নিষ্ঠুর, তিনি সেখানে ব্যঙ্গপ্রবণ।” (আজহার, ১৯৯৬ : ১০৬) শওকত ওসমানের গল্পসমূহ থেকে কিছু ‘উইট’-এর ব্যবহার উদ্ধৃত হলো :

(ক) ইয়ে বাংলা মুলুক সব শুষ লেতা, সব শুষে নেয়। তোম ভি বাংলা শিখতা হ্যায়? (জন্ম যদি তব বঙ্গে ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৯৪)

(খ) রক্তের দাগ ধরে ডালকুত্তারা শিকার খুঁজে বের করে। এই ডালকুত্তারা আবার মানুষ। কুকুরের চেয়ে হিংস্র এবং আক্কেল ঢের বেশি। (রক্ত চিহ্ন ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৯৮)

(গ) কুকুর কামড় দিলে মানুষ কি মানুষ মনে রাখে, না পা কাইট্যা ফেলে?...জানোয়ারকে মানুষ মাফ কইর‌্যা দ্যায়। মাফ কইর‌্যা দে মা– জানোয়াররে মাফ কইর‌্যা দে...। (ক্ষমাবতী ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫০৫)

(ঘ) জবাব দিলে দারোগা, “লোকটা গ্রামের হাটের মধ্যে প্রেসিডেন্টকে গাল দিচ্ছিল।” কী গাল? তারও জবাব দিলে ওসি। “আইয়ুব খান মাদার্চোদ, ভুট্টো বেটিচোদ– আরো নানা রকম খিস্তি।” (ভারতীয় গোয়েন্দা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫০৮)

(ঙ) যুদ্ধের কাজ ত ফুরিয়ে গেছে। তাই এখন আমরা বেওয়ারিশ (ওয়াগন ব্রেকার ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫১৮)

(চ) ইতিহাস লাথি মেরে যাদের পেছনে ধাক্কিয়ে ফেলে দেয়, তারা সবসময় কেয়ামত দেখে। (ন্যায়-অন্যায় ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫৪৬)

(ছ) চৌধুরানী নাইলনের শাড়ী পরে উঠে এসেছেন।...দশ বছর আগে শওকত ওসমানের একটি গল্পে নাইলনের বৈশিষ্ট্য পড়েছিলাম : এই পরিচ্ছদ কাঁটাতার–ঘেরা সরকারী সংরক্ষিত এলাকার মত। মাল হেফাজতে রাখে কিন্তু দৃষ্টির কোন ব্যাঘাত ঘটায় না। (কে প্রাদে ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫৭০)

(জ) পশুর কাছ উলঙ্গ থাকতে মানুষের কোন লজ্জা থাকার কথা নয়। এক পশু বেমালুম ন্যাংটো থাকে অন্য পশু সমীপে। (মনিব ও তাহার কুকুর ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫৭৬)

শওকত ওসমানের সাহিত্যিকজীবনের শেষ পর্যায়েও গল্পের কাব্যিক ভাষা তাঁকে ছাড়েনি কিংবা তিনি কাব্যিকতাকে ছাড়েননি। ফলে, এ-পর্বের গল্প-শরীরও উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্পের রঙে রঙিন। কিন্তু সে রঙ কখনও কবিতার কাল্পনিক রঙে রাঙানো নয়, বিষয়কে স্পষ্টতর ব্যঞ্জিত করাই তার লক্ষ্য। এ-জাতীয় অলঙ্কার ব্যবহার কখনও প্রকৃতি, কখনও চলমান ঘটনা আবার কখনও ব্যক্তির যাপিত জীবনের প্রতিচ্ছবি থেকেই রংধনুর মতো রং ছড়িয়েছে এ-পর্বের গল্পে। যেমন:

Dcgv

(ক) দেহ বকুল ফুলের মত শুকিয়ে গেলেও সহজে সৌরভ হারায় না। (আলোক-অন্বেষা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৮০)

(খ) পানকৌড়ির মত হঠাৎ ডুব, হঠাৎ ভাসা কায়দা আর কতক্ষণ তার সহায় হতে পারে? (সারেঙ সুখানী ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৮৭)

(গ) নিদ্রিত জনের দেহাভ্যন্তরে রক্ত চলাচলের নিঃশব্দ নিনাদের মতো। (দ্বিতীয় অভিসার ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫৫২)

(ঘ) বিদেশী শাসন ক্রমশ সাপের মত দেশের অঙ্গে অঙ্গে বেড় দিয়ে ফুঁসছিল। (এবং তিন মির্জা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫২২)

(ঙ) নানা ঝড় ঝাপ্টায় ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো মৃত্তিকা-লগ্ন। (পুরাতন খঞ্জর ॥ শওকত, ২০০৩ : ৬০০)

(চ) বর্ধিষ্ণু শহরের শিং ষাঁড়ের মত মাটি গুতিয়ে-গুতিয়ে এগোয়। (ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ॥ শওকত, ২০০৩ : ৬৩৯)

(ছ) তখন সদ্য পাশ ডাক্তারের মনে হোলো চুনী তাকে বড়শী গাঁথা মাছের মত এতদিন খেলিয়েছে মাত্র। (ফলাফল জানা ছিল না ॥ শওকত, ২০০৩ : ৭১৪)

(জ) শরীরের ভাঁজ যেন দূরগামী কোনো নদীর মোচড়-খাওয়া আকস্মিক আবর্ত। (হন্তারক ॥ শওকত, ১৯৯১ : ১৯)

mgv‡mvw³

(ক) বিপদ তো পথেই তাদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। (আলোক-অন্বেষা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৮০)

(খ) বাংলাদেশের বর্ষার আকাশ হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। (বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৮৫)

(গ) দুরন্ত ঢেউ সব মুছে দিতেই যেন অমন দাবড়ি মেরে উঠে। (সারেঙ সুখানী ॥ শওকত, ২০০৩ : ৮৭)

(ঘ) মৃত্যুর কথা একবার চকিতে তার মনের উপর দিয়ে দৌড়ে গিয়েছিল বৈকি। (রক্ত চিহ্ন ॥ শওকত, ২০০৩ : ৪৯৫)

(ঙ) সমগ্র পৃথিবী নিঃশব্দে ঘুমায়। (দ্বিতীয় অভিসার ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫৫২)

(চ) মাঝে মাঝে মিলিটারি টহল গাড়ী শুধু ঘর্ঘর শব্দে নির্জনতার সমতলে হুল ফোটায়। (কেন মৌন ॥ শওকত, ২০০৩ : ৬৭৬)

(ছ) বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের দাবানল নানা দ্বিখণ্ডিতায় দীর্ণ লেলিহান সর্প-জিহবার মত বিস্তারিত। (এবং তিন মির্জা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫২৪)

(জ) আমার দুই চোখ হঠাৎ অপর জোড়ার মধ্যে সাঁতার কাটতে লাগল। (কে প্রাদে ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫৬৬)

(ঝ) অক্ষি-কোটরের ভেতর দিয়ে ছুটে আসছে দ্রুত উঁচু উঁচু ঢেউ তুলে। (নিজের লাশ লইয়া ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫৯১)

(ঞ) আবছা জোছনার আলোর বিস্তারে অন্ধকার থতমত খায়। (অনন্ত বাসর ॥ শওকত, ২০০৩ : ৬৫৩)

wPÎagx fvlv

(ক) একটি কুমারী মেয়ের দিকে আকাশ চেয়ে আছে।... গোধূলি-লগ্নে আকাশ শুধু জানালার দিকে চেয়ে থাকে। (ফয়সালা ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫৩০)

(খ) তখন পৃথিবী জেগে উঠবে, যে-পৃথিবী সুপ্ত, গভীর প্রশান্তির মধ্যে হয়ত সুখস্বপ্ন দেখছে। পৃথিবী জেগে উঠলে তার পৃথিবী ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। (দ্বিতীয় অভিসার ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫৫৩)

(গ) থমথমে মুখ এক-আকাশ ঐশ্বর্যে বিপুলতার বাহন। চোখের পাতা তরুলতার ধূসরিত ছায়ায় যেন কোন অনাগত শ্রাবণকে ডাক দিচ্ছে। (দম্পতি ॥ শওকত, ২০০৩ : ৫৪৩)

(খ) বন্দীশালা থেকে পলাতক কোনো প্রেমিক ও দয়িতা অশ্বপৃষ্ঠে আসীন থাকে, তাহলে ওই ক্ষুরধ্বনির কাছ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতও ম্লান। (হন্তারক ॥ শওকত, ১৯৯১ : ২০)

শওকত ওসমানের গল্পগুলোতে যেমন রাজনৈতিক সচেতনতা, সমাজসচেতনতা, প্রবহমাণ ঘটনাস্রোত, বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণের সন্ধান পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর গল্পের শিল্পকৌশলে প্রভাব বিস্তার করেছে বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যের-সংগ্রামের নিবিড় সম্পৃক্ততা। "সৃষ্টিশীল সাধনা ও মননচর্চাকে শওকত ওসমান বাঙালির জাতীয় চেতনার গুণগত বিকাশের শিল্পক্রিয়ায় পরিণত করেছেন। ক্রমাগত অন্ধকারের দিকে ধাবমান রাষ্ট্র ও সমাজযন্ত্রের সামনে তিনি উপস্থাপন করেন প্রগতি আলোয়– উত্তরণের দিগদর্শন।...জাতীয় ইতিহাসের দীর্ঘ সময়ক্রমের মধ্য দিয়ে বহমান এই ব্যক্তিপুরুষ এখন নিজেই হয়ে উঠেছেন জাতির ইতিহাসচেতনা, সৃজনশীলতা ও মননধর্মের মূর্ত প্রতীক।" (রফিকউল্লাহ, ২০০৭ : ১৭৫) শওকত ওসমানের এ-পর্বের ছোটগল্প বিষয়গৌরবে যেমন ব্যতিক্রমী, প্রকরণ-পরিচর্যাও তেমনি উজ্জ্বল।

Mš' I ceÜcwÄ

অনীক মাহমুদ (১৯৯৫)। evsjv K_vmvwn‡Z¨ kIKZ Imgvb, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৯১)। 'শওকত ওসমানের প্রভাব ও প্রস্তুতি'; wbmM [সম্পা. সরকার আশরাফ], বাণী প্রকাশনী, বগুড়া।

আজহার ইসলাম (১৯৯৬)। evsjv‡'‡ki †QvUMí : welq-fvebv ¯i/c I wkígj¨, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

চঞ্চল কুমার বোস (২০১১)। evsjv‡'‡ki K_vmvwnZ¨ Ges Ab¨vb¨, শব্দকোষ প্রকাশনী, ঢাকা।

বীরেন্দ্র দত্ত (২০০০)। evsjv †QvUMí cm½ I cKiY, পুস্তক বিপণী, কলকাতা।

রফিকউল্লাহ খান (২০০৭)। gvB‡Kj iex›'bv_ I Ab¨vb¨, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা।

শওকত ওসমান (১৯৯১)| nšÍviK, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০০৩)। kIKZ Imgvb MímgM [সম্পা. বুলবন ওসমান], সময় প্রকাশন, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০০৭)। ivnbvgv 1 †Q‡j‡ejv I ˆK‡kvi †Kvjvnj, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

Dcmsnvi

শওকত ওসমানের শিল্পচেতনা মূলত সমকালেরই নির্দেশক। ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ— এই তিন কালপর্বে বিস্তৃত জীবনে শওকত ওসমান দীর্ঘকাল নিবিষ্টচিত্তে সাহিত্যসাধনায় মগ্ন ছিলেন। অর্থাৎ তিনি প্রবহমাণ সময়ের সমান্তরালে তাঁর সাহিত্যের ভুবন সৃষ্টি করেছেন। বাংলা সাহিত্যের নিরীক্ষাধর্মী পরিব্রাজক হিসেবে তিনি শৈল্পিক সৃজন-আকাঙ্ক্ষার সাথে ব্যক্তিক-রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার সমন্বয় সাধন করে কথাসাহিত্যে নিজের স্থান চিহ্নিত করেছেন। সৃজননিরীক্ষার বৈচিত্র্যে সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তি-ধর্ম-সমাজ মানসের সত্য উদঘাটন প্রচেষ্টাই ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। একদিকে ইতিহাস-সচেতন মন, অন্যদিকে বহমান ঘটনাস্রোত তাঁর গল্পের পরিপুষ্টি সাধনে সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাঁর শিল্পকৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্য বাস্তবের শিল্পমণ্ডিত উপস্থাপনা। শওকত ওসমান অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পরিশীলিত রুচিবোধ, নৈতিক মানবিকতাবোধ, সুতীক্ষ্ণ শিল্পজ্ঞান, সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ, আধুনিক ধ্যান-ধারণার সাহায্যে ভারতবর্ষীয় সমাজ তথা বাঙালি জীবনের অজ্ঞতা, সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাবনার সকল প্রান্তকে সাহিত্যিক-জীবনে সূচনাতেই আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন। বহমান সময়-সমাজ-সমাজস্থ মানুষ এবং ইতিহাসের সাথে আধুনিক চিন্তা-চেতনার সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন।

শওকত ওসমানের গল্পের পটভূমি জীবন-সমাজ ও সময়ের অন্তর্নিহিত চেতনায় বিশিষ্ট। জীবনসন্ধানী লেখক তাঁর শেকড়ায়িত চেতনা দিয়ে তিন কালপর্বের ঘটনা-প্রবাহকে বিশ্লেষণ করে তা তুলে ধরেছেন গল্পের শিল্পভাষ্যে। সময়-সংকট ও জীবনাদর্শ নির্বাচনের প্রশ্নে শওকত ওসমানের গল্প প্রাগ্রসর কালের শিল্পরূপ। এ-জন্য তাঁর রচনাতে দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭ সালের বাংলাভাগ, ভাষা আন্দোলন, সামরিক শাসন, ১৯৭১ সালের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ গাঢ় রঙে অঙ্কিত। তাছাড়া মার্কসীয় সমাজভাবনাও তাঁর সাহিত্যিক মানসকে প্রভাবিত করেছে। মার্কসীয় সমাজবীক্ষণের ফলে গল্পকার দারিদ্র্য, মধ্যবিত্ত শ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতিচ্ছবি, অন্যায়-অবিচার, আন্দোলন, সমাজ পরিবর্তন এমনকি বারবধূদের চিত্র এঁকেছেন সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার তুলিতে। লেখকের সমাজমনস্ক চিন্তা-চেতনা ইতিহাসের পথ ধরে ভবিষ্যৎ-সমাজ বিনির্মাণের দিকে অগ্রসর হয়েছে। ঘটমান ইতিহাসকে তিনি সাহিত্যকর্মের প্রধান উপজীব্য করলেও নর-নারীর স্বাভাবিক সম্পর্ক উপস্থাপনেও সমান পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে তিনি তাঁর সাহিত্য-সাধনাতে ঘটনা ও চরিত্রের বহির্বাস্তবতা এবং অন্তর্বাস্তবতার সমন্বয় সাধনে ছিলেন সচেতন। তাঁর ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে ঘটমান সময়-স্রোতের নানাবিধ

চিত্র এবং বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যা। জীবন আর বাস্তবতার সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে তিনি বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের সাথে চরিত্রেরও বিবর্তন ঘটিয়েছেন। তাই বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, এক চরিত্র থেকে আরেক চরিত্র নির্মাণে গল্পকারের সাবলীল পদক্ষেপ সহজেই পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়। শওকত ওসমানের গল্পের চরিত্র-পাত্ররা আদর্শের বরপুত্র নয়, দ্বন্দ্ব জটিল এক সময়ের সন্তান, যে-সময়ে আবহমান কার্যকারণ শৃঙ্খলাযুক্ত অতীত আছে এবং অনাদি ভবিষ্যতের সংগ্রামী সম্ভাবনার বীজ তার গর্ভে অঙ্কুরিত এবং ক্রমবর্ধমান। তিনি কেবল চরিত্রের রূপকে দেখেননি, তার স্বরূপকেও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে আধুনিক জীবনভাবনা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, শোষণমুক্ত সমাজের প্রত্যাশা, প্রবহমাণ কালকে উপস্থাপন করেছেন। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়বাহী শওকত ওসমানের গল্পে সুদীর্ঘ জীবন পথের বিভিন্ন সময়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার চিত্র, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের বাস্তব সমস্যা সুদৃঢ়ভাবে বিন্যস্ত। তিনি চল্লিশের দশকে লেখা আরম্ভ করেন; এরপরে তিনি আর কলম থামাননি— অবিরামভাবে লিখে গেছেন নব্বই-এর দশক পর্যন্ত। কালের সরণি পেরিয়ে শওকত ওসমানের ছোটগল্প যত পরিণত হয়েছে, ততই তাতে যুক্ত হয়েছে নতুন বিষয়-শিল্পাঙ্গিক। ফলে তাঁর লেখা যেমন গতি অর্জন করেছে, তেমনি বাংলা সাহিত্যও সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

শওকত ওসমানের সাহিত্যিক মন আবর্তিত হয়েছে এদেশের প্রকৃতি, সমাজ, জীবন ও তার পরিপার্শ্বকে ঘিরে। প্রতিটি কালপর্বের সময়স্রোতের আন্তর বৈশিষ্ট্যকে তিনি বিষয়ভাবনার মর্মমূলে স্থাপন করে সাহিত্য রচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ফলে স্বদেশের সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে তাঁর গল্পে। গল্পে তিনি প্রগতিশীল চিন্তাধারার আলোকে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী এবং ধর্মান্ধতার বিষয়গুলোকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। একই সাথে সমাজ জীবনের রূপকার এবং সমাজ সমালোচক হিসেবে তিনি বাংলা ছোটগল্পে ফুটিয়ে তুললেন সমাজের প্রকৃত রূপ। জীবন এবং বাস্তবতার সমন্বয় সাধনার্থে শওকত ওসমানের গল্পের বিষয়বস্তু এবং চিন্তা-জগতের পরিবর্তন লক্ষযোগ্য। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পরিবেশের পরিবর্তনের সমান্তরালে তাঁর গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্যেও দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ-কারণে তাঁর তিন কালপর্বের গল্পে বিষয়বৈচিত্র্যে স্পষ্ট বিভাজনরেখা ফুটে উঠেছে।

ব্রিটিশ কালপর্বের (ত্রিশ ও চল্লিশের দশক) ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধকাল শওকত ওসমানের সাহিত্যিক মানসকে করেছে ঋদ্ধ এবং সাহিত্যের বিষয়কে করেছে বৈচিত্র্যময়। তাঁর এ-কালপর্বের গল্পে উপকরণ নির্বাচনে নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবনের প্রাধান্যে মৃত্তিকামূলস্পর্শী জীবনাকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটেছে। সমাজবাস্তবতার রূপকার শওকত ওসমানের এ-কালপর্বের গল্পের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে গ্রামীণ জীবনালেখ্য। প্রথম দিকে তিনি মুসলিম মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত জীবনপ্রাঙ্গণ থেকে চয়ন করেছেন গল্পের উপাদান। গ্রামীণ জীবনের চিত্র অঙ্কনসূত্রে গ্রামীণ অর্থনৈতিক সংকট এবং দারিদ্র্য অনিবার্যভাবে উঠে এসেছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। লেখক তাঁর এ-পর্বের গল্পে দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষ এবং

দারিদ্র্যের রূপকে আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বাংলাভাগ পূববর্তী অস্থিরতা, মধ্যবিত্তের সংকট, রোম্যান্টিক ভাবাবেগ, দরিদ্র মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, শ্রেণিশোষণ, ধর্মশোষণ, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, কুসংস্কারের প্রতি আঘাত, ভাববাদ বা ভক্তিবাদের প্রতি তীব্র আক্রমণ এবং গ্রামীণ সংকট সুস্পষ্টভাবে এ কালপর্বের গল্পে প্রতীকায়িত হয়েছে। ব্রিটিশ কালপর্বে রচিত শওকত ওসমানের গল্পের নামকরণও গল্পের রক্ত-মাংস-মজ্জা-প্রাণের সম্পর্কে বাঁধা। লেখকের ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পের ক্যানভাসে মৃত্তিকামূলস্পর্শী মানুষের জীবনের পরিপ্রেক্ষিত, ব্যক্তির স্ফুরণের বহুবর্ণিল চিত্র নানা রঙে এঁকেছেন। এ-পর্বের গল্পে গ্রাম-জীবন-নির্ভর চরিত্রের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে সমাজের নিচুতলার এবং মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কনে এ-পর্বে গল্পকারের নিবিষ্টতা উজ্জ্বলরেখায় প্রতিভাসিত হয়। গল্পগুলোর অধিকাংশ চরিত্র গ্রামীণ নিম্নবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। তাছাড়া এ-জাতীয় চরিত্রগুলোর অবস্থান নাগরিকতা বা আধুনিকতার ছোঁয়া থেকে বেশ দূরে। এ পর্বে রোম্যান্টিকতা দ্বারাও প্রভাবিত ছিল গল্পের চরিত্রেরা।

শওকত ওসমানের পাকিস্তান-কালপর্বের গল্পে বিষয়ের বিস্তৃতি ঘটেছে। বাংলাভাগোত্তরকাল থেকেই শওকত ওসমানের ছোটগল্পে সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্মচিন্তা, ব্যক্তিক সংকট এবং সমকালীন আন্দোলনের সমান্তরালে বিন্যস্ত হয়েছে তাঁর জীবনভাবনা। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পের উপাদানের গ্রামজীবনমুখিতা এ পর্বে নাগরিক জীবনের স্বরূপ-সন্ধানে বাঁক পরিবর্তন করেছে। এ-পর্বের গল্পে ১৯৪৭ সালের বাংলাভাগের প্রতিক্রিয়া, ভাষা আন্দোলন, সামরিক শাসন ব্যবস্থা, মুক্তি সংগ্রামের প্রস্তুতি, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, নরনারীর সম্পর্ক, মধ্যবিত্তের সংকট এবং মানবমনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জটিল গ্রন্থি উন্মোচিত হয়েছে। এ-পর্বের গল্পে নিম্নবিত্ত শ্রেণিচরিত্র থেকে মধ্যবিত্ত জীবনের দিকে ক্রমশ শওকত ওসমানের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে। আধুনিকতার ছোঁয়া এবং নাগরিকতার সংস্পর্শে চরিত্রগুলোর মধ্যেও নানাবিধ জটিলতা সঞ্চারিত হয়েছে। এ-পর্বের গল্পে সাধারণ শ্রেণিচরিত্রের পাশাপাশি নানা পেশাজীবী-চরিত্র বিশেষ করে অফিসার-ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-কেরানি-মোল্লা-মৌলভী-পাদ্রী আসতে থাকে ব্যাপকভাবে। এছাড়াও এ-পর্বে সমাজ-রাষ্ট্র-ইতিহাস থেকে উত্থিত বিভিন্ন চরিত্র তাঁর গল্পে ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছে। এ-পর্বের চরিত্র-পাত্ররা সমাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্তিত্বের পরীক্ষায় সংগ্রামরত, কুসংস্কার ও ধর্মব্যবসার পুরুষানুক্রমিক শোষণে আলোড়িত এবং পাকিস্তানি শোষকের নিষ্পেষণে পদদলিত কিন্তু দেশমাতৃকার স্বাধীনতা-চিন্তায় আন্দোলিত।

১৯৭১ সালের মর্মন্তুদ বাস্তবতা প্রগতিবাদী-জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পী শওকত ওসমানের সাহিত্যিক মানসের বাঁক পরিবর্তনে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। এ পর্বে লেখক বাংলাদেশের যুদ্ধোত্তর সমাজবাস্তবতা নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তাই এ অংশের গল্পে বাঙালি ও বাংলাদেশের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ধ্রুপদী ঘটনা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা-পরবর্তী অস্থিরতা, সমাজ-রাষ্ট্র

Dhaka University Institutional Repository

ভাবনার বিভিন্ন দিক, ১৯৭৫-পরবর্তী নবোদ্ভূত সেনাতন্ত্রের কর্মপ্রবাহ, নেপথ্য শক্তি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জাতীয়-আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীসমূহের সক্রিয় ভূমিকা এবং ব্যক্তির আত্মিক সংকট-সমস্যা-সংশয়ের কথা উপস্থাপিত হয়েছে। এ-কালপর্বের গল্পের নামকরণে লেখক কখনও ঘটনাশ্রয়ী, কখনও রূপক-প্রতীকের ধর্ম-অবলম্বী, আবার কখনও ইতিহাস-ঐতিহ্যের পথ অনুসারী। গল্পের অন্তর্নিহিত বক্তব্যের সঙ্গে গভীর সম্পর্কসূত্রে রূপক-প্রতীকের ব্যবহার গল্পে যেমন ব্যঞ্জনা এনেছে, তেমনি নামকরণেও সৃষ্টি করেছে চমৎকারিত্ব। এ-পর্বে অধিকাংশ গল্পের চরিত্রসমূহ একাত্তরের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় বিন্যস্ত। বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্ম-যন্ত্রণার রক্তিম লাবণ্যে গল্পের চরিত্রগুলো সজীব। কাল্পনিকতা পরিহার করে বাস্তবের জারক রসে এ-পর্বের চরিত্রগুলো অনেকাংশে সিক্ত। তাছাড়া বরাবরের মতো দরিদ্র মানুষের প্রতি পক্ষপাতের স্মারক স্বরূপ গল্পকার এ-পর্বে উচ্চবিত্ত শ্রেণি চরিত্র অপেক্ষা নিম্নবিত্ত শ্রেণি চরিত্র বিশেষ করে চোর, ডাকাত, দারওয়ান, উন্মাদ শ্রেণির চরিত্রগুলো উজ্জ্বলরেখায় অঙ্কন করেছেন। তবে, এ-পর্বে সামগ্রিকভাবে দৈশিক ভাবনায় উজ্জীবিত চরিত্র অঙ্কনেই শওকত ওসমানের কুশলতা ধরা পড়ে| এখানে উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান কালপর্বের গল্পের চরিত্র অপেক্ষা এপর্বে চরিত্রগুলোর বলিষ্ঠতা ও ব্যক্তিত্বশীলতা অনেক বাঙ্ময়।

গল্পের আঙ্গিক নির্মাণের প্রশ্নে শওকত ওসমানের সাফল্য স্বীকৃত। লেখকের শিল্পদৃষ্টি ও সৃষ্টিবৈচিত্র্যের স্বরূপ বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যে অভিব্যঞ্জিত। তাঁর গল্পের দৃষ্টিকোণ, আঙ্গিক নির্মাণ, চরিত্রানুগ ভাষা-প্রয়োগ, এমনকি ব্যঞ্জনাধর্মী রূপক প্রতীকের ব্যবহার, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নব-আঙ্গিকের পরিচয় স্পষ্ট।। তীব্র ও গভীর ইঙ্গিতের দ্বারা, ক্ষেত্র বিশেষে রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে তিনি তাঁর গল্পের বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করে তোলেন। লেখকের রূপক-প্রতীকাশ্রয়ী মানসচেতনার জন্ম স্বকাল-সংকট থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্যই। তাঁর কৃতিত্ব তিনি অবরুদ্ধ সময়-সঙ্কটকে নিরীক্ষাধর্মী শিল্পরূপে উদ্ভাসিত করতে সমর্থ হন। ফলে তাঁর গল্পগুলো কখনও হয়ে ওঠে ইঙ্গিতধর্মী, কখনও ঘটনাধর্মী আবার কখনও রূপক-প্রতীকধর্মী। অল্প কথায় বা স্বল্প পরিসরে তিনি গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে ছিলেন তৎপর। বিষয়াংশের সাথে প্রকরণের শিল্পিত সম্পর্ক শওকত ওসমানের গল্প বাংলা সাহিত্যের ধারায় বিশিষ্টতার পরিচয়বাহী। তবে, শিল্পের বিচারে তাঁর সব গল্পই রসোত্তীর্ণ হয়েছে এ-কথা বলা যায় না। ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান কালপর্বের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মন্বন্তর, দেশ-বিভাগ, ভাষা আন্দোলন-বিষয়ক গল্পগলো সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করলেও বিপরীত দিকে রোম্যান্টিক আবহে নির্মিত নর-নারীর জটিল মনস্তত্ত্ব, গার্হস্থ্য-জীবন ও ধর্মীয় কুসংস্কারবিষয়ক গল্পগুলোতে শৈল্পিক শিথিলতা লক্ষ করা যায়।

গল্পের জমিনে শওকত ওসমান নাটকীয় পরিচর্যা (Dramatic treatment) এবং নাটকীয় শ্লেষ (Dramatic irony)-এর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে তিনি গল্পের বিষয়কে Deep Structure-এ রূপ দিতে গিয়ে বর্ণনধর্মী দৃশ্য (Narrative scene) ও সংলাপধর্মী দৃশ্যের

(Dialogue scence) অবতারণা করেছেন। তিনি সময়ের বিস্তারকে (Time span) যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করে গল্পের ধারাবাহিক বর্ণনভঙ্গি রক্ষা করেছেন। এছাড়া দৃশ্য রচনার (Scene composition) ক্ষেত্রে বাস্তবের নিখুঁত বিবরণ তাঁর গল্পে স্থান করে নিয়েছে। সমকালীন জীবন প্যাটার্নের সাথে সম্পর্কিত হয়েই সৃষ্টি হয়েছে শওকত ওসমানের গল্পের শিল্প প্যাটার্ন। তবে তিন কালপর্বের গল্পের শিল্পরীতির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ক্রমপরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

ব্রিটিশ কালপর্বে রচিত শওকত ওসমানের অধিকাংশ গল্পের কাহিনি বিন্যাস বর্ণনাত্মক এবং দীর্ঘ। এ-পর্বের গল্পে লেখক কাহিনিবিন্যাস-চরিত্রসৃষ্টি-পরিচর্যারীতিতে প্রচলিত ভিক্টোরীয় প্রকরণরীতিকেই ব্যবহার করেছেন। গল্পের অনুচ্ছেদ পরিকল্পনা তাঁর এ-পর্বের গল্পের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। এ-পর্বের গল্পে চরিত্র-সৃষ্টিতে গল্পকার ভিক্টোরীয় আদর্শবাদ, রোম্যান্টিক দৃষ্টিময়, আবেগী পরিচর্যাকেই অনিবার্য করে তুলেছেন। এ পর্বে রোম্যান্টিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তাঁর গল্পের কিছু চরিত্র। তাছাড়া চরিত্রের অন্তর্জটিলতা অপেক্ষা বাহ্যসংকট-স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং চরিত্রের যদি কিছু গতিসাধিত হয়ে থাকে তা এসেছে কাহিনির প্রয়োজনে, ঘটনার প্রয়োজনে নয়। শওকত ওসমান গল্পের ভাষা ব্যবহারেও ছিলেন গতানুগতিকতা বিরোধী। এ-পর্বে তিনি ভাষাকে হাতের ক্রীড়নক করে অবলীলাক্রমে আঞ্চলিক কথ্যভাষা, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত ভাষা, ধর্মব্যবসায়ী, শোষক শ্রেণি, কুলি, মজুর, পাগল, বারবনিতা এবং বিভিন্ন শ্রেণির নর-নারীর মুখের ভাষাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ-পর্বের গল্পে গ্রামীণ নিস্তরঙ্গ জীবন বর্ণনায় শওকত ওসমানের সাধু এবং চলিত উভয় ভাষারীতির ব্যবহারই দৃষ্টিগোচর হয়। কিছু গল্পের ভাষায় কাব্যিকতার ছোঁয়া পরিলক্ষিত হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভাষা হয়ে উঠেছে অলঙ্কারমণ্ডিত।

বাংলাভাগের পর থেকেই তাঁর জীবনদৃষ্টি রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের নানামুখী সংকট-সংগ্রামের সমান্তরালে বেগবান হয়েছে। সুতরাং অনিবার্যভাবে আঙ্গিকে ও পরিচর্যারীতিতে এসেছে পরিবর্তন। পাকিস্তান কালপর্বে শওকত ওসমানের সাহিত্যবৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্ততায়, তির্যকভাষণে, ইঙ্গিতময়তায়, রূপক-প্রতীকে এবং গূঢ় বাক্যপ্রয়োগে প্রকাশিত। বিশেষ করে এ-কালপর্বে স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে কলম ধরতে গিয়ে তাঁকে রূপক এবং প্রতীকধর্মিতার আশ্রয় নিতে হয়েছে। ফলে ভাষার সুতীক্ষ্ণ ব্যবহারের ফলে অধিকাংশ গল্প হয়ে উঠেছে রূপক-প্রতীকধর্মী এবং গল্পের নামকরণও রূপক-প্রতীকের বেড়াজালে আবর্তিত। এ-পর্বের গল্প বর্ণনার ক্ষেত্রে শওকত ওসমান আত্মজৈবনিক, উত্তম পুরুষের এবং কিছু গল্পে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহার করেছেন। লেখক ব্রিটিশ কালপর্বের গল্পে চরিত্রায়ণে ভিক্টোরীয় আদর্শবাদ, চরিত্রের বাহ্যিক রূপকে ফুটিয়ে তোলার কৌশলকে সচেতনভাবেই সমকালীন-ভাবনার গর্ভে বিসর্জন দেন। ব্যঞ্জনাধর্মী রূপক ও প্রতীকের আশ্রয়ে শওকত ওসমান প্রায়ই প্রকাশ করেন তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাস্রোত এবং সে চিন্তাস্রোতে সিক্ত হয়ে ওঠে তাঁর এ পর্বের গল্পের চরিত্রেরা। ঘটনা ও চরিত্রের কার্যকারণভিত্তিক বিকাশ এ পর্বে অন্তর্হিত; তার পরিবর্তে চরিত্র-রূপায়ণ ও ঘটনাবর্ণন হয়েছে ইঙ্গিতধর্মী-সঙ্কেতময়। তাছাড়া চরিত্রের বহির্বাস্তবতার সাথে

অন্তর্বাস্তবতার রসায়ন এ-পর্বের চরিত্রগুলোকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। এ-পর্বে চলিতরীতিতেই তিনি ছিলেন স্বাচ্ছন্দ্যবিহারী। চলিতরীতির ভাষা ব্যবহার করলেও গল্পের প্রয়োজনানুসারে উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন। তাঁর এ-পর্বের গল্পের ভাষা একাধারে বৈদগ্ধ্যপূর্ণ, ইঙ্গিতধর্মী, তির্যকতাপূর্ণ, অলঙ্কার বহুল ও চেতনাপ্রবাহী। রূপক-প্রতীক-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পের বহুল ব্যবহার এ-পর্বের ভাষাকে আলঙ্কারিক রূপ দান করেছে। তাঁর বাক্য ব্যবহার কখনও সরল, কখনবা জটিল ও দ্ব্যর্থতাবোধক। এ-পর্বে আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি-ইংরেজি শব্দের বহুল ব্যবহার গল্পকাহিনি এবং চরিত্রকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। কবিতার ন্যায় গল্পেও তিনি চিত্রকল্প, সমাসোক্তি এবং উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া সংলাপধর্মী ভাষার ব্যবহার এ-পর্বের গল্পকে নাট্যধর্মে সিক্ত করেছে।

রচনাকালানুসারে বিন্যস্ত শওকত ওসমানের গল্পের কাহিনি বিন্যাস পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় লেখকের শিল্পদৃষ্টি ক্রমশ স্বভূমিতে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি প্রতিটি পর্বেই নবমাত্রিক শিল্পরীতির সম্ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং সেই সূত্রে বাংলাদেশ কালপর্বেও গল্পের উপকরণ-প্রকরণের ক্ষেত্রে নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যের সন্ধান করেছেন। পাকিস্তান কালপর্ব অপেক্ষা বাংলাদেশ কালপর্বের গল্পে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি আরও বেশি শানিত-তীক্ষ্ণ এবং পরিশীলিত। এ-পর্বে তিনি ছোটগল্পের পরিচর্যা রীতিতে রূপক-প্রতীক, নাটকীয়তা, কাব্যিকতা ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া ফ্ল্যাশ ব্যাক, ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড, মনোবিশ্লেষণ, চেতনা প্রবাহরীতির প্রয়োগে লেখক এ পর্বের গল্পকে বিশিষ্ট করে তুলেছেন। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পকৌশলের পরিচর্যা রীতিতে তিনি হয়ে ওঠেন আরও বেশি নিরীক্ষাধর্মী। ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে শওকত ওসমানের শিল্পরীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বাঁক পরিবর্তন ঘটে। এ-পর্বের গল্পের পরিসর আরও বেশি সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রকাশধর্মিতা তীব্র। লেখকের এ-কালপর্বের গল্পের চরিত্রায়ণ কৌশল প্রতিনিধিত্বমূলক, কৃত্রিমতাবর্জিত, আত্মানুসন্ধানী। তিনি এ পর্বের গল্পের চরিত্র-বিকাশে কাহিনি বা ঘটনাকে প্রাধান্য দেননি— চিত্রাত্মক পরিচর্যা রীতি, ইঙ্গিতময়তা বা সংকেতময়তাকেই প্রধান করে তুলেছেন। এ-পর্বের বেশ কিছু গল্পের বিষয়-বিন্যাস অন্তর্মুখী ও প্রতীকধর্মী হওয়াতে, চরিত্রের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া বা তার মানসদ্বন্দ্বটিই বড় হয়ে উঠেছে। আর মানসদ্বন্দ্বের উৎসমূলে ক্রিয়াশীল তার দৈশিকচেতনা বা দেশপ্রেম। ফলে প্রতীকী ভাবনায় এবং দৈশিকচেতনার আলোকে ধরা পড়েছে চরিত্রের অন্তঃস্বরূপ। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে গল্পকারের গল্পে ভাষা ব্যবহারেও এসেছে নতুনত্ব, সেক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহার হয়ে উঠেছে আরও বেশি তির্যক এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আশ্রয়ী। এ-কালপর্বে রচিত উনপঞ্চাশটি গল্পের সবগুলোই চলিত রীতিতে রচিত। প্রতীক ও ইঙ্গিতধর্মী ভাষা ব্যবহারের সার্থক প্রয়োগ তাঁকে এক ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। গল্পের শব্দ-ভাষ্য এ-পর্বে সবচেয়ে ধারালো। ভাষা আবেগতাড়িত, কোথাও ত্রস্ত-অস্থির, কোথাও শানিত প্রতিক্রিয়ায় উজ্জ্বল, আবার কোথাও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের আধার। শব্দ ব্যবহারে গল্পকারের শুচিবায়ুগ্রস্ততা নেই, বাস্তবতাই তাঁর

অন্বিষ্ট। ব্রিটিশ-পাকিস্তান কালপর্বের ন্যায় এ-পর্বেও গল্পকার আঞ্চলিক-আরবি-ফারসি শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন।

শওকত ওসমান জীবনচলার পথে সমকালীন সমাজ, সংস্কৃতি, মানুষ এবং স্ব-কালের নানামাত্রিক জটিলতা, পারিপার্শ্বিকতাকে অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে তুলে ধরেছেন গল্পের শিল্পভাষ্যে। তিনি বাংলা ছোটগল্পে বিষয়গত কারণে দাবি করেন অনন্যতা। বিষয়ের পাশাপাশি প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্যেও তাঁর ছোটগল্প বিশিষ্ট। তাঁর সৃষ্টিকর্ম ইতিহাস, সামাজিক, রাজনৈতিক যুগ-জীবন-চিত্রেরই শিল্পভাষ্য। লেখকের সহজাত জীবনাচরণ ও জীবনবৈশিষ্ট্য তাঁর সাহিত্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে। তাঁর রচিত সাহিত্যসমূহ তাঁর আচরিত জীবনেরই প্রতিরূপ। এ-জন্য ব্যক্তি শওকত ওসমান ও সাহিত্যিক শওকত ওসমান বাংলা সাহিত্যে অভিন্ন-সত্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। জীবন চলার পথে মেকি-তোষামোদি-স্বার্থপর মনোবৃত্তিকে সচেতনভাবে পরিহার করে তিনি সাহিত্য-শিল্পকে বাস্তবের জারকরসে সমৃদ্ধ করেছেন। আঙ্গিক-নিরীক্ষা, চরিত্রানুগ ভাষা-প্রয়োগ এবং ব্যঞ্জনাধর্মী রূপক-প্রতীক ব্যবহার শওকত ওসমানের গল্পের অন্যতম সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য। বিষয়াংশের সঙ্গে প্রকরণের শিল্পিত সম্পর্কে শওকত ওসমানের গল্প বাংলা সাহিত্যের ধারায় বিশিষ্টতার পরিচয়বাহী। ষাট বছরের সাহিত্যচর্চায় শওকত ওসমানের পরিশ্রমী এবং সচেতন ভূমিকা, বিশেষ করে বাংলাদেশের একজন সার্থক ছোটগল্পকার হিসাবে তাঁর অনবদ্য অবদান বিশেষ গৌরবের সাথে বিবেচিত হবে।

MšcwÄ

K. (1) gjMš : kIKZ Imgv‡bi †QvUMí

M‡šíi bvg	Av‡jwPZ Mí	Abv‡jwPZ Mí
১. wcRiv‡cvj, নওরোজ লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৫১।	‘থুতু’, ‘ইলেম’, ‘পিঁজরাপোল’, ‘দাতব্য চিকিৎসালয়ে ইতিহাস’, ‘কাঁথা’ এবং ‘আলিম মুয়াজ্জিন’।	
২. Rb Avcv I Ab¨vb¨ Mí, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৫১।	‘জুনু আপা’, ‘সাদা ইমারত’, ‘নতুন জন্ম’, ‘গেঁহু’ এবং ‘দুই চোখ কানা’।	
3. mv‡eK Kvwnbx, ওয়ার্সী বুক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৫৩।	‘মো’জেজা’, ‘বকেয়া’, ‘ভাগাড়’, ‘সে কিরূপে স্বর্গে গেল’, ‘হুকুম নড়ে না’, ‘খোওয়াব’, ‘দীর্ণ পত্র’, ‘প্রতীক্ষা’, ‘তুচ্ছ স্মৃতি’, ‘দেনা’ এবং ‘বিবেক’।	
৪. c¯Íi djK, এ.বি. পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৪।	‘দুই মুসাফির’, ‘উভসঙ্গী’, ‘শিকারী’, ‘উদবৃত্ত’, ‘বর্ণামৃত’, ‘ভ্রূণাঙ্ক’, ‘দীক্ষায়ণ’, ‘গন্তব্য’, ‘পিতাপুত্র’, ‘গোর-নিদ্রা’, ‘প্রতিবেশী’, ‘চূর্ণলয়’, ‘সেলুন’, ‘আজব জীবিকা’ এবং ‘প্রস্তর ফলক : একটি রাগিনী’।	‘টুলেট’।
৫. Dcj ÿ¨, ওয়ার্সী বুক করপোরেশন, ঢাকা, (১৯৬৫)।	‘খলিফা’, ‘উপলক্ষ্য’, ‘দুই মোনাজাত’, ‘দাওয়াই’, ‘জবর খাতির’, ‘কালের অপরাধ’, ‘গুরুশিষ্য’, ‘যোগাযোগ’, ‘কাব্যফল’, ‘ফলাফল’, ‘দুই ধার্মিক’, ‘বাপের নাম’, , ‘পরিচয়’, ‘হেরফের’, ‘পত্নী ও উপপত্নী’ ‘আহার্য’ এবং ‘দম্পতি’	‘মোরগ মুর্গী’, ‘চর্মে মর্মে’, ‘কারণ’, ‘গ্রাম্য গল্প’, ‘পাঁচ আইন’, ‘ইভল্যুশান’, ‘ফারাক’ এবং ‘সাফাই’।
6. †bÎc_, নওরোজ	‘জনারণ্যে’, ‘বালকের মুখ’, ‘একটি বহস’,	‘দ্রব্যগুণ’, ‘তস্কর সঙ্গীত’,

কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৮।	‘নেত্রপথ’, ‘দেশ কাল পাত্র’, ‘গিরগিটি’, ‘আনারকলি’, ‘আপনি ও তুই’, ‘সাবালক’, ‘থেরী-সন’, ‘একটি উপহার’, ‘রাস্তার হদিস’, ‘খরচ তেরিজ’, ‘গ্রেশামং শরণং’, ‘ফলাফল’, ‘ব্ল্যাকআউট’, ‘গোরস্থানে’, ‘আদি অন্ত’, ‘শরিকান’, , ‘পুরস্কার’, ‘মন্ত্রগুণ’, ‘জিহ্বাহীন’, ‘চিড়িমার’ এবং ‘কুকুরের ভাষা’।	‘হিংসাধার’, ‘প্রতিষেধ’, উৎসর্গ’, ‘অকাল পক্ব’, ‘জন্তুগাথা’, ‘ব্ল্যাকমার্কেট’ এবং ‘চোর ও সাধু’।
৭. Dfk½, পুথিঘর লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৬৮।	‘মৎস্য’, ‘সৌদামিনী মালো’, ‘চিড়িয়া’, ‘সাহেবালি সাহেব’, ‘জমা-খরচ’, ‘নোট’, ‘স্বগতোক্তি’, ‘লুভ’, ‘কিংবদন্তী’, ‘বোন-বিবির কেচ্ছা’, ‘ফ্লাশ’, ‘শকুনের চোখ’, ‘জাতক কাহিনী’, ‘শৃগালস্য’, ‘রাতা’, ‘ষাঁড়’, ‘দানসত্র’, ‘আখেরী সংক্রান্ত’, ‘ফৌৎ’, ‘নেমক-হালাল’ এবং ‘উভশৃঙ্গ’।	‘গরু-চোরের কাহিনী’ এবং ‘কর্ণব্যাধি’।
৮. Rb¥ hw' Ze e‡½, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৫।	‘আলোক-অন্বেষা’, ‘বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া’, ‘সারেঙ সুখানী’, ‘বার্তাবহ’, ‘জন্ম যদি তব বঙ্গে’, ‘রক্ত চিহ্ন’, ‘দুই ব্রিগেডিয়ার’, ‘ক্ষমাবতী’, ‘ভারতীয় গোয়েন্দা’, ‘জননী : ‘জন্মভূমি’ এবং ‘ওয়াগান ব্রেকার’।	
৯. Ges wZb wgR©v, বর্ণ বিচিত্রা, ঢাকা, ১৯৮৬।	‘তিন মির্জা’, ‘ফয়সালা’, ‘শেষ আগে শুরু হয়’, ‘দম্পতি’, ‘ন্যায়-অন্যায়’ এবং ‘দ্বিতীয় অভিসার’।	
১০.. gwbe I Zvnvi KKi, প্যাপিরাস প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬।	‘গ্রহচ্যুত’, ‘কে প্রাদে’, ‘মনিব ও তাহার কুকুর’, ‘গোয়েন্দা কাহিনীর খসড়া’ এবং ‘ধর্মের দোহাই জবর’।	‘মুষ্টিযুদ্ধ লঘুনৃত্য’।
১১. civZb LÄi, ওয়ার্সী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭।	‘নিজের লাশ লইয়া’, ‘কবন্ধ কাহিনী’, ‘পুরাতন খঞ্জর’, ‘অসংখ্য শিকড় দুর্বার’, ‘শিয়া-সুন্নীর পূর্ব পুরুষ’, ‘ওয়েটিং রুম’, ‘এক কাফন চোরের আত্মকাহিনী’, এবং ‘দস্যু-দারোগা সংবাদ’।	‘অথবা’।
১২. weMZ Kv‡ji Mí, বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৮৭।	‘শেখ্জী’, ‘চুহা-চরিত’, ‘ব্যবধান’ এবং ‘মূল্যদান’।	
১৩. Ck‡ii cwZØ›Øx,	‘ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী’, ‘কুটিল ভবেৎ’, ‘শিবগঞ্জের	

পাইওনিয়ার পাবলিকেশান্স, ১৯৯০।	মেলা', 'অনন্ত বাসর', 'ভুবন পাগলার সমস্যা', 'জনপদে', 'নিদয়-নিদয়া', 'কেন মৌন' এবং 'স্বৈরিণী'।	
14. nšÍviK, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯১।	'হন্তারক'।	
১৫. ivRciæl, সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৯৪।	'রাজপুরুষ', 'আলিবাবা : লোকভাষ্য', 'রত্নাকর : একটি উপন্যাসের খসড়া', 'স্বজন স্বজাতি' এবং 'কালব্যাধি' ।	'ফলাফল জানা ছিল না' এবং 'চিৎকার'।

শওকত ওসমান (২০০৩)। kIKZ Imgvb MÍmgM [সম্পা. বুলবন ওসমান], সময় প্রকাশন, ঢাকা।

K. (2) gjMš : kIKZ Imgv‡bi Dcb¨vm

১. eYx Av'g, আজাদ, ঈদ সংখ্যা, কলকাতা ১৯৪৬।
২. Rbbx, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৫৮।
৩. Zviv 'BRb, গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৮।
৪. µxZ'v‡mi nvwm, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৬২।
৫. †PŠimwÜ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬৬।
৬. mgvMg, কথাকলি, ঢাকা, ১৯৬৮।
৭. ivRv DcvL¨vb, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭০।
৮. Rvnvbg nB‡Z we'vq, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭১।
৯. ÿ‡a †mvmvwj÷, ধানশীষ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৩।
১০. 'B ˆmwbK, নসাস, ঢাকা, ১৯৭৩।
১১. †bK‡o Ai‡Y¨, আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭৩।
১২. RjvsMx, নসাস, ঢাকা, ১৯৭৪।
১৩. cÂm½x, এভার নিউ প্রেস, ঢাকা, ১৯৭৫।
১৪. ivRmvÿx, তুরহান স্মৃতিলোক, ঢাকা, ১৯৮৩।
১৫. cZ½ wcÄi, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৮৩।
১৬. AvZbv', বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।
১৭. wcZciæ‡li cvc, নসাস, ঢাকা, ১৯৮৬।
১৮. RRMMv, শতরূপা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮।

K. (3) gjMš : kIKZ Imgv‡bi bvUK

Dhaka University Institutional Repository

১. Z¯‹i I j¯‹i, প্রগতি পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৪৮।
২. Avgjvi gvgjv, নওরোজ লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৪৯।
৩. KvKi-gwY, মাসিক মোহাম্মদী, ১৯৪৯।
৪. evM'v‡'i Kwe, কোহিনূর লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম, ১৩৫৯।
৫. GwZgLvbv, এ.বি.পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৫৫।
৬. Rb¥-Rb¥všÍi, তুরহান স্মৃতিলোক, ঢাকা, ১৯৮৬।
৭. bó Zvb Aó fvb, প্যাপিরাস প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৬।
৮. gwjqvi : cvPwU bvUK, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৭২ (১৯৬৫)।
৯. Wv³vi Ave'jøvi KviLvbv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩।
১০. KYPÝ, সমকাল পত্রিকা, ১৩৬৪।
১১. B¯'vU‡bi wewe, সমকাল পত্রিকা, ১৩৬৫।

K. (4) gjMš : kIKZ Imgv‡bi ceÜ

১. mg' b'x mgwcZ, নবজীবন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৩।
২. fve fvlv fvebv, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ১৯৭৪।
৩. BwZnv‡m we¯ÍwiZ, তুরহান স্মৃতিলোক, ঢাকা, ১৯৮৫।
৪. ms¯‹wZi PovB DrivB, তুরহান স্মৃতিলোক, ঢাকা, ১৯৮৫।
৫. gmwjg gvb‡mi i|cvšÍi, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬।
৬. wbtm½-wbgvY, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ১৯৮৬।
৭. cY¯vaxbZv PY¯vaxbZv, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০।

K. (5) gjMš : kIKZ Imgv‡bi Kve¨

১. wbR¯ msev' 'vZv †cwiZ, তুরহান স্মৃতিলোক, নতুন প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮২।
২. †k‡Li m¤iv, তুরহান স্মৃতিলোক, নতুন প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২।

K. (6) gjMš : kIKZ Imgv‡bi AvZ¥RxebxgjK iPbv

১. Kvj iwÎ LÐwPÎ, জগচ্চিত্র প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬।
২. ¯Rb ¯Mvg, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৬।
৩. ivnbvgv 1 : †Q‡j‡ejv I ˆK‡kvi †Kvjvnj,, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭।
৪. ivnbvgv 2 : Ab¨ iYcvšÍi I feb PZ‡i, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭।
৫. 1971 : ¯§wZLÐ gwRebMi, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯।
৬. DËice gwRebMi, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯।

K. (7) gjMš : kIKZ Imgv‡bi Imgv‡bi m¤úwv'Z Mš

১. dRjj n‡Ki Mí : ঢাকা, ১৯৮৩ (হবীবুল্লাহ বাহার ও আনোয়ারা বাহার চৌধুরী সহযোগে)।

L. kIKZ Imgvb-welqK MÖš' I cwÎKv
(KvjvbµwgK)

সরকার আশরাফ [সম্পা.] (১৯৯১)। wbmM, শওকত ওসমান সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বাণী প্রকাশনী, বগুড়া।
শিরীণ আখতার (১৯৯৩)। evsjv‡`‡ki wZbRb Jcb¨vwmK, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
অনীক মাহমুদ (১৯৯৫)। evsjv K_vmvwn‡Z¨ kIKZ Imgvb, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী।
ইকবাল আহমদ [সম্পা.] (১৯৯৮)। ˆkjx, শওকত ওসমান সংখ্যা, বর্ষ ৩, সংখ্যা ২২, নন্দিনী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
আবুল আজাদ (২০০০)। bRiæj Bmjvg-kIKZ Imgvb mgKvj-ms¯'wZ, রাইটার্স ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
আবু রুশদ্‌ (২০০৩)। kIKZ Imgvb I ˆmq` IqvjxDjøvni Dcb¨vm, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা।
সেলিনা বাহার জামান [সম্পা.] (২০০৪)। kIKZ Imgvb ¯§viK MÖš', বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।
বুলবন ওসমান (২০০৪)। K_v-mvwn‡Z¨ kIKZ Imgvb, সময় প্রকাশন, ঢাকা।
বুলবন ওসমান [সম্পা.] (২০০৮)। e¨w³ I mvwnwZ¨K kIKZ Imgvb, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা।
মোহাঃ সাইদুর রহমান (২০১১)। Avgv‡`i wZb Jcb¨vwmK, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।
কুদরত-ই-হুদা (২০১৩)। kIKZ Imgvb I m‡Z¨b †m‡bi Dcb¨vm : Aw½K wePvi, আদর্শ প্রকাশনী, ঢাকা।
স্মৃতি ভৌমিক (২০১৩)। bvU¨Kvi kIKZ Imgvb, সুচয়নী প্রকাশনী, ঢাকা।
শান্তনু কায়সার (২০১৩)। kIKZ Imgvb, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

M. mnvqK Mš
(eYvbµwgK)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯৯৮)। K‡jøvjhM, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা।
অনিন্দ্য ভট্টাচার্য (২০১১)। K_bZË I evsjv Dcb¨vm, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা।
অনুপম সেন (১৯৮৮)। evsjv‡`k : ivóª I mgvR-mvgwRK A_bwZi ¯^iƒc, সাহিত্য সমবায়, ঢাকা।
অমলেন্দু সেনগুপ্ত (১৯৮১)। DËvj Pwjøk-Amgvß wecøe, পার্ল পাবলিশার্স, কলিকাতা।
অমিতাভ দাস (২০১৪)। AvL¨vbZË, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৮২)। Kv‡ji cÖwZgv : evsjv †QvUM‡íi beYB eQi 1891-1980, ডি.এম লাইব্রেরী, কলকাতা।
অলোক রায় [সম্পা.] (১৯৬৭)। mvwnZ¨ †KvI K_v mvwnZ¨, বাগর্থ, কলকাতা।
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৫)। Ebwesk kZvãxi c_gva I evsjv mvwnZ¨, বুকল্যান্ড প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
আকবর আলি খান (২০১১)। civ_ciZvi A_bwZ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।
আজহার ইসলাম (১৯৯৬)। evsjv‡`‡ki †QvUMí : welq-fvebv ¯^iƒc I wkíiƒc, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
আনিসুজ্জামান (১৯৬৪)। gmwjg gvbm I evsjv mvwnZ¨, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা।
আনোয়ার পাশা (১৯৭৮)। iex›`` †QvUMí mgxÿv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
আবদুন নুর [সম্পা.] (২০০৮)। fvlv Av‡›`vj‡bi BwZK_v, মেলা, ঢাকা।
আবুল ফজল (২০০৬)। †iLwPÎ, গতিধারা, ঢাকা।
আবুল মনসুর আহমদ (২০০২)। Avgvi †`Lv ivRbwZi cÂvk eQi, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা।
আমিনুর রহমান সুলতান [সম্পা.] (২০১৩)। †mv‡gb P›`‡i Mí I MícvV, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।
আলাউদ্দিন মণ্ডল (২০০৯)। AvLZvi‌æ¾vgvb Bwjqvm wbgv‡Y wewbgv‡Y, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
আহমদ ছফা (২০১১)। wbewPZ ivR‰bwZK ceÜ, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা।
আহমেদ মাওলা (১৯৯৭)। evsjv‡`‡ki K_vmvwn‡Z¨ ceYZvmgহ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
ইন্দ্রানী চক্রবর্তী (১৯৯৯)। evsjv †QvUMí: iwZ cKiY I wbweo cvV, রত্নাবলী, কলকাতা।
ইমরান হোসেন (১৯৯৩)। evOwj gmwjg ew×Rxex : wPšÍv I Kg©, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
এ.আর.দেশাই (২০০১)। fviZxq RvZxqZvev‡`i mvgwRK cUf‚wg, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা।
এম এম আকাশ (১৯৮৭)। evsjv‡`‡ki A_bwZ I ivRbwZ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।
কালিপদ বিশ্বাস (২০১২)। h³ evOjvi †kl Aa¨vq, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।
ক্লিনটন বি সিলি (২০১১)। Abb¨ Rxebvb›`, অনুবাদ : প্রথমা প্রকাশনা, ঢাকা।
কুন্তল চট্টোপাধ্যায় (২০১২)। mvwn‡Z¨i iƒc-ixwZ I Ab¨vb¨ cm½, রত্নাবলী, কলকাতা।
ক্ষেত্র গুপ্ত (১৯৬৮)। iex›`ª‡bv_ : †QvUM‡íi mgvRZË, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা।
খালেদা হানুম (১৯৯৭)। evsjv‡`‡ki †QvUMí 1947-১৯৭০, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
খোন্দকার সিরাজুল ইসলাম (২০০৬)। gmwjg mvwnZ¨-mgvR : mgvRwPšÍv I mvwnZ¨Kg©, সূচীপত্র, ঢাকা।
গোপাল হালদার (২০০৮)। ms¯‹…Zi iƒcvšÍi, মুক্তধারা, ঢাকা।
গোপিকানাথ রায় চৌধুরী (১৯৮৬)। `B wekh‡×i ga¨Kvjxb evsjv K_vmvwnZ¨, দে’জ পাবলিশিং, কলিকাতা।

(১৯৯৭)। iex›'bv‡_i cKiYwkí, সাহিত্যলোক, কলিকাতা।

গোলাম মুরশিদ (২০০৮) । nvRvi eQ‡ii evOwj ms¯‥wZ, অবসর, ঢাকা।

চঞ্চল কুমার বোস (২০০৯)। evsjv‡'‡ki †QvUM‡íi wkíiƒc, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০১১)। evsjv K_vmvwnZ¨ Ges Ab¨vb¨, শব্দকোষ প্রকাশনী, ঢাকা।

জগমোহন মুখোপাধ্যায় (১৯৯২)। M‡elYvcÎ AbmÜvb I রচনা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা।

জয়ন্ত গোস্বামী (১৯৮৯)। mvwn‡Z¨ M‡elYv c×wZ I c‡য়াগ, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা।

জয়া চ্যাটার্জী (২০০৭)। evOjv fvM nj, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

জাহানারা ইমাম (২০১২)। GKvË‡ii w'b¸wj, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা।

জীবেন্দ্র সিংহ রায় (১৯৮৭)। K‡jøv‡ji Kvj, †দ'জ পাবলিশিং, কলিকাতা।

দেবেশ রায় (১৯৯১)। Dcb¨vm wb‡q, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৪০৮)। mvwn‡Z¨ †QvUMí, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

পল্লব সেনগুপ্ত (২০০২)। †jvKms¯‥wZi mxgvbv I ¯^iƒc, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

বদরুদ্দীন উমর (১৯৯৩)। wbevPZ ceÜ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

(২০০৯)। fvlv Av‡›`vjb I Ab¨vb¨ cm½, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

বশীর আল্ হেলাল (১৯৮৫)। fvlv-Av‡›`vj‡bi BwZnvm, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বিজলি প্রভা [সম্পা.] (২০০৯)। i³v³ evsjv, মুক্তধারা, ঢাকা।

বিনতা রায় চৌধুরী (১৯৯৭)। cÂv‡ki gš¿íi I evsjv mvwnZ¨, বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স, কলকাতা।

বিনয় ঘোষ (১৯৮০)। wkí ms¯‥wZ I mgvR, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০২)। evsjv K_vmvwnZ¨ পাঠ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০০৫)। bRiæj gvbm I Ab¨vb¨ cm½, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

(২০০৯)। evsjv‡'‡ki mvwnZ¨, আজকাল, ঢাকা।

বীরেন্দ্র দত্ত (১৯৮৯)। evsjv †QvUMí : cm½ I cKiY, ইন্ডিয়ান বুক মার্ট, কলকাতা।

(২০০২)। K‡jøvj †cwÿZ I †QvUMí, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

ভাস্বতী লাহিড়ী (১৯৯১)। mvgwRK I A_©bwZK †cÿvc‡U evsjv †QvUMí : 1940-50, শরৎ পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা।

ভীষ্মদেব চৌধুরী (১৯৯৮)। Zvivk¼i e‡›`¨vcva¨v‡qi Dcb¨vm: mgvR I ivRbxwZ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ভূদেব চৌধুরী (১৯৮৯)। evsjv mvwn‡Z¨i †QvUMí I MíKvi, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

মনসুর মুসা (২০০৪) [সম্পা.]। evOjv‡'k, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

মাহবুবুল আলম (২০১১)। evsjv‡'‡ki mvwnZ¨, গতিধারা প্রকাশনী, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা।

মাহবুব বোরহান (২০০৮)। Ave'j nK Rxeb I mvwnZ¨, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মিজানুর রহমান খান (২০০৮)। ebd‡ji †QvUMí : Rxeb'wó I wkíixwZ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুনতাসীর মামুন (১৯৯৯)। 1905 mv‡ji e½f½ I cee‡½ cwZwµqv, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মুসা আনসারী (১৯৯২)। BwZnvm : mgvR I ms¯‥wZ fvebv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (১৯৯৯) [সম্পা.]। Avengvb evsjv, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

মুহম্মদ হায়দার (২০০৩)। gyw³hy× I evsjv‡'‡ki †QvUMí, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (১৯৯৪)। M½vF×x †_‡K evsjv‡'k, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০১১)। hv †P‡qwQ hv †c‡qwQ, নিমফিয়া পাবলিকেশন, ঢাকা।

মোহাম্মদ হাননান (১৯৯৯)। evOwji BwZnvm, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।

মোবারক হোসেন (১৯৯৫) [সম্পা.] । GK‡ki wbevPZ ceÜ 1963-1976, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন (১৯৯৮)। gbxi †PŠaixi mwnZ¨Kg, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন (১৯৯৭)। evsjv‡`‡ki †QvUMí : Rxeb I mgvR, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (১৯৯১)। fviZ ¯^vaxb nj, [অনু. সুভাষ মুখোপাধ্যায়], ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা।

রুশতী সেন (১৯৯৭)। mgKv‡ji Mí Dcb¨vm, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

রথীন্দ্রনাথ রায় (১৯৫৯)। †QvUM‡íi K_v, সুপ্রকাশ প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৭)। evsjv‡`‡ki Dcb¨vm : welq I wkíiƒc, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০০৭)। gvB‡Kj iex›`bv_ I Ab¨vb¨, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম (২০১১)। evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZv msMvg, ঐতিহ্য, ঢাকা।

রবিউল ইসলাম (২০১৩)। mgKvj cwÎKvi mwnwZ¨K I mvs¯‹wZK fwgKv, ঝিনুক প্রকাশনী, ঢাকা।

রবিন পাল (১৯৯৮)। K‡jøwjZ †QvUMí, বুক ট্রাস্ট, কলকাতা।

রশীদ আল ফারুকী (১৯৮৪)। mgKvjxb cm½, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

(১৯৮৫)। evsjvi RvMiY I Ab¨vb¨ cm½, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রেজোয়ান সিদ্দিকী (২০০৬)। ce evsjvi mvs¯‹wZK msMVb I mvs¯‹wZK Av‡›`vjb, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা।

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় (২০১২)। †Qv‡UvMí ZËmÜvb I mgv‡jvPbwPšÍv, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

শাহজাহান মনির (১৯৯৩)। evsjv mwn‡Z¨ evOwj gmjgvb‡`i wPšÍvaviv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শিখা ঘোষ (১৯৯০)। gwbK e‡›`¨vcva¨v‡qi †QvUMí : AeqeMZ we‡kølY, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

শিশিরকুমার দাশ (১৯৮৩)। evsjv †QvUMí (১৮৭৩-১৯২৩), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৮)। e½mwn‡Z¨ Dcb¨v‡mi aviv, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

শ্রী নরেন্দ্র চক্রবর্তী (১৩৫৭)। evsjv †QvUMí msw ÿß mgv‡jvPbv, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৯) cjwk †_‡K cwUkvb, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা।

সরোজ মোহন মিত্র (১৩৮৬)। †QvUM‡íi wewPÎ K_v, গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

(১৯৯৭)। evsjvq Mí I †QvUMí, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা।

সাঈদ-উর-রহমান (১৯৮৩) ce evsjvi ivRbxwZ, ms¯‹wZ I KweZv, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সানজিদা আকতার (২০০২)। evsjv †QvUM‡í †`kwefvM, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ (২০০০)। evsjv‡`k : AZxZ eZgvb fwel¨r, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

সায়েদা বানু (২০০০)। evsjv‡`‡ki †QvUM‡í ev¯ÍeZvi ¯^iƒc, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা।

সিরাজ সালেকীন (২০০৬)। Rxebvb›` `v‡ki †QvUMí : RxebwRÁvmv I ˆkjxwePvi, ঐতিহ্য, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম [সম্পা.] (১৯৯৩)। evsjv‡`‡ki BwZnvm 1704-1971, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য [সম্পা.] (১৯৯০)। AvšÍRwZK †QvUMí I mgvR wRÁvmv, প্রতিভাস, কলকাতা।

সেমন্তী ঘোষ [সম্পা.] (২০১১)। †`kfvM : ¯§wZ Avi ¯ÍäZv, গাঙচিল, কলকাতা।

সেলিম জাহাঙ্গীর (১৯৯৩)। gxi gkvii‡di †nv‡mb : Rxeb I mwnZ¨, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৮৫)। evsjv‡`‡ki mwnZ¨ I Ab¨vb¨ cm½, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(১৯৯৭) cm½ : evsjv K_vmwnZ¨, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক (১৯৯৮)। gwbK e‡›`¨vcva¨v‡qi †QvUMí : mgvR‡PZbv I Rxe‡bi iƒcvqY, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

(২০১১)। gb I gbb, ধ্রুবপদ, ঢাকা।

হারুন-অর-রশিদ (২০০৭)। evsjv‡'k : ivRbxwZ miKvi I kvmbZvwšK Dbqb 1757-2000, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

হাসান আজিজুল হক (১৯৯৯)। K_vmwn‡Z¨i K_KZv, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

(২০১৩)। wPšÍb-KYv, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

N. mnvqK Bs‡iwR Mš (eYvbµwgK)

A. K. Nazmul karim (1976). *Changing Society in India, Pakistan and Banglaseh* , Dhaka.

David Diaches (1964). *A Study of Literature for readers and critics*, The Norton Library, London.

David Lodge (1984) *Language of Fiction*, Rautledge and Kegan Paul, 2nd edn, London

Henry James (1957) *The House of Fiction*, London.

Percy Lubook (1968) *The Craft of Fiction*, Jonathan Cape, London.

Ralph Fox (1937) *The Novel and the people*, London.

Sir Jadunath Sarkar (1972) *The History of Bengal.* Vol 2. 2nd imp, The University of Dhaka.

Sumit Sarkar (1977) *The Swadeshi Movement in Bengal*, New Delli.

O. mnvqK cwÎKv
(eYvbµwgK)

দুলাল ভৌমিক [সম্পা.] (২০০৯)। evsjv‡'k GwkqwUK †mvmvBwU cwÎKv। সপ্তবিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা। ঢাকা।

সিদ্দিকা মাহমুদা [সম্পা.] (২০১২)। mvwnZ¨ cwÎKv। বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্ষ : ৪৯, সংখ্যা : ২ । ফাল্গুন, ঢাকা।